# উনিশ শতকের বাঙলা সাহিত্যে কেশবচন্দ্র

ড. ঝরা বসু

জি জ্ঞা সা

কলিকাতা-৯ ।। কলিকাতা-২৯

প্রথম প্রকাশ :   মাঘ ১৩৭১, জানুয়ারি ১৯৬৪

প্রকাশক
শ্রীশ্রীশকুমার কুণ্ড
জি জ্ঞা সা
১এ ও ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৯
১৩৩এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-২৯

মুদ্রক
শ্রীএককড়ি ভড়
নিউ শক্তি প্রেস
১০ রাজেন্দ্রনাথ সেন লেন,
কলিকাতা-৬

# ভূমিকা

ঊনবিংশ শতাব্দীর পরিস্থিতে বাংলাদেশে ধর্ম-আন্দোলন প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ধর্মের অন্তর্নিহিত ব্যাখ্যা, প্রচার, প্রথা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুক্তির প্রয়াস এবং সাংস্কৃতিক জীবনের পুনরুজ্জীবন, সাহিত্য সৃষ্টি এবং সামাজিক আন্দোলন, ধর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। অন্যদিকে খ্রীষ্টীয় ধর্মপ্রচারকগণ জনসাধারণের মধ্যে ভীতি ও প্রলোভন প্রদর্শন করে তাদের ধর্মে দীক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। রাজা রামমোহন তাঁর 'ব্রাহ্মণসেবধি' পত্রিকায় খ্রীষ্টীয় ধর্মপ্রচারকগণের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা করেন। তিনি তাদের মুসলমান-অধ্যুষিত দেশসমূহে খ্রীষ্টীয় ধর্মের আদর্শ প্রচারে উপদেশ দেন।

রাজা রামমোহন 'ব্রহ্মসভা' প্রতিষ্ঠা করেন ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে। এর পূর্বে শাস্ত্রীয় আলোচনা, বেদপাঠ এবং ব্রহ্মসংগীতের জন্ম 'আত্মীয় সভা' ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। রামমোহন তাঁর ব্রহ্মসভাকে সকল ধর্মের মিলন-ক্ষেত্ররূপে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। রামমোহনের আদর্শে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন। তাঁর সঙ্গে কেশবচন্দ্র সেন তাঁর অসাধারণ কর্মদক্ষতা, ধর্মবিশ্বাস এবং বাগ্মিতা নিয়ে যোগদান করেন। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাহ্মিকা সমাজ স্থাপিত হয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে কোন কোন বিষয়ে মতভেদ হওয়ায় তিনি নূতন ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত করেন। কেশবচন্দ্রের আদর্শের মূলে ছিল ধর্ম ও সমাজের সংস্কারসাধন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সমাজ নববিধানরূপে পরিচিত। 'পৃথিবীর সকল বিধান যাহার মধ্যে নিহিত তাহাই নববিধান।' নববিধানে ভক্তি, যোগ ও কর্মের সামঞ্জস্য ঘটেছে। সকল ধর্মের যা কিছু শ্রেষ্ঠ, তিনি তা গ্রহণে দ্বিধা করেন নি। তাই নববিধান একাধারে ভারতীয় ও বিশ্বজনীন। ঈশ্বরকে এখানে পিতা রূপে কল্পনা করা হলেও বিশ্বজননীর ভাব এখানে বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছে।

কেশবচন্দ্রের জন্ম হয়েছিল গোঁড়া বৈষ্ণব পরিবারে। সুতরাং ভক্তির ভাব ছিল তাঁর মধ্যে সহজাত। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আলোকিত বিশুদ্ধ হৃদয় এবং আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞানকে ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তি রূপে প্রচার করেন কেশবচন্দ্র তার মধ্যে যুক্ত করেন ভক্তির ধারা।

বাংলা সাহিত্যে কেশবচন্দ্রের দান বিশিষ্ট। ধর্মকে কেন্দ্র করে একদা বাংলা সাহিত্যের বিকাশ ঘটলেও পরবর্তী কালে তা নানা শাখা-প্রশাখায় ব্যাপ্তি লাভ করেছে। রাজা রামমোহন বেদান্ত গ্রন্থ রচনা করে বাংলা সাহিত্যকে গ্রানিট প্রস্তরের ওপরে স্থাপন করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ধর্মসম্পর্কিত নানা আলোচনা, অক্ষয়কুমার দত্ত ও রাজনারায়ণ বসুর গদ্য প্রবন্ধসমূহ বাংলা গদ্য ভাষাকে বিকশিত করে তুলতে সাহায্য করে। কেশবচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক, অথচ তাঁর সাহিত্য রচনায় বঙ্কিমের কোন প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না। কেশবচন্দ্র নানা বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনা 'জীবনবেদ' নানা তত্ত্বের অবতারণায় সমৃদ্ধ। এখানে তিনি প্রচার করেন যে, ঈশ্বর শুধু নিরাকার ব্রহ্ম নন, তিনি ভক্তের ভগবান্। কবির আন্তরিক অনুভূতি নিয়ে তিনি গ্রন্থটি লিখেছেন। তাঁর গ্রন্থের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হল প্রকৃতিপ্রেম। 'সুলভ সমাচারে' তাঁর সাম্যবাদ-মূলক আলোচনা আমাদের বিস্মিত করে। বঙ্কিমচন্দ্র 'কমলাকান্তের দপ্তরে' 'সাম্যবাদে' এবং 'বঙ্গদেশের কৃষকে' যে-জাতীয় অর্থনৈতিক আলোচনা করেছেন তার পূর্বাভাস আমরা কেশবচন্দ্রের রচনার মধ্যে পাই। উভয়ের সাম্যবাদ মানবিক অনুভূতির উপরে প্রতিষ্ঠিত। কেশবচন্দ্র দুঃখী দরিদ্র মানুষদের জন্য একটি সহজ ধর্ম গঠনের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।

কেশবচন্দ্র সেন ব্যতীত নববিধানের লেখকগোষ্ঠী নানা গ্রন্থ রচনা করেছেন। এগুলির মধ্যে আছে নাটক ও কাব্য, কীর্তন ও সংগীত, জীবনী ও আত্মজীবনী, চিঠিপত্র ও ডায়েরী এবং পত্রিকা সম্পাদনা। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, গৌরগোবিন্দ রায়, সাধু অঘোরনাথ, গিরিশচন্দ্র সেন, মহেন্দ্রনাথ বসু ও ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, বাংলা সাহিত্যে এক নতুন গোষ্ঠীর সাধক। কিন্তু এঁদের রচিত সাহিত্য গোষ্ঠীনিরপেক্ষ। ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের নববৃন্দাবন নাটকে মদ্যপানের ফলে সমাজ যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তার জীবন্ত বর্ণনা আছে। নাটকটি মঞ্চে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। স্বয়ং কেশবচন্দ্র একটি ভূমিকা গ্রহণ করেন। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ছিলেন নানা শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। গিরিশচন্দ্র সেন আরবী ভাষায় রচিত বহু জীবনীগ্রন্থ অনুবাদ করেন। এই গোষ্ঠীর মধ্যে মনীষায় ও ব্যক্তিত্বে সর্বাপেক্ষা অসাধারণ ছিলেন কেশবচন্দ্র।

নববিধান সমাজের আদর্শ ও ধর্মজিজ্ঞাসার কথা আলোচনা করে,

এই সমাজের ভক্তবৃন্দের কথা শ্রদ্ধাসহকারে রচনা করে 'উনিশ শতকের বাঙলা সাহিত্যে কেশবচন্দ্র'-এর লেখিকা অধ্যাপিকা ড. শ্রীমতী ধরা বসু আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হলেন। তাঁকে আমরা আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করি। তবে তাঁর গ্রন্থে স্থানাভাব হেতু কেশবচন্দ্রের ইংরেজী রচনা সম্পর্কে আলোচনা করা হয় নি। আশা করা যায় যে, দ্বিতীয় সংস্করণে এই ত্রুটি দূরীভূত হবে। ড. বসু সত্যই একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচনা করে আমাদের ঋণী করে রাখলেন।

শ্রীভবানীগোপাল সান্যাল

## প্রাক্‌কথন

গ্রন্থজগতে আমি আগন্তুক। যে বিষয়টি নিয়ে এই গ্রন্থ, সেটিও বাঙলা সাহিত্যের এক প্রায়-অনালোচিত দিক। কাজেই গ্রন্থপরিচিতি প্রয়োজনীয়। 'উনিশ শতকের বাঙলা সাহিত্যে কেশবচন্দ্র'-এর প্রাক্ রূপটি ছিল 'নববিধান ও বাঙলা সাহিত্য'। সেটি ছিল আমার গবেষণার বিষয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে আমার গবেষণাপত্রটি গৃহীত হয়। ড. সুকুমার সেন ও ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করেন ও গ্রন্থাকারে যাতে প্রকাশিত হয়, সেই ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

গ্রন্থের বিষয়টি গৃহীত হয়েছে বাঙলা সাহিত্যের এক উপেক্ষিত কিন্তু বহুমূল্যবান্ একটি দিক নিয়ে। উনিশ শতকের ব্রাহ্ম আন্দোলন ও আমাদের জাতীয় জীবনে তার প্রভাব সম্পর্কে আমাদের সবিশেষ জানা আছে। কিন্তু কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্ম ধর্মান্দোলনের মাধ্যমে বাঙলা সাহিত্যে যে সুদূর-প্রসারী অবদান রেখে গেছেন, তা সত্যই আমাদের কৌতূহল জাগায়। গভীর স্বদেশানুরাগ তাঁকে মাতৃভাষার ও সাহিত্যের সেবায় নিযুক্ত করেছিল। এই জন্যই তাঁর বক্তৃতা ও উপদেশের ভাষা সাহিত্যের ভাষা, তাঁর 'জীবনবেদ' আত্মজীবনীমূলক শ্রেষ্ঠ রচনা। তাছাড়া 'সুলভ সমাচার'-এ এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়, চিঠিপত্রে তাঁর সাহিত্যিক সত্তা সমুজ্জ্বল হয়ে আছে। বাঙলা সাহিত্যে কেশবচন্দ্র সেন শুধু সাহিত্য সৃষ্টি ও সম্পাদনার মধ্যেই নিজের শক্তি নিঃশেষ করেন নি—নতুনতর সাহিত্যিক গোষ্ঠী সৃজনের মধ্যে তাঁর প্রতিভার যথার্থ পরিচয় দিয়েছেন। উনিশ শতকের মধ্য পর্ব থেকে ঐ শতাব্দী ব্যাপ্ত করে শুধু কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁর সঙ্গে নববিধান সমাজের আরও কয়েকজন প্রচারক বাঙলা সাহিত্যে যে গভীর নিষ্ঠা ও একাগ্রতার পরিচয় রেখে গেছেন, সে বিষয়টি এই গ্রন্থে অনুধাবন করার চেষ্টা করেছি। এই প্রচারকগণ হলেন—প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, গৌরগোবিন্দ রায়, গিরিশচন্দ্র সেন, সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত, মহেন্দ্রনাথ বসু ও ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল। এই প্রেরিত প্রচারকদের ধর্ম আলোচনা, ধর্ম উপদেশ ও নানা শাস্ত্রানুশীলনের সঙ্গে শাস্ত্র আলোচনায় পাণ্ডিত্যের সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছিল ভক্তের আকুতি। অপরদিকে সংস্কৃত, ইংরেজী, আরবি, গুরুমুখী ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রভাবে এই

সমস্ত প্রচারকগণের দ্বারা সৃষ্ট হয়েছিল উনিশ শতকের বাঙলা সাহিত্যের একটি নতুন ধারা। সেই অনালোকিত ধারাটিই এই গ্রন্থের আলোচ্য দিক। প্রচারকদের বাদ দিলে যেমন কেশবচন্দ্র সেনের অবদান সীমিত হয়ে যায়, তেমনি আরও কয়েকজন সাহিত্যিকের আলোচনা ছাড়াও বাঙলা সাহিত্যে কেশবচন্দ্র সেনের দান অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এঁরা হলেন— কৃষ্ণবিহারী সেন, প্যারীমোহন চৌধুরী, বিনয়েন্দ্রনাথ সেন ও মোহিতচন্দ্র সেন। কাজেই এঁদের আলোচনা ও এই সঙ্গে বিভিন্ন মহাপুরুষের জীবনী, আত্মজীবনী, চিঠিপত্র, ডায়েরী, পত্রিকা, সম্পাদনা, নাটক ও কাব্যরচনা শুরু করেন। ধর্মসংগীত ও কীর্তনের নবদিগন্ত সূচিত হল। কেশব-মণ্ডলীর অন্যতম হৃদয়বান্ ব্যক্তিত্ব ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল। কীর্তন, সংগীত, নাটক ও কাব্য রচনায় তিনি যে দক্ষতা দেখিয়েছেন, তার বিস্তারিত আলোচনা এই গ্রন্থে প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছি। কেশবচন্দ্রের সর্বধর্মসমন্বয়ী দর্শনে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার খ্রীষ্ট ধর্ম, গৌরগোবিন্দ রায় হিন্দু ধর্মশাস্ত্র, গিরিশচন্দ্র সেন ইসলাম ধর্ম ও শাস্ত্র, মহেন্দ্রনাথ বসু শিখ ধর্ম ও শাস্ত্র আলোচনার যে গুরু-দায়িত্ব বহন করেছিলেন—তাঁদের এই সব গ্রন্থে তা বিশেষ স্থান পেয়েছে। কেশবচন্দ্র সেনের জীবন ও বাণীর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন বহু মহিলা। এঁদের মধ্যে বাগ্মীকবি শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুও আছেন। কেশবচন্দ্র সেন-প্রভাবিত পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্ম কবিদের সম্পর্কেও আলোচনা করেছি। কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁর অনুগামিগণের দ্বারা যে বিরাট বিপুল বাঙলা সাহিত্য গড়ে উঠেছিল উনিশ শতকে, সেই সাহিত্য বিংশ শতকের প্রারম্ভ পর্বে আবির্ভাব ঘটিয়েছিল কৃষ্ণবিহারী সেন, বিনয়েন্দ্রনাথ সেন, মোহিতচন্দ্র সেনের মত প্রতিভাধর সাহিত্যিকগণের—তাঁদের সকলের রচনাবলীর বিস্তৃত অনুশীলনের প্রচেষ্টা নিয়ে এই গ্রন্থ গড়ে উঠেছে।

কেশবচন্দ্র সেনের ইংরেজী রচনাসম্ভারের আলোচনা এই গ্রন্থে সংযোজিত করবার ইচ্ছা থাকলেও কার্যত তা সম্ভব হয়নি। এজন্য কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্মূল্য দায়ী বললে অন্যায় হবে না। আগামী কালে এই গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণের সুযোগ এলে এই সদিচ্ছা সম্ভব হবে বলে আশা রাখি।

গবেষণার ব্যাপারে প্রেরণা—দৈবী প্রেরণা—পেয়েছিলাম আমি আমার পরমআরাধ্য গুরুদেব শ্রীশ্রীস্বামী সত্যানন্দদেবের কাছ থেকে। এক পরম কল্যাণময় ঐশ্বরিক ইচ্ছায় আমি গবেষণার কাজে নিযুক্ত হয়েছিলাম। তাঁর

চরণে আমি তাই প্রথমেই প্রণাম জানাচ্ছি। গবেষণার বিষয়টির প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিয়েছিলেন আমার শিক্ষাগুরু ড. সুকুমার সেন ও ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—তাঁদেরও প্রণতি জানিয়ে আমার সকৃতজ্ঞ চিত্তের পরিচয় দিতে চাই। আমার মাস্টারমশাই ড. ভবানীগোপাল সান্যাল; তিনি প্রথমাবধি আমার কাজ দেখেছেন, পথ দেখিয়েছেন এবং সর্বোপরি এই পুস্তকের একটি মূল্যবান্ ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। তাঁকে আমার সকৃতজ্ঞ প্রণতি জানাই।

আমাদের বাঙলা সাহিত্যের দিক্‌পালগণ উনিশ শতকের বিভিন্ন দিকে আলোচনা করেছেন, কিন্তু কেশবচন্দ্র ও তাঁর অনুগামিগণ দ্বারা রচিত বাঙলা সাহিত্যের ভাণ্ডার তাঁদের অমনোযোগিতার জন্য অযত্নে বিস্মৃত-প্রায়। বহুক্ষেত্রে এঁদের প্রকাশিত গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু এই কলকাতাতেই এক প্রবীণ অথচ কর্মে ও চিন্তায় যুবক শ্রীসতীকুমার চট্টোপাধ্যায় অসীম আগ্রহ ও ধৈর্য নিয়ে নববিধান-সাহিত্যের মূল্যবান্ ধনের অধিকারী হয়ে বসে আছেন। কিন্তু তিনি ধনকুবের নন, লক্ষ্মীর মত অকাতরে অকুণ্ঠ চিত্তে ধন বিতরণ করে চলেছেন দেশী ও বিদেশী ছাত্রছাত্রীদের। মূলত তাঁর কাছ থেকে সাহায্য না পেলে এই গবেষণা-গ্রন্থটি সম্পূর্ণ করা যেত না। এই গ্রন্থে প্রকাশিত ছবিগুলিও তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি। গ্রন্থের যোগান দিয়েই শুধু নয়, প্রয়োজনীয় সময়ে যথাযথ পথ নির্দেশ করে, উপদেশ ও নির্দেশ দিয়ে তিনি আমার যথার্থ গুরুর কাজ করেছেন। শ্রীমতী প্রতিভা চট্টোপাধ্যায়—তিনিও আমার সাধনা-সংগ্রামের প্রতিটি পর্যায়ে পাশাপাশি থেকে, নানাভাবে উপদেশ দিয়ে ঠিক পথের নিশানা দিয়েছেন। উভয়ের ঋণ আমি কোনদিনও শোধ করতে পারব না। তাঁদের আমার প্রণাম জানাই।

ঋণী আমি অনেকের কাছেই। ন্যাশানাল লাইব্রেরী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, প্রতাপ মেমোরিয়াল লাইব্রেরী, চৈতন্য লাইব্রেরী, রামকৃষ্ণ কালচারাল ইনস্‌স্টিটিউট্ লাইব্রেরী, সরোজিনী নাইডু কলেজ লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষ তাঁদের গ্রন্থাগারের দ্বার উন্মোচন করে দিয়ে আমাকে ঋণজালে আবদ্ধ করেছেন। তাঁদের আমার ধন্যবাদ জানাই। বিশেষতঃ প্রেসিডেন্সি কলেজের শ্রীপ্রবোধ বিশ্বাস ও সরোজিনী নাইডু কলেজের শ্রীমতী বাসন্তী চৌধুরী ও শ্রীমতী অমিতা সিংহের কাছ থেকে আমি বিশেষ ভাবে উপকৃত।

ঋণী আমি শ্রীচিন্মোহন সেহানবীশের কাছে। তাঁকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। আমার কলেজের অধ্যাপিকা শ্রীমতী ইন্দিরা দাশগুপ্ত, ড. লক্ষ্মী সান্যাল, ড. করুণা ভট্টাচার্য ও সুরেন্দ্রনাথ কলেজের অধ্যাপক শ্রীঅরবিন্দ ভট্টাচার্যকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আমার পিতৃদেব জাস্টিস্ শ্রীঅমিয়প্রসাদ দাস ও মাতৃদেবী শ্রীমতী বিভা দাস ও আমার স্বামী ড. প্রদীপকুমার বসু নানাভাবে উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়েছেন। ধন্যবাদ জানাবার সম্পর্ক তাঁদের সঙ্গে নয়। তাঁদের উদ্দেশ্যে সকৃতজ্ঞ প্রণাম রাখছি।

শ্রীশ্রীশকুমার কুণ্ড গ্রন্থ ও গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট ছবিগুলির প্রকাশনার সমস্ত দায়িত্ব বহন করে আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। তাঁকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই।

ঝরা বসু

## সূচীপত্র

## প্রথম অধ্যায়

# উনবিংশ শতাব্দীর ব্রাহ্ম আন্দোলন ও নববিধান

ভারতের তথা বাঙলার ইতিহাসে উনবিংশ শতাব্দী স্মরণীয়। মধ্যযুগের জড়িমাজড়িত কুসংস্কারের অন্ধকার কেটে গিয়ে পাশ্চাত্ত্য চিন্তা-প্রধৌত মনন ও বুদ্ধিবাদ বাঙালীর চেতনাকে পরিশোধিত করল। নবজাগরণ-উদ্দীপ্ত জাতি একটির পর একটি আন্দোলনকে বরণ করে নিল। এইসব আন্দোলন ছিল সর্বাত্মক; মূলতঃ ধর্ম, শিক্ষা ও সমাজ—এই ত্রিধারায় উনবিংশ শতাব্দীর চেতনা পরিবর্তিত হয়েছিল। এই শতাব্দীর সূচনাপর্বে ধর্ম আন্দোলনের সূত্রপাত।

১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে জন কারনান্দার বাঙলার মাটিতে ওল্ড মিশন চার্চ প্রতিষ্ঠা করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্ত-দশকে রেভারেণ্ড ডেভিড ব্রাউন ও ডাঃ ক্লডিয়াস বাচনন, ধর্মপ্রচারে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত খ্রীষ্ট ধর্মপ্রচারে কোথাও বিশেষ সুগঠিত উদ্যম ও সুষ্ঠু পরিচালনা লক্ষিত হয়নি।[১] শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠিত হল ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে। মার্শম্যান, ওয়ার্ড ও কেরীর পূর্ণ উদ্যোগে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারিত হতে সুরু হল। সুসমাচার প্রচার, ভারতীয় ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ ও জনসাধারণের মধ্যে বাইবেল বিতরণ এবং শিক্ষাবিস্তার,—এই ত্রিবিধ কর্মধারায় তাঁরা খ্রীষ্ট-মাহাত্ম্যপ্রচারে বিশেষ দক্ষতা দেখালেন। মিশনারী-গণের ধর্মপ্রচার শুধু বাইবেলের অনুবাদ ও ধর্মসংগীত প্রচারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকল না,—তাঁরা সাময়িক পত্রও প্রকাশিত করলেন। ১৮১৮ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে 'দিগ্‌দর্শন' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হল। শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে যোশুয়া মার্শম্যানের পুত্র জন ক্লার্ক মার্শম্যান এটি সম্পাদনা করতেন। এরপর ঐ একই প্রেস থেকে জন ক্লার্ক মার্শম্যানের সম্পাদনায় 'সমাচারদর্পণ' (মে, ১৮১৮) নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকা-দুটিতে খ্রীষ্ট-মাহাত্ম্য প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুধর্মের অসারতা ও যুক্তিহীনতা প্রমাণের চেষ্টা দেখা গেল। এদিকে হিন্দুধর্ম মৌল-সত্য থেকে

---

১. Nemai Sadhan Bose, The Indian Awakening and Bengal, পৃ. ১১৪।

বিচ্যুত হয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট আচার ও বিধিসর্বস্ব অনুষ্ঠানে পর্যবসিত হয়েছিল। অপরদিকে অতিসূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক ভাবরাজ্য, তান্ত্রিক গুহ্য সাধনায় অন্ধ-বিশ্বাস জাতীয় জীবনকে কুণ্ঠিত ও ভয়গ্রস্ত করে রেখেছিল। এইভাবে মিথ্যা-চারের উপর ভিত্তি করে হিন্দুধর্ম কৃত্রিম হয়ে পড়েছিল। ইংরেজ পাদ্রীগণ যখন ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে হিন্দুধর্মের প্রতি কটাক্ষপাত আরম্ভ করলেন তখনই সমাজে প্রচণ্ড আলোড়ন উপস্থিত হল। জাতির এই ঘোরতব দুর্দিনে রাজা রামমোহন রায়ের আবির্ভাব। 'এই শুষ্ক নির্জীব দেশে মুক্তিব বাণী ও জীবনেব শ্যামলতা নিয়ে রামমোহন'[১] আবির্ভূত হলেন ভারতভূমিতে। 'রামমোহনই সর্বপ্রথম এই মৃতকল্প জাতির ঘোর তামসিকতাকে সাত্ত্বিকতাব ভাণমুক্ত করিয়া একটা রাজসিক আদর্শেব প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইয়াছিলেন।'[২] আধুনিকতাব অগ্রদূত রামমোহন আপন স্বাতন্ত্র্য ও যুক্তিবাদেব দ্বারা যেমন সমাজনীতি ও রাষ্ট্রচিন্তাকে পরিশোধিত কবেছিলেন তেমনি ধর্মক্ষেত্রেও নবমন্ত্রে সংশোধনের দীক্ষা দিলেন জাতিকে।

বেদান্ত-প্রতিপাদ্য সত্যধর্ম পুনঃসংস্থাপনের চেষ্টা রামমোহন করেছিলেন। আশৈশব ধর্মচর্চার ফলে বেদ-উপনিষদ, কোবান, বাইবেল প্রভৃতি শাস্ত্রীয় গ্রন্থ পঠন ও আলোচনাব দ্বারা রামমোহন একেশ্বরবাদের সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। তাঁব প্রবর্তিত একেশ্বরবাদ ও বেদান্ত-প্রতিপাদ্য সত্যধর্মেব উপর ভিত্তি করেই পববর্তী কালে ব্রাহ্মধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দেব ২০শে আগস্ট, বামমোহনের 'ব্রহ্মসভা' প্রতিষ্ঠিত হয়, এটিই ব্রাহ্ম আন্দোলনেব সূত্রপাত। 'ব্রহ্মসভা'র সূত্রপাত নিয়ে দুটি তথ্য প্রচলিত আছে। খ্রী. ১৮২১-এ রেভাঃ অ্যাড্যাম 'হরকরা' সংবাদপত্রের অফিসে 'ইউনিটাবিয়ান সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত কবেন। রামমোহন বায় ঐ সমাজে যোগ দিয়েছিলেন। ঐ সভার কাজ শেষ কবে একদিন তিনি যখন ফিরে আসছেন তখন তাঁব বন্ধুদ্বয় তারাচাঁদ চক্রবর্তী ও চন্দ্রশেখব দেব তাঁকে বলেছিলেন, 'আমাদেব উপাসনা করার জন্য অন্যত্র যাবার কি প্রয়োজন—আমবা তো উপাসনার জন্য আলাদা গৃহ তৈরী করলেই পারি।' সোফিয়া ডবসন কলেট বলেন, 'This proposal is the first germ of

---

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভারতপথিক রামমোহন, পৃ. ৮০। ২, মোহিতলাল মজুমদার, বাংলার নবযুগ, পৃ. ১।

Brahmo Samaj,'[১] অন্যদলের মতে অ্যাডাম সাহেবের 'ইউনিটারিয়ান সোসাইটি' বেশীদিন জনসাধারণকে আকৃষ্ট করতে পারল না। অ্যাডাম ভেবেছিলেন, রামমোহন খ্রীষ্টধর্মের সমর্থক ও তিনি ধর্মপ্রচারে তাঁকে সাহায্য করবেন ; এই কারণে তিনি রামমোহন রায়কে তাঁর স্বতন্ত্র সমাজ প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ দিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর আশা পূর্ণ হয় নি। অ্যাডাম সাহেব জন ব্রাউবিংকে একটি পত্রে উৎসাহ দিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর আশা পূর্ণ হয়নি। অ্যাডাম সাহেব জন ব্রাউরিংকে একটি পত্রে (ফেব্রুয়ারী ৫, ১৮২৮ খ্রীঃ) লিখেছেন, **'I am endeavouring to get the Hindu Unitarians in Calcutta to unite in forming an Association auxiliary to British India Association and for the establishment of the public worship of the one God among themselves."**[২]

কিন্তু রামমোহনের ব্রাহ্মসমাজ হিন্দু-আকারে প্রতিষ্ঠিত হল, সেইজন্য তৎকালীন একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টানরা অসন্তুষ্ট হন।

প্রথম দিকে ব্রহ্ম-উপাসনার জন্য এঁদের নিজস্ব কোন গৃহ ছিল না। পরে এই উদ্দেশ্যে জোড়াসাঁকো চিৎপুর রোডে ফিরিঙ্গি কমল বসুর বাড়ী ভাড়া করা হয়। সেখানে ১৮২৮ খ্রীঃ ২০শে আগস্ট থেকে উপাসনার কাজ আরম্ভ হয়। এইভাবে ব্রহ্মসভা তথা ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হল। প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় ৭টা থেকে ৯টা পর্যন্ত সভা চলত। রাওজী নামে একজন হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ বেদ এবং উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ উপনিষদ পাঠ করতেন। বিষ্ণু চক্রবর্তী সঙ্গীত পরিবেশন করতেন আর গোলাম আব্বাস পাখোয়াজ সঙ্গত করতেন সঙ্গীতের আসরে। ভাড়াটে বাড়ীতে 'সমাজ'কে বেশীদিন থাকতে হয়নি। 'সুতানটি নিবাসী কালীপ্রসন্ন রায় ১৮২৯ সনের ৬ই জুন কবালা রেজিষ্টারী করিয়া দ্বারকানাথ ঠাকুর, কালীনাথ রায়চৌধুরী, প্রসন্ন কুমার ঠাকুর, মথুরানাথ মল্লিক ও রামমোহন রায়কে বিক্রয় করেন।'[৩] ১৮৩০ খ্রীঃ, ২৩শে জানুয়ারী ব্রাহ্মসমাজের নিজস্ব গৃহে উপাসনার উদ্বোধন হয়। সাড়ম্বরে উৎসব পালিত হয়। এই উৎসবে প্রায় পাঁচশত হিন্দু ও 'বেঙ্গল হেরাল্ড'-এর সম্পাদক, একমাত্র ইউরোপীয় মন্টগোমারি মার্টিন উপস্থিত

১. Sophia Dobson Collet, Life & Letters of Raja Rammohun Roy, পৃ. ২২০।

২. Ibid, পৃ, ২২১-২২। ৩. যোগেশচন্দ্র বাগল, কলিকাতার সংস্কৃতি-কেন্দ্র, পৃ. ৫২।

ছিলেন।[১] এই সমাজ পরিচালনার ভার একটি ট্রাষ্ট ডীডের দ্বারা তিনজনের—বৈকুণ্ঠনাথ রায়চৌধুরী, রাধাপ্রসাদ রায় ও রমানাথ ঠাকুরের—উপরে ন্যস্ত করা হল। কিন্তু রামমোহনকে ঠিক ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠাতা বলা চলে না। "রামমোহনের 'ব্রাহ্মসমাজ' কোনদিনই একটি বিশিষ্ট ধর্ম-সম্প্রদায় ছিল না। এই সমাজে তথা উপাসনা-গৃহে আসিয়া সকল সম্প্রদায়ের লোকই এক ঈশ্বরের উপাসনা করিতে পারিতেন, বস্তুতঃ হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান ইহুদী সকলেই এই উপাসনায় যোগ দিতেন।"[২] রামমোহন যে ট্রাষ্ট ডীড করে যান এই প্রসঙ্গে তার উল্লেখ করা প্রয়োজন।

ব্রাহ্মসমাজে নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনা হবে। সমাজে কোন পুত্তলি বা চিত্র থাকবে না। কোন সম্প্রদায়-বিশেষের জন্য এই মন্দির নয়; বেদান্ত-প্রতিপাদ্য একেশ্বরবাদের উপাসনা হলেও অন্য কোন ধর্মের বা সম্প্রদায়ের প্রতি ব্যঙ্গবিদ্রূপ করা চলবে না। যাতে পরমেশ্বরের ধ্যান-ধারণার প্রসার হয়, প্রেমনীতি-ভক্তি-দয়া-সাধুতার উন্নতি হয় ও সকল সম্প্রদায়নির্বিশেষে সকলের মধ্যে প্রীতির ও ঐক্যের বন্ধন দৃঢ়তর হয় সেই উদ্দেশ্যে এখানে নানা উপদেশ, বক্তৃতা, প্রার্থনা ও সংগীত হবে।[৩]

ব্রাহ্মসমাজের ট্রাষ্ট ডীড দ্বারা একথা নিঃসংশয়ে ও স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হয় যে, রামমোহন রায় কোন বিশেষ শাস্ত্রবাদী বা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছিলেন না। উদার অসাম্প্রদায়িক বিশ্বজনীন ধর্মই রামমোহন রায়ের ধর্ম ছিল।[৪] তিনি শাস্ত্র-নিরপেক্ষ অথচ সর্বশাস্ত্রে শ্রদ্ধাবান ও সর্বশাস্ত্রের সারগ্রাহী ব্রাহ্ম ছিলেন।[৫] মুসলমান ধর্মশাস্ত্রের একেশ্বরবাদ—মুতাজালা ও মুয়াহিদ্দীন দুটিরই প্রভাব ছিল তাঁর উপর। খ্রীষ্টান ধর্মশাস্ত্রেও রামমোহনের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। 'বাইবেলের পুরাতন অংশ মূলে অধ্যয়ন করিবার জন্য তিনি হিব্রু ভাষা শিখিয়াছিলেন।'[৬] যীশুখ্রীষ্টকে তিনি অবতার পুরুষ মনে করেন নি, কিন্তু খ্রীষ্টের উপদেশামৃতে মানুষের চরিত্র, মন ও ধর্মবুদ্ধি

১, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত, পৃ. ১৬৩ ও Shivnath Sastri, History of Brahmo-Samaj, পৃ. ১৩। ২. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য-সাধকচরিতমালা, রামমোহন রায়, পৃ. ৫৬। ৩. Shivnath Sastri, History of Brahmo Samaj. ৪. নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত, পৃ. ৩২৯। ৫. তদেব, পৃ. ৩২৯। ৬. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য-সাধক চরিতমালা প্রথম খণ্ড, রামমোহন রায়, পৃ. ৪৯।

উন্নত হয় বলে বিশ্বাস করতেন। এইজন্যই রামমোহনের ধর্মকে 'Universal Religio.'[১] বা সর্বজনীন ধর্মও বলা হয়।

১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন অনুবাদ ও ভাষ্যসহ বেদান্ত-গ্রন্থ প্রকাশ করেন। বাঙলা ভাষায় তিনিই সর্বপ্রথম বেদান্তের ভাষ্যকার। এছাড়া ব্রহ্ম-সম্বন্ধীয় আলোচনার জন্য ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে 'আত্মীয়সভা' স্থাপিত হয়। এই সভায় শাস্ত্রীয় আলোচনা, বেদপাঠ ও ব্যাখ্যা এবং ব্রহ্মসঙ্গীত হত। রামমোহনই সমাজে সর্বপ্রথম ব্রহ্মসঙ্গীতের প্রচলন করেন। সমাজে সঙ্গীত প্রচলন করতে গিয়ে তাঁকে বেশ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। প্রথম প্রথম সমাজে গান গাইতে অনুরোধ করলে গায়করা হয় সাধারণ প্রেমসঙ্গীত কিংবা পৌত্তলিকতাযুক্ত ধর্মগীতি গাইতেন। রামমোহনই প্রথম তাঁর প্রবর্তিত ধর্ম অনুযায়ী ধর্মগীতি প্রচলন করলেন।[২] এ বিষয়ে 'ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্তে' উল্লেখিত আছে—"একদিন রামমোহন রায় বলিলেন যে ভাল ভাল গায়কসকল সংগ্রহ করিয়া মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্ম-সমাজে সঙ্গীত দিলে ভাল হয়, অমনি গুণী গায়ক সকল সেখানে একত্রিত হইল এবং নানাভাবের সঙ্গীত চলিল। রামমোহন রায় বলিলেন, ও সব গান কেন? 'অলখ নিরঞ্জন' গাও। ব্রহ্মসঙ্গীত হইতে লাগিল। তাঁহার সঙ্গীদিগের মধ্যে একটুকুও তখন কাহারও বুঝা হয় নাই যে ব্রাহ্মসমাজে সঙ্গীত গাইতে বলিলে ঈশ্বরের সঙ্গীত গাইতে হইবে।"[৩] এই সভায় তৎকালীন বহু নামী লোক একেশ্বরবাদ সম্পর্কে আলোচনা করতেন। বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্যধর্মের প্রচারই ছিল 'ব্রহ্মসভা'র উদ্দেশ্য। "These organisations were chiefly institutions founded on Rammohun Roy's purificationist or puritanical view of the Vedic golden age. The Vedas were chosen as the Scriptural basis of the new reformed religion."[৪]

রামমোহন রায়ের 'ব্রহ্মসভা' পরবর্তী কালের ব্রাহ্ম-আন্দোলনের সূত্রপাত করলেও প্রকৃতপক্ষে রামমোহন এই সভাগৃহকে সকল ধর্মবাদীদের মিলনক্ষেত্রে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। কার্পেনটার-লিখিত গ্রন্থের আলোচনা প্রসঙ্গে কিশোরীচাঁদ মিত্র বলেন—'It is therefore manifest that what

---

১, Shivnath Sastri, History of Brahmo Samaj, পৃ. ৫১। ২. তদেব, পৃ. ৭৮। ৩. ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত, পৃ. ৬০-৬১। ৪. David Kopf, British Orientalism & the Bengali Renaissance, পৃ. ২০২।

Rammohun Roy wanted was not unity of creed or the creation of a separate religious community like that of the Brahmos, but to monotheistic worship, to establish a universal church where all classes of people,—Hindus Mohamedans and Christians would be all alike welcome to unite in the worship of their supreme and common Father.'[১]

ম্যাক্স মূলার তাঁকে বলেছেন 'Father of Comparative Theology'—মিস মেরি কার্পেণ্টার লক্ষ্য করেছেন, মানবহিতই তাঁর ধর্মমতের চূড়ান্ত বাক্য। মৃত্যুর আগে রামমোহন একটি ইচ্ছা প্রকাশ করেন, পারসিক কবির বিখ্যাত উক্তিটি যেন তাঁর সমাধির উপর খোদিত করা হয়—'The true way of serving God is to do good to man.'[২] রামমোহন নিজেকে 'হিন্দু' বলেই পরিচয় দিতেন। রামমোহন রায় একখানি পত্রে বলেছেন, 'আমার সমস্ত তর্ক-বিতর্কে আমি কখনও হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করি নাই। উক্ত নামে যে বিকৃত ধর্ম এক্ষণে প্রচলিত তাহাই আমার আক্রমণের বিষয় ছিল।'[৩] ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মাতার সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় তিনি স্বতন্ত্রভাবে কলকাতায় পিতৃশ্রাদ্ধ করেন। তিনি কখনও যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করেননি। ১৮৩৩ খ্রীঃ তিনি যখন ব্রিষ্টলে দেহত্যাগ করেন তখনও তাঁর দেহে উপবীত ছিল।[৪] মিস কলেটও বলেছেন, 'He never gave up his Brahmical thread.'[৫] এমন কি বিদেশে যাবার সময় স্বদেশ থেকে একজন ব্রাহ্মণ পাচককেও নিয়ে গিয়েছিলেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পরবর্তী কালের ব্রাহ্মদের মধ্যে ব্রাহ্মণের চিহ্নস্বরূপ উপবীত ধারণ করা হবে কি না জাতিভেদ মানা হবে কি না, এই বিষয়ে বিরাট মতপার্থক্য ও আদর্শের বিরোধ উপস্থিত হয়।

১৮৩০ খ্রীঃ ১৫ই নবেম্বর রামমোহন রায় বিদেশ গমন করেন। এবং

১. Calcutta Review, No. LXXXVII, পৃ. ২৩২। ২. Shivnath Sastri, History of Brahmo Samaj, পৃ. ৫১। ৩, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত, পৃ. ৪। ৪. Mary Carpenter, Last Days in England of the Rajah Rammohun Roy, পৃ. ১৫৫। ৫. Sophia Dobson Collet, Life & Letters of Raja Rammohun Roy, পৃঃ ১৩৮।

ব্রিস্টল নগরে ১৮৩৩ খ্রীঃ রামমোহনের মৃত্যু ঘটে। রামমোহন রায়ের ভারত ত্যাগের পর থেকেই রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের উপর 'ব্রহ্মসভা'র ভার ন্যস্ত হল। আচার্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ উপাসনা-সম্বন্ধীয় কার্য সম্পাদনা করতেন। বিদ্যাবাগীশ যথার্থ ধার্মিক ছিলেন। তিনি দরিদ্র ব্রাহ্মণ হলেও মৃত্যুকালে ৫০০শত টাকা সমাজকে দান করে যান। রামমোহন রায়ের পরে প্রায় দ্বাদশ বৎসরকাল তিনি সমাজকে অত্যন্ত যত্নে রক্ষা করেছিলেন।[১] রামমোহন রায়ের বিলেত গমনের পর প্রধানতঃ দ্বারকানাথ ঠাকুরের অর্থ-সাহায্যে সমাজের কার্যনির্বাহ হত। 'বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রচুর অর্থ-সাহায্যে সমাজের ব্যয় নির্বাহ হইত।[২] কেশবচন্দ্র সেনও 'রামমোহন রায়' প্রসঙ্গে জানিয়েছেন একই তথ্য।[৩] অবশ্য রামমোহন রায় ইংল্যাণ্ড যাবার পূর্বেই ৮০৮০ টাকা তৎকালীন বিখ্যাত মেসার্স ম্যাকিণ্টশ কোম্পানীতে গচ্ছিত রাখেন এবং ঐ টাকায় নিয়মিতভাবে ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ ব্যয়গুলি নির্বাহ হত।[৪] রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আগমনের অপেক্ষায় ছিলেন। ব্রাহ্মধর্মের যে দীপশিখাটিকে তিনি জ্বালিয়ে রেখেছিলেন সেটি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে অর্পণ করে (১৮৪৫ খ্রীঃ) তিনি দেহত্যাগ করেন। (১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে) মৃত্যুর সময় সঞ্চিত ৫০০ শত টাকা একটি উইল করে সমাজকে দান করে যান।[৫]

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাল্যেই রামমোহনের দ্বারা গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। 'শৈশবকাল অবধি আমার রামমোহন রায়ের সহিত সংস্রব। তাঁহার মূর্তি প্রশান্ত ও গম্ভীর। আমি বড় শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত তাঁহাকে দেখিতাম।[৬] একবার জোড়াসাঁকোর বাড়িতে দুর্গাপূজা উপলক্ষে বালক দেবেন্দ্রনাথ রামমোহনকে নিমন্ত্রণ করতে যান,—রামমোহন নিমন্ত্রণের উত্তরে

---

১. ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত, পৃ. ৭৪। ২. তদেব, পৃ. ৭৩-৭৪। ৩. 'After the departure of Ram Mohun Roy to England and his subsequent death, the spiritual affairs of his church were managed by Acharya Ram Chandra Vidyabagish and its pecuniary wants were met by the liberal contributions of Babu Dwarakanath Tagore'.—Keshab Chandra Sen, Discourses and Writings : Ram Mohun Roy. Pages 17-18. ৪. Ibid, পৃ. ১৭। ৫. Shivnath Sastri, History of Brahmo Samaj, পৃ. ৮১। ৬. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আত্মজীবনী পৃ, ১৮-১৯।

শুধু বলেছিলেন, 'আমাকে পূজায় নিমন্ত্রণ'। এই কথাকয়টি দেবেন্দ্রনাথের জীবনে এক প্রগাঢ় প্রভাব বিস্তার করেছিল। 'তাঁহার কথাগুলি আমার পক্ষে গুরুমন্ত্র স্বরূপ হইয়াছিল। তাহা হইতেই আমি ক্রমে পৌত্তলিকতা ত্যাগ করিলাম। ঐ কথাগুলি এখনও যেন কানে বাজিতেছে। আমার এই দীর্ঘজীবনে ঐ কথাগুলি আমার নেতাস্বরূপ হইয়াছে।'[১] এর পরের ঘটনাটিও দেবেন্দ্রনাথের জীবনে উল্লেখযোগ্য। পৌত্তলিকতা-বিরোধী সত্যানুসন্ধানীর অন্তর যখন দ্বন্দ্বমথিত তখন একদিন ঈশোপনিষদের একটি ছিন্নপত্র তাঁর সামনে দিয়ে উড়ে যায়। তিনি কৌতূহল-আবিষ্ট হয়ে সেটি সযত্নে তুলে নেন ও রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নিকট থেকে অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে সেটির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ অবগত হন। এটি ছিল রামমোহন রায়েরই সম্পাদিত ঈশোপনিষদের ছিন্নপত্র, শ্লোকটি ছিল ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোক—

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা. মা গৃধঃ কস্য সিদ্ধনং॥

জগতে যেসব প্রপঞ্চভূতচঞ্চল বিষয় আছে, সে সমুদায়কে পরমেশ্বর দ্বারা আচ্ছাদন করতে হবে, অর্থাৎ সমস্তই ব্রহ্মময় এরূপ জেনে বিষয়বুদ্ধি ত্যাগ করে পরমাত্মাকে সম্ভোগ কর, কারো ধনে আকাঙ্ক্ষা করো না।—এই মন্ত্রটি মহর্ষির জীবনে আধ্যাত্মিক দিগ্‌দর্শনে পরম সহায় হয়েছিল। এটি ঘটেছিল ১৮৩৮ খ্রীঃ। এরপর থেকেই তিনি রামমোহন-প্রবর্তিত 'ব্রহ্মসভা'র প্রতি শ্রদ্ধাশীল হন ও এই মতে বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। ইতিপূর্বে দেবেন্দ্রনাথের জ্ঞানাকাঙ্ক্ষা ও তত্ত্বজিজ্ঞাসা তাঁকে আরও দুটি সভার সঙ্গে যুক্ত করেছিল। ১৮৩২ খ্রীঃ তাঁর বয়স যখন ১৫ বৎসর তখন তিনি 'সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা' সভার সভাপতি নিযুক্ত হন। ১৮৩৮ খ্রীঃ 'Society for the Acquisition of General Knowledge' এর সভ্য হন। কিন্তু এইসব সভার কার্যাবলী তাঁকে সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত করতে পারেনি। এই কারণেই ব্রহ্মসম্পর্কে জ্ঞানলাভের জন্য ও ধর্মমূলক আলোচনার জন্য নিকট বন্ধু ও আত্মীয়দের নিয়ে 'তত্ত্বরঞ্জিনী সভা' স্থাপন করেন। প্রতিমাসের প্রথম রবিবারে অপরাহ্ণে এর সভা বসত। এই সভার দ্বিতীয় অধিবেশনে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। তিনি সভার আচার্যপদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি সভার নাম পরিবর্তন

১. নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, পৃ. ৬৮২, ৬৯০।

করে দিলেন। নাম হ'ল 'তত্ত্ববোধিনী সভা' ( ৬ই অক্টোবর, ১৮৩৯ )। এর উদ্দেশ্য ছিল 'সমুদায় শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব এবং বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার।'[১]

তত্ত্ববোধিনী সভা রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের যত্নে প্রথমতঃ সংস্থাপিত হয়। প্রথম অবস্থায় দশজন মাত্র সভ্য ছিল। বিবিধ উপায়ে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করা এই সভার উদ্দেশ্য ছিল। বেদ-উপনিষদাদি সংগ্রহপূর্বক জনসমাজে প্রচার বিদ্যালয় স্থাপন, পত্রিকা প্রচার, পুস্তক প্রণয়ন প্রভৃতি বহুতর উপায়ে ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির সহায়ক হয়েছিল 'তত্ত্ববোধিনী সভা'। প্রথমে কিছুদিন অর্থাভাব ও উপযুক্ত নেতার অভাব ছিল। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ এই সভাতে যোগ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রভূত উন্নতির পথ খুলে গেল।[২] ১৮৪২ খ্রীঃ দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা-গৃহে যোগদান করেন। 'তত্ত্ববোধিনীসভা'কে তাঁর কাজের সঙ্গে যুক্ত করে দেন। পরের বৎসর অর্থাৎ ১৮৪৩ খ্রীঃ, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের কাছে প্রতিজ্ঞা গ্রহণপূর্বক ২০ জন সঙ্গিসহ দেবেন্দ্রনাথ আনুষ্ঠানিক ভাবে ব্রাহ্মধর্ম ব্রত গ্রহণ করেন। 'কোন কার্যাই বিধিপূর্বক না করিলে তাহার কোন ফল হয় না।' আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণের চিন্তা সর্বপ্রথম দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরেরই অন্তরে জাগে। সমাজে জোয়ার-ভাটার ন্যায় কত লোক আসিতেছে, চলিয়া যাইতেছে কিন্তু কেহই এক ধর্মসূত্রে গ্রথিত নাই। অতএব সমাজে লোকের সমাগম বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তখন মনে হইল যে, লোক বাছা আবশ্যক। কাহাকে আমরা ব্রহ্মোপাসক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি? এই ভাবিয়া স্থির করিলাম, যাঁহারা পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া এক ঈশ্বরের উপাসনায় ব্রতী হইয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবেন, তাঁহারাই ব্রাহ্ম হইবেন। যখন ব্রাহ্মসমাজ আছে, তখন তাহার প্রত্যেক সভ্যের ব্রাহ্ম হওয়া চাই। অনেকে হঠাৎ মনে করিতে পারেন যে, ব্রাহ্মদল হইতে ব্রাহ্মসমাজ হইয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। ব্রাহ্মসমাজ হইতে ব্রাহ্মনাম স্থির হয়।[৩] এইভাবে দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে 'ব্রাহ্মসমাজ' নামে একটি ভিন্ন ধর্মমণ্ডলী গড়ে উঠল। তিনি 'ব্রাহ্মসমাজ' ও ব্রাহ্মধর্মকে একটি স্থায়ী রূপ দানের জন্য সচেষ্ট হন। সকলকে একটি ধর্মসূত্রে আবদ্ধ করার জন্য তিনি একটি ব্রাহ্মধর্ম বীজ ও

---

১. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আত্মজীবনী, পৃ. ৬৪। ২. ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত, পৃ. ১৬। ৩. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আত্মজীবনী, পৃ ৪::

একটি প্রতিজ্ঞাপত্র রচনা করেন। তাতে প্রতিদিন গায়ত্রী মন্ত্র দ্বারা ব্রহ্মোপাসনা'র কথা ছিল। 'ঐ প্রতিজ্ঞাপত্রে প্রাতে অভুক্ত অবস্থায় উপাসনা করিবার আর একটি কথা ছিল।'[১] উপাসনার জন্য 'সত্যংজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি' এই শ্লোকটি তিনি তৈত্তিরীয় ও মুণ্ডকোপনিষদ্ থেকে উদ্ধার করেন। পরে 'শান্তং শিবমদ্বৈতং' এই শ্লোকটিও গ্রহণ করা হয়। মন্ত্র-নির্বাচনে অবশ্য রাজনারায়ণ বসুরও কিছু কৃতিত্ব আছে। " 'ওঁ নমস্তে সতে তে জগৎকারণায়' ইহার বাঙ্গালা অনুবাদ এবং অসতো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মামৃতং গময়'—এই প্রার্থনাটুকু আমা দ্বারা প্রবর্তিত।"[২] পরবর্তী কালে প্রতিজ্ঞাপত্রে অনেক পরিবর্তন ও সংশোধন হয়। 'প্রথমে এমন একটি প্রতিজ্ঞা ছিল যে উপাসনার সময়ে কোন জাতীয় চিহ্ন ধারণ করিব না। যেসকল ব্রাহ্মণ ব্রাহ্ম এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন তাঁহারা উপাসনার সময়ে উপবীত পরিত্যাগ করিয়া উপাসনা করিতেন। উপাসনা হইয়া গেলে তাহা আবার পরিতেন।'[৩] আবার কেউ বলেন, দীক্ষিত ব্রাহ্মদের উপবীত ব্রাহ্মসমাজ গৃহে দগ্ধ করা হত—পরে গৃহে প্রত্যাগমন করে আবার উপবীত গ্রহণ করতেন। 'কলিকাতা সমাজে যে সকল লোক দীক্ষিত হইতেন, তাহার মধ্যে ব্রাহ্মণদিগকে সেই সমাজ-গৃহে উপবীত দগ্ধ করিতে হইত, পরে আবার গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া তাহা গ্রহণ করিতেন।'[৪]

দেবেন্দ্রনাথ ১৮৪৩ খ্রী. ১৬ই আগস্ট 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশ করেন। ব্রাহ্মধর্ম-প্রচারে এই পত্রিকা প্রভূত সাহায্য করেছিল। অক্ষয়কুমার দত্তকে দেবেন্দ্রনাথ পত্রিকার সম্পাদক মনোনীত করেন। অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁর মনন ও পাণ্ডিত্যকে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র উন্নতির কাজে নিযুক্ত করলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে অক্ষয়কুমারের কয়েকটি বিষয়ে মতদ্বৈধ দেখা দেয়। দেবেন্দ্রনাথ অনেক সময়ই হয়তো অক্ষয়কুমার দত্তের মতামত গ্রহণ করতে পারতেন না। 'তিনি যাহা লিখিতেন, তাহাতে আমার মত-বিরুদ্ধ কথা কাটিয়া দিতাম, এবং আমার মতে তাঁহাকে আনিবার চেষ্টা করিতাম, কিন্তু তাহা আমার পক্ষে বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। আমি কোথায় আর তিনি কোথায়! আমি খুঁজিতেছি ঈশ্বরের সহিত আমার কি

১. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আত্মজীবনী, পৃ ৪৪। ২. রাজনারায়ণ বসু, আত্মচরিত, পৃ. ৬২। ৩. তদেব, পৃ. ৬৩। ৪. ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত, পৃ. ..১।

সম্বন্ধ, আর তিনি খুঁজিতেছেন বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির কি সম্বন্ধ, আকাশপাতাল প্রভেদ।'[১] আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলে দেবেন্দ্রনাথ আর বিজ্ঞানের পরিমণ্ডলে অক্ষয়কুমার দত্ত—দুই বিপরীত কোটিতে দুজনের বাস। তাই যদিও অক্ষয়কুমারের দ্বারা লোকহিতকর জ্ঞানগর্ভ রচনা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হত তবুও এই দুই মনীষীর মনের বিপরীতমুখী গতি উভয়ের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করল। 'দেবেন্দ্রনাথ বেদকে যে সকল কারণে শ্রদ্ধার চোখে দেখিতেন, অক্ষয়কুমার দত্তের মধ্যে সে সকল কারণের অভাব ছিল। অক্ষয়কুমার নানা বিজ্ঞান ও ইতিহাসের চর্চা অষ্টাদশ শতাব্দীর এনসাইক্লোপিডিস্টদের মত শাস্ত্রের অভ্রান্ততা, অলৌকিক ক্রিয়া প্রভৃতি যাহা কিছু যুক্তির কষ্টিপাথরে কষা যায় না তাহাকে বাদ দিয়া বসিয়াছিলেন। ব্রহ্মতত্ত্বের চেয়ে ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব তাঁহার রচনায় ফুটিত বেশি।'[২] প্রথমদিকে দেবেন্দ্রনাথ বেদের অপৌরুষেয়ত্বে বিশ্বাস করতেন না। পরে অবশ্য দেবেন্দ্রনাথের মত পরিবর্তিত হয়। এবং উভয়েই এক বিষয়ে স্থির হন যে বেদকে ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট বলে প্রতিপন্ন করা অনুচিত, কারণ উহাতেও ভ্রম ও অযুক্তিপূর্ণ বাক্য আছে। 'দেবেন্দ্রবাবু চিরকাল ভক্তিপ্রধান ও রক্ষণশীল ব্যক্তি অথচ সংস্কারক, অক্ষয়বাবু যুক্তির অত্যন্ত অনুরাগী ও সংস্কার বিষয়ে অগ্রসর। দুইজনে তর্ক হইয়া স্থির হইল যে বেদকে আর ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন করা কর্তব্য নহে যেহেতু উহাতে ভ্রম ও অযুক্তিযুক্ত বাক্য দৃষ্ট হইতেছে। বেদ ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট নহে, বিশ্ববেদান্তই প্রকৃত বেদান্ত, এই মত অক্ষয়বাবু দ্বারা ১৭৭২ শক (১৮৫০ খ্রীঃ) ১১ই মাঘ দিবসের সাম্বৎসরিক উৎসবের বক্তৃতায় প্রথম ঘোষিত হয়।'[৩] দেবেন্দ্রনাথের অন্তর সর্বদা সত্যের আলোকের জন্য উন্মুখ থাকত। তিনি যে চারজন পণ্ডিতকে বেদ অধ্যয়নের জন্য বারাণসীতে পাঠিয়েছিলেন, তাঁরা ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রত্যাগমন করে জানালেন বেদের অপৌরুষেয়তা সর্বত্র মেনে নেওয়া হয়নি। দেবেন্দ্রনাথ কিছুটা বিচলিত হলেন এবং নিজে বেনারসে বেদ অধ্যয়নের জন্য গমন করলেন। শেষে তিনি 'আপনার গাঢ় রক্ষণশীল স্বভাব সত্ত্বেও যেমন সত্য প্রদর্শিত[৪] হল অমনি তাকে গ্রহণ করলেন। 'ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম অগ্রে বেদান্ত-ধর্ম ছিল।

১. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আত্মজীবনী, পৃ. ৩৭। ২. অজিতকুমার চক্রবর্তী, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ. ১৭৭। ৩. রাজনারায়ণ বসু, আত্মচরিত পৃ. ৬৭। ৪. তদেব, পৃ. ৬৮।

ব্রাহ্মগণ বেদের অভ্রান্ততাতে বিশ্বাস করিতেন। অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় এই উভয়ের প্রতিবাদ করিয়া বিচার উপস্থিত করেন। প্রধানতঃ তাঁহারই প্ররোচনাতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উভয় বিষয়ে গভীর চিন্তায় ও শাস্ত্রানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন।[১] ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ থেকে যে অভিনন্দনপত্র মহর্ষিকে দেওয়া হয়েছিল তাতে কেশবচন্দ্র সেন ( ও অন্যান্যগণ ) বলেছেন, 'কিন্তু পবিত্র ধর্মের উন্নতিস্রোতে অধিককাল অসত্য তিষ্ঠিতে পারে না। এ কারণ বেদাদি গ্রন্থের অভ্রান্ততা-বিষয়ক যে ভয়ানক মত এই সমুদায় ব্যাপারের মূলে গূঢ়রূপে স্থিতি করিতেছিল, তাহা যখনই বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চাতে প্রকাশিত হইল, তখনই বিবেকের অনুরোধে ও ঈশ্বরের আদেশে আপনি উহা পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্ম ভ্রাতাদিগকে তাহা হইতে মুক্ত করিতে যত্নবান হইলেন। হিন্দুশাস্ত্র মন্থন করিয়া পূর্বে সত্যামৃত লাভ করিয়াছিলেন, পরে তন্মধ্যে গরল দৃষ্ট হওয়াতে আপনি তদুভয়কে ভিন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অবশেষে ব্রাহ্মধর্ম নামে হিন্দুশাস্ত্রোদ্ধৃত সত্যসংগ্রহ প্রচার করিলেন। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ-প্রণালী সুতরাং পরিবর্তিত হইল। গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া আপনি ব্রাহ্মধর্মের কয়েকটি নির্বিরোধ মূল সত্য নির্ধারণ করত, তদুপরি ব্রাহ্মমণ্ডলীকে স্থাপন করিলেন।[২]

উপনিষদকে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রাণ-মন দিয়ে ভালবাসতেন। উপনিষদের বাক্যসমূহ তাঁর হৃদয়ে সজ্জিত ও গ্রথিত হয়ে থাকত। তিনি সাধক, তিনি ঋষি—উপনিষদই তাঁর সাধনার ধন। এই কারণেই উপনিষদের মন্ত্রে গাঁথা তাঁর 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থ। মহর্ষি আত্মজীবনীতে লিখেছেন—'তাঁহার প্রসাদে আধ্যাত্মিক সত্যসকল আমার হৃদয়ে যাহা উদ্ভাসিত হইতে লাগিল আমি তাহা উপনিষদের মুখে নদীর স্রোতের ন্যায় সহজে সতেজে বলিতে লাগিলাম এবং অক্ষয়কুমার তাহা তখনি লিখিয়া যাইতে লাগিলেন।'[৩] 'এই প্রকারে আমার হৃদয়ে যেমন যেমন উপনিষৎ সত্যের আবির্ভাব হইতে লাগিল, তেমনি পর পর বলিতে লাগিলাম।... তিন ঘণ্টার মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ হইয়া গেল।[৪] ব্রাহ্মধর্ম-গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় অতি শীঘ্র প্রস্তুত হয়,

---

১. শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃ. ১৮১। ২. মণিকা মহলানবিশ-সম্পাদিত, ব্রহ্মানন্দ শ্রীকেশবচন্দ্রের পত্রাবলী, পৃ. ৬০। ৩. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আত্মজীবনী, পৃ. ১৩১-১৩২। ৪, তদেব, পৃ. ১৩৩-১৩৪।

কিন্তু দ্বিতীয় অধ্যায় প্রস্তুত হতে অনেক সময় লাগে। উপনিষদের একেশ্বরবাদকে স্বীকৃতি দিয়ে ব্রাহ্মধর্ম-গ্রন্থ প্রণীত হল।

১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করে রাজনারায়ণ বসু আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন। শেভালিয়র র‍্যামজে-র 'সাইরাসেজ ট্রাভেলস্' পড়ে প্রচলিত হিন্দুধর্মে বিশ্বাস বিচলিত হয়। ধর্মমতের পর পর কয়েকটি পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে শেষপর্যন্ত তিনি দেবেন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ পান ও ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। চিরপ্রচলিত হিন্দু সংস্কারের দাসত্ব রাজনারায়ণ বসু কখনও করেননি। যেদিন তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন সেদিন বিস্কুট ও শেরি আনিয়ে গ্রহণ করেন। জাতিবিভেদ যে তিনি মানেন না—এর মধ্য দিয়ে সেটিই প্রমাণিত করতে চেয়েছিলেন। কারণ, তৎকালে 'হিন্দুকলেজের ছাত্রেরা মনে করিতেন যে, মদ্যপান করা সভ্যতার চিহ্ন, উহাতে দোষ নাই।'[১] আর রাজনারায়ণ বসুরও পান-অভ্যাস ছিল। আত্মচরিতে তিনি লিখেছেন, 'এইরূপ অপরিমিত মদ্যপানে আমার একটি পীড়া জন্মিল।'[২]

১৮৪৫ খ্রীঃ ডাফ্ সাহেব হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করেন তাঁর India and India's Missions গ্রন্থে। তত্ত্ববোধিনী সভার পক্ষ থেকে দেবেন্দ্রনাথ বেদকেই হিন্দুধর্মের ভিত্তি বলে প্রতিষ্ঠিত করলেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয়—Vaidantic Doctrines Vindicated—লেখকের নামটি গোপন থাকলেও কারো বুঝতে অসুবিধে হল না যে এটি রাজনারায়ণ বসুর লেখা। রেভাঃ ডাইসন ও রেভাঃ লালবিহারী দের উৎসাহে ডাফ সাহেবের হিন্দু-বিরোধিতা আরও বেশী সক্রিয় হয়ে উঠছিল। ১৮৬৩ খ্রীঃ কৃষ্ণনগরে কেশবচন্দ্র সেন-'The Brahmo Samaj Vindicated' বক্তৃতাটি দেবার পর এই হিন্দুবিরোধী তৎপরতা অনেকাংশে কমে আসে এবং ডাফ সাহেব ইংলণ্ড প্রত্যাগমন করেন।

১৮৫০ খ্রীঃ থেকেই 'ব্রাহ্মধর্ম' আন্দোলনের ধারা কিছু সামাজিক কুসংস্কার ও প্রথা দূর করতে নিযুক্ত হল। বিধবা-বিবাহ, নারীশিক্ষা, বাল্য-বিবাহরোধ, বহু-বিবাহ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় নানা নিবন্ধাবলী প্রকাশিত হতে লাগল। এইসব সংস্কারমূলক পরিবর্তনকে

---

১. রাজনারায়ণ বসু, আত্মচরিত, পৃ. ৪৫। ২. তদেব, পৃ ৪৭।

সহজে গ্রহণ করা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পক্ষে সম্ভব ছিল না। বৈদিক ভারতেব সনাতন আদর্শ ও চিন্তা তাঁর অন্তরের আশ্রয়। হঠাৎ কিছু পরিবর্তনে তাঁর অন্তর সাড়া দিত না। এ প্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছেন, 'তিনি সহজে স্বীয় অবলম্বিত কোনও মত বা কার্যপ্রণালী পরিবর্তন করিতেন না। শীঘ্র কিছু অবলম্বন করিতেন না। করিলে শীঘ্র ছাড়িতেন না। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে ঈশ্বরালোকে বহু পরীক্ষার পর কর্তব্য নির্ণয় করিতেন এবং একবার যাহা নির্ণীত হইত তাহা হইতে সহজে বিচলিত হইতেন না।'[১] তাঁর রক্ষণশীল মনোভাব এই নূতনতর সংস্কার কর্মকাণ্ডকে সহজে গ্রহণ করতে পারে নি। ১৮৪৫ খ্রীঃ বেদের অপৌরুষেয়তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল এখন সমাজ-সংস্কারকে কেন্দ্র করে বিবোধ ঘনিয়ে উঠল। এদিকে অক্ষয়কুমার দত্তেব 'আত্মীয়সভা' ১৮৫৩ খ্রীঃ স্থাপিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সভার সভাপতি ও অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদক নিযুক্ত হন। ঈশ্বরের বিষয় আলোচনা করা এই সভার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল। এই সভার উপাসনাকার্য প্রথমে সংস্কৃতে এবং পরে বাঙলায় ব্যাখ্যা করা হত। অক্ষয়কুমার ও তাঁব সঙ্গিগণ বাঙালায় উপাসনাকার্য প্রবর্তিত করতে চান, কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাতে সম্মত হননি। অক্ষয়কুমারের এই 'আত্মীয়সভা' দেবেন্দ্রনাথের সন্তুষ্টি বিধান করতে পারেনি। 'আত্মজীবনী'তে তিনি লিখেছেন, "ওদিকে অক্ষয়কুমার দত্ত একটা 'আত্মীয়সভা' বাহির করিলেন তাহাতে হাত তুলিয়া ঈশ্বরেব স্বরূপ বিষয়ে মীমাংসা হইত। যথা, একজন বলিলেন, ঈশ্বর, আনন্দস্বরূপ কি না? যাহার যাহার আনন্দস্বরূপে বিশ্বাস আছে, তাহারা হাত উঠাইল। এইরূপে অধিকাংশের মতে ঈশ্বরের স্বরূপের সত্যাসত্য নির্ধারিত হইত।"[২] "একদিন সভার কার্যাবস্ত হইলে দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন 'ঈশ্বব সর্ব্বশক্তিমান্'। অক্ষয়বাবু বলিলেন 'সর্ব্বশক্তিমান্ নন, সর্ববিচিত্র শক্তিমান্।' তিনি বলেন, 'কি! ঈশ্বরের মহিমা ও সর্বশক্তিমত্তা বিষয়ে আমরা এখনও সন্দিহান।' এইসকল কারণে নানা প্রকার গণ্ডগোল উপস্থিত হওয়ার জন্য আত্মীয় সভা উঠিয়া যায়।"[৩] আত্মীয়-সভার কার্যক্রম দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পছন্দ করতে পারলেন না; এটি তাঁর অন্তরের শান্তি ও স্থৈর্য নষ্ট করে দিল। 'এখানে যাঁহারা আমার অঙ্গস্বরূপ

---

১. শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ (নিউ এজ সংস্করণ), পৃ. ১৮১।
২. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আত্মজীবনী, পৃ. ১৭১। ৩. নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস, অক্ষয়চরিত, পৃ. ৬০।

যাঁহারা আমাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন তাঁহাদের অনেকের মধ্যে আর কোন ধর্মভাব ও নিষ্ঠাভাব দেখিতে পাই না। কেবলি নিজের বুদ্ধির ও ক্ষমতার লড়াই। কোথাও মনের মত সায় পাই না। আমার বিরক্তি ও ঔদাস্য অতিশয় বৃদ্ধি হইল।'[১] এরপর দেবেন্দ্রনাথ আরও বেশী অন্তরমুখী হয়ে পড়েন ও পরমাত্মাকে উপলব্ধি করবার জন্য ব্যগ্র হয়ে ওঠেন। ১৮৫৬ খ্রীঃ থেকে ১৮৫৮ খ্রীঃ পর্যন্ত তিনি সিমলার হিমালয়ের প্রশান্তির মধ্যে আত্মস্থ হবার চেষ্টা করেন। এদিকে অক্ষয়কুমার দত্তও অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থতার জন্য তত্ত্ববোধিনীর সংস্রব রক্ষা করা আর সম্ভব হয়নি। '১৮৫৫ সালের আষাঢ় মাসে সন্ধ্যার পর একদিন ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাতে উপস্থিত আছেন, এমন সময়ে হঠাৎ মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া যান। তখন অনেক যত্নে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদিত হইল বটে, কিন্তু দুই দিবস পরে একদিন তত্ত্ববোধিনীর প্রবন্ধ লিখিতেছেন এমন সময়ে মস্তিষ্কের একপ্রকার অভূতপূর্ব জ্বালা হওয়ায় লেখনী ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।'[২]

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর হিমালয় থেকে প্রত্যাগমন করার পর কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্ম-আন্দোলনে যোগ দেন। কেশবচন্দ্র সেনের অসাধারণ নেতৃত্বশক্তি ও প্রতিভাব স্পর্শে ব্রাহ্মসমাজ-আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে উঠল। নবতর ভাব নবতর আদর্শ ও নবতর সংস্কারের দ্বারা ব্রাহ্মসমাজ প্রভূত প্রভাব বিস্তার করল। অবশ্য কেশবচন্দ্র সেন ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন প্রবাসে তখনই ব্রাহ্মসমাজ-ভুক্ত হয়েছিলেন। 'তিনি প্রচলিত পদ্ধতি অনুসরণ না করিয়া প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করণান্তর সঙ্গোপনে ব্রাহ্মসমাজের কর্তৃপক্ষের নিকট উহা প্রেরণ করিলেন। ইহা ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের কথা।'[৩] কলুটোলার বৈষ্ণব সেন-পরিবারের ছেলে কেশবচন্দ্র সেনের মধ্যে ঈশ্বরভক্তি জন্মগত। কিন্তু রাজনারায়ণ বসুর বিখ্যাত বক্তৃতা 'ব্রাহ্মধর্মের লক্ষণ' প্রবন্ধটি পাঠ করেই তিনি ব্রাহ্মধর্মমুখী হয়ে পড়লেন। 'আত্মচরিতে' রাজনারায়ণ বসু জানান, 'কেশববাবু আমার ব্রাহ্মধর্মের লক্ষণ-বিষয়ক বক্তৃতা পাঠ করিয়াই ব্রাহ্মধর্ম অবলম্বন করেন।'[৪] রাজনারায়ণ বসুর ব্রাহ্মধর্ম-বিষয়ক গ্রন্থাবলীর প্রভাব কেশবচন্দ্র সেনের প্রথম জীবনকে

---

১. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আত্মজীবনী, পৃ. ১৭১। ২. শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃ. ১৮২। ৩. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্যসাধক চরিতমালা, নবম খণ্ড, কেশবচন্দ্র সেন, পৃ. ২৬। ৪. রাজনারায়ণ বসু, আত্মচরিত, পৃ. ৭৮।

প্রভাবিত করেছিল।[১] তিনি ব্রাহ্মধর্ম পুস্তকটি পাঠ করে মুগ্ধ হয়েছিলেন। এটি অন্য পাঠকদের নিকট সহজবোধ্য না হলেও কেশবচন্দ্র গ্রন্থটি পাঠ করে বলেছিলেন, 'লোকে উহার তত্ত্ব সকল আপনার জীবনে উপলব্ধি না করিলে এরূপ গ্রন্থ লিখিতে সক্ষম হয় না।'[২] ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করে ক্রমে ব্রাহ্মধর্মের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এর মূল অন্বেষণে প্রবৃত্ত হলেন। তিনি দেখলেন যে কেবল ভাবের ও অসম্পূর্ণ ন্যায়, যুক্তি, বিজ্ঞানের উপর ব্রাহ্মধর্ম অস্থিরভাবে অবস্থান করছে। বিশুদ্ধ জ্ঞান ব্যতীত ধর্ম থাকতে পারে না। ধর্মের মূলতত্ত্ব অনুসন্ধানের জন্য ইউরোপীয় বিজ্ঞান শাস্ত্র-সকল গাঢ় মনোযোগেব সঙ্গে অধ্যয়ন করতে লাগলেন। অনেক চিন্তা ও অনুসন্ধানের পব ধর্মেব পত্তনভূমি যে একমাত্র আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ সহজ জ্ঞান সেটি দৃঢ় প্রত্যয় হল।[৩] হিমালয়-যাত্রার পূর্বেই দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্ববোধিনী সভা ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদকের প্রতি বিরক্ত হয়েছিলেন ; সেইজন্য হিমালয় থেকে প্রত্যাগমন করে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তত্ত্ববোধিনী সভা বন্ধ কবে দেন। কেশবচন্দ্র সেনের সহযোগিতায় এই বছবেই ৮ই মে ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। 'এখানে প্রতি সপ্তাহে বাঙ্গালায় বক্তৃতা দিতেন স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ এবং ইংবেজিতে বক্তৃতা করিতেন কেশবচন্দ্র।'[৪] দেবেন্দ্রনাথ বক্তৃতা করতেন ব্রাহ্মধর্মেব মতবাদ ও বিশ্বাস বিষয়ে-'ব্রাহ্মধর্মেব মত ও বিশ্বাস'। আব কেশবচন্দ্র সেন প্রধানতঃ দার্শনিক তত্ত্ব ও নীতিতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতেন। সেগুলি ১-১৩ সংখ্যক 'ট্রাক্টস্ ফর দি টাইমস্' পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে।[৫] জনসাধারণের মধ্যে এই বক্তৃতাগুলি খুব প্রভাব বিস্তাব করেছিল। সেই সময়েই 'সঙ্গত্ সভা' স্থাপন করে 'ঐ' প্রভাবকে ব্যক্তিগত জীবনে স্থায়ী করার চেষ্টা করেন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে

১. একটি বক্তৃতায় কেশবচন্দ্র সেনও স্বীকার করেন।

"A small publication of the Calcutta Brahma Samaj fell into my hands and as I read the chapter on 'What is Brahmaism?' I found that it corresponded exactly with the inner conviction of my heart, the voice of God in the soul...I at once determined that I would join the Brahma Samaj." ( Lecture in England, 28th April 1870 by Keshub Chandra Sen, ).

২. তদেব পৃ, ৭৮। রাজনারায়ণ বসু, আত্মচরিত, পৃ. ৭৮। ৩. ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত, পৃ. ২৩৯। ৪. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র সেন, পৃ. ২৩৯।

৫. Dr. Prem Sundar Basu, Life & Works of Brahmananda Keshub, পৃ. ৫।

সেপ্টেম্বর কেশবচন্দ্র সেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে সিংহল ভ্রমণে যান। এই সময়ে উভয়ের নৈকট্য বৃদ্ধি পায়। এই সময় থেকেই মহর্ষি কেশবচন্দ্র সেনকে পুত্রবৎ স্নেহ করতে থাকেন। মহর্ষির সঙ্গে কেশবচন্দ্র সেনের যে-সকল পত্র বিনিময় হয়েছে সেই পত্রাবলীর পরস্পরের সম্বোধন অতি প্রীতি ও স্নেহপূর্ণ। কেশবচন্দ্র সেন লিখছেন 'পিতৃচরণকমলে ভক্তির সহিত প্রণাম'[১] 'পিতৃচরণকমলে প্রণাম ও নিবেদন'[২] দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রকে সম্বোধন করছেন 'আমার হৃদয়ের ব্রহ্মানন্দ'[৩] 'প্রাণাধিক ব্রহ্মানন্দ'[৪] ইত্যাদি। একটি পত্রে (২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ খ্রী.) কেশবচন্দ্র সেন দেবেন্দ্রনাথকে লিখেছেন, 'শুনিলাম, আপনার শরীর অসুস্থ, ইচ্ছা হয় নিকটে থাকিয়া এ সময়ে আপনার চরণ-সেবা করি। হৃদয়ের যোগ, আত্মার যোগ তো আছেই তথাপি মন চায় যে, শারীরিক সেবা করিয়া পিতৃভক্তি চরিতার্থ করি।'[৫] আবার অন্য একটি পত্রের উত্তরে কেশবচন্দ্র সেনকে মহর্ষি লিখেছেন, 'তাহা পড়িতে পড়িতে তোমার সৌম্য মূর্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তোমার শরীর দূরে, কি করি তাহাকেই মনের সহিত প্রেমালিঙ্গন দিলাম এবং আনন্দে প্লাবিত হইলাম।'[৬] ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল মহর্ষি ভগবানের আদেশে কেশবচন্দ্রকে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের আচার্যের পদে বরণ করে নেওয়া হয়। এই উপলক্ষে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধিতে বিধিবদ্ধভাবে ভূষিত করেন ও একখানি অধিকারপত্র দান করেন।

অধিকার পত্র

ওঁ তৎ সৎ

'ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মধ্যান ব্রহ্মানন্দ রসপান।'[৭]

অধিকারপত্রের শিরোনামাতে উপরিউক্ত বাক্যটি লেখা ছিল। ইতিপূর্বে ১৮৬২ খ্রী. ২৩শে জানুয়ারি (১১ই মাঘ, ১৭৮৩ শক) ব্রাহ্ম সমাজের দ্বিত্রিংশতম প্রতিষ্ঠা দিবসে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কেশবচন্দ্র সেনকে 'ব্রহ্মানন্দ' নামে ভূষিত করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পরম আদরে পিতৃস্নেহ দিয়ে

১-৬. শ্রীমতী মণিকা মহলানবীশ সম্পাদিত, ব্রহ্মানন্দ শ্রীকেশবচন্দ্রের পত্রাবলী, পৃ, ৩, ৫, ২, ৪, ৩, ২। ৭. শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র ব্রহ্মানন্দ কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য মহাশয়েষু।

"তুমি অদ্য ঈশ্বর প্রসাদে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের আচার্যপদে অভিষিক্ত হইলে, তুমি এই ভার কায়মনোবাক্যে বহন করিবে। তোমার উপদেশ ও অনুষ্ঠান যেন ব্রাহ্মদিগের অমৃতের সোপান হয়।"...

কেশবচন্দ্র সেনকে স্নেহাবদ্ধ করেছিলেন। ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা দিবসে কেশবচন্দ্র সেন সস্ত্রীক সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর স্ত্রী এইসময় পিত্রালয় বালিতে ছিলেন। সেখান থেকে তাঁকে দেবেন্দ্রনাথের গৃহে নিয়ে আসেন উৎসবে যোগ দেবার জন্য। নিঃসন্দেহে এটি সে যুগে প্রথাবদ্ধ সমাজের বিরুদ্ধে এক বিরাট পদক্ষেপ।[১] উৎসব-শেষে দেবেন্দ্রনাথের অন্তঃপুরে একমাত্র নিকট-আত্মীয়দের সম্মুখে এক বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয়। সেখানে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রার্থনা করেন,—"এতদিন পরে তোমার প্রসাদে তোমার প্রেরিত সাধুজনকে দর্শন করিয়া আমার আশা বৃদ্ধি হইল। সেই সাধু যুবা, যিনি অদ্য আমার আলয়ে সস্ত্রীক আসিয়া আমার গৃহকে উজ্জ্বল করিলেন, তাঁর সঙ্গে যতই সহবাস করি, ততই আমার আশা বৃদ্ধি হয়, ততই কৃতার্থ হই। তিনি, যিনি আমার পুত্র হইতেও প্রিয়তর, আমার অভিন্ন হৃদয়, এক হৃদয় যিনি ঈশ্বরের পরিশুদ্ধ ব্রহ্মানন্দ নিয়তই পান করিতেছেন। আমি যত লোকের সঙ্গে সহবাস করিয়াছি, এমত পবিত্র, এমত দৃঢব্রত, এমত জ্ঞানালোকে ধর্মবলে বিভূষিত ব্রহ্মপরায়ণ কোথাও দেখি নাই, তিনি আজ সস্ত্রীক দীক্ষিত হইয়া আমার গৃহকে উজ্জ্বল কবিলেন। এক্ষণে হে পরমাত্মন্, তোমার কৃপাতে ইনি আমাব বৃদ্ধ বয়সের অবলম্বন হইয়া আমাব সহায়তা করুন।"[২] ধর্মীয় মতামতের বিরোধিতা সত্ত্বেও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুবের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের আত্মিক যোগটি অক্ষুণ্ণ ছিল। মতবিবোধিতা ও আদর্শগত দ্বন্দ্বের ফলে কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁব অনুগামীরা স্বতন্ত্র সমাজ 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' স্থাপিত করেছিলেন ও দেবেন্দ্রনাথের নিকট থেকে অনেক দূরে চলে এসেছিলেন। তৎসত্ত্বেও দেবেন্দ্রনাথের পিতৃতুল্য স্নেহ কেশবচন্দ্রকে ভুলতে পারে নি। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দেব ২২শে জানুয়ারি ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা-দিবসের উৎসবে দেবেন্দ্রনাথ পুনর্মিলনের চেষ্টা কবেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে প্রভাতের প্রার্থনা পরিচালনা করেন ও আচার্যের কাজ করেন। কিন্তু তাঁর উপদেশ দান-কালে খ্রীষ্ট সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য সমবেত ভক্তমণ্ডলীর অসন্তুষ্টির কাবণ হয় এবং পুনর্মিলনেব সম্ভাবনা সম্পূর্ণ তিরোহিত হয়।[৩]

---

১. Dr. Prem Sundar Basu : Life & Works of Brahmananda Keshav : Page 57. ২. শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, কেশবচন্দ্র ও বঙ্গসাহিত্য, পৃ. ৩৭/৩৮। ৩. Dr. Prem Sundar Basu : Brahmananda Keshav. Page 279.

উপদেশটির কিছু অংশ নিম্নরূপ—

"ধন্য কেশবচন্দ্রকে যে তিনি এই ব্রহ্মমন্দিব সংস্থাপন করিয়া ব্রহ্মের আরাধনার জন্য আমাদের সকলকে এখানে অবকাশ দিয়াছেন। পৃথিবীময় ব্রাহ্মধর্ম ঘোষণা করিবাব জন্য তাঁহাব ব্রত। যেমন উৎসাহ তেমনি উদ্যম।... কিন্তু তাঁহাকে আমি অনুনয় পূর্বক বলি যে, তিনি ইহার সঙ্গে সঙ্গে খৃষ্টকে না আনেন। ইয়োবোপ ও আসিয়ার মধ্যবর্তী খৃষ্ট যেন না হয়, ঈশ্বর এবং আত্মার মধ্যে কোন প্রকার ব্যবধান না থাকে।· ব্রাহ্মগণ! মন্দিরেব দ্বারে খৃষ্টরূপ এক বিভীষিকা রহিয়াছে, অদ্য ব্রহ্মমন্দিরে কতলোক আসিতে পারিত যদ্যপি দ্বারে খৃষ্টরূপ বিভীষিকা না থাকিত। খৃষ্টের নামে ইয়োরোপে শোণিতে প্লাবিত হইয়াছে, দুর্বল ভারতবর্ষে একবাব আসিলে তাহার অস্থি চর্ম চূর্ণ হইবে। স্বাধীনতাব বিপবীত যাহা কিছু তাহাই খৃষ্টধর্ম। ব্রাহ্মদিগেব মধ্যে খৃষ্ট নাম যেন না আসে।"[১] ১৮৮৩ খ্রীঃ দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের শেষ মিলন ঘটে কেশবচন্দ্রের রোগশয্যায়। একদিন বৃদ্ধ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রকে দেখিবাব জন্য কমল কুটীরে আসিলেন। কেশবচন্দ্র ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। মহর্ষি তাঁহাকে প্রেমভরে আলিঙ্গন দিয়া পার্শ্বে বসাইলেন। যেন পিতা-পুত্রেব শুভ সম্মিলন হইল।· ·· মহর্ষি স্নেহপূর্ণ মধুর ও কোমল কণ্ঠে বলিলেন—

"তোমার পীড়াব সংবাদে যতদূর দুঃখিত হইয়াছি, আমি আমার জামাতাব মৃত্যুতেও তত দুঃখিত হই নাই। শুধু তোমাকে দেখিবাব জন্যই কলিকাতায় আসিয়াছি। তোমাকে আচার্য ও প্রচারক করিয়া পবিব্রাজক হইয়াছিলাম, এখনও তাহাই আছি। তুমিই আচার্য ও প্রচারক।"[২]

কেশবচন্দ্র সেন ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্প্রীতিব স্পষ্ট পবিচয় আছে পত্রাবলীতে—"তুমি তাহাতেই ( সত্যেন্দ্রনাথকে লিখিত কেশবচন্দ্র সেনেব পত্রে ) আমাকে ধর্মতাত বলিয়া বরণ করিয়াছিলে, এবং আমার স্নেহ তৎক্ষণাৎ চক্ষুসলিলে পরিণত হইয়া তোমাকে প্রিয় পুত্ররূপে অভিষেক কবিল।·· তাহার পূর্বে আমি কিছুই জানিতাম না যে, তোমার সহিত আমার এত নৈকট্য অবিচ্ছেদ্য, প্রিয়তর সম্বন্ধ নিবদ্ধ হইবে। ( পত্রাবলী পৃ. ৪৮ )।

"অপ্রিয় ঘটনাতে প্রীতির স্রোতকে মন্দগতি করিতে পারে, কিয়ৎকালের

১. ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত, পৃ. ৩৯৬-৩৯৭।

২. যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, কেশবচন্দ্র ও বঙ্গ সাহিত্য, পৃ. ৮৩।

জন্য অবরোধ করিতে পারে, কিন্তু উহাকে শুষ্ক করিতে পারে না।"—একথা কেশবচন্দ্র নিজেই আর একটি পত্রে বলেছেন ( পত্রাবলী পৃ. ৪৯ )।

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে নানা কারণে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের মতপার্থক্য দেখা যায়। এই মতান্তর শেষে মনান্তরে পর্যবসিত হয়। আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হয় কেশবচন্দ্র ও অনুগামী যুবকদলের সমাজসংস্কারকে কেন্দ্র করে এই বিচ্ছেদের সূত্রপাত ঘটে। নব্যদল চান সমাজসংস্কারকে ত্বরান্বিত করতে। "যখন তিনি রক্ষণশীলতার সীমা অতিক্রম করিলেন, সঙ্কর ও বিধবা বিবাহ দিয়া ব্রাহ্মণ তনয়দিগের উপবীত ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিলেন তখন উভয়ের মধ্যে প্রভেদ রেখা লক্ষিত হইল।"[১]

এতদিন পর্যন্ত সামাজিক অনুষ্ঠানগুলি প্রচলিত বৈদিক হিন্দুধর্ম অনুসারেই হত। কিন্তু ১৮৬৫ খ্রী. জাতকর্ম, নামকরণ, উপনয়ন, দীক্ষা, বিবাহ, অন্ত্যেষ্টি, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি সামাজিক অনুষ্ঠানগুলিতে নব্য সংস্কারশীল যুবকেরা প্রচলিত প্রথার বিরোধিতা করেন। মহর্ষি ব্রাহ্মমতে আপনার দ্বিতীয় কন্যার বিবাহ দেন ও নিজে উপবীত ত্যাগ করেন। পূর্বে উপবীতধারী উপাচার্যগণ ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে আসীন হয়ে উপাসনাদি কাজ করতেন। কিন্তু নব্যদলের আন্দোলনে মহর্ষি তাঁদের কর্মচ্যুত করে দুইজন উপবীত-ত্যাগী উপাচার্যকে সেই পদে নিযোগ করলেন। এতে সমাজের প্রাচীন সভ্যগণের মনে বিরাগ জন্মাল।[২] শুধু তাই নয় ইতিমধ্যে দুটি অসম ও সঙ্কর বিবাহ ব্রাহ্ম-মতে সংঘটিত হয়। এতে প্রাচীনপন্থী ব্রাহ্মগণ ভীত হলেন এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সচেতন করে দিলেন যে, এইসকল সংস্কারের হোতা কেশবচন্দ্রের হাতে সমাজের কর্তৃত্বভার থাকলে মহা অনিষ্ট হবে। দেবেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে নানাবিধ সংস্কারগুলো মেনে নিলেও বিরোধ-বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়াল অন্য আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণে।

১৮৬৪ খ্রী. মাদ্রাজ ও বোম্বাইতে ধর্মপ্রচার করেন কেশবচন্দ্র সেন। সর্বভারতে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারিত হল, সর্বত্রই কেশবচন্দ্রের বিরাট ব্যক্তিত্ব ( Thunderbolt of Bengal ) ও বাগ্মিতা স্বীকৃতি পেল। পূর্ব বাংলাতেও ঢাকা, বরিশাল, মৈমনসিংহ ইত্যাদি স্থানে ও উত্তর ভারতে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারিত হয়েছিল। দক্ষিণভারত ভ্রমণ-অন্তে তিনি একটি প্রতিনিধিস্থানীয়

---

১. চিরঞ্জীব শর্মা, কেশবচরিত, ৩য় সং, পৃ. ৯৭। ২. শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ, ২য় সং, পৃ ২৪২।

"মণ্ডলী স্থাপন করতে ইচ্ছুক হন যেটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠবে আর শুধু বাংলায় নয় ভারতের সর্বত্র সমাজগুলির মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করবে, আর সর্বাত্মক উন্নতির সহায়ক হবে। বঙ্গদেশে এই প্রতিনিধিসভা গঠিত হল ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে অক্টোবর। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন সভাপতি এবং সম্পাদক ছিলেন কেশবচন্দ্র সেন।[১]

১৮৬৫ খ্রী. এই প্রতিনিধি-সভার কয়েকটি অধিবেশন হয় এবং নিয়মাবলীও রচিত হয়। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উক্ত সভা ও সংস্কারকামী ব্রাহ্মদের সমুদয় কার্য ব্রাহ্মসমাজের প্রতিবন্ধক-স্বরূপ জ্ঞান করেন ও ট্রাস্টির ক্ষমতাবলে ব্রাহ্মসমাজের কর্তৃত্বভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন পরিচালক পদে বিভিন্ন ব্যক্তিকে বসান। এই ট্রাস্ট-ডীড অনুসারে ব্রাহ্মসমাজ-গৃহ কেবল উপাসনার জন্য ব্যবহৃত হবে এবং প্রচারের জন্য ভিন্ন স্থান আবশ্যক, এইভাবে ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু ট্রাস্ট-ডীডের বিরুদ্ধাচরণ করে ঐ গৃহেই ব্রহ্ম-বিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু প্রতিনিধি-সভার কার্য ঐ গৃহে নিষিদ্ধ করা হল। প্রতিনিধি সভার তৃতীয় অধিবেশন-কালেই 'সংগ্রামের সূত্রপাত'। "এই অধিবেশন জন্য কলিকাতা সমাজের নিম্নতল গৃহ ট্রাস্টীগণের নিকট প্রার্থনা করা হয়, কিন্তু তাঁহারা গৃহ দিতে অসম্মত হন। অগত্যা চিৎপুর রোডে ভূতপূর্ব হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজগৃহে উহা আহূত হয়।"[২] চতুর্থ অধিবেশনও কলিকাতা কলেজের তৃতীয়তল গৃহে আহূত হয়েছিল। "কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতর ট্রাস্টী শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মসমাজ গৃহে সভাকে স্থান দানে অসম্মত হওয়াতে কলিকাতা কলেজের তৃতীয়তল গৃহে সভার অধিবেশন হইয়াছিল।"[৩] এতে কেশবচন্দ্র সেন অত্যন্ত মনঃপীড়া অনুভব করেন ও বিশেষ অনুযোগ সহ দুঃখ প্রকাশ করে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে পত্র দেন।[৪] এই পত্রের উত্তরে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কেশবচন্দ্রকে জানান, "আমার কথা যদি শ্রবণ কর, তোমার এই করা কর্তব্য যে তুমি আমার কোন কার্যে হস্তক্ষেপ না কর। আমি তোমার কোন কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে চাহি না।... কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজ আমার কার্যের পরিমিত ক্ষেত্র, আমি তথায়

---

১. Dr. Prem Sundar Basu—Life & Works of Brahmananda Keshav. Page 79. ২. অধিবেশন--ব্রাহ্ম ট্রাষ্ট সোসাইটি, পৃ. ১৭। ৩. তদেব, পৃ. ২৫। ৪. ৫ই মে, ১৮৬৫ খ্রী. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা কেশবচন্দ্রের পত্র, পত্রাবলী, মণিকা মহলানবীশ সম্পাঃ পৃ, ১২।

ব্রাহ্মদিগের ও ঈশ্বরপরায়ণ সাধুদিগের সঙ্গে একত্র হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করিব. তথা হইতে যাহাতে ব্রহ্মবিদ্যার শিক্ষা হয়, তাহার সদুপায় অবলম্বন করিব. পত্রিকা দ্বারা ও অন্যান্য উপায়ে ব্রাহ্মধর্ম যাহাতে প্রচার হয় তাহাতে যত্ন করিব। ইহা করিলে যদি তোমার বিপক্ষতা করা হয় তবে ইহার উপায় নাই।"১ হয়তো দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কেশবচন্দ্র সেনকে ভুল বুঝেছিলেন যে কারণে ব্রাহ্মসমাজের কর্তৃত্বের ভার প্রতিনিধি-সভার হাতে তুলে দিতে ভীত হলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ট্রাস্ট-ডীড-এর ক্ষমতাবলে তার কর্তৃত্বভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। কেশবচন্দ্রকে লেখা দেবেন্দ্রনাথের একটি পত্রে এই ভুল বোঝার ভাবটি স্পষ্ট রূপে ধরা পড়েছে। "তুমি যদি আপনাকে ভুলিয়া এবং জয়-পরাজয় ভুলিয়া, কেবল ঈশ্বরের মহিমাকে মহীয়ান করিতে প্রবৃত্ত থাক, তবে এই বঙ্গভূমিতে অমৃতবারির বর্ষণ হইবে ও ইহার মহোপকার সাধিত হইবে—নতুবা আপনার গৌরবের জন্য, আপনার দলপুষ্টির জন্য, আপনার জয়লাভের জন্য যদি ঈশ্বরের মহিমা ঘোষণা উপায়মাত্র করা হয় তবে তাহা হইতে কালকূট গরল উৎপন্ন হইয়া সকল লোককে অভিভূত করিবে।"২ এই পত্রের উত্তরে কেশবচন্দ্র সেনও দেবেন্দ্রনাথকে লিখেছেন—"আমাকে আপনি বুঝিতে না পারাতেই 'তত্ত্ববোধিনী' সভার মত, অক্ষয়কুমার দত্তের মত, আমাকে বিঘ্ন জ্ঞান করতঃ, আমাকে বিদায় করিয়া, নিশ্চিন্ত ও নিষ্কণ্টকরূপে ব্রাহ্মসমাজকে স্বীয় ইচ্ছানুসারে শাসন করিবেন, এরূপ কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন।"৩ এইভাবে বিবাদের মেঘ ঘনীভূত হয়ে উঠল। কেশবচন্দ্রের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিচ্ছেদ ঘটল। কেশবচন্দ্র সেন সদলে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ থেকে দূরে সরে দাঁড়ালেন। 'ইণ্ডিয়ান মিরর'-এর স্বত্বাধিকার ও পরিচালনার ভারটি তাঁরই উপর রইল। এই গোলমালের মধ্যে আর একটি ঘটনার উল্লেখ শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় করেছেন—

"১৮৬৪ সালের সুপ্রসিদ্ধ ঝড়ে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বাড়ী ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে তাহার জীর্ণ সংস্কারের প্রয়োজন হইল। তখন কিছুদিনের জন্য সমাজের উপাসনা দেবেন্দ্রনাথের গৃহে উঠিয়া গেল। সেখানে যেদিন প্রথম উপাসনা আরম্ভ হইল, সেদিন উপবীত-ত্যাগী উপাচার্যদ্বয় গিয়া দেখেন যে তাঁহাদের উপস্থিত হইবার পূর্বেই পূর্বকার উপবীতধারী উপাচার্যগণ উপাসনা

১. ৬ই মে, ১৮৬৫ খ্রী. ব্রহ্মানন্দকে লিখিত মহর্ষির পত্র, পত্রাবলী পৃ. ১৭। ২. তদেব. পৃ. ১৬। ৩. তদেব পৃ. ২৩।

কার্য আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা যুবক ব্রাহ্মদলের পক্ষে অসহনীয় বোধ হইল। তাঁহাদের অনেকে সেই মুহূর্তেই সে স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যস্থানে গিয়া উপাসনা করিলেন। বলিতে গেলে এই সময় হইতেই প্রকাশ্য গৃহবিচ্ছেদ আরম্ভ হইল। ইহার পর কেশবচন্দ্র অনেকদিন কোনও প্রকারে সম্মিলিত ভাবে থাকিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু চরমে শান্তি স্থাপিত হওয়া অসম্ভাবিত হইল।"[১] কেশবচন্দ্র কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক-পদ ত্যাগ করেন—এই পদে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর নিযুক্ত হলেন এবং শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী তাঁর সহকারী নিযুক্ত হলেন।[২] কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজের অধ্যক্ষতা ত্যাগ করে কেশবচন্দ্র প্রতিনিধি সভা নিয়ে ব্যস্ত রইলেন ও আরও নানাবিধ কর্মযজ্ঞে নিজেকে নিযুক্ত করলেন। এইভাবে বিচ্ছেদ রচিত হলেও দেবেন্দ্রনাথ বেশ কিছুদিন যুবকদের আত্মিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে সহায়তা করেছেন। এমন কি এই দলের প্রতিষ্ঠিত 'ব্রাহ্মবন্ধু সভা'তে একবার তিনি 'ব্রাহ্ম সমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত' বিষয়ে বক্তৃতা করেছিলেন।

১৮৬৩ খ্রী. কেশবচন্দ্রের উদ্যোগে বামাবোধিনী সভায় একটি মহিলা সম্মেলন ঘটে। পরে ১৮৬৫ 'ব্রাহ্মিকা সমাজ' স্থাপিত হয়। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের মাঘোৎসবে ব্রাহ্মিকা সমাজের মহিলারা উপস্থিত ছিলেন। কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজের বেদীর পূর্বপার্শ্বে পরদার আড়ালে মহিলাদের বসবার আসন দেওয়া হয়। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে সর্বপ্রথমে নারীগণ এই প্রকাশ্য উপাসনা মন্দিরে পুরুষদের সঙ্গে বসলেন। এতে মহিলাদের মধ্যে উৎসাহের সাড়া পড়ে গেল। পরবর্তী ফেব্রুয়ারি মাসে কেশবচন্দ্র মহিলাদের পাদরি ডাক্তার রবসনের ভবনে প্রকাশ্য সান্ধ্য সমিতিতে গেলেন। এতে প্রাচীন ব্রাহ্মগণ অসন্তুষ্ট হলেন।

এই বছরেই ৫ই মে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ থিয়েটারে কেশবচন্দ্র তাঁর বহু বিতর্কিত বক্তৃতাটি Jesus Christ : Europe & Asia প্রদান করেন।[৩] ইংরেজগণ এই বক্তৃতার বক্তব্য ঠিক উপলব্ধি করিতে না পারাতে

---

১. শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, ২য় সং, পৃ. ২৪৩।
২. সম্পাদকীয়, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, পৌষসংখ্যা, ১৮৭৬ শক, ডিসেম্বর ১৮৬৪।
৩. এই বক্তৃতায় খ্রীষ্টের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পরিবেশিত হয়েছিল—"His death on the cross affords the highest illustration of self-sacrifice. In obedience to the will of his father, he laid down his life and said—'Thy will be done. O God!' Fellow countrymen, it is your duty to follow these precepts, and imitate this

তাঁকে খ্রীষ্টান বলে ধারণা করলেন। এই বক্তৃতাপাঠে সেই সময়ের বড়লাট লর্ড লরেন্স তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য আগ্রহান্বিত হয়ে ওঠেন। দেশী ও বিদেশী সকলেই ভাবলেন কেশবচন্দ্র সেন কিছুদিনের মধ্যেই খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করবেন। দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুগামীরা কেশবচন্দ্রকে ও নবোদিত ব্রাহ্মদলকে 'খ্রীষ্টিয়ান' বলে নিন্দা করতে লাগলেন।

কেশবচন্দ্র সেন তাঁর প্রদত্ত বক্তৃতার এই অপব্যাখ্যা হওয়াতে জনসাধারণের অমূলক সন্দেহ দূর করার জন্য 'Great Men' বলে আর একটি বক্তৃতা প্রদান করেন (১৮৬৬ খ্রী. ২৮শে সেপ্টেম্বর)। এই বক্তৃতায় জগতের মহাপুরুষদের জীবনাদর্শ বিবৃত করে প্রত্যেকের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এই বৎসরই বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ হতে সারাংশ সংগ্রহপূর্বক 'শ্লোক সংগ্রহ' প্রকাশ করা হয়। এটিকে 'নববিধান'এর সূত্রপাত মনে করা চলে।

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জুলাই শ্রীকেশবচন্দ্র সেন, শ্রীউমানাথ গুপ্ত, শ্রীমহেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযদুনাথ চক্রবর্তী, শ্রীনিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ নব্য ব্রাহ্মগণের স্বাক্ষরসহ দেবেন্দ্রনাথকে একটি পত্র দেওয়া হয়, তাতে কয়েকটি প্রস্তাব ছিল—

১. ব্রাহ্মসমাজের আচার্য বা উপাচার্য বা অধ্যেতা কেহ সাম্প্রদায়িক বা জাতিভেদসূচক কোন চিহ্ন ধারণ করিবেন না।

২. সাধু, সচ্চরিত্র ও জ্ঞানাপন্ন ব্রাহ্মেরাই কেবল বেদীর আসনের অধিকারী হইবেন।

৩. ব্যাখ্যান, স্তোত্র ও উপদেশে ব্রাহ্মধর্মের উদার, প্রশস্ত ও নিরপেক্ষ ভাব প্রকাশ পাইবে। কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতি অবজ্ঞা বা ঘৃণাসূচক বাক্য উহাতে ব্যবহৃত হইবে না, সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করা উহার উদ্দেশ্য থাকিবে।

৪. যদ্যপি উপাসনা সম্বন্ধে উল্লিখিত নূতন প্রণালী অবলম্বনে আপনি স্বীকৃত না হন, তাহা হইলে সাধারণ ব্রাহ্মদিগকে ঐ প্রণালী অনুসারে অপর একদিন ব্রাহ্মসমাজ গৃহে উপাসনা করিতে অনুমতি দিয়া বাধিত করিবেন। ইহা হইলে উভয় দিক রক্ষা হইবে, এবং ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে, তৎপরিবর্তে সদ্ভাব সঞ্চারের সম্ভাবনা হইবে। যদ্যপি ইহাতেও

**example of self-sacrifice in the cause of truth." Dr. Prem Sundar Basu, Life and Works of Brahmananda Keshav, p. 105.**

আপনি অস্বীকৃত হন, তাহা হইলে আমাদিগকে পৃথক ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন বিষয়ে সৎপরামর্শ দিবেন।[১]

এই পত্রপাঠে দেবেন্দ্রনাথ অসন্তুষ্ট ও দুঃখিত হলেন। কারণ এতকাল যখন যেরূপ প্রয়োজন তিনি সাধ্য অনুসারে তা সম্পন্ন করেছেন, তাঁর রক্ষণশীল মনোভাব সত্ত্বেও। কারণ তিনি মনে করতেন, "কাল সহকারে মনুষ্যের অবস্থার পরিবর্তন হইয়া উঠে, সেই পরিবর্তন সহকারে পুরাতন সামাজিক প্রণালীও পরিবর্তিত করিতে হয়। তাহা না করিলে উন্নতির পক্ষে অনেক ব্যাঘাত উপস্থিত হইতে পারে।"[২] উল্লেখিত পত্রপাঠে তিনি নব্যব্রাহ্মদিগের সহিত যদিও একমত হতে পারলেন না তথাপি ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ৬ই জুলাই-এর লেখা একটি পত্রে তিনি তাঁদের নতুন সমাজ তৈরি করতে সম্মতি দিলেন ও আশীর্বাদ করলেন।

"তোমরা পৃথক ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করিবে এবং তন্নিমিত্ত আমার নিকট সৎপরামর্শ প্রার্থনা করিয়াছ। একমেবাদ্বিতীয়ং পরব্রহ্মের উপাসনা বিস্তারের জন্য ব্রাহ্মসমাজ স্থানে স্থানে যত সংস্থাপিত হয় ততই মঙ্গল। ব্রাহ্মধর্মের প্রথম প্রবর্তক মহাত্মা রামমোহন রায়ের উপদেশ অবলম্বন করিয়া, ইহাতে আমি এই পরামর্শ দিতেছি যে, যাহাতে পরমেশ্বরের প্রতি মন ও বুদ্ধি ও হৃদয় ও আত্মা উন্নত হয়, যাহাতে ধর্ম, প্রীতি, পবিত্রতা ও সাধুভাব সঞ্চার হয়, সেই সমাজের উপাসনা সময়ে এই প্রকারে বক্তৃতা, ব্যাখ্যান, স্তোত্র ও পাঠ ব্যবহৃত করিবে।"[৩]

এদিকে ১১ই নবেম্বর ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে, শতাধিক ব্রাহ্মের আহ্বানে প্রতিনিধি সভার একটি সাধারণ সম্মেলন আহূত হয়। "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের জন্য একশত বিংশতি জন ব্রাহ্ম আবেদন করেন। এই আবেদন অনুসারে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দ ১লা নবেম্বরের 'মিরর'-এ এই বিজ্ঞাপন বাহির হয়—ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মমণ্ডলীকে নূতন সংগঠন করিবার জন্য ১৫ই নবেম্বর বৃহস্পতিবার, অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় ৩০০ সংখ্যক চিৎপুর রোড প্রচার-ভবনে সভা হইবে। রবিবার ভিন্ন সকল ব্রাহ্মের উপস্থিত হইবার সুবিধা হয় না বলিয়া অদ্য অপরাহ্ণে ( রবিবার, ১১ই নবেম্বর ১৮৬৬ ) সভা আহূত হইয়া চিৎপুর রোডের কার্য আরম্ভ হয়। দুইশত ব্রাহ্ম উপস্থিত হন।

১. মণিকা মহলানবীশ সম্পাদিত পত্রাবলী, পৃ. ২৯। ২. তদেব, পৃ. ৩০। ৩. তদেব, পৃ. ৩৪।

এই সভায় তিনজন ইউরোপীয় দর্শক ছিলেন।" এই সভা ভেঙ্গে দেওয়ার দাবী নিয়ে বাবু নবগোপাল মিত্র আপত্তি উত্থাপন করেন ও বিরোধিতা করেন।[১] ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই নবেম্বরের অধিবেশনে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' স্থাপিত হয়। শুধু মাত্র ব্রাহ্মসমাজ নয়—ভারতবর্ষীয় কথাটি লক্ষণীয়। ধর্মের ক্ষেত্রে সমগ্র ভারতেব ঐক্য কামনা করেছেন ঐ নামটির মধ্য দিয়ে। তাই 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ'-ইংরেজীতে The Brahmo Samaj of India ; ইংরেজ-শাসিত যুগে British India কথাটির চল থাকলেও কেশবচন্দ্র সেন India বা 'ভারত বলতে স্বাধীন ও সার্বভৌম ভারতেরই হয়তো ইঙ্গিত কবেছেন। যদিও এব নাম ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ. কিন্তু এর কার্যক্ষেত্র ভারতবর্ষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। এব প্রতিষ্ঠাতাগণ মনে করতেন, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজকে সমগ্র মানবেব সমাজরূপে পরিগণিত করতে হবে। এই সমাজ স্থাপন করবার সময় একটি শ্লোক বচিত হয়েছিল ; সেটি এই সমাজেব উদার প্রশস্ত ভাব দ্যোতনা কবছে—

"সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং॥
বিশ্বাসোধর্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্ত বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্যতে॥"

"জাতি-নির্বিশেষে, ব্যক্তি-নির্বিশেষে, দেশ-নির্বিশেষে সমুদায় নরনারীকে সমাজ সম্বন্ধে ও ধর্মবিষয়ে সমান অধিকার দিয়া সকলকে এক ঈশ্বরের উপাসক করা এবং পবিত্র ভ্রাতৃভাবে সকলের সহিত এক পরিবারে বদ্ধ হওয়া ইহাব উদ্দেশ্য।"[২]

'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা দিবসেব এক অধিবেশনে কেশবচন্দ্র সেন বলেন, "বন্ধুগণ অতি গুরুতর কর্তব্য সাধনের জন্য অদ্য আমরা এখানে উপস্থিত হইয়াছি। এই কর্তব্যের জন্য আমরা নিজের নিকট, সমাজের নিকট এবং সমগ্র ভারতের নিকট দায়ী। ব্রাহ্মমণ্ডলীকে একত্র করাই অদ্যকার প্রধান উদ্দেশ্য।"[৩] ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ২০শে অক্টোবরেব একটি অধিবেশনে স্থির হল যে এই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের কখনও সভাপতি

১. অধিবেশন—ব্রাহ্ম ট্রাক্ট সোসাইটি, পৃ. ৪৪-৪৫। ২ ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল, ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত, পৃ. ২৭৫। ৩. নববিধানাচার্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, অধিবেশন (ব্রাহ্ম ট্রাক্ট সোসাইটি) পৃ ৪৫।

থাকিবে না। স্বয়ং ঈশ্বরই ইহার অধিপতি। যখন ব্রাহ্মধর্মের প্রচারকার্যের সূত্রপাত হয় তখন অতি অল্পসংখ্যক লোক এই কার্যে ব্রতী ছিলেন। পরে অবশ্য তাঁদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। প্রথমদিকে আঠারো জন প্রচারক এই কার্যে নিযুক্ত হলেন, তাঁদের নাম—

(১) কেশবচন্দ্র সেন; (২) প্রতাপচন্দ্র মজুমদার; (৩) মহেন্দ্রলাল বসু; (৪) অঘোরনাথ গুপ্ত; (৫) উমানাথ গুপ্ত; (৬) বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী; (৭) অমৃতলাল বসু; (৮) ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল; (৯) গৌরগোবিন্দ রায়; (১০) কান্তিচন্দ্র মিত্র; (১১) প্যারীমোহন চৌধুরী; (১২) বঙ্গচন্দ্র রায়; (১৩) প্রসন্নকুমার সেন; (১৪) দীননাথ মজুমদার (১৫) বনোয়ারি লাল; (১৬) গিরিশচন্দ্র সেন; (১৭) রামকুমার ভট্টাচার্য; (১৮) শ্রীধরালু নাইডু প্রমুখ। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বৈষয়িক কার্য নির্বাহের ভার একজন সম্পাদক এবং একজন সহকারীর প্রতি অর্পিত হয়। কেশবচন্দ্র সেন সম্পাদক এবং প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও শ্রীযুক্ত উমানাথ গুপ্ত যুগ্ম সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্মতিক্রমে তাঁকেও 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে'র সভ্য শ্রেণীভুক্ত করা হয়। কারণ নব্যব্রাহ্মগণ মনে করেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে পথ-প্রদর্শন করেছেন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ তারই ফল। সুতরাং তিনি সভ্যশ্রেণীভুক্ত হলে সেটি 'সমধিক সম্মাননার কারণ হয়।'[১] প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে নবগঠিত 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ থেকে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে একটি অভিনন্দন পত্রও দেওয়া হয়। (২১শে ডিসেম্বর ১৮৬৭ খ্রী.)[২]

প্রকৃতপক্ষে চিন্তার স্বাধীনতা ও সমাজ ও ধর্মীয় সংস্কার-সাধনের উদ্দেশ্য নিয়েই কেশবচন্দ্র সেন 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সৃষ্টি করলেন। তিনি একটি অধিবেশনে বলেন, "যাঁহারা ব্রাহ্মধর্মের মূল সত্যে বিশ্বাস করেন, তাঁহাদিগকে একত্র করিয়া একটি উপাসনাশীল এবং নীতিপরায়ণ সমাজ গঠন করা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য। সকলের সঙ্গে ইহার বন্ধুতার সম্বন্ধ, শত্রুতার নহে। উন্নতি-স্রোতেই ইহা হইয়া আসিয়াছে। সমস্ত ভারতবর্ষে ব্রাহ্ম-ধর্ম প্রচার করা এবং ব্রহ্ম-উপাসকদিগকে সচ্চরিত্র করিবার

১. নববিধানাচার্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, অধিবেশন (ব্রাহ্ম ট্রাক্ট সোসাইটি) পৃ. ৫৩।
২. ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, ব্রাহ্ম সমাজের ইতিবৃত্ত, পৃ. ২৯২।

জন্য এই সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সুতরাং কলিকাতার আদি ব্রাহ্ম সমাজও ইহার অন্তর্গত।"[১] প্রকৃতপক্ষে প্রচুর বিরোধিতা সত্ত্বেও কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ ও সভ্যদের প্রতি নব্যদলের ব্রাহ্মরা সর্বদা শ্রদ্ধা-ভক্তিই প্রদর্শন করেছেন।

মূল 'কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ' থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এইরূপে যখন নতুন আর একটি সমাজ প্রতিষ্ঠিত হল, তখন পূর্বের সমাজ নাম গ্রহণ করল 'আদি ব্রাহ্মসমাজ'। তৎকালীন মননধর্মী সাহিত্য পত্রিকা তত্ত্ববোধিনীতে ১৭৯০ শকের মাঘ সংখ্যায় (১৮৬৯ খ্রী. জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি) কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজকে 'কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ' নামে বর্ণনা করা হয়েছে। ঐবছরেই পরবর্তী চৈত্র সংখ্যায় ইহার 'কলিকাতা' অংশ বর্জিত হয়ে শুধু 'আদি ব্রাহ্মসমাজ' নামে পরিচিত করা হয়।[২] এখন থেকে কলকাতায় দুটি ব্রাহ্ম সমাজ সমান্তরালভাবে কাজে অগ্রসর হল। নতুন সমাজের সভ্যগণ উচ্চশিক্ষিত, অপেক্ষাকৃত তরুণ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই যুব-সম্প্রদায়ের হাতে সমাজের প্রচারকার্য, ও জনহিতকর অনুষ্ঠানাদির ভার অর্পণ করেছিলেন। কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে স্বতন্ত্র দল গঠিত হবার পরও এই যুবকদল অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে এই সকল কর্মসাধনে তৎপর হলেন।

চিৎপুর রোডের যে বাড়িতে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় তার প্রচার কার্যালয় ভাড়াটে বাড়ি ছিল। ১৮৬৯ খ্রী. ২২শে আগস্ট ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের নিজস্ব উপাসনা গৃহ ব্রহ্মমন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন হয়। এই দিন একুশজন ব্রাহ্ম যুবক এবং দুইজন মহিলা ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই একুশজনের মধ্যে ছিলেন আনন্দমোহন বসু, মোহিনীমোহন বসু, অনাথবন্ধু গুহ, শিবনাথ শাস্ত্রী ও কৃষ্ণবিহারী সেন। মহিলাদের মধ্যে ছিলেন আনন্দমোহন বসুর সহধর্মিণী স্বর্ণপ্রভা বসু। কৃষ্ণবিহারী সেনের পত্নীও সেদিন প্রাতে বাড়িতে বসে কেশবচন্দ্র সেনের নিকট দীক্ষিত হন।[৩]

১১ মাঘের উৎসবে ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠার দিন কেশবচন্দ্র সেন 'দয়াময়'[৪] নাম লাভ করেন। ইতিপূর্বে ব্রাহ্মদের মূল মন্ত্র ছিল 'সত্যমেব জয়তে'—তারই সঙ্গে কেশবচন্দ্র সেন যুক্ত করলেন 'ব্রহ্মকৃপাহি কেবলং'। "কতকগুলি সামান্য

১. নববিধানাচার্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, অধিবেশন, পৃ. ১২৯। ২. যোগেশচন্দ্র বাগল, কলিকাতার সংস্কৃতি কেন্দ্র, পৃ. ৫৮। ৩. তদেব, পৃ. ১৫২। ৪. কেশবচন্দ্র সেন, অধিবেশন, পৃ. ৭৯।

অসহায়, পাপ ব্যথিত ব্যক্তি একদা দয়াময় পরমেশ্বরের আহ্বানে সম্যক্‌রূপে সত্যের শরণাপন্ন হবার সংকল্প নিয়েই এই ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। "ব্রহ্মকৃপাহি কেবলং—এই কৃপাতে জীবন, শান্তি ও পরিত্রাণের আশা লাভ করিয়াছি এবং কেবলমাত্র এই কৃপা অবলম্বন করিয়া গত বৎসর ১১ই মাঘের এই উৎসব দিবসে প্রথমে আমরা ব্রহ্মমন্দিরে প্রবেশ করি। সেই দিন আমরা কি বিশেষ শাস্ত্র লাভ করিলাম? 'দয়াময়' নাম—যাহা আনন্দের অপার সিন্ধু, আশার অব্যর্থ উৎস, পবিত্রতার অক্ষয় ভাণ্ডার লাভ করিতে পারি এই জন্যই পরম পিতা তাঁহার গভীর 'দয়াময়' নাম আমাদিগকে প্রেরণ করিলেন।"

১৮৭০ খ্রী. ১৫ই ফেব্রুয়ারি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের মধ্যমণি কেশবচন্দ্র সেন বিলাতে গমন করেন। পর বৎসর অক্টোবর মাসে তিনি ভারতে প্রত্যাগমন করেন। কেশবচন্দ্র সেনের ভারতে অনুপস্থিতিকালে ব্রাহ্মসমাজের কাজ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখ ব্রাহ্ম প্রধানদের পরিচালনায় সুষ্ঠুভাবেই চলেছিল। এই বৎসরের অক্টোবর মাসে কেশবচন্দ্র সেন বিলেত থেকে ফিরে আসেন ও ২রা নবেম্বর 'ইণ্ডিয়ান রিফর্ম এসোসিয়েশন' বা 'ভারত-সংস্কার সভা' প্রতিষ্ঠিত হল। এই সভার সভাপতি হলেন কেশবচন্দ্র সেন স্বয়ং এবং অবৈতনিক সম্পাদক হলেন গোবিন্দচন্দ্র ধর। পাঁচভাগে এই সভার কর্মপদ্ধতি ভাগ করা হয় এবং পূর্ণ উদ্যমে পাঁচটি বিভাগের কাজ এগিয়ে চলে। ১৮৭১ খ্রী ১লা ফেব্রুয়ারি 'নেটিভ এডাল্ট ফিমেল এবং নর্মাল স্কুল' নামে একটি বয়স্কা মেয়েদের শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হল। পরবর্তী সেপ্টেম্বর মাসে এর অন্তর্গত একটি বালিকা বিদ্যালয় খোলা হল। বয়স্থা শিক্ষয়িত্রী-বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে নারী জাতির সর্ববিধ উন্নতি বিধানের জন্য ১৮৭২ খ্রী. ৫ই এপ্রিল 'ভারতাশ্রম' ও 'বামাহিতৈষিণী সভা' স্থাপিত হয়। শুধু ধর্ম নয়, অন্যান্য বিষয়ও যেমন শিক্ষা, সাহিত্য, আচার-আচরণ, রীতিনীতি, পোষাকপরিচ্ছদ, সামাজিক ও পারিবারিক কর্তব্যা-কর্তব্য বিষয় এই সভায় আলোচিত হত। বাইরে থেকে ভদ্রমহিলারা এসে এই সভায় যোগ দিতেন। ইতিমধ্যে Albert Institute প্রভৃতি আরও বহুবিধ কর্ম-উদ্যোগের মধ্য দিয়ে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে'র কাজ এগিয়ে চলল। কেশবচন্দ্র সেনই ছিলেন এ সকল কর্মযজ্ঞের প্রধান হোতা।

পরিচালকবর্গের মধ্যে নানা কারণে মতবিরোধ দেখা দিল ও ভারতবর্ষীয়

ব্রাহ্মসমাজ থেকে একদল বহির্গত হয়ে ১৮৭৮ খ্রী. মে মাসে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর থেকে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ 'নববিধান' রূপে ক্রমশঃ পরিচিত হতে থাকে। ১৮৮০ খ্রী. ২৬শে জানুয়ারি থেকে এই সমাজ সম্পূর্ণভাবে 'নববিধান' নামটি পরিগ্রহ করে। 'নববিধানে'র নূতন বাণী শিক্ষিত সাধারণের গোচরে আনবার জন্য ইংরেজি 'দি নিউ ডিস্‌পেন্সেসান' এই সময় প্রকাশিত হয়। এবং ভারতের সর্বত্র 'নববিধান'কে জনপ্রিয় করে তুলবার জন্য "নববিধানের বিভিন্ন মত সকল ইংরেজী, বাঙ্গালা, হিন্দী, উর্দু, সিন্ধী, মহারাষ্ট্রী, সংস্কৃত, উড়িয়া, তামিল এবং তেলেগু ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়া বিতরিত হয়।"[১]

'নববিধান' ব্রাহ্মধর্ম বহির্ভূত নয়। কিন্তু 'নববিধানে'র সার্বভৌমিক আবেদন ব্রাহ্মধর্মকে এক উদার আধ্যাত্মিক ও সার্বজনীন মহাধর্মরূপে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছে। "ব্রাহ্ম সমাজের ব্রহ্ম এতদিন কেবল হিন্দুস্থানের ব্রহ্ম ছিলেন—এখন তিনি সমস্ত জগতের ব্রহ্ম হইলেন।"[২] নববিধানে সকলই অসীম। এতে সাম্প্রদায়িকতা ও সংকীর্ণতার স্পর্শ নেই। "পৃথিবীর সকল বিধান যাহার মধ্যে নিহিত তাহাই নববিধান।"[৩] তথাপি নববিধান যে ব্রাহ্মসমাজেরই অগ্রগতিতে একটি অবশ্যম্ভাবী পরিণতি তা বলাই বাহুল্য। তাছাড়া কেশবচন্দ্রেরও আজীবনের সাধনা এই নববিধানের আদর্শে গঠিত। নববিধানের মূলভাব সমন্বয়ের ভাব, এই সমন্বয় শুধু ধর্মের ক্ষেত্রে নয় কর্মের ক্ষেত্রেও প্রসারিত।

ধর্মের ক্ষেত্রে এক ঈশ্বরের উপাসনা ব্রাহ্ম সমাজের ইতিহাসে নূতন নয়। রামমোহন রায় যিনি ব্রহ্মসভার স্রষ্টা তিনিই 'একমেবাদ্বিতীয়ং' উপাসনার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি একটি সংগীতে বললেন,

"ভাব সেই একে।
জলে স্থলে শূন্যে যে সমান ভাবে থাকে।
যে রচিল এ সংসার আদি অন্ত নাহি যার
সে জানে সকল, কেহ নাহি জানে তাঁকে॥"

রামমোহন ব্রাহ্মসমাজ-গৃহকে সর্বজাতির মিলনক্ষেত্র রচনা করেছিলেন, ইতিপূর্বে ব্রাহ্মসমাজের ট্রাস্ট-ডীডে তার স্পষ্ট প্রমাণ পেয়েছি আমরা। কিন্তু

১. অধিবেশন : ১৮৮১ খ্রীঃ ২০শে জানুয়ারি পৃ. ১৪৪-১৪৫। ২. কেশবচন্দ্র সেন, সেবকের নিবেদন. ৩য় খণ্ড পৃ. ৩। ৩. তদেব, পৃ. ৫।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দুর উপনিষদকে অন্তরের আশ্রয় ও ব্রাহ্মসমাজের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা ও শাস্ত্র-গ্রন্থ (ব্রাহ্মী উপনিষদ) সকলই উপনিষদের ছাঁচে গড়া। রামমোহন উপাসনা-পদ্ধতি স্থির করেছিলেন—গায়ত্রী মন্ত্রজপ, উপনিষদের বাক্য আবৃত্তি, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। দেবেন্দ্রনাথ কিন্তু উপাসনায় অর্চনা, প্রণাম, সমাধান, ধ্যান, স্তোত্র, প্রার্থনা ইত্যাদি পদ্ধতি উপনিষদের ছাঁচে গড়ে তুললেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্তর ছিল উর্ধ্বমুখী—ধ্যানালোকে তিনি ঈশ্বরানন্দ লাভ করতে সক্ষম হলেও ব্রাহ্মসমাজকে হিন্দুধর্মের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলেছিলেন। নব্য ব্রাহ্মদলের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিরোধের এটিও অন্যতম একটি কারণ ছিল। কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মধর্মকে হিন্দুধর্মের সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি দিয়ে উদার সার্বভৌমিক সমন্বয়-ধর্মে পরিণত করলেন। "গগনে উড়িতেছিল কেবল হিন্দুধর্মের নিশান, হিন্দুধর্মের নিশানের পরিবর্তে এখন গগনে সার্বভৌমিক নববিধানের নিশান উড়িল। হিন্দুস্থানের ব্রহ্ম এখন সমস্ত জগতের ব্রহ্ম হইলেন—বেদান্তের সঙ্গে এখন বেদ পুরাণ, বাইবেল, কোরাণ, ললিতবিস্তর, প্রভৃতি সমুদয় ধর্মশাস্ত্র মিলিল।"[১]

প্রকৃতপক্ষে কেশবচন্দ্র আচার্যের পদ গ্রহণ করার পর থেকে ব্রহ্ম-উপাসনায় ও তৎসহ ব্রাহ্ম সমাজের নূতন অধ্যায় সূচিত হয়। সংস্কৃত ভাষার পরিবর্তে মাতৃভাষার প্রবর্তন, শাস্ত্র-বচনের স্থলে অন্তরের পবিত্রাত্মার প্রেরণা (প্রত্যাদেশ) ও উপাসনার ক্ষেত্রে ভক্তির আগমন ও সাক্ষাৎযোগ ইত্যাদি ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে নূতনতর অবদান। এই ভক্তি আবার যোগ, কর্ম ও জ্ঞানের সমন্বয়ে এক অপূর্ব সমন্বয় সৃষ্টি করল। উপাসনার অঙ্গ হল উদ্বোধন, আরাধনা, ধ্যান, প্রার্থনা, শাস্ত্রপাঠ ও উপদেশ। সাধনাকে মধুর করার জন্য রইল ব্রহ্মসংগীত ও সংকীর্তন। কেশবচন্দ্রের নিয়ত বিবর্তনশীল সাধনা সামঞ্জস্যের পথে বিধান ও নববিধানের পথে ব্রাহ্মসমাজ ইতিহাসকে পরিচালিত করেছে। "এই দেখিয়াই নববিধান নামে আখ্যাত করিলাম নব ব্রাহ্মধর্মকে। অন্যে আংশিক ভাব রাখিতে পারেন, নববিধানে তাহা কখনই হইতে পারে না। আমার জীবনে যখন দেখিয়াছি এক একটি লইলে অপরাধ থাকে তখন এই নূতন নামে ব্রাহ্মধর্মকে উপস্থিত করা আবশ্যক।[২] কেশবচন্দ্র

১. কেশবচন্দ্র সেন, সেবকের নিবেদন, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৩। ২. কেশবচন্দ্র সেন, জীবনবেদ পৃ. ১১৮।

নিজ জীবনে দৈনন্দিন আচার-আচরণে জগতের বিভিন্ন ধর্মের প্রবর্তক ও ও মহাপুরুষের রীতি অনুষ্ঠানে মন দিলেন। যীশু খ্রীষ্ট, শাক্যমুনি, মহম্মদ, চৈতন্য বিভিন্ন মহাজনগণের সাধন-ভজনে নিজেকে অভ্যস্ত করতে লাগলেন, আর এই পথেই যে নূতন সত্য আবিষ্কার করলেন তার নাম দিলেন 'নববিধান'। কেশবচন্দ্র নিজেও 'আচার্যের উপদেশে' নববিধানকে ব্রাহ্মসমাজেরই বিবর্তিতরূপ বলে বর্ণনা করেছেন। এ যেন নবশিশু, যে শিশু প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে মাতৃজঠরে সংগোপনে কলেবর লাভ করেছে। "পৃথিবী শুন, পঞ্চাশ বৎসর ব্রাহ্মসমাজ গর্ভে ধর্মের শিশু গঠিত হইতেছিল, বহুকালের প্রসব যন্ত্রণার পর আজ সেই শিশু জন্ম ধারণ করিয়াছে।...সেই শিশুর ভিতরে যোগ, ধ্যান, বৈরাগ্য, প্রেম, ভক্তি সমুদয় গুণ সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। সেই শিশুর মধ্যে বেদ-বেদান্ত পুরাণ, তন্ত্র, বাইবেল, কোরাণ সমুদয় রহিয়াছে।"[১] কেশবচন্দ্র সেন আমৃত্যু নববিধানের সাধন ও প্রচারকার্যে কঠোর পরিশ্রম শুরু করেন। 'The New Dispensation' পত্রিকায় (২৪শে মার্চ, ১৮৮১ হইতে প্রকাশিত। তিনি প্রতি সপ্তাহে এই বিষয়টির ব্যাখ্যা প্রদান করতেন। নববিধানের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনার দ্বারা এই ধর্মটির সহজ ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে। নববিধানের বৈশিষ্ট্য—

১. নববিধানে ঈশ্বরের এক নূতন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। তিনি নির্গুণ নন, তিনি প্রাণ হয়ে সর্বভূতে বর্তমান আছেন। তিনি সর্বত্র বিদ্যমান; সাধুর হৃদয়ে থেকে শুভবুদ্ধি, নবোদ্যম ও নবপরাক্রম যোগাচ্ছেন। বজ্রে তিনি, সূর্যে তিনি, অনলে তিনি, অনিলে তিনি, অন্নে তিনি, বস্ত্রে তিনি—সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডে শক্তিভাবে বর্তমান। 'সগুণ' কথাটির মধ্যে আকারবিশিষ্ট এই ভাবটি আছে। কিন্তু নববিধানের ব্রহ্ম আকারবিশিষ্ট নয়। নিরাকার, অন্তহীন—অনন্ত। অনন্ত ভাব, অনন্ত দয়া, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত ব্যাপ্তি যদি উপলব্ধি করা যায় তবে অনন্ত পরমেশ্বরের অস্তিত্বও স্বীকার করতে হয়। এইভাবে নববিধানীগণ অনন্ত পরমেশ্বরকে বিশ্বাস করেন।

২. নববিধানে ভগবানের তিনপ্রকার প্রকাশকে স্বীকার করা হয়েছে। পিতাভাবে, পুত্রভাবে আর ঈশ্বরের পবিত্রাত্মার ভাবে। বিশ্বের স্রষ্টা ঈশ্বর, তিনি পিতা। আবার পুত্র কথাটি পিতার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। পিতা আমাদের প্রতিপালন করেন, তেমনি পুত্রেরও কিছু কর্তব্য আছে। ধর্ম-সাধন

১. কেশবচন্দ্র সেন নবশিশুর জন্ম, আচার্যের উপদেশ (১০ খণ্ড), পৃ. ১৮০/১৮১।

ব্রত-আচরণ ইত্যাদি তার কর্তব্য। কিন্তু সাধারণ মানুষ কর্তব্য বিস্মৃত হয় বলে তিনি পুত্ররূপে আমাদের বিশুদ্ধ জ্ঞানে আলোকিত করার জন্য পৃথিবীতে আগমন করেন। যেমন যীশু খ্রীষ্ট এবং অন্যসব মহাপুরুষগণ। তিনি পুত্রভাবে ক্ষমা, নির্ভয়, প্রেম প্রভৃতি ভাবের মূর্ত প্রতীক। ঈশ্বরের তৃতীয় প্রকাশ পবিত্র ভাব-রূপে—এই ভাবকে 'প্রত্যাদেশ' বলা চলে। পৃথিবীর ধর্মেতিহাসে এই তিন ভাবের লীলা অভিনয় হচ্ছে। যে হৃদয় আত্মসমর্পিত ও সরল তারই অন্তরে এই পবিত্রাত্মা বা প্রত্যাদেশ উপলব্ধি হয়।

৩. নববিধান যেমন মূর্তিপূজাকে স্বীকার করে না, তেমনই অবতারবাদকেও অস্বীকার করেছে। ঈশ্বরের অনন্তত্ব আকারবিশিষ্ট মানুষের মধ্যে প্রকাশিত হওয়া সম্ভব নয়। তবে ভগবান পুত্রভাবে বহুবার মহাপুরুষদের প্রেরণ করেছেন। ঈশ্বরের এক-একটি ভাব মহাপুরুষের প্রকৃতিতে প্রবিষ্ট হয়। যখনই কোন দেশ ভয়ানক দুরাচারে প্রবৃত্ত হয়, অহংকার, পাপ, নাস্তিকতা লোকদের আচ্ছন্ন করে, তখনই ঠিক সেই পাপগুলি মোচন করার জন্য এক একজন মহাপুরুষ এক-একটি বিধান নিয়ে আসেন।[১] রোম ও গ্রীস দেশে ভয়ংকর অমানুষিক পাপ প্রবল হলে ঈশা পরিত্রাতা হয়ে আবির্ভূত হন, আরব দেশে পৌত্তলিকতা দূর করবার জন্য মহম্মদ আসেন, ভারতকে বাহ্যিক ধর্ম প্রণালী থেকে রক্ষা করবার জন্য বুদ্ধ প্রেরিত হন।

৪. নববিধান সমন্বয়ের ধর্ম—নববিধানের মধ্যে সর্বধর্ম-সমন্বয়ের ভাবটি বর্তমান। নববিধানে সর্বশাস্ত্রের, সকল সাধুগণের, সকল সাধুকার্যের মিলন ঘটেছে। নববিধান পৃথিবীর সমুদয় ধর্মকে আপনার ভিতর বিলীন করেছে। নববিধানে জ্ঞান ও ভক্তি, যোগ ও কর্মের সামঞ্জস্য ঘটেছে। নববিধান প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্যের, বিশ্বাসের সঙ্গে বিজ্ঞানের, যুক্তির সঙ্গে ভক্তির, প্রথার সঙ্গে প্রগতির দ্বন্দ্ব বিতাড়িত করেছে। বস্তু-বিজ্ঞান, প্রকৃতি-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, রাজ্য-বিজ্ঞান, ধর্ম-বিজ্ঞান—সকল প্রকার বিজ্ঞান এই ধর্মের অন্তর্গত। আকাশের বায়ু, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা এবং পৃথিবীর

---

১. যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।
—শ্রীমদ্ভাগবত গীতা, চতুর্থ অধ্যায়, জ্ঞানযোগ

সাগর, পর্বত সকলের সঙ্গে ঈশ্বরের নামে সংযুক্ত ও সকল বস্তুর মধ্যে সার্বভৌমিক ধর্ম উপলব্ধি করে এই ধর্ম। নববিধানের মধ্যে আছে স্পষ্ট একটি সামঞ্জস্যের ভাব। বিজাতীয় বিবাহ সংঘটিত করে প্রাদেশিকতা দূর করেছে, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ, ভারত-আশ্রম, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকা, 'এ্যালবার্ট ইনস্টিটিউট' প্রতিষ্ঠা ও ভারত সংস্কার-সভা ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে জাতীয়তার ঐক্য বন্ধন দৃঢ় করেছে, অন্তর্ভারতীয় প্রেরণা ও শিক্ষা দিয়েছে। নববিধান সমুদয় ধর্মবিধানকে পূর্ণ করতে এসেছে। "কোথায় য়িহুদী বিধান, কোথায় বৌদ্ধ বিধান, কোথায় শিখ বিধান, কোথায় গৌরাঙ্গ বিধান, কোথায় মুসলমান বিধান, সমুদয়ের সঙ্গে ইনি সম্বদ্ধ। নববিধান কিছুই ভাঙ্গিতে আসে নাই।"[১] কেশবচন্দ্র নিজেই সামঞ্জস্যের প্রতিমূর্তি। যোগের সঙ্গে ভক্তি ও কর্ম, কার্যের সহিত যোগ, সমাধি, ধ্যান, সভ্যতা এবং গার্হস্থ্য ধর্মের সহিত বৈরাগ্য, শান্তির সহিত উদ্যম, বিনয়ের সহিত মহত্ত্ব, প্রেমের সহিত পুণ্য, দেশীয় ভাবের সহিত বিদেশীয় সভ্যতা, অদ্বৈতবাদের সহিত দ্বৈতবাদ—এইসকল পরস্পর-বিপরীত গুণের মিলন তাঁর মধ্যে হয়েছিল। কেশবচন্দ্রের হৃদয়-বৃন্দাবন ভগবানের পুরুষ-প্রকৃতি উভয় স্বভাবের যুগল মিলনের স্থান।

৫. "নববিধান শাস্ত্র একখানি শ্লোক-সংগ্রহ নহে। ইহা জীবনের ধর্ম।"[২] নববিধানীগণ জীবনে এক বিশেষ উপলব্ধি ও চর্যার মধ্য দিয়ে সমন্বয়-তত্ত্বটি প্রত্যক্ষ করবেন। "সমন্বয় জীবন দ্বারা হইবে, জ্ঞান দ্বারা হইবে না।"[৩] যিনি ভক্ত তাঁর হৃদয় দর্পণের ন্যায়। তিনি ঈশ্বরপ্রেরিত সমস্ত ভাবগুলির যেগুলি বিভিন্ন ধর্মে সন্নিবিষ্ট হয়েছে জীবনে প্রত্যক্ষ দেখতে পান। একজন ভক্ত এক সময়ে ঈশার ভাব, অন্য সময়ে শাক্যের ভাব, আর এক সময়ে হয়তো চৈতন্যের ভাব জীবনে উপলব্ধি করেন: কোন ব্যক্তি কেবল ভক্তি, কিংবা জ্ঞান, অথবা কার্য বা যোগ নিয়ে থাকতে পারে না। মানুষের প্রতিটি জিনিসই দরকার। একটি ভাব মানুষকে অসম্পূর্ণ করে রাখে; সর্বভাবের সমষ্টি থাকলে মনুষ্যত্বের পূর্ণতা আসে। "নববিধান Eclecticism নহে, কিন্তু ইহা একটি নূতন জীবন্ত শক্তি, এক স্বপ্রতিষ্ঠিত অভিনব আদর্শ, যাহা জগতের

১. কেশবচন্দ্র সেন, সেবকের নিবেদন, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৭। ২. কৃষ্ণবিহারী সেন, নববিধান কি, পৃ. ১২৯। ৩. তদেব, পৃ. ১২৭।

যাবতীয় আদর্শকে রূপান্তরিত করিয়া, আপনার মধ্যে সকলের জীবনী রস সংগ্রহ করিয়া নবজীবনে নূতন শিশু হইয়া জগতে দর্শন দিয়াছেন।"[১] নববিধানের আলোকে সাধক প্রত্যক্ষ করেন যোগের ঈশ্বর, ভক্তির ঈশ্বর, কার্যের ঈশ্বর—সবই এক। এটির জন্য প্রয়োজন 'প্রত্যাদেশ'। যে হৃদয় বিষয় ও অহংশূন্য হয়ে ঈশ্বরচিন্তায় পূর্ণ সেই ব্যক্তিই প্রত্যাদেশ শ্রবণ করে ও সকল ধর্মের ভাবগুলি জীবনের পথে সত্য বলে প্রত্যক্ষ করতে পারে। নববিধান ধর্মকে অন্তরমুখী করে রাখে নি। ধর্মকে জীবনের সত্য করে তুলেছে। নববিধান ধর্মে জীবনকেই জীবন্ত ধর্মগ্রন্থের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। "যতদিন ভক্তজীবনে হরি জীবন্ত ধর্ম দেখান, ততদিন উহাই ঈশ্বররচিত বাইবেল, কোরাণ বলিয়া আদৃত হইবে।"[২] 'নববিধান' "পৃথিবীতে আসিয়া আজ্ঞা প্রচার করিলেন—কোন বিশেষ পুস্তকের আধিপত্য থাকিবে না, বাইবেল, কোরাণ, বেদপুরাণ সকলের উপরে ভক্ত-জীবনরূপ ধর্মপুস্তক সমাদৃত হইবে, সর্বত্র ঐ গ্রন্থ পূজিত হইবে। উহা পৃথিবীকে হরিপ্রেমলীলা জীবন্ত আকারে প্রদর্শন করিয়া ধর্মশিক্ষা দিবে।"[৩]

৬. নববিধানের অপর একটি বিশেষত্ব—এটি জাতীয় ও এককালীন বিশ্বজনীন। যদিও নববিধান হিন্দুস্থানের গর্ভে জাত, তথাপি এর সঙ্গে সমস্ত পৃথিবীর সম্বন্ধ আছে। সকল জাতির কাছ থেকে ঈশ্বরের সত্য 'নববিধান' গ্রহণ করেছে। মুসা, সক্রেটিস, ঈশা, মহম্মদ—বিদেশী হয়েও নববিধানে গভীর শ্রদ্ধার পাত্র। "বিদেশীয় মুষা আমাদিগকে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ প্রত্যাদেশ শুনিতে উপদেশ দিতেছেন, বিদেশীয় সক্রেটিস আমাদিগকে আত্মতত্ত্ব শিক্ষা দিতেছেন, বিদেশীয় ঈশা সৎপুত্র হইয়া স্বর্গীয় পিতার ইচ্ছা পালন করিবার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন, দূর-দেশীয় মহম্মদ একেশ্বরবাদ শিক্ষা দিতেছেন। অপরাপর বিদেশীয় মহাপুরুষেরা স্বর্গের বিচিত্র সৌন্দর্য দেখাইতেছেন।"[৪] এই কারণেই নববিধান বিশ্বজনীন—কিন্তু বিশ্বজনীনতার ভাব বর্তমান থাকলেও নববিধান হিন্দুজাতির অন্তর্গত। "কিন্তু এই বৃক্ষের রস হিন্দু, এই বিধানের দক্ষিণ হস্তে ইংরাজী বিদ্যা ও সভ্যতা, বামহস্তে মুসলমান তেজ, কিন্তু ইহার রক্তে হিন্দুর যোগ-ভক্তি, হিন্দুর কোমল প্রীতি। যিনি নববিধানের ব্রাহ্ম

১. বিনয়েন্দ্রনাথ সেন, আরতি, পৃ. ৪৬। ২. কেশবচন্দ্র সেন, সেবকের নিবেদন, ১ম ভাগ পৃ. ২২১। ৩. তদেব, ১ম ভাগ, পৃ. ২২১। ৪. তদেব, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯০।

তিনিই প্রকৃত হিন্দু।"[১] এই কারণেই নববিধান একদিকে যেমন সার্বভৌমিক আর একদিকে তেমনি জাতীয় লক্ষণাক্রান্ত।

৭. নববিধানের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল ঈশ্বরকে পিতৃভাবে নয়, মাতৃভাবে সাধনা। সমগ্র খ্রীষ্টধর্মে ঈশ্বরের পিতৃসত্তা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে বহুকাল। 'আদি ব্রাহ্ম সমাজে'ও ঈশ্বরকে পিতৃভাবে ভজনা করা হয়েছে। 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ'ও সকল সাম্প্রদায়িকতাকে বিনাশ করে ঈশ্বরের পিতৃভাব এবং মানবের ভ্রাতৃভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু ভারতীয় ধর্মসাধনায় ভগবানকে মাতৃরূপে ভজনা করা হয়েছে। কেশব সেনও ভারতীয় সাধনার পথেই এগিয়েছেন। বিভিন্ন মাতৃনামে তিনি ঈশ্বরকে ডেকেছেন। পিতার সঙ্গে পুত্রের সম্পর্ক অপেক্ষা মাতা-পুত্রের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর। কুচবিহার বিবাহ ব্যাপারে কেশবচন্দ্রের অন্তর যখন বিচ্ছেদের দুঃখ-সাগরে মথিত সেই যুগেই ঈশ্বরকে মাতৃরূপে ডাকা খুব সহজভাবেই তাঁর সাধনার অঙ্গীভূত হয়। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ১৫ই মার্চ কেশবচন্দ্র সেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সান্নিধ্যে আসেন। তিনি দক্ষিণেশ্বরের কালীসাধক ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব মাতৃনামে আত্মহারা হয়ে যেতেন—কখনও বা সমাধিপ্রাপ্ত হতেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট থেকেই তিনি হয়তো ঈশ্বরকে মাতৃভাবে সাধনার পথে কিছুটা প্রভাবিত হয়েছিলেন। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাহ্মধর্ম-প্রচারের জন্য ভারতের নানা স্থানে প্রচারকগণ একত্রে পদযাত্রা করেন। সেই প্রচার-যাত্রায় যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন তাঁরা সকলেই ঈশ্বরকে জননী বলে সম্বোধন করেন। কেশবচন্দ্র সেন ১৮৭৯ খ্রীঃ ১৩ই ডিসেম্বর মাতৃভাব উপদেশ দানকালে বলেছেন —"ঈশ্বরকে জননী বলিয়া স্বীকার করা আমাদিগের মধ্যে নূতন ব্যাপার নহে। আমাদিগের অতি প্রাচীন সঙ্গীতে এই কথা আছে।

'জননী সমাজ করেন পালন
সবে বাঁধি আপন স্নেহগুণে।' "[২]

কেশবচন্দ্র সেন ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ২৩শে ফেব্রুয়ারি 'আচার্যের উপদেশ দানকালে বলেছেন. "একবার কেবল বিশ্বাসী হইয়া, হে ব্রহ্ম, হে জননী বলিয়া হরিকে ডাক।" কিন্তু এখন যে ভাবে আমরা ঈশ্বরকে মা বলিয়া সম্বোধন করিতেছি, সেই ভাব সম্পূর্ণরূপে নূতন। আমাদিগের বিশেষ বিশেষ অভাব

---

১. কেশবচন্দ্র সেন, সেবকের নিবেদন, ১ম ভাগ, পৃ. ১৯৩। ২. সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক রচিত।

অনুসারে ঈশ্বর তাঁহার স্বর্গ হইতে সময়ে সময়ে এক একটি নূতন ভাব প্রেরণ করেন। এক এক সময় তাঁহার এক একটি নাম বিশেষ ভাবের সহিত আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হয়। ঈশ্বর দেখিলেন, এখন ব্রাহ্মদিগের যেরূপ অবস্থা হইতেছে তাহারা কেবল তাঁহাকে দয়াময় গুণনিধি বলিলে তাহাদিগের পরিত্রাণ হইবে না, এইজন্য তিনি আমাদিগের নিকট তাঁহার মিষ্টতর 'মা' নাম প্রেরণ করিলেন। তাঁহার যে নামের মোহিনী শক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক, তিনি নিজ স্নেহগুণে সন্তানদিগের কল্যাণের জন্য, আমাদিগের নিকট সেই নাম প্রেরণ করিলেন। শিশুসন্তানের কাছে মা যেমন, আমাদিগের সম্পর্কে তিনি সেইরূপ।"[১] মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঈশ্বরকে পিতৃভাবে (পৌঃ পিতা নোঽসি) ভজনা করলেও তাঁর উপদেশে তিনি কখনও কখনও ঈশ্বরকে মাতৃভাবে উল্লেখ করেছেন। হিমালয়-ভ্রমণকালে পরমপুরুষকে জগজ্জননী রূপে কল্পনা করেছেন। তাঁর সমসাময়িক কালে রচিত কয়েকটি ব্রহ্মসংগীতেও ঈশ্বরের মাতৃভাবের উল্লেখ আছে।[২] কেশবচন্দ্রের বেশির ভাগ ইংরেজি ভাষায় প্রদত্ত বক্তৃতা ও রচনায় ঈশ্বরের পিতৃভাব স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু অনেক বাঙ্গালা প্রার্থনা, বক্তৃতা ও উপদেশে ঈশ্বরকে মাতৃভাবে দেখেছেন। ১৮৭৫ খ্রীঃ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক উৎসবে ঈশ্বরের মাতৃভাবের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হোল।[৩] ১৮৭৫ খ্রীঃ ২৫শে জানুয়ারি ব্রাহ্মিকা সমাজের প্রতি উপদেশ-দান-কালে ঈশ্বরকে জগজ্জননী রূপে প্রার্থনা করা হয়েছে। "আমাদিগের সকলের মা ইনি, বাপ ইনি। প্রেমময়ী জননী। স্নেহের

---

১. কেশবচন্দ্র সেন, আচার্যের উপদেশ, দশম খণ্ড, পৃ ১২৪।

২. ক. জননীর কোলে বসি, কেনরে অবোধ মন, করিছ রোদন
সদা মাতৃহীন শিশুপ্রায়।

খ. কেবা জানে কত সুখরত্ন দিবেন মা তালয়ে
তাঁর অমৃত নিকেতনে।

গ. জগৎ জননী জননীর জননী তুমি গো মাতঃ।

ঘ. স্নেহময়ী মাতা হয়ে, পুত্র কন্যাগণে লয়ে, বসেছেন
আনন্দময়ী আনন্দধামে।

ঙ. চরণ দেখি মাগো কাতরজনে।

চ. ওগো জননী। রাখ লুকাইয়ে তব নিরাপদ কোলে।

গৌরগোবিন্দ রায়, আচার্য কেশবচন্দ্র, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০২৬।

৩. Prem Sundar Basu, Life & Works of Brahmananda Keshub, পৃ. ৩১৭।

পিতামাতা! কি দুঃখ তাঁহাদের যাঁহারা তোমাকে দেখিতে পান না। তোমার হাত দিয়া আমাদের চক্ষু খুলিয়া দাও।"[১]

"তাই ডাকিতেছি, জননি, কাছে এসে বস, এই আমাদের অবিশ্বাসী মস্তকের উপর তোমার শ্রীচরণ স্থাপিত কর।"[২]

ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল-রচিত একটি সংগীতে নববিধানের বৈশিষ্ট্যটি সুন্দররূপে ধরা পড়েছে।

কর হে নববিধান মূর্তিমান এ জীবনে।
যোগ ভক্তি কর্মজ্ঞান সবাকার সম্মিলনে।
সক্রেটিসের আত্মজ্ঞান, ঋষিদের যোগ ধ্যান,
মুষার বিবেক নীতি, যাচি তব শ্রীচরণে।
ঈশার অভেদ ভাব, চৈতন্যের মহাভাব,
শাক্যের নির্বাণ দয়া, দাও দীন অকিঞ্চনে।
মহম্মদের নিষ্ঠা রতি, ধ্রুব প্রহ্লাদের ভক্তি,
জনকের অনাসক্তি সঞ্চার হৃদয় মনে॥

—ব্রহ্মসংগীত, পৃ. ৫১১ ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির

কেশবচন্দ্রের ধর্মসাধনায় নববিধানের স্থান

এইভাবে নববিধানের বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে কেশবচন্দ্র সেনের ধর্মসাধনার এক পরিণত পূর্ণাঙ্গ মূর্তিটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বৈশিষ্ট্যগুলি যখন একে একে এল তখন বললেন 'বিধান'। আস্তে-আস্তে পূর্ণাঙ্গরূপ নিলে তাকে নাম দিলেন নববিধান। 'নববিধান' ব্রহ্মসমাজের ইতিহাসে কিংবা কেশবচন্দ্র সেনের সাধনায় আকস্মিক কিছু নয়। পূর্ণতা, সাম্য, ঐক্যের আকাঙ্ক্ষা তাঁর সমগ্র সাধনায় একটি বিশিষ্ট পরিণতি দান করেছে নববিধানে।

১৮৬৬ খ্রীঃ প্রতিষ্ঠিত 'ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মসমাজ' ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে 'নববিধান' রূপে পরিচিত হয়েছে। কেশবচন্দ্র সেনের ধর্মসাধনা সুদীর্ঘকালের ইতিহাস। নিয়ত-পরিবর্তনশীল সাধন পদ্ধতির মধ্য দিয়ে নব নব বিধান লাভ করে তিনি নববিধানের পরিণতির পথে অগ্রসর হয়েছেন। প্রার্থনার মধ্য দিয়েই তাঁর ধর্মজীবনের শুরু। "আমার জীবনের প্রথম কথা প্রার্থনা।

১. কেশবচন্দ্র সেন, জগজ্জননীকে দেখা: আচার্যের উপদেশ (৬ষ্ঠ) পৃ. ১৩৮-১৩৯।
২. তদেব, পৃ. ১৪০।

যখন কেহ সহায়তা করে নাই, যখন কোন ধর্মসমাজে সভ্যরূপে প্রবিষ্ট হই নাই······ধর্মজীবনের সেই উষাকালে 'প্রার্থনা কর প্রার্থনা কর' এই ভাব, এই শব্দ হৃদয়ের ভিতর উত্থিত হইল।"[১] যখন হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, কোন ধর্মই তাঁকে আকৃষ্ট করেনি তখন এই প্রার্থনা—বেদ, বেদান্ত, কোরাণ, পুরাণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যে প্রার্থনা তাকেই তিনি অবলম্বন করলেন। তাঁর ধর্মজীবনের দ্বিতীয় স্তরে পাপবোধের প্রকাশ। পাপের ভাবে গুরুভারাক্রান্ত হৃদয় সহজেই ঈশ্বরমুখী হয়ে পড়ে। পাপবোধ তাঁকে বৈরাগ্যের দীক্ষা দিয়েছে। অন্তরে বিবেকের অগ্নি জ্বালিয়ে বৈরাগ্যের বিষাদ নিয়ে তিনি অগ্নিমন্ত্রে স্নাত হলেন। রামমোহনের কাছ থেকে তিনি পেয়েছিলেন যুক্তি ও স্বাধীনচিন্তা, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে পেলেন আধ্যাত্মিকতা ও সংসার-অনাসক্তি। "তখন বিবেক-প্রধানই ছিলাম, সেকালে ব্রাহ্মদের সকলেই প্রায় বিবেক-প্রধান ছিলেন।"[২]

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দ কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মসমাজের ধর্মগঠনে মনোনিবেশ করলেন। ধর্মের ভিত্তিতে ব্রাহ্মসমাজের পুনর্গঠনই ছিল তাঁর মুখ্য কার্য। কিন্তু তাঁর বরাবর লক্ষ্য ছিল জাতির সেবা, জাতি-গঠনকল্পে বিভিন্ন ভাবধারার মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা। এই কারণেই কর্ম ও ভক্তির মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টি করে ব্রাহ্মসমাজে এক পবিত্র ও আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল দান করলেন। ব্রাহ্মধর্ম এতকালের মত 'রিলিজিয়ান অব থিয়োরি' মাত্র রইল না। 'রিলিজিয়ান অব লাইফ'-এ পরিণত করার চেষ্টায় তিনি মেতে উঠলেন।[৩] এই সময় দু'প্রকার ভক্তগোষ্ঠীর সৃষ্টি হল। সাধারণ ভক্ত ও প্রচারক। যারা সমস্ত প্রকার কৃচ্ছ্রসাধন ও তপস্যার জন্য সমাজে নিজেকে উৎসর্গ করেছিল এমন ভক্তদেরই

---

১. কেশবচন্দ্র সেন, জীবনবেদ, পৃ ২। ২. কেশবচন্দ্র সেন, জীবনবেদ, পৃ. ৬২ ও প্রচারকগণের সভার নির্ধারণ। ৩. "ব্রাহ্মধর্মের মধ্যে যে শক্তি ঘুমাইয়াছিল, বীজের মধ্যে যেমন একটা প্রকাণ্ড গাছের প্রাণ লুকাইয়া থাকে—কেশব তাহাকে জাগাইয়া, কাজের ক্ষেত্রে বাহির করিয়া আমাদের এই নূতন যুগের ভারতের সমাজে, ব্যক্তিগত জীবনে এক আশ্চর্য পরিবর্তন করিয়া দিলেন।···· ··আমার মনে হয় কেশব যদি কর্মক্ষেত্রে না নামিতেন, তবে কত বৎসর ধরিয়া এই যুগের ব্রাহ্মসমাজ একটা কলেজের ফিলসফি সেমিনারী মাত্র হইয়া কলিকাতার একটি ধনী দলের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া আর দু তিনখানি পুস্তিকা এবং একখানি ছোট মাসিক ধর্ম পত্রিকা বিতরণ করিয়াই ক্ষান্ত হইত।" —আচার্য যদুনাথ সরকার, ভাষণ ২১শে নভেম্বর, ১৯৫৩। যুগান্তর ২৫শে নভেম্বর, ১৯৫৩।

তিনি প্রচারকরূপে বেছে নিলেন। কেশবচন্দ্র সশিষ্য সুনীতি, সদাচার ও উন্নত ধর্মের মধ্য দিয়ে সাধনমার্গে অগ্রসর হতে লাগলেন। কেশবচন্দ্র নিজে সাধনা করে শিষ্যদের সামনে জ্বলন্ত উদাহরণ তুলে ধরলেন। সকলে মিলে একটি আদর্শ দল গঠনে সচেষ্ট ছিলেন। এই সময় মুষ্টিভিক্ষা, স্বপাকে আহার, মস্তক মুণ্ডন, সাধারণ পোষাক-পরিচ্ছদ-ব্যবহার, নিজের নিজের ঘর পরিষ্কার ও আরও নানাবিধ কৃচ্ছ্রতার পথে তাঁরা এগিয়ে চললেন। বৈরাগ্য ও কৃচ্ছ্রসাধন ব্রাহ্মসমাজেব ইতিহাসে সম্পূর্ণ নূতন। ইতিপূর্বে ১৮৭২ খ্রীঃ বেলঘরিয়ার জয়গোপাল সেনের উদ্যানবাটিতে 'তপোবন' স্থাপিত হয়েছিল। এই সময়ে এখানে কেশবচন্দ্র তাঁব গোষ্ঠীদের নিয়ে সাধনায় মগ্ন হলেন। উদ্যান-বাটিকাব প্রাকৃতিক পরিবেশেব মধ্যে তপোবনের সাধনায় প্রাচীন তপস্যাব প্রতিচ্ছবিটি ফুটে উঠেছে। ১৮৭৬ খ্রীঃ ৪ঠা জুন ইণ্ডিয়ান মিরর পত্রিকায় এই বিষয়ে একটি বিবরণী প্রকাশিত হয়।

"তাঁহারা বৃক্ষতলে কুশাসন, বনাতের আসন ও ব্যাঘ্রচর্মেব উপর বসিয়া প্রাতঃকালে একত্র উপাসনা কবিয়া থাকেন।...উপাসনাব পব তাঁহারা রন্ধন করেন, এবং দুপ্রহবের মধ্যে তাঁহাদের ভোজনকার্য্য শেষ হয়। আহারের পব অর্দ্ধঘণ্টা বিশ্রাম করিয়া, একঘণ্টাকাল তাঁহারা সৎপ্রসঙ্গ করেন। অপরাহ্ণে জল তোলা, বাঁশ কাটা, পথ প্রস্তুত ও সমান করা, গাছ পোঁতা, গাছ সরাইয়া দেওয়া ও জলসেচন, নানাস্থান পবিষ্কারকবা এইসকল কার্য্য করিয়া থাকেন; ছয়টা পর্য্যন্ত এইরূপে কার্য্য করিয়া, অর্দ্ধঘণ্টা বিশ্রামের পব সকলে নির্জ্জন সাধনে গমন করেন। সন্ধ্যা ঘোব হইয়া আসিলে·· তাঁহারা সংকীর্তন আরম্ভ কবেন। এই সকল কার্য্যেব ভিতরেও বাবু কেশবচন্দ্র সেন গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী এবং অন্যান্য বড়লোকেব সঙ্গে পত্রালাপ, আলবার্ট হলেব উন্নতি ও ভাল অবস্থার জন্য উদ্যমসাধ্য উপায় গ্রহণ, সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লেখা ইত্যাদিরও সময় পান।"[১] ১৮৭৬ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি ধর্ম-সাধনার চারটি অঙ্গের উপর জোর দিলেন। যোগ, ভক্তি, জ্ঞান ও সেবা। গভীর ধ্যান, আন্তরিক ভক্তি, জ্ঞান ও কর্ম, মানবসেবাব মধ্য দিয়েই ঈশ্বরকে লাভ করা যায়। হিন্দুধর্মের এই চারিটি অঙ্গের সাধনায় ও অনুশীলনে তাঁর কয়েকজন অনুগামীকে সাধন-ভজনে নিযুক্ত করলেন। অঘোরনাথ গুপ্ত যোগের, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও ত্রৈলোক্যনাথ ভক্তির, গৌরগোবিন্দ রায় জ্ঞানের ও প্রতাপচন্দ্র

১. উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়, আচার্য কেশবচন্দ্র, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০২৭-১০২৮।

মজুমদার কর্মের পথটি বেছে নিলেন। পরবর্তী কালে ১৮৭৯ খ্রীঃ কেশবচন্দ্রের ইচ্ছায় ও অনুপ্রেরণায় শুধু হিন্দুধর্মেরই নয়, বিভিন্ন ধর্ম ও শাস্ত্রগ্রন্থের অনুশীলনে তাঁর অনুগামী ও সঙ্গীরা নিযুক্ত হয়েছিলেন। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার খ্রীষ্টীয় শাস্ত্র, গৌরগোবিন্দ হিন্দুশাস্ত্র, সাধু অঘোরনাথ বৌদ্ধশাস্ত্র, গিরিশচন্দ্র সেন মুসলমান শাস্ত্র, মহেন্দ্রনাথ বসু শিখধর্ম ও ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল ঈশ্বরমুখী সংগীত রচনার মধ্য দিয়ে সাধনায় নিজেদের নিযুক্ত করলেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজের চারণকবি হিসেবে পরিচিত।

১৮৭৮ খ্রীঃ 'কুচবিহার বিবাহে'র একটি মীমাংসা হয় এবং এর পরই কেশবচন্দ্রের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যায় এবং সমস্ত মনটিকে তিনি বহির্জগত থেকে গুটিয়ে এনে আধ্যাত্মিকতায় নিবিষ্ট করলেন। তখনই নূতন করে তাঁর আজীবন ধর্মসাধনার পরিণত ঘনীভূত রূপটি নববিধান ঘোষণার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হল। ( ১৮৮০ খ্রীঃ )।

বিশ্বাস, বিবেক, বৈরাগ্য তিনটি শুষ্ক ও কঠোর ধর্মাচরণে সরসতা আনে ভক্তি। প্রথমে ব্রহ্মকে বিশ্বাস করতেন বলে ব্রহ্মজ্ঞানী নাম পেয়েছিলেন। প্রথম যুগে কঠোর কঠিন পিতা, পরে প্রেমময়ী মাতা তাঁর সাধনপথে উদ্ভাসিত হলেন। ভক্তিভাব সম্পূর্ণ অভিনব, যেটি কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজে প্রবর্তন করলেন। তাঁর রক্তে প্রবাহিত ছিল ভক্তি। তিনি কলুটোলার বিখ্যাত বৈষ্ণব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ব্রাহ্মধর্মে যখন ভক্তির আগমন হল তখনই এল ঈশ্বরের মাতৃভাবের সাধনা। "মা নামের মধ্যেও কতরূপ দেখিলাম। কতভাবেই মাকে ডাকিলাম। কখনও শক্তির সহিত মা নাম সংযুক্ত দেখিলাম, কখনও জ্ঞানের সহিত মা নামের যোগ নিরীক্ষণ করিলাম।"[১] ঈশ্বরকে মাতৃনামে সাধনার পর থেকেই তাঁর সাধনায় আবেগের প্রাবল্য দেখা দিল। সর্বস্ব সমর্পণ করে শিশুর মত নাচ-গান, কান্না-হাসির মধ্য দিয়ে আত্মহারা হয়ে যেতেন। কখনও বা সমাধিস্থ হয়ে পড়তেন। প্রাচ্য দেশের ভক্তি তাঁর মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠল।

**"All the excesses of oriental piety, whether found in Palestine or Persia, Egypt or India, gradually found their embodiment in him."[২]**

১. কেশবচন্দ্র সেন, জীবনবেদ, পৃ. ৬৪। ২. P. C. Mazumdar, The Life & Teachings of Keshub Chunder Sen, page 177.

প্রায় দশ পনের বৎসর সত্য, প্রেম ও বৈরাগ্য-সাধনার অন্তে তাঁর অন্তরে ভক্তির সঞ্চার হয়েছিল। এবং এই ভক্তি ক্রমে ক্রমে প্রমত্ততায় পরিণত হল।[১] ভক্তি যখন বাড়তে লাগল তখন ভক্তিকে স্থায়ী করবার জন্য যোগের আবশ্যকতা উপলব্ধি করলেন। হৃদয় যেমন ভক্তের হৃদয়, নয়নটা তেমনই যোগীর নয়ন হওয়া উচিত। ভক্তি ও যোগ ব্যতীত ব্রাহ্মজীবন সার্থক নয়—এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি যোগসাধনায় মগ্ন হলেন। কখনও বা নির্জনে, কখনও বা একতারা হাতে নিয়ে সংগীতের মাধ্যমে সাধনায় মগ্ন থাকতেন, কখনও বা স্ত্রীকে পাশে বসিয়ে তিনি যোগসাধনা করতেন। স্ত্রীর মধ্যে তিনি ব্রহ্মময়ীর সত্তাই উপলব্ধি করতেন। নাম-সংকীর্তনেও কখনও কখনও মাতোয়ারা হয়ে যেতেন। তাঁর সাধনার পথে কোন গুরু বা ধর্মশাস্ত্রের প্রভাব নেই।[২]

তিনি প্রার্থনার উপরই প্রথমাবধি জোর দিয়েছেন, প্রার্থনা দ্বারাই তিনি সব কাজে অগ্রসর হতেন। ঈশ্বর নিয়মাধীন, তাঁর নিয়মের পরিবর্তন সম্ভব নয়, কিন্তু প্রার্থনার দ্বারা ঈশ্বরের প্রসাদ লাভ হয়। মানুষ দৈবভাব প্রাপ্ত হয়। ভারত আশ্রমের পরিচালনা, বহু বিতর্কিত ও সমালোচিত 'কুচবিহার বিবাহ,' এমন কি গৃহভৃত্যের চুরির ব্যাপারেও তিনি প্রার্থনার দ্বারা প্রত্যাদৃষ্ট হয়ে কাজ করেছেন। তিনি স্বেচ্ছায় নয়, সর্বদাই প্রত্যাদেশের বশবর্তী হয়ে কাজ করতেন, যে কারণে তাঁর অনেক কর্মেরই সমালোচনা করা চলে না। যোগীর চক্ষুতে তিনি সৃষ্টির বিভিন্ন উপকরণে ব্রহ্মকে দেখলেন, আর ভক্তির চক্ষুতে 'হরিকে, সুন্দর ঠাকুরকে প্রত্যক্ষ করতে লাগলেন। প্রার্থনা, সংকীর্তন ও ব্রহ্ম-উৎসবের মধ্য দিয়ে কেশবচন্দ্রের সাধনা মাধুর্য লাভ করল। পূর্বজীবনে যীশু খ্রীষ্ট তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল, পরবর্তী জীবনে শ্রীচৈতন্যদেব ও বৈষ্ণবধর্ম তাঁর সাধনমার্গকে প্রভাবিত করেছে। ১৮৬৮ খ্রীঃ ব্রহ্মমন্দির স্থাপনের কাল থেকেই সংকীর্তন ও আবেগপূর্ণ বৈষ্ণব প্রেমধর্মের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

---

১. কেশবচন্দ্র সেন, জীবনবেদ। ২. তিনি একটি পত্রে জানাচ্ছেন—

"These twenty five years the Holy Ghost has been to me not only Teacher and Guide but also my Guardian and Protector,...I never knew any Guru or priest, but in all matters affecting the higher life I have always sought and found light in the direct counsels of the Holy Spirit."—Protap Mazumdar. The Life & Teachings of Keshub Chunder Sen. page 180-181.

হিন্দুধর্মের মূর্তিপূজাকে গ্রহণ না করলেও হিন্দুর বিভিন্ন দেব-দেবীর শক্তিকে ব্রহ্মেরই বিভিন্ন প্রকাশরূপে দেখেছিলেন। হিন্দুধর্মের মাধুর্য ও সৌন্দর্য তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। সেই অবিশ্বাস ও অধর্মের যুগে ব্রাহ্মসমাজে এই প্রেমভক্তি, যোগ-কর্মের মিলিত সাধনার রূপটি তাঁর জীবিতকালে ভারতবর্ষে বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছিল, কিন্তু তাঁর ধর্মাচরণের কঠোরতা ও নীতিচর্যা সর্বসাধারণের মধ্যে স্থায়ী ও জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারে নি। কেবল ভক্তির ব্রহ্ম নয়, যোগের ব্রহ্ম, ধ্যানের ব্রহ্মকে মিলিয়ে কেশবচন্দ্রের যে সমন্বয় সাধনা তাই আগামী দিনের নববিধানের সূচনা বহন করে। কেশবচন্দ্রের ধর্মসাধনায় যেমন, তেমনি সমস্ত জীবনের কর্মযজ্ঞের মধ্যেও এই নববিধানের বৃক্ষটি বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ১৮৫৭ খ্রীঃ প্রতিষ্ঠিত 'গুডউইল ফ্র্যাটারনিটি'-তে প্রদত্ত বক্তৃতার মধ্যে নববিধানের সূচনা দেখেছি। একটি উপদেশে তিনি বলেছেন "God our Father, every man our brother."

১৮৬০খ্রীঃ 'Religion of Love' রচনায় তিনি বলেছেন, 'অন্য ধর্মকে ঘৃণা করা উচিত নয়, প্রকৃতপক্ষে ধর্ম মানুষের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি করে না, সকল মানুষকে একত্রিত করে।" প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সকল হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ সকলে মিলে উদার সার্বভৌমিক ধর্মক্ষেত্রে মিলিত হোক।

১৮৬১ খ্রীঃ কেশবচন্দ্র যখন কৃষ্ণনগরে গিয়েছিলেন তখন তিনি 'সেখানকার বিখ্যাত মৃৎশিল্পীকে দিয়ে একটি মাটির মূর্তি তৈরি করেছিলেন। মূর্তিটিতে একজন হিন্দু, একজন মুসলমান ও একজন খ্রীষ্টান পরস্পরকে জড়িয়ে আছে, আর তারা একটি সেতুর উপর দিয়ে পার হচ্ছে, যেন দুঃখের জগৎ থেকে শান্তির জগতে অতিক্রম করছে।[১] এর মধ্যেও আমরা নববিধানের তত্ত্বটি প্রকাশ হতে দেখি। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারি উপদেশদানকালে কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মধর্মের বিশ্বজনীনতার প্রতি ইঙ্গিত করেন। "অদ্য সেই সমাজের জন্মদিন, যে সমাজের জ্যোতি ক্রমশ বিস্তৃত হইয়া বঙ্গদেশের এবং সকল দেশের উন্নতি সাধন করিবে। যাহার প্রভাবে কুসংস্কার তিরোহিত হইবে, কাল্পনিক ধর্মের বিনাশ হইবে, অনাথ সনাথ হইবে, পাপী মুক্ত হইবে, পর্ণকুটীর রাজপ্রসাদ অপেক্ষা আনন্দময় হইবে এবং এই পৃথিবী প্রীতি পবিত্রতা ও আনন্দে অনুরঞ্জিত হইয়া স্বর্গতুল্য হইবে।"[২]

১. Prem Sundar Basu, Life & Works of Brahmananda Keshub, p. 316.
২. কেশবচন্দ্র সেন আচার্যের উপদেশ, ১১ই মাঘ, ১৭৮৩ শক।

১৮৬৫ খ্রীঃ ব্রাহ্মবন্ধু সভায় ১লা এপ্রিলের অধিবেশনের কার্যসূচিটিও নববিধানের ইঙ্গিত দেয়। (১) প্রার্থনা, (২) হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে পাঠ, (৩) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপদেশের ইংরেজি অনুবাদ পাঠ, (৪) 'God, the Creator & the Brotherhood of Man'—এই বিষয়ের উপর কেশবচন্দ্রের ইংরেজি বক্তৃতা। এই সময়ে কেশবচন্দ্র সেনের একজন সঙ্গী মহেন্দ্রনাথ বসু Indian Mirror পত্রিকায় একটি পত্রে ব্রাহ্মসমাজের উদার ও সার্বজনীন ভাবটি প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "ব্রাহ্মসমাজ শুধু ভারতের নয়, সমস্ত বিশ্ব এর গৃহ ; এটা সমগ্র মানবজাতির ধর্ম। ব্রাহ্মধর্ম হিন্দু, মুসলমান খ্রীষ্টানদের সমদৃষ্টিতে দেখে আর বেদ, কোরাণ ও বাইবেল ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থের প্রতি সমানভাবে শ্রদ্ধা পোষণ করে।"[১]

১৮৬৫ খ্রীঃ প্রদত্ত 'Great Men' ও 'Jesus Christ, Europe & Asia'—প্রভৃতি বক্তৃতায় যীশু খ্রীষ্টের ও অন্যান্য মহাপুরুষদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশিত হয়েছে। পরবর্তী কালে 'সাধুসমাগমের' বীজ এখানেই লুকিয়ে আছে।

১৮৬৬ খ্রীঃ সকল দেশের ধর্মশাস্ত্র-গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি সংকলন করে একেশ্বরবাদ-প্রতিপাদক 'শ্লোক-সংগ্রহ' নামে পুস্তক প্রকাশ করেন—এই পুস্তকে গৌরগোবিন্দ রায়-বিরচিত একটি শ্লোকে ব্রাহ্মধর্মের উদারতা ও সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

"সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসোধর্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্যতে॥"

—আখ্যাপত্র, শ্লোক-সংগ্রহ

১৮৬৯ খ্রীঃ ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মসমাজের মন্দিরের চূড়া নির্মিত হয়। হিন্দুর মন্দির, খ্রীষ্টানদের গীর্জা ও মুসলমানদের মসজিদের স্থাপত্যের সমন্বয়ে এই মন্দিরটি তৈরি হয়েছে।

১৮৭৪ খ্রীঃ ৬ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় ব্রাহ্মমন্দিরে উপদেশদানকালে 'Love

১. Indian Mirror, 6th July, 1865.

Triumphant'-এর উপর উপদেশ দেন। প্রার্থনাটি শেষ করেন "Father. reveal unto us Thy new dispensation, the new covenant."

অতঃপর ১৮৭৪ খ্রীঃ ধর্মতত্ত্ব পত্রিকায় ১লা অক্টোবর 'ঈশ্বরের নববিধান' নামে একটি প্রবন্ধে নববিধানের ধারণাটি স্পষ্ট হয়। ১৮৭৫ খ্রীঃ প্রদত্ত 'Behold the Light of Heaven in India'—বক্তৃতায়ও নববিধানের প্রসঙ্গ আছে। এটি নববিধানের বিকাশের পথে মূল্যবান বক্তৃতা।

১৮৭৬ খ্রীঃ সাধনকাননে কেশবচন্দ্রের কর্মপদ্ধতির মধ্যেও প্রাচীন ও নবীনের মিশ্রণ, যোগ ও কর্মের সাধন, নববিধানের পথেই এগিয়ে নিয়ে যায়। এইভাবে আমরা কেশবচন্দ্র সেনের কর্ম ও ধর্ম-সাধনার ইতিহাসে নববিধান কিভাবে মূর্ত হয়ে উঠছে সে ধারণা লাভ করি। কিন্তু তাঁর সমগ্র জীবনসাধনা নববিধানের সাধনা হলেও ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে নববিধান ঘোষিত হয়নি। ১৮৮০ খ্রীঃ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা-দিবসে নববিধান প্রথাবদ্ধ ভাবে ঘোষিত হয়। এর কারণটিও কেশবচন্দ্র সেন নিজেই ব্যাখ্যা করেছেন, "নববিধান, আগে যদি আসিতে সকল দলের মধ্যে সন্ধিস্থাপন করিতে পারিতে। কিন্তু তুমি আপন ইচ্ছায় আসিতে পারিতে না। ভগবান তোমাকে যথাসময়ে পাঠাইলেন।"[১] কোন কর্মই তাঁর স্বেচ্ছাধীন নয়; "প্রথমে ইচ্ছা জন্মে নাই, নববিধানে সমস্ত একত্র গাঁথিব, পরে দেখি প্রকৃতির মধ্যে কে তাহাই করিতেছেন।"[২]

১৮৮১ খ্রীঃ নববিধানের প্রচারক-সভার নামকরণ হলো 'প্রেরিত দরবার'। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, অঘোরনাথ গুপ্ত, গৌরগোবিন্দ রায়, ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল প্রভৃতি সভ্যেরা ঈশ্বর-প্রেরিত প্রচারক বলে গণ্য হলেন। তাঁদের নামের পূর্বে 'ভাই' ব্যবহার করা হতে লাগল। কারণ "ব্রাহ্মসমাজ" ভাই ভিন্ন অন্য কিছু বলিতে পারেন না। কারণ ভাই নাম সাধারণের সঙ্গে সমতা, ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং যথার্থ বিনয় প্রকাশ করে।"[৩]

নববিধান প্রকাশিত হওয়ার পর কেশবচন্দ্র সেন সর্বধর্ম, সর্বশাস্ত্র, ও সর্ব-সম্প্রদায়ের সাধুদিগের প্রতি বিশেষভাবে শ্রদ্ধা পোষণ করতে থাকেন। স্বর্গীয় সাধুদের সাধনার ভাব দ্বারা আত্মস্থ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা 'সাধুসমাগম' রূপ উৎসবানুষ্ঠানে পরিণত হয়। এই সাধন এক অভিনব ব্যাপার। যেন

---

১. আচার্য কেশবচন্দ্র সেন, সেবকের নিবেদন, ৩য় খণ্ড, পৃ, ১০। ২. কেশবচন্দ্র সেন, জীবনবেদ, পৃ, ১১৪। ৩. কেশবচন্দ্র সেন অধিবেশন, পৃ, ১৪৮।

আত্মিক তীর্থযাত্রা। মুসা, সক্রেটিস, শাক্যঋষি, খ্রীষ্ট, মহম্মদ, চৈতন্য-প্রমুখ সাধুদের সঙ্গে মনে ও প্রাণে, ভাবে ও চরিত্রে মিলিত হওয়া এই সাধনের মূলকথা। ধ্যান, প্রার্থনা ও উপাসনার মধ্য দিয়ে 'সাধুসমাগম' সাধনাটিকে সম্পূর্ণতা দিয়েছিলেন কেশবচন্দ্র।

'নববিধান' খ্রীষ্টধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, মুসলমানধর্ম, শিখধর্ম—সকল ধর্মের প্রতিই গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করেছে। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র সেন 'Jesus Christ, Europe & Asia' বক্তৃতায় খ্রীষ্টের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। এই বক্তৃতাটি গ্রহণ করে তৎকালীন হিন্দু ও অহিন্দু অনেকেই মনে করেছিলেন কেশবচন্দ্রের খ্রীষ্ট-অনুরাগ তাঁকে খ্রীষ্টান-ধর্মান্তরিত করবে। কেশবচন্দ্র জনসাধারণের ভ্রান্তি দূর করলেন পরবর্তী আর একটি ভাষণ 'গ্রেট ম্যান'-এ। এতে তিনি সকল ধর্মের মহাপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

'নববিধান' ধর্ম খ্রীষ্টধর্ম নয়। খ্রীষ্টানদের 'ত্রিত্ববাদে'র ঈশ্বর, ঈশ্বরপুত্রকে স্বীকার করলেও 'পবিত্রাত্মাবাদ' অলৌকিকবোধে পরিত্যাগ করেছে নববিধান। এক ঈশ্বর, ঈশ্বরপুত্র, প্রত্যাদেশ ও সমগ্র মানবের ভ্রাতৃত্ব-বোধের উপরই 'নববিধানে'র মূল ভিত্তি গড়ে উঠেছে।

খ্রীষ্টীয় ধর্মের প্রধান উপদেশ—জনসমাজকে ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্যে পরিণত করতে হবে। কেশবচন্দ্র সেন খ্রীষ্টীয় ধর্মের অনুশীলন করেই সামাজিক উন্নতিকে মানবের ধর্মসাধনের অঙ্গীভূত করেছিলেন। ধর্মকে সমাজমুখীন করা ও সামাজিক উন্নতিকে ধর্মের অঙ্গীভূত করা এদেশে সম্পূর্ণ অভিনব। আবার আমাদের হিন্দুধর্মে আসক্তি বর্জন করার উপদেশ আছে—"তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিথা", কিন্তু খ্রীষ্টধর্মে 'পাপবোধ, অনুতাপ ও প্রার্থনা'র নির্দেশ আছে। কেশবচন্দ্র সেন প্রতীচ্য ধর্মবোধের প্রভাবে পাপবোধ, অনুতাপ ও প্রার্থনাকে ধর্মসাধনার প্রধান অঙ্গস্বরূপ গ্রহণ করেছিলেন। তবুও নববিধানকে খ্রীষ্টধর্ম বলা চলে না। নববিধানের এই অনুতাপ ও প্রার্থনা খ্রীষ্টধর্মজাত নয়, এটি বিধানবাদী ব্রাহ্মদের হৃদয়জাত। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে নববিধান ব্রাহ্মধর্মে বৈষ্ণব ভক্তির প্রবাহে এই অনুতাপ ও ব্যাকুল প্রার্থনা আরও প্রবল হলো। ব্রহ্ম-সঙ্গীত ও কীর্তনের সময়ে ভূমিতলে অচেতন হয়ে গড়াগড়ি কিংবা আত্যন্তিক আবেগে ক্রন্দন প্রায়ই দেখা যেত।

নববিধানধর্ম মুসলমানধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছে। মুসলমানধর্মের একেশ্বরবাদ নববিধানধর্মের একেশ্বরবাদীদের আকর্ষণ করেছে। 'বোধিসত্ত্ব'

এবং 'বুদ্ধত্ব' লাভই বৌদ্ধধর্মের লক্ষ্য। আত্মপুরুষকার সহকারে ধ্যান ও শীল অভ্যাস করলে ধর্মকে আয়ত্ত করা যায়। নববিধান ধর্মেও ধ্যান ও জীবনে ধর্ম ও নিয়মের আনুগত্য স্বীকৃতি পেয়েছে।[১] বৌদ্ধদের 'সঙ্ঘং শরণম্ গচ্ছামি' 'নববিধানে'র গোষ্ঠীবন্ধনের মধ্যে প্রকটিত। প্রকৃতপক্ষে শিখধর্মের আদর্শে নববিধান সমাজেও 'সঙ্গত' ও 'শ্রীদরবার' গড়ে উঠলো। 'সঙ্গতে' আত্মতন্ময় হয়ে ঈশ্বর-আলোচনা ও 'শ্রীদরবারে' প্রেরিত দলের একসঙ্গে বসে প্রার্থনা, ধ্যান ও কর্মপদ্ধতি-নির্ধারণ শিখগুরুদেব পথকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।[১] নববিধান খ্রীষ্টধর্ম নয়, বৌদ্ধধর্ম নয়, মুসলমানধর্ম নয়, শিখধর্ম নয়—কিন্তু সকল ধর্মের সারবস্তু অনুসন্ধান করেছে। এইভাবেই নববিধান সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উদার সার্বভৌমিক এবং জাতীয়তার ঊর্ধ্বে আন্তর্জাতিক, ভারতীয়তার ঊর্ধ্বে বিশ্বজনীন হয়ে উঠেছে।

কেশবচন্দ্র সেন 'নববিধান' ধর্মের মধ্য দিয়ে ব্রাহ্মসমাজের ক্রমবিকাশমান পথটিকে প্রশস্ত করে দিলেন। একেশ্বরবাদী রামমোহন রায় ব্রহ্মোপাসনার সূত্রপাত করেছিলেন। অদ্বৈতবাদী ব্রহ্মতত্ত্ব, খ্রীষ্ট ধর্মের ঐক্যতত্ত্ব এবং ইসলামীয় মোতাজেলা মুওয়াহিদ্দীনি সম্প্রদায়ের যুক্তিবাদী একেশ্বরবাদ তাঁকে এক ঈশ্বরের সাধনায় বিশ্বাসী করে তুলেছিল। রামমোহন সকল ধর্মগ্রন্থ থেকে একেশ্বরবাদের সমর্থন পেলেও প্রধানতঃ বেদ ও উপনিষদকে ভিত্তি করেই তিনি এক ঈশ্বরের পূজা প্রবর্তন করেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বেদ ও উপনিষদকে ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেছিলেন। প্রথমে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বেদের অপৌরুষেয়তায় বিশ্বাসী ছিলেন। পরে অবশ্য তিনি এই ধারণা পরিবর্তন করেন। 'জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়' ও 'আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ জ্ঞান'ই ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তি বলে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘোষণা করলেন। শুধু তাই নয় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মধর্মকে বিধিবদ্ধ করলেন ও ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মদের 'ব্রাহ্মসমাজ'-অন্তর্ভুক্ত করলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সমাজ প্রথমে 'কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ' ও পরে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে 'আদি ব্রাহ্মসমাজ' নামে অভিহিত হল। কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেওয়ার পর ব্রাহ্ম-আন্দোলনে নব নব ভাব ও নব নব কর্ম-উদ্দীপনায় প্রচণ্ড শক্তির সঞ্চার হল। পিতৃতুল্য-হৃদয় ঘনিষ্ঠ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে

১. কেশবচন্দ্র সেন, সঙ্গত ১ম ও ২য় ভাগ, প্রচারকগণের সভার নির্দ্ধারণ।

কেশবচন্দ্র সেনের কয়েকটি সংস্কারমূলক কাজকে কেন্দ্র করে মতদ্বৈধ শুরু হয় ও ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁর অনুগামীদল দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ' থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্র সমাজ 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠিত করলেন। কেশবচন্দ্রের জীবনে অধ্যাত্মসাধনা শুধু যোগের বিষয় হয়ে রইল না—সম্পূর্ণ জীবনটাই জীবন্ত ধর্মগ্রন্থে রূপান্তরিত হল। প্রতি কাজে ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভ ও ঈশ্বরের প্রত্যাদেশে জীবন চালিত করে ধর্মচিন্তার ক্ষেত্রে 'নববিধান' দিলেন কেশবচন্দ্র সেন। ব্রাহ্মসমাজ বিধাতার হাতের যন্ত্রস্বরূপ, 'নববিধান' ঈশ্বরের আকাঙ্ক্ষিত কৃপার বিধান। এই সত্যটি তিনি সকলের অন্তরে জাগ্রত করেছেন। 'ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান ও ব্রহ্মানন্দ-রস পান' মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনসাধনা ছিল। কিন্তু কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মধর্মকে নিছক জ্ঞানালোকিত বেদান্ত-প্রতিপাদ্য সত্যধর্ম রাখলেন না—তাকে ভক্তির কর্মে পরিণত করলেন। শুধু তাই নয়, সামাজিক জীবনের সঙ্গে অধ্যাত্ম-সাধনার মিল ঘটালেন। একদিকে সমাজ-সংস্কার, অপরদিকে সমন্বয়ী ধর্মের মধ্য দিয়ে ব্রাহ্মসমাজের উদার, সর্বভারতীয় তথা সার্বজনীন মিলনের পথ উন্মুক্ত করে দিলেন। জাতিভেদ-লোপ, নরনারীর সমান অধিকার, স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতার প্রচলন, অনুন্নত জনসাধারণের উন্নয়ন, অসবর্ণ বিবাহবিধি প্রণয়ন, নীতি ধর্মের ভিত্তিতে জীবন গঠন ইত্যাদি সংস্কারের মধ্য দিয়ে জাতির সাংস্কৃতিক বিপ্লবও সম্ভব হল। ধর্ম ও জীবনচর্যার পথে কেশবচন্দ্র সেন যে সমন্বয়ী ধর্ম স্থাপন করলেন তাই ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারি 'নববিধান' রূপে ঘোষিত হল। মানুষের সঙ্গে ভগবানের জীবন্ত সংস্পর্শ, সকল ধর্মকে আত্মস্থ করা যোগ-ভক্তি, কর্ম-জ্ঞানের মিলন নববিধানের নূতন বিধান। এটির নাম নববিধান হলেও কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্ম-সমাজের ক্রমবিকাশের পথেই এই তত্ত্বটি উপলব্ধি করেছিলেন। রামমোহন রায় কুসংস্কার বর্জন করে সকল ধর্মমত থেকে সত্য সংগ্রহ করে 'সার্বভৌম ধর্মমতে'র পথটি প্রদর্শন করে গেছেন। রামমোহন রায় শুধুই অধ্যাত্মবাদী ছিলেন না, তাঁর সাধনা ছিল বিজ্ঞান-ভিত্তিক; ঈশ্বপ্রেমের সঙ্গে মানবপ্রেমকে যুক্ত করেছিলেন, মানবসত্তার সমগ্রতা—বিশ্বমানবতা তাঁর ধারণায় রূপ পেয়েছিল। তিনি ছিলেন জ্ঞানবাদী। যুক্তি ও মনন-নির্ভর প্রজ্ঞাবান আধুনিকতার অগ্রদূত রামমোহন। এইখানেই 'নববিধানে'র বিজ্ঞান ও ধর্মের যোগ ও কর্মের

মিলনের সূত্রটি নির্ধারণ করতে পারি। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে আছে আত্মতন্ময়তা, আধ্যাত্মিকতা। কেশবচন্দ্র সেনের মধ্যে দুটিরই সম্মিলিতরূপ প্রত্যক্ষ করা গেছে। রামমোহনের মনন ও জ্ঞানবাদ আর দেবেন্দ্রনাথের ঈশ্বর-নির্ভরতা ও ভক্তিবাদ দুই-ই কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁর ঘোষিত 'নববিধান' ধর্মে সত্য হয়ে উঠেছিল।

"রামমোহন এসে নিদ্রিত ভারতকে জাগ্রত করে বললেন, 'ভাব সেই একে, জলে স্থলে শূন্যে যে সমানভাবে থাকে।' বহু দেবদেবীর মধ্যে সেই একমাত্র সত্যস্বরূপের চিন্তাকে প্রতিষ্ঠা করাই তাঁর প্রধান কাজ ছিল। রাজা রামমোহনের পর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বললেন,—'একমেবাদ্বিতীয়ং পরম পুরুষকে পরমাত্মারূপে প্রতিষ্ঠিত করে উপাসনা কর।' তাঁর প্রধান উপদেশ ব্রহ্মোপাসনা। এরপর কেশবচন্দ্র সেন এসে বললেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যাঁকে উপাসনা করতে বললেন, তাঁর ইচ্ছার বশবর্তী হও। কেশবচন্দ্রের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ উপদেশ ঈশ্বরাদেশের বশবর্তী হওয়া। এই উপদেশ তিনি জীবনের দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রচার করে গেছেন। নববিধানের আদর্শগুলি ব্রাহ্মসমাজ-মধ্যে সন্নিবিষ্ট করে কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম জীবনকে গাঢ়তা প্রদান করে স্থায়ী আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর স্থাপন করেছেন।"[১] জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম, যোগের সম্মিলিত মূর্তিই নববিধান। নববিধান প্রাচ্যের ভক্তির সঙ্গে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানকে, প্রাচীন প্রথার সঙ্গে প্রগতিকে মিলিত করেছে। কেশবচন্দ্র সেনের প্রেরণায় নববিধান ধর্মকে কেন্দ্র করে এক বিরাট ভক্তগোষ্ঠী ও প্রেরিত প্রচারকগণের দ্বারা একটি ধর্মবলয় সৃষ্টি হল। কেশবচন্দ্র সেনের প্রভাবে এই প্রচারকগণ ব্যক্তিগত সুখ পরিত্যাগ করে আপন ধর্মপ্রচারে ব্রতী হলেন। উচ্চশিক্ষিত অভিজাত পরিবারের এই প্রচারকগণ বৈরাগ্য ও ধর্মভাবের দ্বারা উদ্দীপিত হয়ে দৈহিক ও আর্থিক ক্লেশ সহ্য করেও নববিধান প্রচারে আত্ম-উৎসর্গ করেছিলেন। ধর্মালোচনা, প্রার্থনা, প্রচারকে কেন্দ্র করে কেশবচন্দ্র সেন ও বিধানবাদী এই প্রচারকগণ সুদীর্ঘকাল বাঙ্গালা গদ্যের অনুশীলন করে গেছেন।

---

১. শিবনাথ শাস্ত্রী, মাঘোৎসবে বক্তৃতা, ১৯১০ খ্রীঃ।

## দ্বিতীয় অধ্যায়

## কেশবচন্দ্র সেন ও বাঙলা সাহিত্য

'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের' প্রতিষ্ঠাতা, প্রচারক ও আচার্য রূপেই ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন সমগ্র ভারতে পরিচিত। কিন্তু তাঁর বাঙলা গ্রন্থরাজি বাঙলা সাহিত্যের অমৃতভাণ্ডার হয়ে আছে, আর উনিশ শতকের সাহিত্যের আকাশে কেশবচন্দ্র সেন এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হয়েই বিরাজ করছেন। ব্রহ্ম-সাধনা ও ধর্মচর্যা নিঃসন্দেহে তাঁর পরিচিত ক্ষেত্র, কিন্তু উনিশ শতকীয় সাহিত্য-সৃষ্টির ইতিহাস কেশবচন্দ্র সেনকে বাদ দিয়ে রচিত হতে পারে না।

ধর্ম ও সাহিত্য আপাতদৃষ্টিতে বিপরীত কোটির মনে হলেও সাহিত্যের সঙ্গে ধর্মের বিবাদ নেই। বরং যুগে যুগে সকল দেশেই ধর্মপুস্তক উৎকৃষ্ট সাহিত্যের উপকরণ জুগিয়েছে। "সাহিত্যও ধর্ম ছাড়া নহে। কেননা, সাহিত্য সত্যমূলক। যাহা সত্য তাহা ধর্ম।"[১] রামায়ণ-মহাভারত কিম্বা ইলিয়ড-ওডেসি, এগুলি একাধারে জাতীয় ধর্মগ্রন্থ অপরদিকে জাতীয় সাহিত্যের গৌরব অর্জন করেছে। বিশেষতঃ বাঙলা সাহিত্যের প্রধান বিষয় ধর্ম। "আমাদের দেশে কেবল ধর্মসাহিত্যই আছে। সেইজন্য প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য কেবল শাক্ত এবং বৈষ্ণব কাব্যেরই সমষ্টি।"[২] প্রাচীন ও মধ্যযুগের সমস্ত সাহিত্যকর্মই ধর্মকে অবলম্বন করে। চর্যাপদ, মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলী বা জীবনী সাহিত্য, প্রাচীন-বাঙলার এসব সাহিত্যসম্ভারে আছে বিশেষ ধর্মের প্রচার ও ব্যাখ্যা ; আছে গোষ্ঠী-প্রীতি, আছে ভক্তির আবেগ-প্রাবল্য। সান্ধ্য ভাষায় বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের সাধনা ও পথ বর্ণিত হয়েছে চর্যাপদে। দেবদেবীর মাহাত্ম্য কীর্তন ও ধর্মপ্রচারের জন্যই দৈবাদিষ্ট হয়ে মঙ্গলকাব্য রচনা করতেন কবিরা। রাধা ও কৃষ্ণের প্রণয়-উপাখ্যান ও প্রেমলীলা অধ্যাত্ম-সাধনার অঙ্গ হিসেবেই পদাবলীর ছত্রে ছত্রে ছড়িয়ে আছে। কিন্তু ধর্ম মুখ্য বিষয় হলেও সাহিত্যের রস ও আনন্দ এগুলিতে কিছু কম নেই। এমন কি উনিশ শতক রেনেসাঁস যুগ হলেও জাতীয় ভাব-আন্দোলনের ক্ষণেও ধর্ম সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হয় নি।

---

১. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিবিধ প্রবন্ধ। ২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্য, পৃ, ১১৪।

উনিশ শতকে আধুনিক যুগের সূচনা হল। মানবতাবাদ, জাতীয়তাবাদ, স্বদেশপ্রেম, বৈজ্ঞানিক চেতনা, ইতিহাস-নিষ্ঠা, পাশ্চাত্ত্য লজিক ও ফরাসি সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা ইত্যাদি বিষয় ভারতীয় যুবকদের মনে মধ্যযুগের জড়তা ভঙ্গ করে নবচেতনার জোয়ার আনল। সাহিত্যেও নতুনত্বের আলোড়ন লাগল। তথাপি উনিশ শতকের সাহিত্য-সাধনা ঈশ্বরকে, ধর্মকথাকে বাদ দিতে পারল না। যদিও মানবিকতার আদর্শই রামমোহন, ডিরোজিও, ইয়ংবেঙ্গল-গোষ্ঠী কিংবা পজিটিভিজমের একান্ত অনুরক্ত রামকমল ভট্টাচার্য ও কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের চিন্তার ও আদর্শের উপজীব্য ছিল তথাপি এঁদের উপলব্ধ সত্য ঈশ্বরকে বর্জন করে নি। ব্রাহ্মসমাজের চিন্তায় ও কার্যে পাশ্চাত্ত্য প্রগতির সঙ্গে সংগতি রক্ষা করেই ঈশ্বর প্রধান উপজীব্য বিষয় হয়ে উঠেছে। বঙ্কিম-মনীষায় ইউরোপীয় পজিটিভিজম, গীতার নিষ্কাম কর্মবাদ ও পুরাণের ভক্তিবাদ মিশ্রিত হয়েছে।

উনবিংশ শতাব্দীতে রাজা রামমোহন রায় থেকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব অবধি ধর্ম ও ভক্তির বিচিত্র মত ও রূপ দেখা দিয়েছে সত্য, তবুও বলা চলে মূল সুরটি বেদান্তের অদ্বৈতবাদকে কেন্দ্র করেই প্রবাহিত হয়েছে। কাজেই শুধু বিজ্ঞান ও মানবতার কষ্টিপাথরে উনিশ শতকের চিন্তাধারাকে বিচার করা চলে না।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের ধারা মূলতঃ একটি—ধর্মমূলক সাহিত্য। কিন্তু উনিশ শতকে একদিকে ভারতীয় অধ্যাত্মচেতনা, অপরদিকে ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞান-প্রধৌত মনন ভারতবাসীর মানসলোক সৃষ্টি করেছিল। তাই সাহিত্যেও দুটি ধারা। একটি ধারা ছিল আধুনিক মানসিকতায় পরিপুষ্ট, অপরটির মধ্যে ধর্ম প্রত্যক্ষ ও প্রধান হয়ে উঠেছে। "রামমোহনের বেদান্ত-উপনিষদ অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও বিচার-বিতর্ক, ব্রাহ্মনেতার সমাজের হাতে অশূদ্র-পরিগ্রাহী শাস্ত্রগ্রন্থের আবির্ভাব, হিন্দু কলেজে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভূরিভোজ, সাময়িক পত্রে রাজনৈতিক সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যাপার নিয়ে আন্দোলন, ইয়ং-বেঙ্গলদের যে কোন ধর্মবোধ ও পারমার্থিকতার বিরুদ্ধে রণহুংকার—এই সমস্ত বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত ঘটনা থেকে মনে হবে উনবিংশ শতাব্দীর কালাপাহাড় যুবকদের চাপে এবং পাশ্চাত্ত্যের ইহমুখী ও জড়বাদী সভ্যতার প্রভাবে বাঙালীর দীর্ঘকাল-লালিত ধর্মচেতনা বুঝি লুপ্ত হয়ে গেল।"[১]

১. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, উনিশ বিশ, পৃ. ২২৪।

কিন্তু ব্যাপারটি ঠিক তা নয়। বরং উনিশ শতকের প্রাক-প্রত্যুষ কাল থেকেই দেখি ধর্মান্দোলন ও বিচার-বিতর্কের মাঝেই বাঙলা গদ্য অতি অল্পকাল মধ্যেই যৌবনশ্রী-মণ্ডিত হল।

একদিকে ধর্ম, অপরদিকে সমাজ—দুটি বিষয়েই নানাবিধ সংস্কার ও আন্দোলন এই পরিপ্রেক্ষিত নিয়েই এই শতাব্দীর সাহিত্য গড়ে উঠেছিল। ধর্মপ্রচারের বিশেষ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়েই খ্রীষ্ট মিশনারিরা বাঙলা গদ্যের উৎসমুখ খুলে দিয়েছিলেন। "উইলিয়ম কেরি প্রমুখ খ্রীষ্টান মিশনারীগণও মৌলিক রচনা ও অনুবাদের মাধ্যমে বাঙলা গদ্যের উন্নতিব ভার ধর্মপ্রচারের তাগিদেই গ্রহণ করিলেন।"[১] ওয়ার্ড, বার্ণসডন, গ্রাণ্ট প্রভৃতি ধর্মপ্রাণ যাজকগণ মার্শম্যানের নেতৃত্বে শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। সঙ্গে সঙ্গে বাঙলা গদ্যের দ্বার উন্মোচিত হল। বাঙলা গদ্যের কাজ আরম্ভ হয়েছিল বাইবেলের অনুবাদ-কার্যের মধ্য দিয়ে (১৮০১ খ্রীঃ)। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "আমাদের ক্ষুদ্র বঙ্গদেশেও একটা সাধাবণ সাহিত্যেব হাওয়া উঠিয়াছে। ধর্মপ্রচার হইতেই ইহার আরম্ভ।... ·বাংলা সর্বসাধারণকে আপনাদের কথা শুনাইবার অভাব খ্রীষ্টীয় মিশনারিগণ সর্বপ্রথমে অনুভব করেন। এইজন্য তাঁহারা সর্বসাধারণের ভাষাকে শিক্ষাবহনের ও জ্ঞানবিতরণেব যোগ্য করিয়া তুলিতে প্রবৃত্ত হইলেন।"[২] এর পরবর্তী প্রবাহে এল সংবাদপত্র বা সাময়িক পত্র। ১৮১৮ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে 'দিগ্‌দর্শনে'ব আবির্ভাব। ধর্মপ্রচারের বাহনরূপেই পত্রিকাটিব প্রকাশ। এরপর 'সমাচার দর্পণ' (মে, ১৮১৮ খ্রীঃ) হিন্দুধর্মের নিন্দায় ও সমালোচনায় 'সমাচার দর্পণে'ব পাতা পূর্ণ হয়ে উঠত। এর প্রতিরোধকল্পে ১৮২১ খ্রীঃ রামমোহন 'সংবাদকৌমুদী' (সাপ্তাহিক) প্রকাশ করেন। অপরদিকে, সংরক্ষণশীল ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাচীন সনাতন হিন্দুধর্মের পক্ষ অবলম্বন করে 'সমাচারচন্দ্রিকা' (১৮২২) প্রকাশ করেন। এভাবে ত্রিমুখী ধর্মযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাঙলা গদ্য একটা বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করতে লাগল। সাময়িক পত্রিকার মাধ্যমে রামমোহন হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করলেন। বেদ-উপনিষদ ও অন্যান্য শাস্ত্রের প্রভাবে একেশ্বরবাদ প্রচার করলেন। অমসৃণ বাঙলা গদ্যে বেদান্ত ব্যাখ্যা ও বিচার করে রামমোহন বাঙলা গদ্যের জড়ত্ব মোচন করেছিলেন।

১. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাস, পৃ. ৬০। ২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্য, পৃ. ১১৭

রামমোহনের প্রায় সকল গদ্যরচনা ধর্মকে অবলম্বন করে। প্রতিপক্ষের মত খণ্ডন ও আপন মত প্রতিষ্ঠার জন্য বিতর্কমূলক আলোচনা সমগ্র রচনার বিষয়। উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার ( ১৮১৬-১৭ ), ভট্টাচার্যের সহিত বিচার ( ১৮১৭ ), গোস্বামীর সহিত বিচার ( ১৮১৮ ), সহমরণ বিষয় প্রবর্তক ও নিবর্তকের সংবাদ ( ১ম-২য় ১৮১৮/১৮১৯ ), কবিতাকারের সহিত বিচার ( ১৮২০ ), সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার ( ১৮২০ ), ব্রাহ্মণ সেবধি, ব্রাহ্মণ ও মিশনারি সংবাদ ( ১৮২১ ), চারি প্রশ্নের উত্তর ( ১৮২২ ), পাদরি ও শিষ্য সংবাদ ( ১৮২৩ ), পথ্যপ্রদান ( ১৮২৩ ), কায়স্থের সহিত মদ্যপান বিষয়ক বিচার ( ১৮২৩ ), সহমরণ বিষয় ( ১৮২৯ ) ইত্যাদি গ্রন্থগুলি তাঁর বিচার-বিতর্কসংক্রান্ত রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। বেদ ও উপনিষদ রামমোহনের প্রিয় বিষয় ছিল। বেদান্ত গ্রন্থ ( ১৮১৫ ) ও বেদান্তসার ( ১৮১৫ ) ও বিভিন্ন উপনিষদের ( তলবকার উপনিষদ, কেনোপনিষদ, ঈশোপনিষদ, কঠোপনিষদ, মাণ্ডুক্যোপনিষদ ও মুণ্ডকোপনিষদ ) অনুবাদ করেছিলেন। রামমোহন যে 'ব্রহ্মসভা'র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেটি পরবর্তী কালে ব্রাহ্মধর্মের মহীরুহে পরিণত হয়েছিল আর বাঙলা সাহিত্যের বিরাট ক্ষেত্রকে ছায়া-প্রভাবিত করেছিল। প্রকৃতপক্ষে উনিশ শতকের ধর্মচেতনায় ব্রাহ্মধর্ম একটি বিশেষ ও বিরাট স্থান দখল করে আছে। রামমোহন বেদ-উপনিষদ আলোচনা ও যুক্তিতর্ক-সমন্বিত প্রবন্ধাবলীর মধ্য দিয়ে বাঙলা সাহিত্যকে শুধু স্বাস্থ্যশ্রী-মণ্ডিতই করলেন না, উপরন্তু ধর্ম-আলোচনার সূত্র ধরে বঙ্গসাহিত্যে একটি সুনির্দিষ্ট ধারার সৃষ্টি করলেন। রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজনারায়ণ বসু, কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী—এঁরা সকলেই উনিশ শতকের ব্রাহ্মধর্ম-আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। বহু ধর্মালোচনা, ধর্ম-সম্পর্কিত বিতর্ক, ধর্ম-উপদেশ, ধর্মব্যাখ্যা বাঙলা গদ্যকে পুষ্ট ও পরিণত করেছিল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রামমোহনের পথ ধরে বাঙলা গদ্যসাহিত্যের ধর্মালোচনা-সংক্রান্ত শাখাটির শক্তি বৃদ্ধি করলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববোধিনী সভা ( ১৮৩৯ ) এবং অক্ষয়কুমার দত্ত-সম্পাদিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ( ১৮৪৩ ) হল তাঁর মতপ্রচারের প্রধান বাহন। বেদান্ত-প্রতিপাদ্য সত্যধর্মকে আশ্রয় করেই ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচনা করলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ঋগ্‌বেদের অনুবাদ প্রকাশিত হয়। এই তত্ত্ববোধিনী সভাকে অলংকৃত

করেছিলেন তৎকালীন অনেক গুণিজন। কবি ঈশ্বর গুপ্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর-প্রমুখ সাহিত্যিকগণ 'তত্ত্ববোধিনী' সভা ও পত্রিকাকে কেন্দ্র করে বাঙলা সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি সাধন করেন।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ধর্ম ও সাধনাব জগতে বিচবণ কবলেও তাঁর সাহিত্য-রসিক মনটি তত্ত্ব-আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দিয়েছে। ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থ ( ১৮৫০ ), আত্মতত্ত্ববিদ্যা ( ১৮৫২ ), ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস ( ১৮৬০ ), কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ( ১৮৬২ ), ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান ( ১৮৬১ এবং ১৮৬৬ ), জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি ( ১৮৯৩ ),—দেবেন্দ্রনাথ-কৃত এইসব গ্রন্থের মধ্যে তাঁর গদ্যরীতির বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর সুরচিত আত্মজীবনী মূল্যবান গ্রন্থ। এখানে দেবেন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক জীবনের ক্রমপরিণতির ইতিহাসটুকু যেমন বিবৃত হয়েছে তেমনি স্থানে স্থানে দেবেন্দ্রনাথের ব্যক্তিজীবনের উষ্ণ স্পর্শে রসসমৃদ্ধ সাহিত্য হয়ে উঠেছে। পরবর্তী কালের প্রায় অনেক ব্রাহ্মনেতা আত্মচরিত রচনা করে গেছেন। রাজনারায়ণ বসু, কেশবচন্দ্র সেন ও শিবনাথ শাস্ত্রী প্রত্যেকেরই আত্মচবিত বাঙলা সাহিত্যেব অবিস্মরণীয় সম্পদ হয়ে উঠেছে।

রাজনারায়ণ বসু আদি ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম নেতা—তিনি বাঙলা সাহিত্যে চিন্তাশীল প্রাবন্ধিক বলে সুপরিচিত। "উনিশ শতকের যে কয়জন মনীষী পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারার প্রবল বন্যার সামনে দাঁড়িয়ে স্বদেশ ও স্বজাতিকে আত্মস্থ করার পুণ্যব্রত গ্রহণ কবেছিলেন, রাজনারায়ণ বসু তাঁদেরই অন্যতম।"[১]

হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা ( ১৮৭৩ ), সেকাল আর একাল ( ১৮৭৫ ), বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতা ( ১৮৭৮ ), বৃদ্ধ হিন্দুর আশা ( ১৮৮৭ ), আত্মচরিত ( ১৯০৯ সালে মুদ্রিত ) প্রভৃতি গ্রন্থের মধ্যে রাজনারায়ণ বসুর পাণ্ডিত্যের সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছে স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্ব।

রাজনারায়ণের হৃদয়টি ছিল প্রকৃত ভক্তের হৃদয়। ভক্তি ও মানবপ্রীতির সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছিল তাঁর পরিশুদ্ধ সাহিত্যের পিপাসা। মহাকবি মধুসূদনের সাহিত্যালোচনার সুযোগ্য সারথি তিনি। বন্ধু রাজনারায়ন

---

১. প্রণবরঞ্জন ঘোষ, উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলার মনন ও সাহিত্য, পৃ. ২১১।

বসুকে লেখা মধুসূদনের বহু পত্রেই সাহিত্য প্রসঙ্গ আছে। "বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাবে" রাজনারায়ণ বসু জাতীয় ভাষার উন্নতির সঙ্গে জাতির উন্নতি নির্ভরশীল বলে মনে করেছেন। সেকাল ও একাল এবং আত্মচরিত শুধু উনিশ শতকের লিপিচিত্র নয়, বঙ্গসাহিত্যের সমৃদ্ধ সম্পদও, মানবধর্মী সহজ সরল গদ্যরীতির পরিচয় তাঁব গদ্য-গ্রন্থগুলির বৈশিষ্ট্য।

অক্ষয়কুমার দত্ত বিভিন্ন তত্ত্ব ও জ্ঞানবিজ্ঞানের বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তত্ত্বোধিনী পত্রিকার নিয়মিত সম্পাদনার ভার তাঁর উপর ছিল ( ১৮৪৩ খ্রীঃ থেকে ১৮৫৫ খ্রীঃ পর্যন্ত ) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মের প্রচারার্থে তাঁকে নিয়োগ করলেও অধ্যাত্মসাধনা অপেক্ষা যুক্তিবাদ ছিল তাঁর মধ্যে প্রধান। অন্তরটি ছিল বিজ্ঞানচেতনায় প্রসারিত। 'ব্রহ্মতত্ত্ব'-এর চেয়ে 'ব্রহ্মাণ্ড-তত্ত্ব' তাঁকে বেশী আকর্ষণ করত। তাই তত্ত্বোধিনী শুধু অধ্যাত্ম আলোচনাব ক্ষেত্র রইল না, জ্ঞানবিজ্ঞান-আলোচনার দ্বারা বাঙলা সাহিত্যে বৈচিত্র্য আনল। কুম্ব, পেইন ও কোম্‌তের প্রভাবেই অক্ষয়কুমারের বিজ্ঞান-আশ্রিত ধর্মমত গড়ে ওঠে। বিজ্ঞান ও ঈশ্বরের সমীকরণ করেছেন তিনি। প্রাকৃতিক নির্দেশ পালন করাই ঈশ্বরভক্তি। "পরমেশ্বরকে প্রীতি কবা ও তাঁহার প্রিয় কার্য সাধন করাই ব্রাহ্মধর্ম। বিশ্বপতি যে সকল শুভকর নিয়ম সংস্থাপন করিয়া বিশ্বরাজ্য পালন করিতেছেন, তদনুযায়ী কার্যই তাঁহার প্রিয় কার্য, এবং তাঁহার প্রতি প্রীতি প্রকাশপূর্বক তৎসমুদায় সম্পাদন করাই আমাদেব একমাত্র ধর্ম।"[১] কুম্বের "Essays on the constitution of Man and its Relation to External object"—গ্রন্থটির দ্বারা তাঁর মতামত বিশেষ ভাবে পরিচালিত হয়েছে।

বাঙলা ভাষায় বহু বিদ্যার প্রসারকল্পেই অক্ষয়কুমার সাহিত্য রচনা করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের মত পাঠ্যপুস্তক রচনায় তাঁর কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে স্বীকার করতে হয়, কিন্তু আদি ব্রাহ্মসমাজের সাহিত্যিকগণ, যাঁরা জ্ঞানের সাহিত্যকে ভাবের সাহিত্যে রূপান্তরিত করেছেন, তাঁদের মধ্যে তিনি একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "বঙ্কিম বাবু আজ যে বঙ্গভাষার ও যে বঙ্গসাহিত্যের পরম গৌরবের স্থল, আদি ব্রাহ্ম সমাজ সেই বঙ্গভাষাকে পালন করিয়াছেন, সেই বঙ্গসাহিত্যকে জন্ম দিয়াছেন।"[২] অক্ষয়কুমারের

১. অক্ষয়কুমার দত্ত, বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার, বিজ্ঞাপন অংশ।
২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কৈফিয়ৎ, ভারতী ১২৯১ পৌষ।

যুক্তিবাদী মন একদিকে সত্যের অনন্ত সম্ভাবনাময় বিচিত্র প্রকাশ অপরদিকে অন্তরের গভীর উপলব্ধিজাত সত্য—দুইয়ের সমন্বয়ে ব্যস্ত ছিল। তাঁর রচিত গদ্যেও তাই প্রজ্ঞার দ্যুতি ও ব্যক্তিত্বের ঋজুতা প্রকাশ পেয়েছে।

একটি বিষয় লক্ষণীয়। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ও মধ্য পর্বে যাঁরা বঙ্গসাহিত্যের ধারাকে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন মূলতঃ তাঁদের প্রায় প্রত্যেকেই ব্রাহ্মধর্মভুক্ত। এ যুগের প্রথমার্ধে সনাতন হিন্দুধর্ম একদিকে খ্রীষ্টধর্ম অপরদিকে ব্রাহ্মধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল, কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে বঙ্কিমের প্রভাবে আর্য-জাগৃতি ঘটে। সনাতন ভারতের যে ঐতিহ্যের প্রতি এতদিন শিক্ষিত বাঙালিরা অপ্রসন্ন ছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র সেই আদর্শকেই উদ্বোধন করলেন মানবহিতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত করে। এই যুগে অগস্ত্ কোম্‌তের ধ্রুবদর্শনের প্রভাব পাশ্চাত্ত্য শিক্ষিত বাঙালি মননকে প্রভাবিত করেছিল। আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র, যোগেশচন্দ্র ঘোষ, এঁরা সকলেই কোম্‌তের ভক্ত ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁর প্রভাবে প্রথমযুগে মানবতাবাদী হয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু পরবর্তী কালে প্রাচ্য দর্শন গীতার নিষ্কামতত্ত্ব তাঁকে বেশি আকৃষ্ট করেছিল। তাঁর ধর্মতত্ত্বে ও শেষের তিনটি উপন্যাসে—আনন্দমঠ (১৮৮২ খ্রীঃ), দেবী চৌধুরানী (১৮৮৪ খ্রীঃ) ও সীতারাম-এ (১৮৮৭ খ্রীঃ) তাঁর বিশিষ্ট ধর্মচিন্তার প্রভাব পড়েছে।

বিপিনচন্দ্র পাল উনিশ শতকের বাঙলা সাহিত্যের দুটি ধারা লক্ষ্য করেছেন। "আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস মোটামুটি দুইভাগে বিভক্ত। এক ব্রাহ্মযুগ আর এক বঙ্কিমযুগ। বঙ্গদর্শন এই বঙ্কিমযুগের সূচনা করে।"[১]

প্রকৃতপক্ষে উনিশ শতকের বাঙলা সাহিত্যের দুটি ধারা—ব্যক্তিগত চরিত্রের শুদ্ধতা সাধন, ধর্মপ্রচার ও ব্যাখ্যা, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রেরণায় সমাজসংস্কার ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে রামমোহন থেকে শিবনাথ শাস্ত্রী পর্যন্ত সাহিত্যের অব্যাহত একটি ধারা; অপর ধারাটি ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলিকাতা কমলালয় (১৮২৩ খ্রীঃ), নববাবুবিলাস (১৮২৫ খ্রীঃ), নববিবিবিলাস (১৮২৫ খ্রীঃ) থেকে শুরু করে ঈশ্বর গুপ্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র, দীনবন্ধু মিত্র, মধুসূদন প্রমুখ সাহিত্যিকদের রচনার মধ্য দিয়ে বঙ্কিমের বঙ্গদর্শনের যুগে পদার্পণ। সাহিত্য-সৃষ্টি ও সাহিত্য-সমালোচনায় বঙ্গদর্শন

১. বিপিনচন্দ্র পাল, নবযুগের বাংলা, পৃ. ১৫৯

বাংলা সাহিত্যে জোয়ার আনল। বিষয়ের বৈচিত্র্যে, ভাবের গভীরতায়, রচনার আঙ্গিক-ব্যবহারে বঙ্কিমচন্দ্র প্রকৃত অর্থে বাঙলা সাহিত্যে আধুনিকতার সূত্রপাত করলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের আগমনে হিন্দুশাস্ত্র ও হিন্দুয়ানির পুনর্জাগরণ ঘটেছে সত্য, তবু তাঁর সমসাময়িক কালে ব্রাহ্মপ্রভাব সমাজে ও সাহিত্যে প্রবল পরিমাণে বিরাজ করছিল। ১৮৩৮ খ্রীঃ দুই যুগন্ধর মহাপুরুষের—বঙ্কিমচন্দ্র ও কেশবচন্দ্রের, জন্ম। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের স্রষ্টা কেশবচন্দ্র শুধু নববিধানের প্রবর্তক ও ব্রাহ্মধর্মের প্রচারক মাত্র নন—বঙ্গসাহিত্যের ধর্ম-প্রভাবিত ধারাটি তাঁর ধর্মীয় রচনা ও বিশিষ্ট গদ্যভঙ্গীর দ্বারা সবিশেষ পরিপুষ্টি লাভ করেছে। "বাংলার ধর্মচেতনায় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের প্রভাব যে সুগভীর তা আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু বাংলা গদ্য সাহিত্যেও তাঁর জ্বলন্ত ভক্তি ও অধ্যাত্ম-অনুভূতির এমন প্রত্যক্ষ স্পর্শ আছে যে, বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে তার অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।"[১] উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা সাহিত্যে অধ্যাত্ম-অনুভূতির শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ঘটেছে কেশবচন্দ্র সেনের বাঙলা রচনায়। দুরূহ দার্শনিক তত্ত্ব ও নীরস উপদেশাবলী সহজ উপায়ে ব্যাখ্যাত হয়ে, সুন্দর উপমায় অলংকৃত হয়ে বাঙলা সাহিত্যের ঐশ্বর্য প্রমাণিত করেছে। চর্যাপদের যুগ থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বাঙলা সাহিত্যের যে প্রধান অবলম্বন অধ্যাত্ম-অনুভব সেই ঐতিহ্যপথেই কেশবচন্দ্রের বাণীভঙ্গিমা সার্থকতার স্বাক্ষর রাখল। "কেশবচন্দ্র একাধারে ধর্মগুরু, সমাজসংস্কারক, বাগ্মী ও সাংবাদিক। ধর্মগুরুরূপে তাঁকে অনেক গভীর অভিজ্ঞতা বিবৃত করতে হয়েছে, সমাজসংস্কারকরূপে তাঁকে বহু বিষয়ে লিখতে হয়েছে, সাংবাদিকরূপে তাঁকে সকল বিষয় সরলভাবে প্রকাশ করতে হয়েছে, আর বাগ্মীরূপে ভাষা ও স্বরের বিশেষ ভঙ্গীতে শ্রোতার মন বিচলিত করতে হয়েছে।"[২] বঙ্কিমচন্দ্র ও কেশবচন্দ্র একই বছরে জন্মগ্রহণ করেছেন, বঙ্কিমের যুগে বসেহ কেশবচন্দ্র সাহিত্য রচনা করেছেন, কিন্তু কোথাও বঙ্কিম-প্রভাবিত নন—ব্যক্তিত্বের অসাধারণত্ব, পাণ্ডিত্যের গভীরতা ও বক্তব্যের সহজ সারল্য তাঁকে উনিশ শতকে বঙ্কিমপ্রভাবিত যুগে বিশিষ্টতা-মণ্ডিত করেছে। এর কারণ-স্বরূপ বলা যায়, বঙ্কিমের ও কেশবচন্দ্রের সাধনার

১. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, উনিশ-বিশ, পৃ. ২৫২। ২. শ্রীপ্রমথনাথ বিশী ও বিজিতকুমার দত্ত সম্পাদিত, বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক পৃ. ১২৭।

ক্ষেত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন, মতে ও পথে তাদের মধ্যে কোথাও মিল আছে বলে মনে হয় না। কেশবচন্দ্রের সাহিত্যরুচি ও গদ্যের স্টাইল বঙ্গসাহিত্যে এতই স্বতন্ত্র যে বঙ্কিমী সাহিত্য থেকে তাকে পৃথক করে বেছে নিতে অসুবিধা হয় না। যেমন কেশব সেনের গদ্য—"হৃদয়টা যেমন ভক্তের হৃদয়, নয়নটা তেমনই যোগীর নয়ন হইবে। ভক্তি ও যোগ উভয়েব প্রতিই আমার দৃষ্টি পড়িল, সাধনে প্রয়াস জন্মিল। মনে হইল ভক্তি, যোগ ব্যতীত ব্রাহ্মজীবন কোন কার্যেরই নয়।—যোগে নয়ন পরিষ্কৃত হইল, ভক্তিতে হৃদয় উচ্ছলিত হইল। এক চক্ষু যোগের, আর এক চক্ষু ভক্তির। ঈশ্বর আমাকে সৌভাগ্যশালী করিলেন।" (জীবনবেদ, প্রকাশিত ১৮৮৩ খ্রীঃ)। বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্য—"যাইতে যাইতে সহসা তাঁহার গতিরোধ হইল। সেই পথিপার্শ্বে কলনাদিনী তরঙ্গিনীর কূলে, গগনভ্রষ্ট নক্ষত্রের ন্যায়, কাদম্বিনীচ্যুত বিদ্যুতের ন্যায়, দীপ্ত স্ত্রীমূর্তি শয়ান দেখিলেন।" (আনন্দমঠ, প্রকশিত ১৮৮২ খ্রীঃ)।

### কেশবচন্দ্র সেনের সাহিত্যপ্রীতির উন্মেষ

প্রধানতঃ ধর্মপ্রচার, ধর্মব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে কেশবচন্দ্র ইংরেজি ও বাঙলা রচনায় ব্রতী হন। কেশবচন্দ্র সেনের ইংরেজি বক্তৃতা ও নিবন্ধাবলী তাঁর প্রথমশ্রেণীর পাণ্ডিত্য ও সাহিত্যকীর্তি প্রমাণ করেছে; কিন্তু বাঙলা ভাষায় যে বক্তৃতা ও উপদেশাবলী রয়েছে তার মূল্য কিছু কম নয়। সাহিত্যের প্রতি তাঁর আকর্ষণ শৈশবে বার বার নানাভাবে প্রকাশিত হয়েছে। কীর্তন, কথকতা, যাত্রা শৈশবে তাঁর খুব প্রিয় বিষয় ছিল। এমন কি বালক-বয়সে বন্ধুদের নিয়ে একবার রামযাত্রা অভিনয় করেন।[১] "তিনি ছেলেবেলায় অনেক রকম খেলিতেন, যাহা দেখিতেন, তাহাই নকল করিয়া খেলিতেন। কত বাজি করিতেন, যাত্রা করিতেন, কখন বা গুরুমহাশয় হইয়া ছেলেদের শিক্ষা দিতেন।"[২] শৈশবের খেলার মধ্য দিয়েই মানুষ পরিণত ব্যক্তিত্বের ইংগিত

---

১. He took great pleasure in making up jatras, the popular semi-theatrical performances of Bengal. He was specially fond of Ram Jatra, representing scenes from the Ramayana, dressing up servants as soldiers and singing out of a dilapidated treatise composed by wellknown popular poet. —P. C. Mazoomdar, Life & Teachings of Keshub Chunder Sen, p. 57.

২. শ্রীযোগেন্দ্রলাল খাস্তগীর-সম্পাদিত কেশবজননী সারদাসুন্দরী দেবীর আত্মকথা, পৃ. ৬৭।

রেখে যায়। কেশবচন্দ্র একদিকে জাতির শিক্ষক অপরদিকে বঙ্গসাহিত্যেব অন্যতম প্রধান গদ্যকার, রূপকার। প্রকৃতপক্ষে, গরিফার যে সেন-পরিবারে কেশবচন্দ্রের জন্ম সে পরিবারে স্বতঃই একটি সাহিত্য ও সংস্কৃতির পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল। সাহিত্য ও সংস্কৃতির এক শালীন সুন্দব পরিবেশে কেশবের বাল্য অতিক্রান্ত হয়। বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দেওয়ান রামকমল সেন তাঁর পিতামহ। তাঁর অর্জিত অর্থের প্রাচুর্য গৃহকে করেছিল সুখী ও সুন্দর। নিজে নিষ্ঠাবান দানশীল ভক্ত। উনবিংশ শতাব্দীব প্রথম পাদে স্বদেশের উন্নতিকল্পে শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক যতসব প্রচেষ্টা হয় প্রায় প্রত্যেকটির সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। হিন্দুকলেজ (১৮১৭) ও কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটিব (১৮১৮) সঙ্গে তাঁর দীর্ঘকালের যোগ ছিল। সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠাবধি (১৮২৪) হিসেবপত্র রক্ষার দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত হয়। মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার সময় (১৮৩৪) লর্ড উইলিয়ম বেন্টিক যে পাঁচজনকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেন রামকমল সেন তার মধ্যে একমাত্র ভারতীয় সদস্য ছিলেন। ১৮২৯ সালের প্রারম্ভে বামকমল সেন বয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির অন্যতম সদস্য মনোনীত হন।[১] "প্রতিষ্ঠাবধি, এশিয়াটিক সোসাইটির সভ্যগণ প্রাচ্যবিদ্যা, ভাষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও পুবাতত্ত্বের আলোচনায় লিপ্ত হন। স্যর উইলিয়ম জোন্স, চার্লস উইলকিনস্, নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড, হেনরি টমাস, কোলব্রুক, জন হার্বার্ট হ্যারিংটন, উইলিয়ম কেরী-প্রমুখ ব্যক্তিরা সদস্য ছিলেন।"[২] প্রকৃতপক্ষে উল্লেখিত প্রাচ্য-বিদ্যাবিদগণ ও মনীষীগণেব সংস্পর্শে রামকমল সেনের জ্ঞানের ও কৃষ্টির পরিমণ্ডল বৃদ্ধি পেয়েছিল।

বাংলা, ইংরেজি, সংস্কৃত ও ফারসি ভাষায় তিনি ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তাঁর প্রণীত ইংরেজি-বাংলা 'অভিধান' (প্রথম খণ্ড ৫৪২ পৃষ্ঠা ও দ্বিতীয় খণ্ড ৫৬০ পৃষ্ঠায় রচিত) তাঁব শ্রেষ্ঠ কীর্তি। ১৮৩৪ খ্রীঃ এই অভিধানটি তিনি শেষ করেন। শিক্ষাবিস্তারের ব্যাপারে রামকমল সেনের খ্যাতি এত বিস্তৃত হয়েছিল যে 'ডভেটন কলেজ' সমিতি যখন স্থির করলেন এদেশীয় ইংরেজদের

---

১. সমাচার দর্পণ (২১শে মার্চ—১৮২৯ খ্রীঃ) "আসিয়াটিক সোসাইটির শেষ বৈঠকেতে শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত বাবু রাকমমল সেন ও শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দাস ও শ্রীযুক্ত বাবু রসময় দত্ত ঐ সোসাইটির অন্তঃপাতী, হইয়াছিলেন।"—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংবাদ-পত্রের সেকালের কথা, ১ম খণ্ড. ৩য় সংস্করণ, পৃ. ২১৭। ২. শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, কলিকাতার সংস্কৃতিকেন্দ্র, পৃ. ৪।

প্রথাবদ্ধভাবে বাংলা শেখানো উচিত তখন তাঁরা রামকমল সেনের শরণাপন্ন হন। এবং ঐ উদ্দেশ্যেই তিনি অভিধানটি রচনা করেন। শ্রীরামপুর মিশনের প্রতিষ্ঠাতা অভিধানটি দেখে মুগ্ধ হন। 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় ম্যার্শম্যান রামকমল সেনের প্রশস্তি কীর্তন করে তাঁর পরিশ্রমের ও উৎসাহের পূর্ণ মর্যাদা দেন।

রামকমল সেন ছিলেন সাহিত্যসেবী। পাঠ্যপুস্তকের অভাব দূরীকরণের জন্য তিনি পুস্তক রচনায় উদ্যোগী হন। নীতিকথা ১ম ভাগে (১৮১৮ খ্রীঃ) ইংরেজি ও ফারসি পুস্তক থেকে ১৩১টি কাহিনী অনুবাদ করা হয়েছে। রাধাকান্ত দেব ও তারিণীচরণ মিত্র এ কাজে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। 'হিতোপদেশ' তাঁর অপর একখানি গ্রন্থ। 'ঔষধসারসংগ্রহ'—চিকিৎসাবিদ্যা-সংক্রান্ত এই গ্রন্থটি ইংরেজি থেকে অনুবাদ।

রামমোহন, রামকমল সেন ও রাজা রাধাকান্ত দেব, এঁরা একসঙ্গে জীবন শুরু করেন। রামমোহনের সঙ্গে কর্মে ও ধ্যানে রামকমল ও রাধাকান্ত দেবের কিছু মতপার্থক্য থাকলেও এঁরাই ছিলেন নব্যবঙ্গের প্রতিষ্ঠাতা। কেশবচন্দ্র সেনের পিতামহ সাহিত্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাষ্ট্রচিন্তা, চিকিৎসা-বিদ্যা, বিজ্ঞানসাধনা প্রতিটি বিষয়ের প্রতি সমানভাবে নজর দিয়েছেন। উন্নতির হোমযজ্ঞে তিনি কর্মের অগ্নি জ্বালিয়ে রেখেছিলেন। কেশবচন্দ্রের বয়স যখন পাঁচ তখন রামকমলের মৃত্যু হয়।[১] রামকমল শিশু কেশব সম্পর্কে যে ভবিষ্যৎ-বাণী করে যান তা সত্য হয়েছে। কেশবচন্দ্রের জন্মের পর তিনি কেশবজননী সারদাসুন্দরী দেবীকে বলেছিলেন—"· আমার মতন হইবে। ইহাকে দিয়া তোমার খুব সুখ হইবে।"[২] · কেশবচন্দ্রকে আদর করে রামকমল সেন 'বিশু' বলে ডাকতেন। তিনি মৃত্যুর পূর্বে প্যারীমোহনকে বলেন "Peary ! Your son Bisu is destined to be a great man—a religious reformer"[৩] কেশবের পাঁচ বৎসর বয়সে রামকমল সেন তাঁকে এক ছড়া তুলসীর মালাসহ হরিনাম দিয়েছিলেন।[৪] কেশবচন্দ্র সারা জীবন এই হরিনাম সম্বল করে গেছেন। এমন কি ব্রাহ্মসমাজে

১. P. C. Mazoomdar, The Life & Teachings of Keshub Chunder Sen, পৃ. ৪৯। ২. শ্রীযোগেন্দ্রলাল খাস্তগীর-সম্পাদিত কেশবজননী সারদাসুন্দরী দেবীর আত্মকথা পৃ. ৭০। ৩. Peary Chand Mitra, Life of Dewan Ramcomul Sen, পৃ. ৮৮। ৪. শ্রীযোগেন্দ্রলাল খাস্তগীর-সম্পাদিত সারদাসুন্দরী দেবীর আত্মকথা, পৃ. ৭০।

যোগ দেওয়ার পরেও হরিনামের দ্বারা ব্রাহ্মধর্মের নীরসতার মধ্যে মাধুর্য আনেন।[১]

শুধু পিতামহ নয়, পিতা প্যারীমোহন সেনের চৌত্রিশ বৎসর বয়সে অকাল মৃত্যু ঘটে, কিন্তু জীবনের এই স্বল্প পরিসরেও তিনি কৃষ্টি ও সাহিত্য-প্রীতির পরিচয় রেখে গেছেন। "তিনি হিন্দু কলেজে পরীক্ষা দিয়া মেডেল পাইয়াছিলেন। ইংরাজী, বাঙ্গালা সংস্কৃত ও ফার্সিতে তিনি অতি পণ্ডিত ছিলেন। গানবাজনাতে তাঁহার খুব দখল ছিল। হারমোনিয়াম, এসরাজ, পাখোয়াজ ইত্যাদি অতি সুন্দর বাজাইতেন। অধিকসময় বিশেষতঃ কুঠি হইতে আসিয়া সেতার লইয়া থাকিতেন। তিনি অতি সুন্দর ছবি আঁকিতে পারিতেন।"[২] শুধু তাই নয় তিনি গৃহে আপন স্ত্রীকে শিক্ষিত করে তুলবার দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করেছিলেন। "অন্যত্র শিখিবার কোনও সুবিধা ছিল না বলিয়া তিনি নিজেই আমায় রাত্রিতে পড়াইতেন।"[৩] কেশব সেনের মা সারদাসুন্দরী দেবী গ্রামের মেয়ে হলেও উদার ভক্তিপ্রাণা ও কৃষ্টিসম্পন্না মহিলা ছিলেন। শৈশবে বাড়ির এই পরিবেশে কেশবচন্দ্রের অন্তরে ছোটবেলা থেকে সাহিত্য ও সৌন্দর্য, কলা ও কৃষ্টি দানা বেঁধেছিল। সাহিত্য-সেবা, সমাজ-সেবা, ন্যায়, নীতি, কৃষ্টি ও কলা, এইগুলি যেন খানিকটা কেশবচন্দ্রের জন্মসূত্রে পাওয়া।

দ্বাদশ বৎসর বয়সে কেশবচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের চর্চায় বিশেষ মনোযোগ দেখান। ভার্নাকুলার বাঙলায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। ১৮৫১-৫২ খ্রীষ্টাব্দের সরকারি শিক্ষা রিপোর্টে হিন্দু কলেজ অধ্যায়ে স্কুল-বিভাগের সার্টিফিকেট এবং পুরস্কার প্রাপ্ত সিনিয়র ও জুনিয়র ছাত্রদের একটি ফিরিস্তি আছে। ইহাতেই কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে এই তথ্যটি আমরা পাই—[৪]

Senior School Department.

Second Class

Keshub Chunder Sen .. Vernacular.

---

১. প্রতাপচন্দ্র মজুমদার তাঁর কেশবচন্দ্রের জীবনী গ্রন্থে পরম বৈষ্ণব রামকমল সেনের সঙ্গীত রচনার কথা উল্লেখ করেছেন। বাঙলাতে লেখা রামকমল সেনের কয়েকটি প্রার্থনা গীতির পাণ্ডুলিপি তিনি উদ্ধার করেন। প্রভাতে, সন্ধ্যায় এই গীতগুলি গাইবার উপযুক্ত। ২. শ্রীযোগেন্দ্রলাল খাস্তগীর-সম্পাদিত সারদাসুন্দরী দেবীর আত্মকথা, পৃ. ২১। ৩. তদেব, পৃ. ১৩। ৪. যোগেশচন্দ্র বাগল, সাহিত্যসাধক চরিতমালা, কেশবচন্দ্র সেন, পৃ. ১১।

কেশবচন্দ্র সেন নানা বিষয়ে একনিষ্ঠ পাঠক ছিলেন। ইতিহাস, দর্শন, ধর্মশাস্ত্রের আমগ্ন পাঠের সঙ্গে সাহিত্যও বাদ পড়তো না। বিশেষতঃ হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজের অধ্যক্ষ ডি. এল. রিচার্ডসনের শিক্ষকতার গুণে কেশবচন্দ্রের অন্তরে সেক্সপীয়রের প্রতি অনুরাগ জাগে। একদিকে জে. ই. ডি. মোরেল, ম্যাকোস, থিয়োডোব পার্কার, মিস কবের জ্ঞানগর্ভ রচনাবলী অপরদিকে সেক্সপীয়র, মিল্টন, বেকন, ইয়ং-এর কাব্য তাঁর জ্ঞানান্বেষণী প্রজ্ঞাকে ও সাহিত্যরসিক অন্তবকে একযোগে তৃপ্তি দিত।

ইংরেজি ও বাঙলা বচনায় কেশবচন্দ্র সেন সমান পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু এ যুগে তাঁর রচনার কিছু নিদর্শন নেই। এ যুগে শুধু উন্মেষের ইঙ্গিত, এটি সূচনাপর্ব—১৮৫৭ খ্রীঃ স্থাপিত হয় 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি'—সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ের অনুশীলন করাই এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। এর সভাপতি ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের বিজ্ঞান শাস্ত্রের অধ্যাপক ডক্টর এইচ. হেলিউব আর ছাত্র-উদ্যোগীদের প্রধান ছিলেন কেশবচন্দ্র সেন। সমসাময়িক কালের বিখ্যাত বেথুন সোসাইটি ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বার্ষিক বিবরণে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি সম্পর্কে মন্তব্য করেন, "The (Bethune) Society has much pleasure in recording that its example has been followed by some of the distinguished students of the Presidency College who have established an Association for the purpose of discussing literary and scientific subjects and it is sincerely hoped it may live long and increase in usefulness."[১]

"কেশবচন্দ্র সেক্সপীয়র পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিবার লোক নহেন, তিনি সেক্সপীয়র অভিনয় করিতে উদ্যোগী হইলেন। তাঁহার সঙ্গীগণকে লইয়া তিনি আপনি হ্যামলেট সাজিয়া হ্যামলেটের অভিনয় করিলেন।[২]" হ্যামলেটের ভূমিকায় ছিলেন কেশবচন্দ্র।[৩] প্রতাপ মজুমদার লিয়ারটেজ এবং নরেন্দ্রনাথ সেন 'ওফেলিয়া'র অভিনয় করেন। সাজ-সরঞ্জাম, রঙ্গমঞ্চ ও অভিনয়নৈপুণ্যে এটি একটি পরিপূর্ণ নাটকাভিনয়ের মর্যাদা পেয়েছিল। সময়টি ছিল

১, The Bengal Harkura, January 22, 1858, ২. উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়, আচার্য কেশবচন্দ্র, (১ম খণ্ড) শতবার্ষিকী সংস্করণ, পৃ. ৫৯। ৩. 'নাট্যাভিনয়ে তিনি সুদক্ষ ছিলেন।' অল্পবয়সে তিনি সেক্সপীয়রের কোন কোন গল্প অভিনয় করিতেন। নিজে হ্যামলেট সাজিয়াছিলেন।'—সুনীতি দেবী, শিশু-কেশব, পৃ. ১৫।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ। এই বছরটি নাট্যমঞ্চের ও নাটকের ইতিহাসে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বেলগাছিয়া নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা হয়। ১৮৫৮ খ্রীঃ ৩১শে জুলাই বেলগাছিয়া মঞ্চে রামনারায়ণ তর্কালঙ্কার-অনুদিত 'রত্নাবলী' নাটক দেখেই মধুসূদন বাঙলা নাটক-রচনায় অনুপ্রেরণা পান; সেটি নিশ্চয়ই বাঙলা সাহিত্যের পক্ষে স্মরণীয় ব্যাপার। এঁরা আরও একটা নাটক অভিনয় করেছিলেন। এঁরা ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে মুরলীধর সেন ও কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা বিবাহ নাটক' অভিনয় করেন। এই নাটকটি দুইবার ( ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল ও ৭ই মে ) সার্থকভাবে সুঅভিনীত হয়। মেট্রোপলিটান কলেজ প্রাঙ্গণে এটি অভিনীত হয়, বিদ্যাসাগর এই নাটকের দর্শক ছিলেন। নাটকটির অভিনয় এত বাস্তববাদী হয়েছিল যে, বিদ্যাসাগর অভিনয় দেখে কেঁদেছিলেন। শুধু বিদ্যাসাগর কেন, দর্শকদের মধ্যে অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন—তাঁদের সকলের চোখেই ছিল জল। এই নাটকে কেশবচন্দ্র সেন ছিলেন রঙ্গমঞ্চাধ্যক্ষ। নাটকটির সার্থকতার পিছনে কেশবচন্দ্র সেনের অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম লক্ষণীয়।[১] এই নাটকের সফল অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় সপ্রশংসিত সমালোচনা প্রকশিত হয়—

"সম্প্রতি মুরলীধর সেন স্বীয় বন্ধুবর্গ সহযোগে পূর্বতন মেট্রোপলিটান কলেজ বাটীতে এক সুরম্য রঙ্গভূমি স্থাপিত করিয়া কয়েকবার যেরূপ শ্রবণ মনোহর ও গোচর সুখকর অভিনয় প্রকাশ করিয়াছেন বোধ হয় বাঙালা ভাষায় এরূপ সর্বাঙ্গ সুন্দর অভিনয় আর কদাপি হয় নাই। সুদক্ষ কুশীলব মহাশয়েরা অতি সুচারুরূপে অভিনয় করিয়াছেন। আর ঘটনাস্থলের প্রতিকৃতির অধিকাংশই এরূপ চিত্তচমৎকারিণী ও মনোহারিণী হইয়াছে যে তাহা দেখিলে স্বরূপ ঘটনাস্থলই বোধ হয়, রঙ্গস্থলের কাল্পনিক কাব্য বোধ হয় না। অধিক কি কহিব, দর্শক মাত্রেই মুক্তকণ্ঠে এই অভিনয়ের সর্বাঙ্গীণ প্রশংসা করিয়াছেন।"[২] কাজেই দেখা যাচ্ছে বাঙলা নাটকের ইতিহাসে এই নাটকটির অভিনয় একটা সবিশেষ মূল্য পাওয়ার যোগ্য। কারণ, নাটকের যে গুণগুলি থাকা আবশ্যক—দৃশ্যগুণ ও কাব্যগুণ উভয়ই এই নাটকে আছে।

---

১. প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, Life & Teachings of Keshub Chunder Sen. প. ৭৫, ৭৬।

২. সংবাদ প্রভাকর, ১৪ই মে, ১৮৫৯ খ্রীঃ।

'শ্রবণ মনোহর ও গোচর সুখকর অভিনয় বাস্তবগুণের দ্বারা সমৃদ্ধ। এইজন্যই তৎকালীন বিদ্যাসাগরের ন্যায় দর্শকও নাটকটি দেখে আনন্দ পেয়েছিলেন। এই নাটকের পরিচালক ও মঞ্চাধ্যক্ষ কেশবচন্দ্র সেনের সাহিত্যবোধের পরিচয় বহন করে এই নাটকের সার্থক অভিনয়। একটি নাটক যে শ্রব্যগুণ ও বাস্তবতার মিশ্রণে সার্থক হয়ে ওঠে সে বিষয়ে কেশবচন্দ্র সেন সবিশেষ জ্ঞাত ছিলেন বলেই নাটকের সেই প্রত্যূষ-পর্বে অভিনয়ে ভারসাম্য ও পরিমিতি রক্ষা করা সম্ভব হয়েছিল।

উনিশ শতকে যে ক'জন সাহিত্যিক ইংরেজি ভাষায় সুপণ্ডিত ও পারদর্শী হয়েও বাঙলা ভাষার উন্নতিকল্পে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন কেশবচন্দ্র সেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। বাল্যাবধি তাঁর ইংরেজি সাহিত্যের ও কাব্যের প্রতি অনুরাগ ও ইংরেজি ভাষায় অসাধারণ বাগ্মিতা[১] সত্ত্বেও তিনি বঙ্গভাষাকেই সাদরে শ্রদ্ধা জানালেন, কারণ সুগভীর স্বদেশপ্রেমই বঙ্গভাষার প্রতি তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। তিনি ( ইংলণ্ড থেকে প্রত্যাগমনের প্রাক্কালে একটি ইংরেজি বক্তৃতায় ) নিজেই বলেছেন, "আমি আমার স্বদেশকে যেন ক্রমশই আরও বেশী ভালবাসছি, ইংরেজের স্বাদেশিকতা আমার অন্তরে স্বদেশপ্রেম প্রোজ্জ্বলিত করে তুলছে।" বঙ্কিমচন্দ্র যেমন স্বদেশকে ভালবেসে মাতৃভাষাকে একান্ত করে জেনেছিলেন, তাঁর সমস্ত শিক্ষিত প্রচেষ্টা বাঙলা ভাষার উন্নতির কাজে নিযুক্ত করেছিলেন, সেই যুগের আর এক যুগন্ধর পুরুষ কেশবচন্দ্র সেনেরও স্বদেশানুরাগ তাঁকে মাতৃভাষার সেবায় নিয়োজিত করেছিল। মাতৃভাষার অবমাননা তিনি সহ্য করতে পারতেন না। ইংরেজদের আগমনের পর বিদেশীদের ব্যবহারে বঙ্গভাষার যে বিভিন্ন বিকৃত রূপান্তর ঘটছিল কেশবচন্দ্র সেন তাকে বঙ্গভাষা সাধনায় বিরাট ত্রুটি বলে মনে করেছেন। "দেখ বাঙ্গালা ভাষা না কয় কে, না জানে কে, না লেখে

---

১, এই ব্যাপারে একটি গল্প প্রচলিত আছে। বিলেতে তাঁর চিত্তচমৎকারী বক্তৃতা শুনে অনেকেই মনে করতেন যে তিনি আগে থেকে বক্তৃতার বিষয়টি লিখে মুখস্থ করে নেন। এইজন্য একবার ওদেশীয় ইংরেজরা ঠিক করলেন আগের থেকে বক্তৃতার বিষয় কেশবচন্দ্র সেনকে জানান হবে না। একদিন কেশবচন্দ্র বক্তৃতামঞ্চে উঠে দেখতে পেলেন—একটি ব্লাকবোর্ড ঢাকা অবস্থায় আছে। Black Board-এর পর্দাটি সরাবার পর দেখা গেল বোর্ডে 'O' লেখা আছে। এবং সেই শূন্যের উপরই তিনি প্রায় দেড় ঘণ্টা এক নাগাড়ে বক্তৃতা দিয়ে সকলকে মুগ্ধ করে করে দেন। ( Amiya Charan Banerjee, Brahmananda K. C. Sen, Studies in the Bengal Renaissance, p. 90 )

কে ?"—কিন্তু বঙ্গভাষার সুষ্ঠু সুন্দর রূপটি উচ্চারণভঙ্গী ও শিথিল অনুশীলনের ফলে যেভাবে বিকারগ্রস্ত ও অশ্রদ্ধার সামগ্রী হয়ে উঠছে কেশবচন্দ্র সেন তাতে গভীর অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন সর্বজনপ্রিয় 'সুলভ সমাচারে'র পাতায়। "যেমন গো-হত্যা, ব্রহ্ম-হত্যা, ভ্রূণ-হত্যা ইত্যাদির শাস্তি আছে তেমনি ভাষা-হত্যার কোন শাস্তি থাকা উচিত।"[১]

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে—'কলুটোলা ইভনিং স্কুল'টি খোলা হল। দরিদ্র ছাত্ররা যারা দিনের বেলায় বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত থাকে তাদের জন্যই সান্ধ্য বিদ্যালয়টি উন্মুক্ত রাখা হল। কেশবচন্দ্র সেন অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। শিক্ষাদানের মাধ্যম ছিল বাঙলা; যদিও কিছু কিছু ইংরেজীও শেখান হত।[২]

১৮৬২ খ্রীঃ 'কলিকাতা বিদ্যালয়' স্থাপিত হয়। ইহাতে দুটি বিভাগ ছিল—একটি কলেজ বিভাগ—সেখানে শিক্ষার মাধ্যম ছিল ইংরেজী। আর একটি বিভাগ—পাঠশালা; সেখানে ভার্নাকুলার বা বাঙলা ভাষা পড়ানোর কাজ সুরু হল। সেই যুগে বিদ্যালয়ে বাঙলাকে প্রধান একটি বিষয় হিসেবে পড়ানোর কাজ সুরু হয় কেশবচন্দ্রেরই দ্বারা। পরবর্তী কালে এই প্রচেষ্টাই আরও শক্তিশালী হয়ে উচ্চতর শিক্ষায়তনে ইংরেজীর পাশাপাশি বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যকে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে স্থান করে দিয়েছে।

১৮৬৬ খ্রীঃ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হওয়াব পবে তিনি ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের কিছু সংস্কার সাধন করেন। মাতৃভাষায় ব্রহ্মোপাসনা প্রবর্তন করেন। রামমোহন রায় থেকে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুবের কাল পর্যন্ত সংস্কৃতেই উপাসনা হত। এতদিন (দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত) উপাসনা পদ্ধতি ছিল বৈদিক ছাঁচে ঢালা, ব্রাহ্মণ ভিন্ন আচার্য হওয়া সম্ভব ছিল না, বেদ ভিন্ন উপাসনা হত না। কেশবচন্দ্রকে আচার্য পদে বরণ করায় ব্রহ্মোপাসনায় নতুন অধ্যায় আরম্ভ হল। এখন সংস্কৃতের স্থলে মাতৃভাষার ব্যবহার এবং শাস্ত্রের স্থলে অন্তরে পবিত্রাত্মার প্রেরণা, পারমার্থিকের সঙ্গে উন্নত জীবন এবং ব্রাহ্মণের স্থলে শুদ্ধতা ও ঐকান্তিকতা উপাসনাকে প্রাণের বস্তু করে তুলল। কেশবচন্দ্র সেন জানতেন স্বদেশী ভাষায় ভক্তের প্রাণের আকুতি বেশী পরিমাণে জাগিয়ে তোলা সম্ভব। তাই শুধু বাংলাতে বঙ্গ-

১. বাঙলা ভাষা, সুলভ সমাচার—১৮ই বৈশাখ, ১২৮০ সাল। ২. Protap Chunder Mazoomdar, Life & Teachings of Brahmananda Keshub, পৃ. 66

ভাষায় উপাসনার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য প্রদেশেও স্ব-স্ব প্রাদেশিক ভাষায় উপাসনার প্রচলন করলেন। ব্রাহ্মসমাজে ভক্তিভাবের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙলা কীর্তন ও নগরকীর্তন প্রবর্তিত হল। এ শুধু ভক্তি নয়, বাঙলা ভাষার প্রতি সুগভীর মমতাবশতই তিনি বাঙলার কীর্তনকে শ্রদ্ধা ও আভিজাত্য দান করলেন। এমন কি তিনি যখন ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে 'পদযাত্রায় বের হলেন ( ১৮৭২ খ্রীঃ ) তখন তাঁর প্রচারের মাধ্যম ছিল বাঙলা ; কারণ সাধারণ লোক মাতৃভাষাতেই সাড়া দেবে বেশী! পদযাত্রায় তিনি সমস্ত আকাশ-বাতাস মাতৃনামে মুখরিত করেন, "আমাদের প্রচারের মূলমন্ত্র মা। বঙ্গদেশের জননী, ভারতের জননী আমাদের জননী। সেই জননীর প্রেমে আমরা উন্মত্ত হইব। বসিব জননীর ক্রোড়ে, গাইব জননীর গুণ, মাথা রাখিব জননীর চরণতলে।"[১]

শিক্ষায়তনে মাতৃভাষার প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করার সচেতন প্রচেষ্টা তাঁকে তৎকালীন গর্ভনর জেনারেল ও ভাইসরয় লর্ড নর্থব্রুককে কয়েকটি পত্র লিখতে বাধ্য করেছিল। তিনি এ ব্যাপারে নর্থব্রুককে নয়টি চিঠি লিখেছিলেন। তার মধ্যে সাত সংখ্যক পত্রে আছে—"সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন না করেও বর্তমানের দেশীয় ভাষার মধ্য দিয়ে শিক্ষাকে বিস্তৃত করে দিতে হবে। এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে সমস্ত দেশবাসীকে জাগাবার কাজটি খুবই ব্যাপক ও কঠিন। তাই কয়েকজন যোগ্য পরিদর্শক নিযুক্ত করতে হবে। ভূদেব মুখোপাধ্যায়, প্যারীচরণ সরকার ও প্রসন্নকুমার ঠাকুরের মত মাতৃভাষায় সুপণ্ডিত ব্যক্তিগণকেই একাজে নিয়োগ করা সমুচিত হবে।"[২] কেশবচন্দ্র সেন মাতৃভাষার ব্যাপক প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে গণশিক্ষারও বিস্তৃতি ঘটবে বলে আশা করেছিলেন। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত লিখেছেন "কেশবচন্দ্র মাতৃভাষার একনিষ্ঠ সেবক ও সুলেখক ছিলেন, এজন্যই তিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন যে, মাতৃভাষাই আমাদের শিক্ষার বাহন হওয়া কর্তব্য। এজন্যই তিনি বলিয়াছিলেন মুদ্রাযন্ত্র হইতে

---

১. কেশবচন্দ্র সেন, আচার্যের উপদেশ, দশম খণ্ড, পৃ. ৫০।

[ পরবর্তীকালে রচিত ( ১৮৮২ খ্রীঃ ) বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠে দেশজননীর মাতৃকামূর্তি আরও স্পষ্টভাবে অঙ্কন করা হয়। অবশ্য এর সূত্রপাত ঘটে কমলাকান্তের দপ্তরের "আমার দুর্গোৎসব'-এ ( ১৮৭৫ খ্রীঃ ]। কেশবচন্দ্রের সুগভীর স্বদেশপ্রাণতা জগজ্জননীর মাঝেই দেশজননীর প্রতিচ্ছায়া দেখেছে।) ২. লর্ড নর্থব্রুককে লেখা চিঠির ভাবানুবাদ, ৭নং পত্র। ১৮৭২ খ্রীঃ।

আজকাল সাহিত্য, ইতিহাস ও বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তকসকল প্রকাশিত হইতেছে কিন্তু এই সমুদায় পুস্তকাদি মাতৃভাষায় প্রকাশিত হওয়া উচিত।"[১]

কেশবচন্দ্র সেনের মাতৃভাষার প্রতি অকুণ্ঠ অনুরাগ আর একটি সামান্য ঘটনায় অসামান্যতা লাভ করে আছে। মিস্ সোফিয়া ডবসন কলেট, যিনি এদেশে এসে রামমোহন ও ব্রাহ্মধর্মের অনুরাগী হয়েছিলেন ও এই ব্যাপারে একাধিক প্রামাণ্য গ্রন্থ লিখে অমর হয়েছেন, সেই ইংরেজ ভদ্রমহিলাকে তিনি একটি পুস্তক উপহার দেন। গ্রন্থটিতে স্বহস্তে বাঙলা ভাষাতেই উপহার-লিপি লেখেন।

যিনি ইংবেজী ভাষায় সুশিক্ষিত, যিনি বিদেশীদের সঙ্গে নানাবিধ কাজে জড়িত, যিনি অনর্গল ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতায় পারদর্শী, তিনি যখন একজন ইংরেজ ভদ্রমহিলাকে গ্রন্থটি উপহার দিচ্ছেন তখন উপরে ইংরেজী ভাষায় নাম-স্বাক্ষবই স্বাভাবিক। কিন্তু কেশবচন্দ্র সেন বাঙলাতে লিখলেন। এই ঘটনাটি কেশবচন্দ্র সেনের বঙ্গভাষার প্রতি প্রীতির একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

কেশবচন্দ্র সেনেব বাঙলা রচনাবলী প্রধানতঃ ধর্মকে কেন্দ্র কবে। বক্তৃতা, উপদেশ, প্রার্থনা প্রধান বিষয় হলেও তাঁর সাহিত্যসেবার একটি বিশেষ দিক সাংবাদিকতা। তাছাড়া তাঁর আত্মজীবনী ও চিঠিপত্রের মধ্যে সাহিত্য এষণার পরিচয় আছে।

কেশবচন্দ্র সেনের সুবিস্তৃত গদ্য-কর্মকে কয়েকটি পর্যায়ে আলোচনা করা যায়।

আত্মজীবনীমূলক রচনা— জীবনবেদ ( জানুয়ারী, ১৮৮৩ খ্রীঃ )

ধর্মবিষয়ক রচনা—ক. আচার্যের উপদেশ (দশ খণ্ড, ১৮৬২ খ্রীঃ থেকে ১৮৮৩ খ্রীঃ পর্যন্ত প্রদত্ত উপদেশাবলী)। খ. আচার্যের প্রার্থনা (চার খণ্ড)। গ. বিধান ভগ্নী সঙ্ঘ ( ১৮৭২ থেকে ১৮৮২ খ্রীঃ পর্যন্ত প্রদত্ত উপদেশ)। ঘ. সেবকের নিবেদন ( পাঁচখণ্ড, ১৮৮০ খ্রীঃ থেকে ১৮৮৩ খ্রীঃ পর্যন্ত উপদেশাবলী)। ঙ. সাধু সমাগম ( ১৮৮৭ খ্রীঃ)। চ. ব্রহ্মগীতোপনিষদ, ( ১৮৮৭ খ্রীঃ)। ছ. মাঘোৎসব ( ১৮৮৮ খ্রীঃ)। জ. নবসংহিতা ( ইংরেজী হইতে অনূদিত)।

আত্ম-উদ্‌ঘাটনমূলক রচনা—চিঠিপত্র

---

১. যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, কেশবচন্দ্র ও বাঙ্গলা সাহিত্য প. ১১২।

ডায়েরি জাতীয় রচনা—ক. সঙ্গত (২ খণ্ড)। খ. অধিবেশন। গ. প্রচারকগণের সভার নির্ধারণ।

সাংবাদিকতা—ইংরেজি পত্রিকা—১. ইণ্ডিয়ান মিরর (১৮৬১ খ্রীঃ)। ২. দি সানডে মিরর (১৮৭৩ খ্রীঃ)। ৩. দি নিউ ডিসপেনসেশন (১৮৮১)। ৪. দি লিবারেল (১৮৮২)।

বাঙলা পত্রিকা—১. বামাবোধিনী পত্রিকা (১৮৬৩)। ২. ধর্মতত্ত্ব (১৮৭০)। ৩. সুলভ সমাচার (১৮৭০)। ৪. মদ না গরল (১৮৭১)। ৫. ধর্মসাধন (১৮৭২)। ৬. বালকবন্ধু (১৮৭৮)। ৭. পরিচারিকা (১৮৭৮)। ৮. বিষ বৈরী (১৮৮০)।

আত্মজীবনীমূলক রচনা: জীবনবেদ (জানু. ১৮৮৩)।

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে পুস্তকাকারে জীবনবেদ প্রকাশিত হল। কিন্তু ইতিপূর্বে ২৩শে জুলাই ১৮৮২ খ্রীঃ জীবনবেদের এক-এক অধ্যায় প্রায় প্রতি রবিবার 'ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে' উপদেশ আকারে বিবৃত হত। 'জীবনবেদে'র বিবৃতি শেষ হয় ২৪শে ডিসেম্বর ১৮৮২ খ্রীঃ। এই গ্রন্থটির প্রারম্ভে চিরাচরিত প্রথানুযায়ী 'ভূমিকা' অংশ সংযোজিত করার পরিবর্তে একটি উপদেশ ('জীবনগ্রন্থ' শিরোনামায়) আর একটি প্রার্থনা ('জীবনবেদ' শিরোনামায়) স্থান পেয়েছে। উক্ত উপদেশ ও প্রার্থনার মধ্যে জীবনবেদ-বিবৃতির প্রেরণা ও উৎসের সন্ধান আছে।

'জীবনবেদ' নামটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বেদের অর্থ পূর্ণজ্ঞান। সাধারণ লৌকিক বস্তুর জ্ঞান নয়, পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান। যে শাস্ত্র আমাদের মুক্তির পথ দেখায়, যে শাস্ত্র আমাদের পরমতত্ত্ব শিক্ষা দেয় তাই বেদ। কেশবচন্দ্র সেন মনে করেন জীবনই বেদ। যে জীবনে ঈশ্বরের মহিমা প্রকীর্তিত হচ্ছে, যে জীবন ঈশ্বরের কৃপাধন্য, তাই সবশ্রেষ্ঠ শাস্ত্র। "সকলগ্রন্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ জীবন। বিশ্বাসীর জীবন, সাধকের জীবন সর্বশ্রেষ্ঠ।" যোগী-ভক্ত কেশবচন্দ্র সেনের জীবন ঈশ্বরময়; তাঁরই প্রত্যাদেশে কেশবচন্দ্র সেনের জীবনের ইচ্ছা ও কর্ম আবর্তিত হচ্ছে। কাজেই সে জীবন বেদেরই সমপর্যায়ভুক্ত।

কেশবচন্দ্র সেন-প্রবর্তিত 'নববিধানে' কোন রকম শাস্ত্রগ্রন্থের আনুগত্যকে স্বীকার করা হয়নি। বেদ, পুরাণ কিংবা কোন শাস্ত্রগ্রন্থ নয়; একমাত্র

চলমান মানবজীবনই সত্য প্রচারের সহায়ক। 'নববিধান' ধর্ম জীবনে অনুধ্যান ও প্রত্যাদেশের মধ্য দিয়ে জীবন্ত ও সত্য হয়ে ওঠে। কাজেই প্রতিটি ভক্তের জীবন এক-একটি স্বতন্ত্র ধর্মপুস্তক। এই পুস্তক সমগ্র পৃথিবীতে হরিপ্রেমলীলা জীবন্ত আকারে প্রদর্শিত করবে ও সকলকে ধর্মশিক্ষা দেবে। 'সেবকের নিবেদনে' তিনি উপদেশ দানকালে বলেছেন, "জীবন্ত দৃষ্টান্ত লোকের চক্ষের সম্মুখে ধারণ করিতে হইবে—জীবনরূপ বেদ-বেদান্ত প্রস্তুত করিয়া মানুষের হাতে দিতে হইবে।...আমাদের প্রত্যেকের জীবন ঋগ্বেদ, আমাদের জীবনই শ্রেষ্ঠ পুরাণ।"[১] প্রাচীন শাস্ত্র ও পুরাণের ঈশ্বরমহিমা আমাদের আধুনিক মনকে যত-না ঈশ্বরমুখী করবে ততোধিক আমরা ঈশ্বরকে অনুভব করব বর্তমানের কোন ভক্তজীবনে ঈশ্বরকৃপার বিবরণ শুনে। ঈশ্বর কেমন জ্বলন্তভাবে অবিশ্বাস নিবারিত করছেন, ব্রহ্ম কার জীবনের কতটুকু উন্নতি করলেন ভক্ত জীবনীতে সবই উল্লেখ থাকবে। এভাবে ঈশ্বর শুধু গ্রন্থেরই ঈশ্বর থাকবেন না বা জড় শাস্ত্রেই তিনি নিবদ্ধ থাকবেন না; বরং জীবন-রূপ জীবন্ত বিধান, বর্ণিত ও চিত্রিত হয়ে পরমপুরুষের মাহাত্ম্য কীর্তন করবে। এই ভাবে ভাবিত হয়েই কেশবচন্দ্র সেন আত্মজীবনী রচনার অনুপ্রেরণা পান। "আমি বর্তমান শতাব্দীতে পৃথিবীর একটি ধর্মপুস্তক হইব, আমার চরিত্রে ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, বিনয়, নিরহংকারের দৃষ্টান্ত দেখাইব। আমাদিগের জীবনে গদ্যে-পদ্যে লিখিত প্রত্যাদেশ দেখাইতে হইবে। আমরা কতদূর নিরহংকারী বিনয়ী হইতে পারি, ঘোর বিপদে নিপতিত হইয়া ব্রহ্মের উপর একান্ত নির্ভর করিতে পারি, ইহার দৃষ্টান্ত জীবনপুস্তকে বিবৃত করিতে হইবে।"[২]

ভক্ত-প্রচারক কেশবচন্দ্র সেন ঈশ্বরমহিমা ঘোষণা করবার জন্যই আত্মজীবনী রচনা করেন। এটি সাধারণ মানুষের আত্মকথা নয়। এটি বেদ, এটি ভাগবতের মতই পুণ্যকথা। তাই লেখক বারবার বলেছেন 'জীবনবেদ'—'জীবন ভাগবত'[৩]। দৈনন্দিন জীবনের বাস্তবতা, সমাজ ও রাষ্ট্রের পরিপ্রেক্ষিতে যে মানুষকে আমরা দেখতে অভ্যস্ত সে মানব-ইতিহাস

---

১. 'জীবনগ্রন্থ', সেবকের নিবেদন, ২১শে নবেম্বর ১৮৮০ খ্রীঃ। ২. অবতরণিকা, জীবনবেদ, আচার্য কেশবচন্দ্র সেন. পৃ ।০-।/০। ৩. "জীবন ভাগবতের তৃতীয় পরিচ্ছেদ অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা", জীবনবেদ, পৃ. ১৭

এখানে বর্ণিত হয়নি। 'জীবনবেদ' রচনার উদ্দেশ্য কেশবচন্দ্র সেন নিজেই বর্ণনা করেছেন, "আমার 'জীবনবেদ' পড়িয়া পৃথিবী যেন তোমারই পাদপদ্মে প্রণত হয়, তোমারই প্রেম-ভক্তিতে প্রমত্ত হয়, কৃপা করিয়া তুমি এই আশীর্বাদ কর।"[১] তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনকথা 'জীবনবেদে'র বর্ণিত বিষয়। অধ্যাত্ম-জীবনের উন্মেষ, ক্রমবিকাশ ও পরিণতির এক অন্তরঙ্গ বর্ণনা এই গ্রন্থটিতে আমরা লাভ করি।

'জীবনবেদ' জীবনতত্ত্বের এক আশ্চর্য মহিমময় বর্ণনায় সমৃদ্ধ। শুধু তাই নয়; এই গ্রন্থটির ভাব ও ভাষা বাঙলা সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ। কেশবচন্দ্র সেনের জীবনী-প্রণয়নে এই গ্রন্থটির বিশেষ মূল্য আছে। আত্মদর্শন, আত্মবিচার ও আত্মোপলব্ধির মধ্য দিয়ে লেখক অগ্রসর হয়েছেন। যে কোন আত্মচরিতেরই বৈশিষ্ট্য তাই—আত্মমগ্ন হয়ে অতীতের দিকে দৃষ্টি ফেরানো ও নিরাসক্তভাবে আপনাকে দেখা। 'আত্মচরিতে' আপনাকে দেখা, আপনাকে জানার মধ্য দিয়ে লেখককে অগ্রসর হতে হয় বলে এ জাতীয় রচনায় লেখকের দৃষ্টি পুরোপুরি 'সাবজেকটিভ'। 'জীবনবেদে' অধ্যাত্ম-উপলব্ধির ক্রমবিকাশ বর্ণিত হয়েছে বলে এখানে লেখকের দৃষ্টি আরও বেশী অন্তর্মুখী। "ব্রহ্ম আমার ধন, ব্রহ্মই আমার বিদ্যা ও জ্ঞান, ব্রহ্মই আমার মান ও প্রতিপত্তি", বারবার এটি বোঝাবার জন্যই লেখক জীবনবেদের আশ্রয় নিয়েছেন। "বারম্বার ঈশ্বর দর্শন করিতেছি, তাঁহার বাণী শ্রবণ করিতেছি, এই সত্য, ইহাই বেদের কথা।"[২]

জীবনবেদের প্রথম কথা প্রার্থনা। তরুণ কেশবচন্দ্র সেন যখন ধর্মপথে দিশাহারা, "গির্জায় যাইব কি মস্‌জিদে যাইব, দেবালয়ে যাইব কি বৌদ্ধদিগের দলে যোগ দিব,"[৩] —এমন সময়েই তিনি প্রার্থনা অবলম্বন করলেন। বেদ, পুরাণ, কোরাণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যে প্রার্থনা, তাই তাঁর ধর্ম-জীবনের প্রধান অবলম্বন হল। এরপর তাঁর অন্তরে পাপবোধ প্রবল রূপে দেখা দিল। পাপবোধে বিবেক জাগ্রত হয়। অনুতাপের অনলে নিজেকে দগ্ধ করে হীরকস্বচ্ছ হৃদয় ভগবানকে উৎসর্গ করা যায়। কেশবচন্দ্র সেন প্রথম থেকেই নীতিগত বিশুদ্ধির দ্বারা চরিত্র গঠনের উপর জোর দিয়েছেন। খ্রীষ্টান পিউরিটানদের মতই পাপাগ্নিকে অন্তরে সজাগ রেখে নীতির উৎকর্ষ

১. জীবনবেদ, পৃ. ১৬০। ২. তদেব, পৃ. ১৫৪। ৩. তদেব, পৃ. ৩।

সাধনে মনোযোগ দিলেন। "পিউরিটানেরা যেমন ডায়েরি রাখতেন, নিজেদের দোষত্রুটি লিখতেন, ঈশ্বরের কাছে পাপের মার্জনা ভিক্ষা করতেন, ব্রাহ্মসমাজের ভক্তেরা প্রধানতঃ কেশবচন্দ্র সেনের যোগদানের পর থেকে দিনলিপি রাখা—নিজেদের বাসনা ভাবনাকে, পাপপুণ্য চিন্তাকে নিয়মিত লিপিবদ্ধ করাকে অবশ্য পালনীয় কর্তব্য বলে স্বীকার করেছিলেন। খ্রীষ্টান সাধকদের 'কনফেশন' ( Confession ) পর্যায়ের রচনা ( যেমন Confessions of St. Augustine ) ব্রাহ্মভক্তদের আত্মজীবনী রচনার প্রেরণা যুগিয়েছিল।"[১] কেশবচন্দ্র সেনের আত্মচরিতমূলক রচনা জীবনবেদে 'পাপবোধ' বিস্তারিত ভাবে দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। "আমার কেবলই পাপ, অন্যের যাহা পাপ, আমার নিকট তাহা পাঁচটা পাপ।" পাপপুণ্য অনুভূতিগুলি আপেক্ষিক। কেশবচন্দ্র সেনের সূক্ষ্ম ও অত্যন্ত সচেতন কোমল হৃদয় সহজেই পাপ-ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। যদি কাউকে কখনও কটুবাক্য বলেন তাতেও তিনি অনুতপ্ত। কারণ "কেবল সত্যবাদী হইবার জন্য তো অনুরুদ্ধ নই, অমৃতভাষী হইবার জন্যও অনুরুদ্ধ।"[২]

এরপর দীক্ষা—অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা। বাল্যকালাবধি কেশবচন্দ্র সেন অগ্নিমন্ত্রের উপাসক, অগ্নিমন্ত্রেরই পক্ষপাতী। অধ্যাত্মরাজ্যে তিনি স্বচ্ছন্দ বিচরণ করেছেন, যোগ ও ভক্তির মধ্যে আপনাকে বিলীন করে দিয়েছেন, কিন্তু কখনই তিনি শীতলতাকে স্থবিরত্বকে প্রশ্রয় দেননি। অন্তরে সাধনা ও ঋদ্ধির হোমাগ্নিকে চিরকাল প্রজ্বলিত রেখেছেন। তিনি মনে করেন, "ধর্মজীবনেও উত্তাপ না থাকিলে মৃত্যু।...অগ্নির ভিতরে জীবন থাকে বলিয়াই অগ্নিকে আমি বরণ করি, আলিঙ্গন করি ও অত্যন্ত ভালবাসিয়া থাকি।"[৩] কেশবচন্দ্র সেনের জীবনে যোগ, ভক্তি, কর্ম, জ্ঞানের অপূর্ব সম্মিলন হয়েছিল—তাঁর সমগ্র জীবনে প্রতিটি ধারায় এই অগ্নির তেজ ও দীপ্তি লক্ষ্য করেছি আমরা। যৌবনে ও প্রৌঢ় বয়সে বারবার ভারতীয় তরুণদের প্রাণে এই অগ্নিমন্ত্রকে সঞ্চারিত করতে চেষ্টা করেছেন তাঁর তেজোপূর্ণ তেজস্বী বক্তৃতার দ্বারা। তিনি অগ্নিমন্ত্রের দ্বারা নবজীবন সৃষ্টির কাজে আপনাকে উৎসর্গ করেছিলেন। "জাতীয় জীবন-যজ্ঞে প্রথম অগ্ন্যাধান করিয়াছিলেন

১. দেবীপদ ভট্টাচার্য, বাংলা চরিত-সাহিত্য, পৃ. ১৪৯। ২. জীবনবেদ, পৃ. ১৫। ৩. তদেব, পৃ. ১৯।

কেশব। তাঁহার প্রচার-ধর্মের অপূর্ব উন্মাদনা, নূতন ভাবচিন্তাকে বাহিরের আচার-অনুষ্ঠানে রূপ দিবার আশ্চর্য সৃজনীশক্তি, এবং সর্বোপরি তাঁহার ব্যক্তিত্ব কেশব-বিরোধী সম্প্রদায়কেও অনুপ্রাণিত করিয়াছে তাঁহার কর্মপদ্ধতি কত কর্মীকে পথ দেখাইয়াছে!"[১] যে অগ্নিমন্ত্রের দীক্ষার কথা কেশব তাঁর 'জীবনবেদে' উল্লেখ করেছেন পরবর্তীকালে সেটি বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের কর্ম ও প্রচারের মধ্যেও লক্ষ্য করা গেছে।

'জীবন ভাগবতে'র তৃতীয় অধ্যায়েই তাই তিনি অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছেন। এই অগ্নির ভাব নিয়ে তিনি সেবা করলেন, পরিশ্রম করলেন, ধ্যান ও সাধন করলেন। সমুদয় ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হলেন, কখনই তিনি শীতলতার কূপে নিমজ্জিত হয়ে প্রাণ হারালেন না। যেখানে অগ্নি প্রজ্বলিত, যে জীবন চলমান সেখানেই জীবনের প্রকৃত রূপটি ফুটে ওঠে আর যেখানে শীতলতা সেখানে মৃত্যু। বাঙালি জাতি সাধারণতঃ ভাবুক ও আবেগাত্মক। কিন্তু কেশবচন্দ্র সেনের সত্যপিপাসা ও বলিষ্ঠ ধর্মচেতনা সংহত ও সংযত ভাবে জাতীয় জীবনের সুদৃঢ় মেরুদণ্ড প্রস্তুত করল।

জীবনবেদের চতুর্থ পরিচ্ছেদ অরণ্যবাস ও বৈরাগ্য। চৌদ্দ বছর বয়সে তিনি মাছ খাওয়া পরিত্যাগ করেন। আঠারো বছর বয়সে ধর্মজীবনে প্রবেশ করেন। যৌবনের সমুদয় সুখ বিষের মত পরিত্যাগ করলেন। সংসারের প্রতি ভয় জন্মাল—বিবাহে অসম্মত ছিলেন। বিবাহের পর স্ত্রীর প্রতি আসক্তিকে পাপ বলে মনে করতে শুরু করেন। ক্রমে মৌনব্রত অবলম্বন করলেন। এই বৈরাগ্য তাঁর অন্তর-বৈরাগ্য; বাহ্যিক গেরুয়া বস্ত্র পরিধান কিংবা অরণ্যে পলায়ন করে সাধন-ভজন তিনি করেন নি; কিন্তু এই সংসারে থেকেই তিনি সংসারকে শ্মশান বলে মনে করেছেন। "যে বাড়ীতে ছিলাম সেই বাড়ীকে, যে ঘরে ছিলাম সেই ঘরকে শ্মশানের মত, বনের মত করিলাম।…আমার বন, সত্য বন ছিল না বটে, কিন্তু সংসারই আমার বন হইল।"[২] এইভাবে আত্মপীড়ন ও ভার্যাপীড়নের মধ্য দিয়ে তাঁর জীবনের প্রারম্ভকাল কেটেছে। দেবত্ব লাভ করার জন্য তিনি শ্মশানের সর্বশূন্যতার মধ্যে, কঠোরতার মধ্যে আপনাকে নিমগ্ন করেছিলেন। এবং বৈরাগ্যে আপাত-কঠোরতা নবজীবনের

১. মোহিতলাল মজুমদার, বাংলার নবযুগ, পৃ. ২৫৫-২৫৪। ২. জীবনবেদ, পৃ. ২৯।

সঞ্চার করল। জীবন-উদ্যানে ভক্তির আনন্দ-ফুল ফুটল। যে গৃহকে তিনি শ্মশান করেছিলেন সেই গৃহ স্বর্গীয় সাধুদের সম্মেলনের স্থল হল। যাদের তিনি পরিত্যাগ করেছিলেন সেই আত্মীয়, বন্ধু ও স্ত্রী তাঁর ধর্মপথের সহায়ক হলেন। নববিধান ধর্ম-প্রচারের জন্য কেশবচন্দ্র সেন একদল সর্বত্যাগী প্রচারক নিয়োগ করেছিলেন। আর শেষ জীবনে স্ত্রীকে ধর্মসাধনের সঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করেছিলেন।[১]

কেশবচন্দ্র সেন জীবনের পঞ্চম পর্যায়ে স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষা নিলেন। এই স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারের অধীন না হওয়া, অহংকারের অধীন না হওয়া; পৌত্তলিকতা, জাতিভেদ প্রভৃতি সংস্কার থেকে মুক্ত হওয়া; আসক্তির অধীনতা স্বীকার না করা; এইভাবে সার্বিক স্বাধীন মন্ত্রে নিজেকে দীক্ষিত করে ধর্মের পথে অগ্রসর হলেন। সমগ্র জীবনে তিনি স্বাধীনতার পুজো করেছেন বলেই অনেক সময় অনেকের সঙ্গে মতদ্বৈধ দেখা গেছে। আদি ব্রাহ্মসমাজ ও দেবেন্দ্রনাথের আদর্শের এই কারণেই মতবিরোধ ঘটেছে। জাতিভেদ-প্রথা ও সংকীর্ণতার গণ্ডী কাটিয়ে তিনি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেছিলেন। তাঁর এই স্বাধীন আত্মশক্তি সমগ্র ভারতের জনগণকে উদ্দীপিত করেছে। একদিকে গভীর বিশ্বাস, অপর দিকে চারিত্রিক বীর্য ও নৈতিক উৎসাহ সমগ্র ভারতে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে।

কেশবচন্দ্র সেনের ধর্মজীবনে বিবেক অত্যন্ত সজাগ। 'জীবনবেদে'র ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 'বিবেক'—বিবেকের অগ্নি হৃদয়ে প্রজ্বলিত রাখতে হবে, নৈতিক মান উন্নত করার জন্য সর্বদা বিবেককে সচেতন ও সজাগ রাখতে হবে। "জীববৃক্ষে দুটি পাখী, একটি ছোট পাখী—জীবাত্মা, আর একটি বড় পাখী পরমাত্মা। একটি বেদ-বেদান্ত বলে সূক্ষ্ম রসনায় হরি হরি বলে অপরটি স্থূল রসনায় অসার কথা বলে।"

---

১. "বিধান ঘোষণা করিবার কয়েকমাস পরে কেশবচন্দ্র নৈনিতাল পাহাড়ে গমন করেন। সেখানে থাকিবার সময় কখনও একাকী নির্জনে, কখনও পত্নীর সহিত শিলাতলে বসিয়া ধ্যান ও যোগ সাধন করিতেন। পত্নীকে পার্শ্বে বসাইয়া ব্যাঘ্রচর্মে উপবেশন করিয়া, হস্তে একতন্ত্রী লইয়া যে সময় সাধনে মগ্ন থাকিতেন, তখনকার দৃশ্যের ছবি দেখিলে, ভক্তিতে চিত্ত আপ্লুত হয়। এ সময়ে 'স্বামী আত্মা এবং স্ত্রী আত্মা' বিষয়ে এক প্রবন্ধ লেখেন। পরে সহধর্মিণীকে যোগের সঙ্গিনী করিয়া একত্রে সাধন করেন।"—যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, কেশবচন্দ্র ও বঙ্গ সাহিত্য, পৃ. ৭৮।

"জীবাত্মা আর পরমাত্মা এক বাটীতে গোলা।"[১] এ কারণেই তিনি নিজের অন্তর মধ্যে পরমপুরুষের অস্তিত্ব অনুভব করেন। তিনি যখন কথা বলেন তখন পরমাত্মাই বলেন। এবং অন্তরে ব্রহ্মবাণী শ্রবণ করেন। এই যে বিবেক, একে তিনি অন্তরের বাণী অর্থাৎ পরমাত্মারই বাণী বলে মনে করেন, "আমার ঈশ্বর! তুমি গাছের ভিতর, চন্দ্র সূর্যের ভিতর দেখা দিলে, আবার নীতি-বিজ্ঞানের মধ্যে দেখা দিলে। সে মনোবিজ্ঞান আমি মানি যাহাতে বলে, তুমি জগতের কৌশলে একজন রহিয়াছ, নীতিবিধির মধ্যে তুমি একজন থাকিয়া মানুষকে জাগাইয়া রাখিয়াছ। এ পৃথিবীতে না দেখিয়া যদি কখনও উদাসীন হই, অন্তরের বাণী কখনই নিদ্রা যাইতে দেয় না। একটি অন্যায় কর্মে প্রবৃত্ত হব হব মনে করিতেছি, অমনই ধাক্কা মারে। ঘরে থাকি, বাগানে যাই, বাহিরে যাই, দৈববাণী যেন কানে লাগিয়াই আছে।"[২] ভক্ত কেশব সেনের জীবনে এই বিবেক বা দৈববাণী কিংবা প্রত্যাদেশের গুরুত্ব অনেক; কারণ জীবনে প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি কর্ম-প্রচেষ্টা তিনি এই দৈবাদেশের বশবর্তী হয়ে করেছেন।[৩] তিনি অন্তরমধ্যে প্রার্থনার দ্বারা অভ্রান্ত সত্য দৈববাণী শ্রবণ করতেন। জীবনে কখনও ব্রহ্মবাণী কল্পনা করে তিনি কোথাও ভুল পথে চলেন নি।

জীবনবেদের সপ্তম পরিচ্ছেদ 'ভক্তিসঞ্চার'। তাঁর প্রথম জীবনে ছিল বিশ্বাস, বিবেক ও বৈরাগ্য; মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাই তাঁকে 'ব্রহ্মানন্দ' নামে ভূষিত করেন (১৮৬২ খ্রীঃ ২৩শে জানুয়ারী)। কিন্তু এই নামে তিনি তৃপ্ত হতে পারেন নি। কঠোর ভাব পরিত্যাগ করে কোমলতার দিকে তাঁর

---

১. জীবনবেদ, পৃ. ৫৬। ২. তদেব, পৃ. ৫৭। ৩. এমন কি 'কুচবিহার বিবাহ' ব্যাপারে কেশবচন্দ্র সেনের নিজের কোন দায়িত্ব ছিল না। তিনি দৈবাদেশের দ্বারা চালিত হয়ে এই বিবাহটি দেন। ম্যাকসমূলরকে লিখিত একটি পত্রে (২রা মে, ১৮৮১ খ্রীঃ) কেশবচন্দ্র জানিয়েছেন, "My 'Adesha' is a command of conscience or a providential interposition. In plain language, I should say this marriage is providential'.' —Max Muller, Biographical Essays, page 114.

**[ কুচবিহার বিবাহ—১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে কেশবচন্দ্র সেন এক সংকটের সম্মুখীন হন। কুচবিহারের রাজকুমারের সঙ্গে তাঁর কিঞ্চিদধিক তের বৎসর বয়সের জ্যেষ্ঠা কন্যা সুনীতি দেবীর বিবাহ (৬ই মার্চ ১৮৭৮) হয়। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের একদল ব্রাহ্ম-কেশবচন্দ্রের উপর আগে থেকেই কয়েকটি কারণে বিরূপ হয়ে ছিলেন। এখন এই বিবাহ নিয়ে তাঁরা ভীষণ আন্দোলন সুরু করলেন। ]**

অন্তর সাড়া দিত। গুপ্তভাবে একজন ভিতর থেকে তাঁর রসনাকে ভক্তের ঠাকুরের দিকে টেনে নিল। প্রথমে কঠোর, পরে সুকোমল ; প্রথমে পিতা, পরে মাতা। "ব্রহ্মের প্রস্ফুটিত ভাব জীবনে দেখিলাম। আমার জীবনের সঙ্গে ব্রহ্ম খেলা করিতে লাগিলেন ; আগে 'ব্রহ্ম' নাম একটি নাম ছিল, বস্তুটি রূপান্তর হইয়া কত নামই ধরিল।"[১] কলুটোলার বিখ্যাত ভক্ত পরিবারে তাঁর জন্ম। ভক্তি তাঁর জন্মগত। কাজেই প্রথমজীবনে বিবেকপ্রধান (সেকালে ব্রাহ্মদের সকলেই প্রায় বিবেকপ্রধান ছিলেন)। কেশবচন্দ্র পরবর্তীকালে ভক্ত-কেশবে পরিণত হলেন। শুধু নিরাকার ব্রহ্ম নন, ঈশ্বর হলেন ভক্তের ভগবান ; কীর্তনে, সংগীতে, নৃত্যে, পূজারতিতে তিনি প্রাণের ঠাকুর হয়ে উঠলেন। শুধু জগৎপিতা নন, মাতা ; মাতৃনামে দশদিক মুখর হয়ে উঠল। ঈশ্বরের আনন্দমূর্তি, সৌন্দর্যমূর্তি এই পৃথিবীর সৃষ্টির মধ্যে, শক্তির মধ্যে কতরূপেই না ছড়িয়ে আছে। "All our powers, senses and energies, our very being derive their strength, their vitality from that active principle which is working within us and which is synonymous with God..... God is, in the language of the Upanishadas, Prānasya Prānam, or the life of all life.'[২] ঈশ্বরকে তাই নানা নামে বন্দনা করা হল। ভক্তির স্নিগ্ধ স্পর্শে, খোলমৃদঙ্গ-সহ নাম-কীর্তনে ব্রাহ্ম সমাজের তাত্ত্বিক নীরসতা দূর হল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ 'লজ্জা ভয়'—লজ্জা ও ভয় কেশবচন্দ্রকে জড়িয়ে আছে। যেখানে তিনি হরিকে না দেখেন, যেটি ভক্তের স্থান নয় সেখানে তিনি ভীত হন, লজ্জা পান। কিন্তু ঈশ্বরের এমনই মহিমা তিনি কেশবকে প্রচারক করেছেন—তাঁরই নামের প্রচারক, 'নববিধানে'র প্রচারক। হাজার হাজার অভক্তকে ভক্ত করতে হয়। বলিদানের ছাগলের ন্যায় কাঁপতে কাঁপতে তিনি সেখানে যান। ঈশ্বরমহিমা উপলব্ধি করেন—"এমন লাজুক লোককে নৃত্যে প্রবৃত্ত করিয়াছ, ধর্মে সাহসী করিতেছ। স্বভাব যার লাজুক, ভীত, সেও ভীমরবে ব্রহ্মনাম কীর্তন করিতেছে।...ধর্মের খাতিরে যেন লজ্জা না হয়। ধর্মের জন্য বেহায়া হওয়া চাই, আশীর্বাদ কর ভক্তিতে নির্লজ্জ হইব, বিশ্বাসে সাহসী হইব।"[৩] কেশবচন্দ্র সেন ঈশ্বরের নামে সাধারণ লোকলজ্জা বর্জন

১. 'জীবনবেদ', পৃ. ৬৪। ২. K. C. Sen, God & Our Relations to Him, Indian Mirror, Feb. 23, 1879. ৩. জীবনবেদ, পৃ. ৭৭-৭৮।

করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৮৬৯ খ্রীঃ 'ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির' স্থাপিত হওয়ার পর নগরকীর্তন ব্রাহ্ম সমাজে প্রবর্তিত হল। কেশবচন্দ্র অন্যান্য প্রচারক ও বন্ধুদের সঙ্গে দুই হাত তুলে ভাবে বিভোর হয়ে নগ্ন পদে শহরের বিভিন্ন স্থানে নগর কীর্তন করে বেড়াতে লাগলেন। শুধু তাই নয় বাঙলা দেশের নানা স্থানে, বিহারে পদব্রজে ঈশ্বরের নাম প্রচার করতে বেরোলেন। সঙ্গে তাঁদের কোন অর্থ ছিল না। দিন শেষে পথে কোন গৃহে তাঁরা আশ্রয় নিতেন—ঈশ্বর জোটালে আহার করতেন।

"কলেজ স্কোয়ার থেকে এই প্রচাব যাত্রা সুরু হয় ১৮৭৯ খ্রীঃ ১৪ই অক্টোবর। হাওড়া, নৈহাটি, চুঁচুড়া, দক্ষিণেশ্বর, (নৌকাযোগে) প্রচারকগণ যান। তাবপর তারা বিহারেব নানা অঞ্চলে, যেমন, বড়ঘাট, বাজিদপুর, মজফরপুর, বুদ্ধগয়া, বাঁকিপুর, শোনপুর ও আরা ইত্যাদি অঞ্চলে পবিভ্রমণ-অন্তে প্রচারকদলটি ঐ বছরেরই ডিসেম্বর মাসে ফিরে আসে। বিহারে হিন্দী ভাষায় বক্তৃতায় জনসাধারণকে সহজেই আকৃষ্ট করতে পেবেছিলেন আব সংকীর্তনের মধুবতানে ঈশ্বরমহিমা সর্বত্র প্রচাব করেছেন।"[১]

নবম পরিচ্ছেদ 'যোগের সঞ্চার'। ধর্মজীবনেব আরম্ভ কালে কেশবচন্দ্র যেমন ভক্ত ছিলেন না তেমনি যোগীও ছিলেন না। নীতিবোধের মধ্য দিয়েই তাঁর ধর্মজীবনের সুরু। খুব পুণ্যবান, খুব সচ্চবিত্র হওয়াকে, ঈশ্বর-অভিপ্রেত কাজ করাকেই তিনি ধর্ম বলে জানতেন। ব্রাহ্মসমাজে যোগ-সাধন ইতিপূর্বে কেউ করেন নি। পনের বছব কেশবচন্দ্র সত্য, প্রেম ও বৈরাগ্য সাধন করলেন, ভক্তির সঞ্চাব হল। ভক্তি ক্রমে প্রমত্ততায় পরিণত হল। ভক্তিতে আছে আবেগ কাজেই ভক্তির বৃদ্ধি অর্থই আবেগ-আকুলতা, প্রমত্ততা। এই কারণেই ভক্তিকে স্থায়ী করবার জন্য যোগ আবশ্যক। হৃদয় যেমন ভক্তের হৃদয়, নয়নটাও তেমনি যোগীর নয়ন হবে। ভক্তি যোগকে সুমিষ্ট করে, যোগ ভক্তিকে শুদ্ধ ভক্তি করে। যোগ অর্থে ঈশ্বরের সঙ্গে এক হওয়া—অন্তরাত্মার সঙ্গে এমনই সংযোগ যে প্রতি বস্তু দেখা মাত্র তার মধ্যে ব্রহ্ম দর্শন লাভ। ১৮৭২ খ্রীঃ তপোবন ও ১৮৭৬ খ্রীঃ সাধন-কানন প্রতিষ্ঠিত করেন। তপোবন ও সাধন-কানন তাঁর সাধনার পীঠস্থান। ধ্যান যোগ-সাধনা ও নানা কৃচ্ছ্র-সাধনার মধ্য দিয়ে তিনি ধর্মসাধনের নতুন পথ অবলম্বন

১. প্রেমসুন্দর বসু, ভাগানুসরণ।

করলেন। গাছের তলায় কুশাসন কিংবা ব্যাঘ্রচর্মের উপর বসে প্রাতঃকালে সকলে একত্রে উপাসনা করতেন। উপাসনা-অন্তে স্বপাকে আহার। অপরাহ্ণে জলতোলা, বাঁশ-কাটা, পথ প্রস্তুত ও সমান করা, গাছ পোঁতা, নানাস্থান পরিষ্কার করা তাদের কাজের অঙ্গ ছিল। আধঘণ্টা বিশ্রামের পব নির্জন স্থানে তাঁরা সাধন করতেন। সন্ধ্যায় সংকীর্তন।"[১] "অনেকে ধর্ম করিয়া গিয়াছে, কেশবচন্দ্র ধর্ম হইয়া গিয়াছেন। এরূপ ফলবান জীবন অতি বিরল।"[২] ইংরেজী শিক্ষায় সুশিক্ষিত হয়ে, পাশ্চাত্ত্য দর্শন-বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত হয়েও কেশবচন্দ্র ভারতীয় যোগকেই ধর্মসাধনের অঙ্গ করে নিলেন, ধর্মের পথে তিনি 'নববিধানের' সমন্বয়-দর্শনের দিকে অগ্রসর হলেন। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে 'নববিধান' ঘোষিত হল। সকল ধর্মের সমন্বয়-সাধনের ধর্ম 'নববিধান'। 'নববিধান' সমন্বয়ের ধর্ম। কেশবচন্দ্রের সমগ্র জীবনে ধর্মসাধনায় এই সমন্বয়ের ভাবটি বর্তমান। আমাদেব ভারতীয় সাধনায় যোগ-ভক্তি-কর্ম-জ্ঞানের পথে ঈশ্বরকে লাভ করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কেশবচন্দ্র সমগ্র জীবন-সাধনায় যোগ-ভক্তি, কর্ম ও জ্ঞানেব সমন্বয় করেছেন। জ্ঞান ও কর্মেব পথে অগ্রসর হয়ে ভক্তি ও যোগ তিনি কিভাবে সাধন করলেন, কিভাবে ভক্তি ও যোগ তাঁর সাধনায় 'নববিধান'কে আবিষ্কার করল তার সুন্দর ও ধারাবাহিক বিবরণ পাই আমরা 'জীবনবেদে'। জীবনবেদের দ্বাদশ পরিচ্ছেদে 'নববিধানের' স্বরূপ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ব্রাহ্মধর্মে নববিধান কিভাবে আবির্ভূত হল তার বিশ্লেষণ কেশবচন্দ্র করেছেন। তাঁর ধর্মজীবনেব বহু পর্যায়—সব স্তরগুলি 'নববিধানে' এসে মিলিত হয়ে পূর্ণতা পেয়েছে।

এইভাবে ষোড়শ পরিচ্ছেদে 'জীবনবেদ' গ্রন্থটি সমাপ্ত হয়েছে। ষোড়শ পরিচ্ছেদে 'অনৃত খণ্ডন' অধ্যায়ে কেশবচন্দ্রের ব্যক্তি জীবনের নানা ঘটনার ইঙ্গিত আছে। কেশবচন্দ্র কিছু কারণে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজে'র কয়েকজন সভ্যের কাছে অপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন এবং তাঁর কাজের নিন্দা করে কিছু অভিযোগ তাঁরা এনেছিলেন ; কেশবচন্দ্র সেগুলিকে সত্য মনে করেন না তাই 'অনৃতখণ্ডনে'র চেষ্টা করেছেন। তিনি প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তি। সমস্ত কাজই তাঁব অন্তরে উত্থিত দৈববাণী অনুযায়ী। ঈশ্বরই তাঁর জীবনকে সোনার জীবন করেছেন, হৃদয়কে করেছেন হীরকখণ্ড। এই গ্রন্থটি কেশবের জীবনমাহাত্ম্য

---

১. সমসাময়িক সংবাদপত্র "ইণ্ডিয়ান মিরর"-এর ৪ঠা জুন ১৮৭৬ বিবরণ অনুযায়ী।
২. চিরঞ্জীব শর্মা, কেশবচরিত. পৃ. ৪২৭।

বর্ণনার জন্য রচিত হয়নি। উদ্দেশ্য "আমার জীবনবেদ পড়িয়া পৃথিবী যেন তোমারই পাদপদ্মে প্রণত হয়, তোমারই প্রেম-ভক্তিতে প্রমত্ত হয়, কৃপা করিয়া তুমি এই আশীর্বাদ কর।"১

'জীবনবেদ' গ্রন্থটিকে ঠিক সাধারণ আত্মচরিত মনে করা চলে না। আদর্শবাদ, অধ্যাত্মানুভূতি ও ভক্তির আবেগে এটি আত্মচরিত শাখায় এক নতুন স্বাদ এনে দিয়েছে। আত্মচরিত-সাহিত্যের ক্ষেত্রে ব্রাহ্ম সমাজের দান বিশেষভাবে মূল্যবান। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী (১৮৯৮), রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত (১৯০৯), শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিত (১৯১৮) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এই গ্রন্থগুলির মধ্যে কেশবচন্দ্র সেনের জীবনবেদই সর্বাগ্রে প্রকাশিত হয়েছে (১৮৮৩)। দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী ইত্যাদির গ্রন্থে তাঁদের মনোজগতের নানা সন্ধান ও অধ্যাত্ম-অনুভূতির প্রকাশ দেখতে পেলেও এঁদের প্রত্যেকেরই গ্রন্থে ব্যক্তি জীবনের নানা ছোটখাট ঘটনার উল্লেখ আছে। ব্যক্তি জীবনের ভুল-ভ্রান্তি, আনন্দ-বিষাদে ও কিছু কিছু বাস্তব ঘটনার উল্লেখে দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ ও শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মজীবনী জীবনরসধর্মী হয়ে উঠেছে ও নিঃসন্দেহে সাহিত্য-গুণমণ্ডিত হয়েছে। কেশবচন্দ্রের আত্মজীবনীমূলক রচনা জীবনবেদে কিন্তু দৈনন্দিন ব্যক্তি জীবনের কেশবকে আমরা পাই না। তরুণ কেশব কিভাবে ধর্মের পথে বিবেক-বৈরাগ্যের নিস্তরঙ্গতা অতিক্রম করে ভক্তি ও যোগের পথে 'নববিধান' লাভ করলেন তারই অন্তর্মুখী বর্ণনায় জীবনবেদ উচ্ছ্বসিত। পরমভক্ত কেশবচন্দ্রের হৃদয়ধর্ম মূলতঃ কবির। কাব্যময় ভাষায় একটির পর একটি অধ্যায় বর্ণিত হয়েছে। অধ্যাত্ম-জীবনের স্তর বিশ্লেষিত হলেও আধ্যাত্মিক আলোচনা নেই। বরং আত্মিক উপলব্ধির স্পর্শে, সহজ ভাষারীতির মাধ্যমে পাঠক ও লেখকের সঙ্গে একটা অন্তরঙ্গতা সৃষ্টি হয়। আর এই গ্রন্থের যে উদ্দেশ্য— জীবনবেদ পাঠ করে ঈশ্বরের পাদপদ্মে সহজেই মস্তক অবনত হয়ে আসে। তিনি হয়তো মিস্টিক। "ঊনবিংশ শতাব্দীতেও খ্রীষ্ট ও চৈতন্যের বংশধর।··মিস্টিক যোগীর মত আত্মলব্ধ ঈশ্বরাদেশকেই শিরোধার্য করেছেন।"২ 'জীবনবেদ' পাঠে পাঠক-পাঠিকাও যেন মিস্টিক অতীন্দ্রিয় চেতনায় ক্ষণকালের

১. জীবনবেদ, পৃ. ১৬০। ২. মোহিতলাল মজুমদার, বাংলার নবযুগ, পৃ. ২৫২।

জন্য আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। যাদুকর যেমন তার যাদুকাঠির মায়ায় সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে, কেশবচন্দ্র সেনও তেমনি এই গ্রন্থে পাঠক-পাঠিকাকে অতি সহজেই এক অলৌকিক মিস্টিক রাজ্যে নিয়ে যান—যেখানে আছে বর্ণনায় সৌন্দর্য, ভাষায় সহজ মাধুর্য ও উপলব্ধিতে প্রগাঢ় দৈব আনন্দ। এই গ্রন্থটির সাহিত্য-মান উন্নত—পৃথিবীর প্রায় সব ভাষাতেই হিন্দী ( দুটি ), উর্দু, সংস্কৃত, তেলেগু, উড়িয়া, মারাঠি, ইংরাজি ও ফারসি ভাষায় গ্রন্থটি অনূদিত হয়েছে। গ্রন্থটির সর্বজনবোধ্য সার্বিক আবেদন বহুল অনুবাদের মধ্যে স্বীকৃত।

কেশবচন্দ্রের জীবনই বেদ—চারি বেদের জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম-যোগের মিলন-ভূমি। তাঁর জীবনে এই চারটি বেদ বাঙ্ময় হয়ে উঠেছিল।

ধর্মবিষয়ক রচনা : প্রার্থনা ও উপদেশমূলক

'আচার্য্যের উপদেশ'—প্রথম থেকে দশম খণ্ড পর্যন্ত। আচার্য কেশবচন্দ্র ব্রহ্মমন্দিরে যে উপদেশ দিতেন সেগুলি 'ধর্মতত্ত্বে' প্রকাশিত হত। কোন কোন উপদেশ আবার পুস্তিকাকারে বের হত। নানা স্থানে ছড়ানো বহু উপদেশাবলী সংগৃহীত করে কালানুক্রমিকভাবে দশটি খণ্ডে 'আচার্যের উপদেশ' প্রকাশ করা হয়। ১৮৬২ খ্রীঃ ২৩শে জানুয়ারীতে প্রদত্ত উপদেশ থেকে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রিলের উপদেশ পর্যন্ত সংগৃহীত হয়েছে।

'আচার্যের প্রার্থনা'—প্রথম থেকে চতুর্থ খণ্ড। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আচার্য কেশবচন্দ্রের প্রার্থনাগুলি কেশব-জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে 'আচার্যের প্রার্থনা' নামে চারখণ্ডে কালানুক্রমিক ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।

'সেবকের নিবেদন'—পাঁচখণ্ডে সমাপ্ত। ১৮৮০ খ্রীঃ ২৭শে জুন থেকে ১৯শে আগস্ট ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রদত্ত নানা ধর্মতত্ত্ব-আলোচনা, পাঁচখণ্ডে সমাপ্ত 'সেবকের নিবেদনে' সংগৃহীত হয়েছে। এই আলোচনাগুলিও আগে 'ধর্মতত্ত্বে' প্রকাশিত হয়েছিল, পরবর্তী কালে একসঙ্গে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

কেশবচন্দ্রের বেশীর ভাগ রচনাই বক্তৃতা ও উপদেশ মূলক। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের আচার্যরূপে ও ভক্তরূপে তিনি ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে অনেক প্রার্থনাও করেছেন। যদিও এই জাতীয় বক্তৃতার লিখিত রূপ বা ধর্মোপদেশ তাঁর স্বয়ং-প্রণীত নয়—অনুগত শিষ্যগণ কর্তৃক অনুলিখিত হয়েছে। কেশবচন্দ্র সেগুলি সংশোধিত ও পরিমার্জিত করে দিতেন। তাতে মূল রচনার

ভাবগাম্ভীর্য ও ভাষার সৌন্দর্য কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হলেও মৌলিক রচনার স্বাদ ও ভাষার কাঠামো-অলংকরণ সবই অটুট আছে।

তাঁর প্রদত্ত উপদেশ ও প্রার্থনা মূলতঃ ধর্মকে অবলম্বন করে রচিত হয়েছে সত্য। কিন্তু কোথাও প্রতিপাদ্য বিষয়টি অস্পষ্ট থাকে নি। প্রাবন্ধিক-সুলভ যুক্তি ও বিশ্লেষণী দৃষ্টি নিয়ে প্রতিটি বিষয়ের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা দান করাই তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য। কোন কোন সমালোচক তাঁর সুবিপুল উপদেশ ও প্রার্থনা-জাতীয় গ্রন্থের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হয়েছেন, বিহ্বল হয়েছেন, মনে করেছেন, প্রচারক ভক্তহৃদয়ের ফেনিল আবেগমাত্র সঞ্চিত হয়ে আছে উপদেশ ও প্রার্থনা-মূলক গ্রন্থের সুবিস্তীর্ণ বেলাভূমিতে। কিন্তু উদধি-উচ্ছ্বাসের সমুদ্রের সম্পদ ফুরিয়ে যায় না ; তার আছে অতলান্ত গভীরতা, প্রকৃত ডুবরি ডুব দিয়ে আসল মুক্তা সংগ্রহ করতে পারে। তাই প্রতিপাদ্য বিষয় সম্পর্কে চিন্তার স্বচ্ছতা ও সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত লক্ষ্য করি। প্রকৃতপক্ষে কেশবচন্দ্র সেনের এই উপদেশ ও প্রার্থনা আত্মগত নয়—সাধারণ নরনারী ও ব্রাহ্ম ভক্তদের চিত্তে ভক্তি ও ঈশ্বরপ্রীতি জাগিয়ে তোলাই তাঁর মূল উদ্দেশ্য। 'ঈশ্বর দর্শন', 'ঈশ্বর সত্য কি কল্পনা' 'ঈশ্বরলাভ সহজ', 'পরলোকের সম্বল', 'ব্রহ্মদর্শনের উপায়', 'সংসারে ব্রহ্মসাধন' —ইত্যাদি ঈশ্বর-সম্পর্কিত বহু আলোচনা আছে। 'প্রত্যাদেশ', 'আত্মতত্ত্ব, 'পরিচারিকা ব্রত' 'ভক্তির লক্ষণ', 'ধ্যান', 'মন নিরাকার', 'সিদ্ধের অবস্থা কি ইত্যাদি ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও তত্ত্ব সম্পর্কেও বহু উপদেশ আছে। কেশব-চন্দ্রের অনাড়ম্বর সহজ ব্যাখ্যাতে দুরূহ ধর্মতত্ত্বও সহজ সরল ও হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে—"সর্বাগ্রে সত্য স্বীকার। উপাসনা তত পরিমাণে গভীর হইবে, যে পরিমাণে ঈশ্বরকে সত্য বলিয়া অনুভব করিবে। যে পরিমাণে ঈশ্বর সত্য এই কথা অসার মনে হইবে। যে পরিমাণে উপাসনা গভীর্যবিহীন হইবে।'[১] কিংবা অতি সহজ ভাষায় দয়া ও প্রেম শিক্ষা দেন—"স্বর্গে ও পৃথিবীতে ঈশ্বর বড়, দয়া ঈশ্বরের আদরের বস্তু, ঈশ্বর ক্ষমা ও প্রেমের আধার। সুতরাং দয়ার নিশান সর্বত্র উড়িবে। দয়াই সকলের আশা, সমস্ত ধর্মসাধন এক দয়াতে।...হে ব্রাহ্ম, তুমি নিষ্ঠুর নির্দয় থাকিতে পার না। যে তোমার দয়ার প্রার্থী তাহাকে শূন্যহস্তে ফিরাইয়া দিতে পার না।"[২]

নীরস তত্ত্বালোচনার ফাঁকে ফাঁকে তাঁর প্রকৃতি-প্রেমিক চিত্ত টি ধরা

১. আচার্যের উপদেশ, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৩৫। ২. তদেব, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৩০৮-৩০৯।

পড়েছে। 'শারদীয় উৎসব' ও 'দক্ষিণেশ্বরের ভাগীরথীবক্ষে' (নবম খণ্ড) দুটি রচনাতেই কবিসুলভ হৃদ্‌বৃত্তির অনুরাগে ধর্ম-কথা ব্যাখ্যাত হয়েছে। বসন্ত ঋতুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ; সেটি সর্বজনস্বীকৃত হলেও শরতের স্নিগ্ধ সুপ্রসন্ন প্রকৃতি কেশবচন্দ্রকে আকর্ষণ করেছে। তাই ২৬শে আশ্বিন উপদেশ দিতে গিয়ে শারদীয়া আবেদনকে অগ্রাহ্য করতে পারেন নি।

"গ্রীষ্মের পর শরৎ, উত্তাপের পর জলবর্ষণ, যন্ত্রণার পর সুখ, পাপ-সন্তাপের পর আত্মপ্রসাদ এবং শান্তি।"[১] "এই ঋতুতে বিশেষরূপে পৃথিবীতে লক্ষ্মী-শ্রী প্রকাশিত। মাঠ যেমন সম্পদ, ঐশ্বর্যশ্রীতে পরিপূর্ণ হইয়া হাসিল আমাদিগের প্রাণও তেমনই হাসিল।...শারদীয় উৎসবের এই শোভা গগন এবং পৃথিবী উভয়কেই মনোহর করে। জীববৎসল ঈশ্বর যখন দেখিলেন যে সূর্যের প্রখর উত্তাপে পৃথিবীর বক্ষ ফাটিয়া যাইতেছে, তিনি আকাশের মেঘকে আজ্ঞা দিলেন, মেঘ, তুমি বন্ধুভাবে পৃথিবীর বক্ষে তোমার শীতল বারি-বর্ষণ কর। ধর্মরাজ্যেও এইরূপে স্বর্গ হইতে বারি বর্ষণ হয়।"[২] 'দক্ষিণেশ্বরের ভাগীরথী-বক্ষে' রচনায় শারদীয়া চন্দ্রালোকে ভাগীরথীর শোভা নিরীক্ষণ করেছেন—"বায়ুর হিল্লোলের সঙ্গে গঙ্গার হিল্লোল খেলা করিতেছে। তাহার উপরে পূর্ণিমার শরচ্চন্দ্রের জ্যোৎস্না প্রতিফলিত হইতেছে। চন্দ্রের সৌন্দর্য, সুমন্দ সমীরণের শীতলতা, জলের স্নিগ্ধ গাম্ভীর্য, এ সমুদয় একত্র হইয়া আজ প্রকৃতির প্রিয় মুখকে কেমন আশ্চর্য সুন্দর করিয়াছে।"[৩]

কিন্তু প্রকৃতি শুধু সৌন্দর্যের ডালাটুকু উজাড় করে দিয়েই কেশবচন্দ্র সেনের কাছে নিঃশেষ হয়ে যায় নি—তিনি প্রকৃতির কাছ থেকে আধ্যাত্মিক পাঠ নিতে চান। ভাগীরথীর কাছ থেকে তিনি বৈরাগ্য শিখতে চান, কারণ "তুমি কিছুই চাহ না, ক্রমাগত অমৃত ঢালিতেছ।" আর শারদীয় উৎসব তখনই সার্থক হয়ে উঠবে যখন সেটি আমাদের স্বর্গের সৌন্দর্য ভোগ করতে শিক্ষা দেবে।

উদ্যানে প্রস্ফুটিত পুষ্প থেকেও তিনি অধ্যাত্মবিদ্যা শিক্ষা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে কেশবচন্দ্রের ধর্মচিন্তার সঙ্গে কবিচিত্তের অপূর্ব মিলন সাধিত হয়েছিল—তিনি নিজে এক স্থানে বলেছেন, "ভক্তের চক্ষে সমস্ত জীবন কবিত্ব। ভক্তির অভাব হইলে পদ্য গদ্য হয়। ভক্ত সর্বদাই আপনার প্রাণ হইতে নবপ্রসূত প্রেমপুষ্প তুলিয়া ঈশ্বরের পাদপদ্ম পূজা করেন।"[৪] ভক্ত কেশবচন্দ্র

১ কেশবচন্দ্র সেন, আচার্যের উপদেশ, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৭৯। ২. তদেব, পৃ. ৮৩-৮৪। ৩. তদেব, পৃ. ৮৬। ৪. তদেব, পৃ. ৪১।

সেনও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব অনুভব করেছেন মুগ্ধ বিস্ময়ে, প্রকৃতির সৌন্দর্যের মাঝে ধর্মতত্ত্বের নিগূঢ় পাঠ গ্রহণ করেছেন। "ভক্ত যিনি তিনি পদ্মপ্রিয়, তিনি পদ্মপ্রয়াসী, ফুলের প্রতি তাঁর অত্যন্ত লোভ। পুষ্পলোভী ভক্ত পুষ্পলাভ করেন ইহা তাঁহার ইচ্ছা।"[১] কিন্তু এই পুষ্প ঈশ্বরের পাদপদ্ম। ধর্ম একটি পুষ্প-উদ্যান। ভক্তহৃদয় ভ্রমরের ন্যায় উড়ে গিয়ে পদ্মের উপর বসে। শুধু কি পুষ্পের সৌন্দর্য ভ্রমরকে আকর্ষণ করে? না ভ্রমরের আরও এক আকর্ষণ আছে--সে যে পুষ্পের মধু পান করে। ভক্তহৃদয়ও ভ্রমরের মত মধুলোভী—ব্রহ্মের পাদপদ্মে সৌন্দর্য, শান্তি ও সুখের আশায় ভক্তহৃদয় প্রণত হয়ে থাকতে চায়।

১৯শে জুলাই, ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের উপদেশে তিনি 'দুর্ঘটনার মধ্যে ঈশ্বরের কৃপা' লাভের ঘটনাটি বিবৃত করেছেন। ভক্ত অঘোরনাথ বিহারে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে একদিন রাত্রে ইসরাপুর চটিতে দুর্দান্ত দশ পনর জন ডাকাতের হাতে পড়েছিলেন। 'বাস্, আভি লুটো আউর মার ডালো' বলে চারজন প্রকাণ্ড জোয়ান লম্বা লম্বা লাঠি নিয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে এল। তিনি ভীত সন্ত্রস্ত হৃদয়ে প্রায় সংজ্ঞাবিহীন অবস্থায় কাঁদতে কাঁদতে হিন্দী ভজন করতে লাগলেন। এবং তিনি বিপদমুক্ত হলেন। এইভাবে ঈশ্বর ভক্তকে সর্বদা রক্ষা করেন। এই উপদেশটিতে ব্যক্তিগত একটি ঘটনার উল্লেখ থাকাতে রচনায় আস্বাদনের ভিন্নতা এনেছে।

'আচার্যের উপদেশে' বেদ, পুরাণ ও হিন্দুশাস্ত্র-গ্রন্থের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে বারবার; ধর্ম শিক্ষা দেবার জন্য তিনি কখনও বা হিন্দুর পুরাণ থেকে নিদর্শন সংগ্রহ করেছেন।[২] নারদের জীবনে একদিকে যোগনদী ও অন্যদিকে ভোগনদী এসে মিলিত হয়েছে। যাঁরা হরিনামপ্রিয়, সঙ্গীতপ্রিয় তাঁরা নানা স্থান পর্যটন করে পর্বত, বন-উপবন, নদী ইত্যাদি দর্শন করে মনের আনন্দে হরিগুণ গান করেন। নারদের প্রতি ঈশ্বরের আজ্ঞা হল ঈশ্বরের নাম-গুণ গাইতে গাইতে দেশ-বিদেশে অনাসক্ত হয়ে ভ্রমণ করার। এইভাবে নারদের 'ভগবতী তনু' লাভ হল। সুতরাং আচার্য কেশব চন্দ্রের উপদেশ "হে যোগার্থী বর্তমান নারদগণ, তোমরা আসক্তি ছাড়িয়া

১. আচার্যের উপদেশ, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৬৮। ২. (ক) বেদ ও পুরাণ (আচার্যের উপদেশ) ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৫। (খ) নারদের নবজীবন (তদেব) পৃ. ৫৫। (গ) বেদপুরাণের মিলন (তদেব) দশম পৃ ৭৭। (ঘ) বেদপুরাণের পরিণয় (তদেব) দশম খণ্ড, পৃ. ৩৫০।

পর্যটক হও, তোমাদিগকেও ঈশ্বর নবজীবন দিয়া এবং দেখা দিয়া কৃতার্থ করিবেন।"[১]

আচার্যের কয়েকটি উপদেশে তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজের প্রামাণ্য চিত্র লাভ করা যায়। 'মুঙ্গের ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা' (আচার্যের উপদেশ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২০), 'পরিচারিকাব্রত' (আঃ উঃ, ৭ম খণ্ড পৃ. ১১৩) ও 'ব্রাহ্মিকা সমাজের উৎসব' (আঃ উঃ, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২২৬) ইত্যাদি উপদেশাবলীতে ব্রাহ্মসমাজ-ইতিহাসের অনেক নির্ভরযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায়। 'ব্যাণ্ড অব হোপের বালকদিগের প্রতি উপদেশ' (৮ম খণ্ড, ২২২ পৃ.) ও মাদ্রাজে দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে (আঃ উঃ ৮ম খণ্ড পৃ. ৬৪) সমসাময়িককালের সমাজচিত্র উদ্ঘাটিত হয়েছে। ব্যাণ্ড অব হোপের বা আশালতা বাহিনী গঠিত হয়েছিল দেশময় সুরাপান-নিবারণের জন্য। সেই সময়ে সুরাপান তীব্র আকারে দেখা দিয়েছিল। কত লোক সুরাপানে মারা গেল, কত স্ত্রী বিধবা হল, কত পুত্র-কন্যা অনাথ হল। মানুষ মদ্যপান করে আজ পশুর মত হয়ে গেছে। সমুদয় বিদ্যাবুদ্ধি জলাঞ্জলি দিয়েছে। তাই তরুণদলের প্রতি আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের আবেদন—

"সুরার মুখ দেখিব না, সুরারাক্ষসীর পথে কখনও চলিব না, সুরা-রাক্ষসীকে দেশ হইতে বাহির করিয়া দিব, এই প্রতিজ্ঞা কর।"[২]

১৮৭৭ খ্রীঃ মাদ্রাজ রাজ্যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ঘটেছিল। উক্ত উপদেশটিতে সেই চিত্রটি উদ্ঘাটিত হয়েছে। "মাদ্রাজ প্রদেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হওয়াতে অনাহারে ও রোগে লক্ষ লক্ষ লোক মরিতেছে। উপযুক্ত সময়ে সাহায্য না পাইলে অবিলম্বে ইহারা দুর্ভিক্ষের ভয়ানক কষ্টে পড়িবেন। দুর্ভিক্ষের মৃত্যু ভয়ানক। দুর্ভিক্ষের সঙ্গে সঙ্গে আবার সহস্র প্রকার পাপ আসিয়া মনুষ্যের দুঃখ বৃদ্ধি করিতেছে। ক্ষুধাতুরা জননী আহার করিতেছেন, সন্তান সেই মাতার হস্ত হইতে সেই অন্ন কাড়িয়া লইয়া আপনি খাইল। কোথাও বা সন্তান আহার করিতেছে, তাহার জননী তাহার হস্ত হইতে কাড়িয়া লইয়া আপনি ভোজন করিল। অন্নকষ্ট তাহার উপরে আবার লজ্জা নিবারণ হয় না।[৩]

বাস্তব অভিজ্ঞতা ও সহানুভূতির স্পর্শে বর্ণনাটি উজ্জ্বল। কেশবচন্দ্র সেন

---

১. আচার্যের উপদেশ, ৮ম খণ্ড, পৃ ৫৮। ২. তদেব পৃ. ২২৫। ৩. তদেব পৃ. ৬৫-৬৬।

শুধু ধর্মোপদেষ্টাই নন, সর্বোপরি তিনি মানবদরদী জীবনবাদী। দুর্ভিক্ষের যন্ত্রণায় কাতর মানবের প্রতি তিনি গভীর বেদনা নিয়ে তাকিয়েছেন এবং সকল মানবের সমবেত চেষ্টায় যেন এই বিপদ থেকে মুক্ত হওয়া যায় সেই উদ্দেশ্য নিয়েই সমবেত মণ্ডলীর কাছে আবেদন জানিয়েছেন —বিপদ, শোক, দুঃখ থেকে মানুষকে সাহায্য করা হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বড় ধর্ম। সকল প্রকার দানের মধ্যে প্রাণদানই সর্বশ্রেষ্ঠ দান। কাজেই এই দুর্ভিক্ষ পীড়িত নরনারীর সেবায় সকলের অগ্রসর হওয়া উচিত। নববিধান জীবনকে বাদ দিয়ে নয়, জীবনের মধ্যে ধর্মকে আবিষ্কার করেছে।

কেশবচন্দ্রের ধর্মসাধনায় মাতৃভাব একটি বড় অবলম্বন। মাতৃভাব ব্যাখ্যাত হয়েছে—'জগজ্জননীকে দেখা' ( ৬ষ্ঠ খণ্ড ১৩১ পৃ ), 'ঈশ্বরের মাতৃভাব', 'স্বর্গস্থ মাতার দুঃখ', 'মাতৃভাব' ( দশমখণ্ড ) ইত্যাদি রচনায়। আচার্যের উপদেশের দশমখণ্ডের কয়েকটি নিবন্ধে, নববিধান ধর্মতত্ত্ব সবিশেষ ব্যাখ্যাত হয়েছে—'নবশিশুর জন্ম', 'কলিকাতায় নববিধান', 'নববিধানে পরিত্রাণ', 'যুগলভাব', 'নববিধানের আদর্শ-মনুষ্য', 'সর্বধর্ম-সমন্বয়' ইত্যাদি।

**প্রার্থনা ঃ** আচার্যের প্রার্থনা। চারখণ্ডে সমাপ্ত। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সমস্ত প্রার্থনা এই বৃহৎ গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। আদি ব্রাহ্মসমাজ, গোপাল মল্লিকের বাড়ী, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, ভারতাশ্রম, ভারতাশ্রম ব্রাহ্মিকাসমাজ, মোড়পুকুর সাধনকানন, বেলঘরিয়া তপোবন, কমলকুটীর, দক্ষিণেশ্বর ঘাট, বিডন স্কোয়ার, বাগবাজার নন্দলাল বসুর বাড়ী, গঙ্গাতট মঙ্গলবাড়ী ও মুদিয়ালী ব্রাহ্মসমাজে এই সব প্রার্থনা করা হয়েছিল। এছাড়া কেশবচন্দ্র ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেছেন। সেসকল স্থানে ( চন্দননগর, বুদ্ধগয়া, গয়া, ডুমরাওঁ, নৈনীতাল, দার্জিলিং, হিমাচল, আম্বালা, দিল্লী, কানপুর ) ভ্রমণকালেও তিনি যে সকল প্রার্থনা করেছেন সেগুলিও এই শতবার্ষিকী সংস্করণে স্থান পেয়েছে। কেশবচন্দ্র সেনের কণ্ঠনিঃসৃত অধিকাংশ প্রার্থনাগুলি লিপিবদ্ধ করে রাখেন প্রেরিত প্রচারক ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী। অন্যান্য প্রার্থনাগুলি জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ শ্রীমতী মোহিনী দেবী, জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত করুণাচন্দ্র ও কন্যা শ্রীমতী সুনীতি দেবী, শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী ও অনুজ শ্রীকৃষ্ণবিহারী সেন কর্তৃক অনুলিখিত হয়। কেশবচন্দ্রের সমসাময়িক কালে ধর্মতত্ত্বের পাতায় এই প্রার্থনাগুলি কিছু কিছু মুদ্রিত হয়। পরে গ্রন্থকারের 'কমলকুটীরের

দৈনিক প্রার্থনা' ৮ খণ্ড ও 'হিমাচলের দৈনিক প্রার্থনা' ৩ খণ্ড প্রকাশিত হয়। কিন্তু ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের শতবার্ষিকী উৎসবে ১৯৩৮ খ্রীঃ প্রার্থনাগুলি একত্রে চারখণ্ডে 'আচার্যের প্রার্থনা নামে মুদ্রিত হয়।

কেশবচন্দ্রের প্রার্থনাগুলিকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা চলে—(ক) ব্যক্তিগত প্রার্থনা, (খ) পারিবারিক প্রার্থনা, (গ) সমবেতভাবে প্রার্থনা।

কেশবচন্দ্রের জীবনই প্রার্থনাময়। তাঁর জীবনবেদের প্রথম কথাই প্রার্থনা। প্রার্থনা দিয়েই তাঁর ধর্মজীবনের শুরু। "ধর্মজীবনের সেই উষাকালে 'প্রার্থনা কর, প্রার্থনা কর'—এই ভাব, এই শব্দ হৃদয়ের ভিতরে উত্থিত হইল। প্রথমেই বেদ, বেদান্ত, কোরাণ-পুরাণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যে প্রার্থনা, তাহাই অবলম্বন করিলাম।"[১] তাঁর ব্যক্তিগত প্রার্থনা সাধনারই অঙ্গস্বরূপ। আপন চিত্তের পবিত্রতা ও নীতি-পরায়ণতার জন্য প্রার্থনাগুলি উদ্গত হয়েছে। "শুদ্ধ, শান্ত, সুখ দুঃখ সমান, তোমার নির্দেশদর্শী, সত্যের জন্য সম্যক্ অর্পিতপ্রাণ, নিরন্তর আত্মজ্ঞানপরায়ণ—সেইরূপ হইব।"[২] সকল প্রার্থনার শেষে আত্মার শান্তি কামনা করা হয়েছে। কখনও বা 'ব্রহ্মকে ধারণ' করবার জন্য ঋষিভাবে ভাবিত হবার জন্য প্রার্থনা করেছেন—"যাহাদিগতে নিবৃত্তি, নিয়ম, যোগ ও আত্মতত্ত্বের সমুদয় একত্র মিলিত হইয়াছে, তোমাতে নিমগ্ন, তাঁহাদিগের ন্যায় আমাদিগকে কর।"[৩]

পরিবারের সকলকে নিয়ে কমলকুটীরে কিংবা সমবেতভাবে ভারত-আশ্রমে, ব্রহ্মমন্দিরে ও নবদেবালয়ে তিনি ঈশ্বর-সান্নিধ্যে এসেছেন ও অন্তরের আকুতি নিবেদন করেছেন। কেশবচন্দ্রের প্রার্থনাগুলির সঙ্গে জীবনের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। এই স্তরের প্রার্থনাগুলিতে শুধু আত্মিক উন্নতি ও ব্রহ্মোপলব্ধির আকুতি জানান হয়নি, উপরন্তু জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে জীবনমুখী প্রার্থনা জানান হয়েছে। "কি ধর্ম লইব, প্রার্থনা তাহার উত্তর দিতেন। অফিসের কাজ ছাড়িব কি, ধর্ম প্রচারক হইব কি, প্রার্থনাই তাহা বলিয়া দিতেন। স্ত্রীর সহিত কিরূপ সম্পর্ক রাখিব প্রার্থনাই তাহা নির্ধারণ করিতেন।"[৪] "When his friends quarrelled among themselves, he enjoined upon them to go and pray

১. কেশবচন্দ্র সেন, জীবনবেদ, পৃ. ২.৩। ২. আচার্যের প্রার্থনা, ১ম খণ্ড পৃ. ৪৪৭।
৩. তদেব, পৃ. ৪৬৬। ৪. কেশবচন্দ্র সেন, জীবনবেদ, পৃ. ৫।

together. When one of his servants, a mere boy, committed a theft in his house, he knelt down and prayed by the side of the culprit "[১]

কেশবচন্দ্র সেনের প্রার্থনার বৈশিষ্ট্য হল যে তিনি শুধু সকল বিষয়ে প্রার্থনা জানিয়েই ক্ষান্ত হতেন না, তিনি ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ পেতেন। প্রার্থনা করলেই শোনা যায়—আদেশের মত হৃদয়ে উপলব্ধি হয়। কেশবচন্দ্র তাঁর সকল কার্য, প্রচারকের কাজ, ভারত-আশ্রমের পরিকল্পনা ও পরিচালনা, এমনকি কুচবিহার মহারাজার সঙ্গে কন্যা সুনীতির বিবাহ সকলই তিনি প্রার্থনা-অন্তে প্রত্যাদিষ্ট হয়ে করেছিলেন। "ক্রমে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিলাম, সাধক হইলাম, প্রচারক হইলাম, উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলাম, সব হইল। প্রার্থনা মানি বলিয়াই, জীবন যাহা, তাহা।"[২] জীবনের শেষ বছরে তিনি ম্যাক্সমুলারকে একটি পত্রে জানান—"I never know any guru or priest, but in all matters affecting the higher life I have always sought and found light in the direct counsels of the Holy Spirit "[৩]

ঈশ্বর ও পৃথিবীর মধ্যে যোগ স্থাপন করতে পারে একমাত্র প্রার্থনাই। বিশেষ স্মর্তব্য যে এই প্রার্থনাগুলি ব্রহ্মোপাসনার শেষভাগে নিবেদিত হয়েছে—আরাধনা ও ধ্যানের মধ্যে ব্রহ্মসান্নিধ্য উপলব্ধি করে ভক্ত গভীর আত্মনিবেদন করেছেন। নানা কোলাহলপূর্ণ ও চিত্তবিক্ষোভকারী এই সংসারে থেকেও নরনারী কিরূপে স্বর্গের আনন্দ আস্বাদন করে দুঃখসাগর অতিক্রম করতে পারেন, প্রার্থনাগুলির মধ্যে সেই পথই প্রদর্শিত হয়েছে।

কেশবচন্দ্র সেনের প্রার্থনাগুলি বঙ্গভাষার অমূল্য সম্পদ। মাতৃভাষাতে অন্তরের আকুতি ও হৃদয়ের নিবেদন প্রতিদিন সদ্য স্বচ্ছ শিশিরবিন্দুর মত। জীবনদেবতাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করে আত্মনিবেদনের ভঙ্গী তাঁর প্রার্থনাগুলির মধ্যে ফুটে উঠেছে। ভক্তির আবেগ, অন্তরের আকুলতা লিরিক-মূর্ছনায় প্রকাশিত হয়েছে কোথাও কোথাও। "ভাবের ভাবুক তুমি, যখনই তুলি ধর, আপনি ভাবের তরঙ্গ উঠে। এক চন্দ্রে কত লাবণ্যের

---

১. P. C. Mazoomdar, Life & Teachings of K. C. Sen. ২. কেশবচন্দ্র সেন জীবনবেদ, পৃ. ৫। ৩. F. Max Muller, Biographical Essays, page. 116. (ম্যাক্সমুলারকে কেশবচন্দ্রের লিখিত চিঠি, ২০শে জুলাই, ১৮৮৩ খ্রীঃ) পৃ. ৪৬।

প্রকাশ করিয়াছ, এক একটি ফুলে কত শোভা করিয়াছ, সমুদ্রের তরঙ্গের উপর সূর্যের কিরণ ঢেলে দিয়ে কি সৌন্দর্য দেখাও, পাহাড়ের মাথার উপর গাছগুলি দিয়ে কি শোভা প্রকাশ করিলে, আকাশের উপর অগণ্য গ্রহ নক্ষত্র দিয়ে কত শোভা করিলে, পাখীর শরীরে কত রঙ ফলালে।…যিনি জড়েতে, জীবেতে মানুষেতে দেবতাতে এত সুন্দর ছবি করিলেন, না জানি তিনি কত সুন্দর। চিত্রকর, পরমেশ্বর, ভাবের ভাবুক মহাদেব, তোমাকে কেন ভাবি না।"[১]

'চিরজীবন সখা'র কাছে কখনও বা কেশবচন্দ্রের প্রার্থনা 'আকাশের মত কর।' "হে দেব তোমার সিংহাসনের একদিকে মহত্ত্ব, আর একদিকে পরাক্রম, সম্মুখে অনন্ত, পশ্চাতে অনন্ত। তোমার মাথার উপরে লেখা অনাদি অনন্ত। আকাশে ব্যাপ্ত মহাদেব তাই দেখিব। মন, সংসারের লোভ মোহ চিত্তবিকার—চিরকাল কি ভাল লাগিবে? সব ফেলে দাও আকাশে ওঠ।"[২]

কেশবচন্দ্র সেনের সুগভীর প্রকৃতিপ্রীতি লক্ষ্য করা যায় প্রার্থনাগুলির মধ্যে। শরৎ কালের পূর্ণিমা প্রকৃতি (শারদীয় উৎসব, প্রার্থনা, তৃতীয়ভাগ পৃ. ১০৭৮), হিমালয়ের প্রশান্তি (প্রকৃতি স্বর্গের দ্বার, প্রার্থনা, দ্বিতীয় ভাগ, পৃ. ৪৮৬, ও হিমালয়ের সদ্ব্যবহার, তৃতীয় ভাগ, পৃ. ৯২২ ও চিরস্নিগ্ধতা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১২৯১), পুণ্যতোয়া গঙ্গা (লেখনীর ঐশ্বর্য, দ্বিতীয়, পৃ. ৫৯৩) তাঁর কবিচিত্তকে বার বার উদ্বেলিত করেছে। হিমাচল, নৈনিতাল, দার্জিলিং-এ তিনি কখনও কর্ম-উপলক্ষে, কখনও বা শারীরিক সুস্থতালাভের জন্য বেশ কিছুকাল অবস্থান করেছিলেন। ঈশ্বর প্রকৃতি-বহির্ভূত নন। বরং ঈশ্বর প্রকৃতির নানা বর্ণে, গন্ধে, বৈচিত্র্যে ছড়িয়ে রেখেছেন আপন অস্তিত্ব! এ কারণেই ভক্তের কাছে প্রকৃতি মধুর। 'প্রকৃতির সৌন্দর্য' (তৃতীয় ভাগ, পৃ. ৯১৯) বর্ণনা করতে গিয়ে কেশবচন্দ্র সেন বলেছেন, "যুগে যুগে সকল ভক্তকেই তোমার প্রকৃতি মুগ্ধ করিয়াছে। প্রকৃতি চিরকালই সুন্দর।…তোমার প্রকৃতি যুগে যুগে ভক্তচিত্তকে হরণ করিয়াছে, তোমার দিকে টানিয়া লইয়াছে, এ যুগে কি তাহা হইবে না?…প্রেমিক, আমাদের প্রেমিক কর, ভাবুক, আমাদের ভাবুক কর, সুন্দর, আমাদিগকে সুন্দর কর।

১. কেশবচন্দ্র সেন, আচার্যের প্রার্থনা, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫০৮-৫০৯। ২. তদেব, পৃ. ৫১১-৫১২।

তোমার রসপূর্ণ সৃষ্টি যেন আমাদের নিকটে নীরস না হয়।...চারিদিক পবিত্র, চারিদিক সুন্দর, ইহা দেখিয়া মনকে যেন প্রেমিক ও পবিত্র করিতে পারি।"[১] গিরি, নদ, নদী, নির্ঝর যেমন ঈশ্বরমহিমা ঘোষণা করছে—তেমনি আমরাও যেন ঈশ্বরের মাহাত্ম্য কীর্তন করি।

দৈনন্দিন কর্মক্ষেত্রে কেশবচন্দ্রকে বহু বিবাদ ও বিরোধের সম্মুখীন হতে হয়েছে বারবার। হয়তো সর্বদা তিনি অন্তরের প্রশান্তি রক্ষা করতে পারেন নি। তখন ক্ষুব্ধ উত্তপ্ত চিত্তের শান্তি লাভ করেছেন হিমাচলের ধ্যানগম্ভীর প্রশান্তি ও তন্ময়তা থেকে। হিমালয়ের শিখরে অনন্ত হিমানী রৌদ্রতাপেও তাপিত হয় না। "তোমার মত আমার মাথায় অমনই অনন্ত হিমানী থাকিবে, আমি কিছুতেই রাগিব না।...পাহাড়ের মত গম্ভীর, শান্ত হইয়া থাকিব।"[২]

শারদীয়া প্রকৃতি ও ভাগীরথীর প্রতি তিনি বারবার আকৃষ্ট হয়েছেন। বাল্যকাল অবধি ভাগীরথীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয়। নিত্য প্রভাতী গঙ্গাস্নান, কিংবা বাল্যকালে, গঙ্গাবক্ষে নৌকাযোগে মাতুলালয়-ভ্রমণ তাঁকে ভাগীরথীর প্রতি অন্তরঙ্গ করে তুলেছিল। তিনি বহুবার সংকীর্তন করতে করতে ভাগীরথীর বক্ষ মুখর করে তুলেছেন। কতবার তিনি সদলে ভাগীরথী অতিক্রম করে দক্ষিণেশ্বর গিয়ে পৌঁছেছেন। "শান্ত স্বভাবা গঙ্গে, তুমি বড় প্রাণকে টান।"[৩] "আজ আকাশে চন্দ্র, স্থলে গঙ্গা, ও সমীরণ, এই শীতল স্থানে প্রাণটা যেন জুড়াইয়া যায়। যার নামে মধু ঝরে, অমৃত বর্ষণ হয়।... কোটি কোটি প্রেমপুষ্প ফুটিল। গঙ্গা চন্দ্র তাহার সাক্ষী।"[৪]

শরৎকালের নব জ্যোৎস্না আকাশকে যখন আলোকিত করে তখন ভাবুক কেশবচন্দ্র সেনের ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তার কারণ, "ভক্তের নিকট চন্দ্রের প্রত্যেক জ্যোৎস্না কিরণের মধ্যে মার প্রেমের কণা দেখা দিবেই দিবে।... হে দীনবন্ধো, হে সৌন্দর্য সিন্ধো, তুমি যে সুন্দর, সেইটি আজ আমাদের স্মরণের দিন। শরৎকালের সৌন্দর্যের সঙ্গে সঙ্গে কেবল বৃদ্ধি—আনন্দ বৃদ্ধি, সম্পদ বৃদ্ধি, ধান্য বৃদ্ধি, ধন বৃদ্ধি। আজ দেখছি, গঙ্গা পরিপূর্ণ, আমাদের বাড়ীর কমল সরোবর বর্ষার জলে পরিপূর্ণ চারিদিকে কমল ফুল ফুটিয়াছে।"[৫]

১. কেশবচন্দ্র সেন, আচার্যের প্রার্থনা, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯১৯-৯২০। ২. তদেব, ৪র্থ ভাগ, পৃ. ১২৯৩। ৩. তদেব, ২য় ভাগ, পৃ. ৫৯৫। ৪. তদেব, ২য় ভাগ, পৃ. ৫৯৫। ৫. তদেব, ৩য় ভাগ, পৃ. ১০৭৯-১০৮০।

**বিধান ভগ্নীসঙ্ঘ:** ধর্মরাজ্যই আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের পরিচিত ক্ষেত্র। জীবনের অধিকাংশ সময়ই ধর্মসংগঠন, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ-স্থাপন, নববিধান-প্রচার ইত্যাদি কাজের মধ্যে ব্যয়িত হয়েছে। তাছাড়া নারী-জাগরণের প্রধান উদ্বোধক ছিলেন কেশবচন্দ্র সেন। বামাবোধিনীসভা (১৮৬৩), ব্রাহ্মিকা সমাজ (১৮৬৫) ও আর্যনারী সমাজ (১৮৭৯) ইত্যাদি প্রকল্পের মধ্য দিয়ে নারীপ্রগতির আন্দোলনকে প্রচণ্ড রূপে সচল করেছিলেন তিনি। তাই শুধু ধর্মের ক্ষেত্রে পুরুষ সর্বত্যাগী প্রচারক নয়, খ্রীষ্টান নরনারীর অনুকরণে তিনি 'ব্রাহ্মিকা দল' সৃষ্টি করেছিলেন। এসব নারীদের জন্য তিনি যে উপদেশ দিতেন সেগুলি সন্নিবেশিত হয়েছে—'বিধান ভগ্নীসঙ্ঘ' গ্রন্থে। এই গ্রন্থটিতে জানুয়ারী ২৭, ১৮৭২ থেকে নভেম্বর ৫, ১৮৮২, খ্রীঃ পর্যন্ত ব্রাহ্মিকা মেয়েদের জন্য প্রদত্ত উপদেশ সংকলিত হয়েছে, এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশে 'স্ত্রীর প্রতি উপদেশ' ও 'সুখী পরিবার' নামে দুটি সুবৃহৎ প্রবন্ধও সন্নিবেশিত হয়েছে।

প্রাচীন ভারতীয় বৈদিক নারীর আদর্শে তিনি উনিশ শতকের নারীদের উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন। পৃথিবীর অনিত্য সুখ পরিত্যাগ করে অনন্ত জীবনের উদ্দেশে হবে এই নারীদের যাত্রা।[১] (মৈত্রেয়ীর মীমাংসা ও ব্রহ্মমন্দিরে আহ্বান) সীতা সাবিত্রী গার্গী মৈত্রেয়ী—পুণ্যবতী নারীরা হবে ব্রাহ্মিকা নারীদের অনুসরণীয়। সংসারে থেকে যোগ ভক্তির সাধনা করে পরম জননীকে ভক্তির সঙ্গে পূজা করে সংসারে ও জীবনে সমুদয় ঘটনায় তাঁরই প্রেম উপলব্ধি করতে হবে। নির্জনে সাধনা করতে হবে, নির্জনে ব্রহ্মপূজা, সদ্‌গ্রন্থ পাঠ, সৎপ্রসঙ্গ করে সুখী ও শুদ্ধচরিত্র হতে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন।[২]

ব্রাহ্মিকাদের প্রতি ধর্মজ্ঞান সহজ ভাষায় পরিবেশিত হয়েছে। ঈশ্বর সমস্ত ধর্মের মূলে। ধর্মের মূল সত্য তিনিই প্রেরণ করেন। ব্রাহ্মধর্মে 'ঈশ্বর স্বয়ং গুরু ও উপদেষ্টা'। বহির্জগতের বিচিত্র কর্মযজ্ঞ ও মানবের অন্তর-জগতের নিগূঢ়তম রহস্য এক ঈশ্বর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। উপদেশটিতে কেশবচন্দ্র সেন বিজ্ঞানের রহস্য ও দর্শনের তত্ত্ব সরলমতি নারীদের বোধগম্য করেছেন সহজ ভাষা ও সরল উপমার মধ্য দিয়ে। ভাষাও স্বাভাবিকভাবেই কবিত্বমণ্ডিত।

---

১. কেশবচন্দ্র সেন, বিধান ভগ্নীসঙ্ঘ, পৃ. ৯। ২. তদেব, আদর্শচরিত্র, পৃ. ২০০।

"সূর্য কেমন বহুদূর হইতে আলোক ও উত্তাপ বিস্তার করিতেছে ও শস্যোৎপাদন করিতেছে। চন্দ্র কেমন সুস্নিগ্ধ জ্যোৎস্না বিকীর্ণ করিয়া পরিশ্রান্ত জগৎকে শান্তি ও নিদ্রার ক্রোড়ে সমর্পণ করে। ভাবী শিশুসন্তানের জন্য মাতার স্তনে কেমন যথা সময়ে দুগ্ধের সঞ্চার হয়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে কেমন সরস ফলেব প্রাচুর্য ও শীতপ্রধান দেশে জন্তুসকল কেমন উষ্ণ বস্ত্রোপযোগী লোমে পবিপূর্ণ। ইহাতে ঈশ্বরেব অপার দয়া দেখিয়া কে না বলিয়া উঠে, 'ধন্য কৃপানিধি'।"[১]

দৈববাণী—বিবেকেব বাণী অন্তবে উপলব্ধি করতে হবে, 'প্রত্যেকে প্রচারিকা হও', 'তোমবা ঈশ্বরেব দাসী', 'পিতার ঘরে থাক', 'পুরুষদের অনুকরণ করিও না', 'প্রশস্ত প্রেমের দৃষ্টান্ত দেখাও', 'ভাই ভগ্নীদের সেবা কর' ইত্যাদি উপদেশাবলীব মধ্যে ব্রাহ্মিকাদেব জীবনচর্যার সুনির্দিষ্ট পথটি বাববার দেখিয়ে দিয়েছেন। কঠিন ধর্মচর্যার মধ্য দিয়ে তারা যোগ সাধন কববে ও এই 'সংসাবে স্বর্গভোগ করবে। ঈশ্বরের সঙ্গে যখন তাব যোগে দর্শন হবে তখনই তাব সাধনার সিদ্ধি, তখনই সে স্বর্গভোগ করবে। ব্রাহ্মিকার হৃদয় প্রকাণ্ড আনন্দবসে বিহ্বল হয়ে আছে। মাঝে মাঝে 'মা' 'মা' আত্মগত কণ্ঠে উচ্চারণ কবছে। এই উপদেশ ও এই বর্ণনা আমাদের কাছে নীরস নিঃসন্দেহে। ব্রাহ্মদের বিশিষ্ট মত ও পথ বর্ণিত হয়েছে বলে সাধারণ পাঠক-পাঠিকারা এজাতীয় উপদেশে মনোযোগী হন না। কিন্তু উপদেশের বসহীন বাক্যজালেব মধ্যে মাঝে মাঝেই সাহিত্যেব সামগ্রী লাভ করা যায়।

"স্নিগ্ধ শান্ত সন্ধ্যাকালে ব্রহ্মকন্যা ছাদের উপর বসিযা স্বর্গেব সৌন্দর্যবস পান করিতেছেন। প্রাণেশ্বরী করুণাময়ী স্বর্গের শোভা দেখাইয়া তাঁহার কন্যার মত ভুলাইয়া লইয়াছেন। স্বর্গের দেবীদিগকে দেখিয়া ব্রহ্মকন্যা মোহিত হইয়া গিয়াছেন।"[২] এখানে কেশবচন্দ্র শান্ত সান্ধ্য প্রকৃতির বুকে এক অতীন্দ্রিয় চিত্র সৃষ্টি কবে দিব্য ভাবটি ব্যক্ত করেছেন।

"স্বর্গ পৃথিবীর মধ্যে, সংসারে যোগ ভক্তি বৈরাগ্য। তোমরা হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া সেই স্বর্গবাসিনী সাধ্বীদিগের সঙ্গে আলাপ কর। ব্রহ্মপরায়ণা ব্রাহ্মিকা যখন স্বর্গীয় সুরে ভক্তির সহিত মধুর ব্রহ্মনাম গান করেন, সেই

---

১. কেশবচন্দ্র সেন, বিধান ভগ্নীসজ্ব, ঈশ্বব স্বয়ং গুরু উপদেষ্টা, পৃ. ২৭। ২. তদেব, সংসারে স্বর্গভোগ, পৃ. ১২৭।

স্বর্গের দেবীরা আসিয়া তাঁহার রসনাতে বসেন। তোমাদের মধ্যে যদি কোন ভক্ত থাকেন, তিনি বলিবেন, ছাদের উপর মাকে ডাকিতেছিলাম, মার চারিপাশে কতকগুলি মূর্তিমতী ভগিনীকে দেখিলাম। মার সঙ্গে যোগীকন্যা, ঋষিকন্যা এবং বৈরাগিনীদিগকে দেখিয়া মন আরও কৃতার্থ হইল। তাঁহারা অশরীরী, তাঁহাদিগের গায়ে কোন অলংকার নাই, কিন্তু বিচিত্র ফুলে তাঁহারা অত্যন্ত সুন্দরী।" ( পৃ. ১৯৬ )

এখানেও স্বর্গীয় সৌন্দর্য, ও স্বর্গীয় দিব্য ভাবটি পরিশুদ্ধ অলৌকিক চিত্র রচনার মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন।

এই গ্রন্থটিতে বিভিন্ন বিষয়ে কেশবচন্দ্রের সিদ্ধ মনন আলোচিত হয়েছে। নারীরা গৃহের শ্রী গৃহলক্ষ্মীরূপে প্রতিগৃহে অধিষ্ঠিত। লক্ষ্মী "ঈশ্বরেরই একটি স্বরূপ প্রতি গৃহে অধিষ্ঠিত। 'লক্ষ্মী' ঈশ্বরেরই' একটি স্বরূপ। গৃহে লক্ষ্মীশ্রী রক্ষার জন্য তিনি আর্যনারী-সমাজে উপদেশ দিয়েছেন—"সংসারের সমুদয় কার্য সুনিয়ম ও সুশৃঙ্খলার সহিত করা উচিত। নতুবা সেই লক্ষ্মীর অবমাননা করা যায়। সামান্য দ্রব্যকে অবহেলা বা অপচয় করা হইবে না। গৃহকর্মে অলস হইয়া সংসারে অনিয়ম আনয়ন করিলে পাপ হয়।"[১] শৃঙ্খলা ও সুনিয়মের মধ্যেই যে সৌন্দর্য ফুটে ওঠে, সংযমই যে সৌন্দর্যের ভিত্তি সেটি কেশবচন্দ্র সেন জানতেন, আচার্যরূপে সেটি সাধারণকে অবগত করাতেন।

১৭ই জুলাই, ১৮৭৯ খ্রীঃ আর্যনারী সমাজে স্ত্রীলোকের বিশেষ বিশেষ দোষের উপর আলোকপাত করেন। স্ত্রীজাতির অন্য নারীর দোষ কীর্তন করা, পরশ্রীকাতরতা, প্রবল আসক্তি, স্বার্থপরতা, আবেগপ্রবণতা ইত্যাদি দোষের উল্লেখ করেছেন। তিনি শুধু যোগী নন, নারীদের মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে তিনি সবিশেষ ওয়াকিবহাল ছিলেন সেটি বুঝে নিতে কষ্ট হয় না।

সহজ গল্পের ভঙ্গীতে পরিচিত বস্তুর উপমা দিয়ে গভীর তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেছেন ও সাধারণ ভোগী চিত্তকে ত্যাগের পথে, ঈশ্বরের পথে আকর্ষিত করেছেন। স্ত্রীর অলংকারে স্ত্রী-জাতির প্রবল অলংকার-স্পৃহার কথা বলেছেন। সেই আকাঙ্ক্ষাকে বাদ দিতে বলেন নি—এই কামনাকে শুধু 'মোড় ফিরিয়ে' দিতে হবে। জগজ্জননী নিজেই জগতের ভূষণ, জগতের চন্দ্রহার। "যে স্ত্রী সেই ভুবনমোহিনী জগজ্জননীকে আপনার মস্তকে, কণ্ঠে, হৃদয়ের মধ্যে, প্রাণের মধ্যে রাখিয়াছেন, তাঁহার ন্যায় সুন্দরী আর কে? সেই

১. কেশবচন্দ্র সেন, বিধান ভগ্নী সজ্ঞ, লক্ষ্মীশ্রী. পৃ ১৭২।

জননীর প্রেমানন্দরূপ অলংকার পরিলে স্ত্রীজাতির স্বাভাবিক অলংকার স্পৃহা পূর্ণ হয়।"[১]

ব্রাহ্ম সমাজে ঈশ্বরকে মাতৃনামে ডাকা, মাতৃভাবে বিভোর হয়ে যাওয়া কেশবচন্দ্রেই আমরা প্রথম দেখি। কেশবচন্দ্রের সাধনার শেষ-পর্যায়ে মাতৃভাবটি প্রবল হয়ে ওঠে। ১৮৭৯ খ্রীঃ প্রচার-যাত্রাকালে প্রচারকগণ সকলে ঈশ্বরকে মাতৃনামে সম্বোধন করেন। মাতৃনামের সঙ্গে অনেক মধুর ভাব জড়িত হয়ে আছে। মার স্বভাব অতি কোমল, মার ভাব অতি মধুর—মা কখনও সন্তানকে কোল ছাড়া হইতে দেন না।[২] মা ডাকে সন্তপ্ত সন্তান মাতৃক্রোড়ে আশ্রয় পায়। কল্যাণী জননী স্নেহচ্ছায়ায় সন্তানকে শত বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্বিরোধ ও তার ফলস্বরূপ ১৮৭৮ খ্রীঃ ১৫ই মে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতিমধ্যে কুচবিহার বিবাহ-ব্যাপারে তাঁকে তাঁর প্রিয় ভাইদের কাছে যথেষ্ট অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতে হয়েছে। মানসিক এই সংঘাতকালে একমাত্র শান্তি পাওয়া যায় মাতৃকোলে এবং প্রিয় ভাই বোনেদের জন্যে মার কাছে প্রার্থনায়। ইতিমধ্যে ১৮৭৫ খ্রীঃ কেশবচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সংস্পর্শে এসেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মাতৃসাধনা তাঁকে হয়তো কিছুটা প্রভাবিত করেছিল। জগজ্জননীকে আকুলভাবে 'মা মা' ডেকে যে সাধনা তার মধ্যে মধুর ভক্তি বর্তমান। মধুর ভক্তিভাবে পূজা-অর্চনা কেশবচন্দ্র বাল্যকাল থেকেই নিজ পরিবারে দেখে এসেছেন—সেটিও হয়তো তাঁকে কিছুটা প্রভাবিত করেছে। এই কারণেই তিনি ১৩ই ডিসেম্বর ১৮৭৯ খ্রীঃ 'আর্যনারী-সমাজে' উপদেশ দানকালে বলেছেন, "জননী সমান করেন পালন সবে বাঁধি আপন স্নেহগুণে আমাদিগের অতি প্রাচীন সংগীতে এই কথা আছে। কিন্তু এখন যেভাবে আমরা ঈশ্বরকে মা বলিয়া সম্বোধন করিতেছি, সেই ভাব সম্পূর্ণরূপে নূতন। আমাদিগের বিশেষ বিশেষ অভাব অনুসারে ঈশ্বর তাঁহার স্বর্গ হইতে সময়ে সময়ে এক একটি নূতন ভাব প্রেরণ করেন। ঈশ্বর দেখিলেন এখন ব্রাহ্মদিগের যেরূপ অবস্থা, ইহাতে তাঁহারা কেবল তাঁহাকে দয়াময় গুণনিধি বলিলে তাহাদিগের পরিত্রাণ হইবে না, এইজন্য তিনি আমাদের নিকট তাঁহার মিষ্টতর 'মা' নাম প্রেরণ করিলেন।"[৩]

১. কেশবচন্দ্র সেন, বিধান ভগ্নীসভা, পৃ. ১৭৮-১৭৯। ২. তদেব, 'মাতৃভাব' পৃ. ১৮৩।
৩. তদেব, পৃ ১৮২-১৮৩।

উনিশ শতকের ব্রাহ্ম-আন্দোলন শুধু নূতন ধর্মই প্রবর্তন করে নি, নূতনতর সংস্কৃতিরও জন্ম দিয়েছে সত্যং শিবং সুন্দরম্-এর প্রকাশে। ব্রাহ্মধর্ম সন্ন্যাসীর নির্জন সাধনার ধর্ম নয়। সংসারে থেকে বহু বিচিত্র কর্ম-প্রবাহের মধ্যে নানা মানুষের মঙ্গলময় সম্পর্ক স্থাপন ও ব্রাহ্মধর্মানুগ জীবনযাপনই আদর্শ ব্রাহ্মের কর্তব্য মনে করা হয়েছে। "ফলে একদিকে যেমন মানুষের জীবন সত্যের নির্মল আভায় সুন্দর ও উজ্জ্বল হয়ে উঠল অন্যদিকে অধ্যাত্মসাধনা এক নূতন উন্নতরূপে দেখা দিল। ...সামাজিক জীবনের সঙ্গে অধ্যাত্মসাধনার মিলন ঘটানোতে সমাজ সংস্কারও দ্রুতবেগে অগ্রসর হতে লাগল। সেকালে জাতিভেদ লোপ, নরনারীর সমান-অধিকার প্রতিষ্ঠা, স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রচলন, অসবর্ণ-বিবাহবিধি প্রণয়ন প্রভৃতি আন্দোলনের প্রভাব ও সাফল্য থেকে বোঝা যাবে যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোকের সত্য-সাধনা কি অসাধ্য সাধন করতে পারে। এই সময় থেকে লোকে ব্রাহ্মদের চিনতে পারল শুধু একেশ্বরবাদী বলে নয়, শুধু বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ধর্ম-অনুসরণকারী বলে নয়, পরন্তু ধর্মনিষ্ঠ, চরিত্রবান, উন্নতজীবনে-অধিকারী ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ বলে।"[১] এইভাবে ব্রাহ্মরা স্বতন্ত্র সংস্কৃতির অধিকারী হয়ে উঠলেন। এই বিকাশশীল সংস্কৃতির ও কৃষ্টির প্রবাহে নারীদের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। উনিশ শতকের মেয়েরা আলোক-প্রাপ্ত হয়েছে, স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতা তাদের স্বাধিকার ফিরিয়ে দিয়েছে—এই নব-সংস্কৃতি উষাকালে দৈনন্দিন জীবনে ও গৃহে ব্রাহ্মিকা নারীদের কর্তব্য কেশবচন্দ্র সেন নির্ধারণ করেছেন ২৭শে ডিসেম্বর ১৮৭৯ খ্রীঃ প্রদত্ত উপদেশে—"পুরুষদের সহিত কিরূপে কথা কহিবে, কিরূপে ব্যবহার করিবে, মন্দ স্ত্রীলোকদিগের সহিত কি প্রকার ব্যবহার করিবে, সন্তানাদির শিক্ষা ও পালন কিরূপ হইবে, তাহাদিগকে কিরূপ বস্ত্রাদি পরিধান করাইবে, গৃহ-সকল কিরূপে পরিষ্কার ও সজ্জিত রাখিবে, কি প্রকার পুস্তকাদি পাঠ করিবে, পুষ্পের সম্মান ও আদর রক্ষা কি প্রকারে করিবে এই প্রকার সমুদয় বিষয়ের সুনিয়ম প্রস্তুত কর।"

এদের গৃহসজ্জা, বস্ত্র, সন্তানগণের বেশভূষা, আচার-ব্যবহার, কথা ইত্যাদি বিষয়গুলি সুনীতি, শৃঙ্খলা ও সর্বোপরি সৌন্দর্য-বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে এরা তৎকালীন ভারতীয়দের মধ্যে স্বতন্ত্র কৃষ্টি স্থাপনে সক্ষম

১. অমিয়কুমার মজুমদার, ভারত সংস্কৃতি, পৃ. ৩৫৯ ৩৬০।

হয়েছিলেন। "এই সকল দেখিয়া লোকে স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে, তোমরা আর্যনারী সমাজের অন্তর্গত এবং যথার্থই আর্যনারী।"

সাধুসমাগম (১৮৮৭ খ্রীঃ): সাধুসমাগম গ্রন্থটির বিষয়বস্তুতে অভিনবত্ব আছে। মহাসাধু মুসা, সক্রেটিস, শাক্য, প্রাচীন ভারতীয় ঋষি, খ্রীষ্ট, মোহম্মদ, চৈতন্য ও বিজ্ঞানবিদ্‌দের সমাগম এই গ্রন্থের পর্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। সাধুসমাগম গ্রন্থটির রচনার উদ্দেশ্য ও এর বিষয়বস্তু নববিধান ধর্মচর্যার সঙ্গে একান্ত যুক্ত। নববিধান সমন্বয়ের ধর্ম। কেশবচন্দ্রও নিজের জীবনে আচার-অনুষ্ঠান ও ধর্মের মধ্য দিয়ে সমন্বয়-সাধনা করে গেছেন। নববিধান ধর্মে যেমন সকল ধর্মের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়েছে তেমনি সকল দেশের সাধু-গুরুদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদিত হয়েছে। "ঈশা, মুসা, মহম্মদ, চৈতন্য সকলেই তোমার ভক্তিভাজন। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা কেবল আপন আপন ধর্মশাস্ত্র ও সাধুদিগের সমাদর করে। খ্রীষ্টান কেবল খ্রীষ্ট এবং বাইবেল, মুসলমান কেবল মহম্মদ ও কোরাণ, শিখ কেবল নানক ও গ্রন্থকে আদর করে, কিন্তু নববিধানের লোকের নিকট বেদ, বেদান্ত, বাইবেল, কোরাণ, প্রভৃতি সমস্ত ধর্মশাস্ত্র আদৃত।" তাছাড়া সাধুরা ঈশ্বর-সোপান—সকল সম্প্রদায়ের সাধুদের সম্মান না করলে, ভক্তকে উপযুক্ত মর্যাদা না দিলে ঈশ্বরকে সম্মান করা হয় না। সাধু মহাত্মাদিগের প্রতি শ্রদ্ধা কেশবচন্দ্রের বিভিন্ন উপদেশ ও প্রার্থনায় সব সময়ই প্রকাশ পেয়েছে। কখনও 'মহাজন মানবজাতির প্রতিনিধি'[১] মনে করেছেন, কখনও ঈশ্বরের স্থানেই মহাপুরুষদের বসিয়েছেন—'যেখানে ঈশ্বর সেখানে ভক্ত'।[২]

২৬শে জানুয়ারী ১৮৭৯ খ্রীঃ নববিধান ঘোষিত হয়। ২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৮৮০ খ্রীঃ বিধান মাহাত্ম্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন, "নববিধান চারিদিকে এই সমাচার বিস্তার করিয়া দিল যে, এই পৃথিবীর মধ্যেই স্বর্গের মহাত্মাদিগকে পাওয়া যাইবে এবং যিনি স্বর্গের স্বর্গ, দেব-দেব মহাদেব তিনি পৃথিবীর ঘরে বেড়াইয়া পুণ্য শান্তি বিতরণ করিতেছেন।... এখানেই, এই পৃথিবীতেই ব্রহ্মভক্তেরা সশরীরে স্বর্গভোগ করেন, ইহা নূতন বিধানের কথা।...পরলোকবাসী ঈশা শ্রীচৈতন্য প্রভৃতির সঙ্গে দেখা করিতে হইলে

১. আচার্য কেশবচন্দ্র সেন, সেবকের নিবেদন, ৪র্থ খণ্ড (১৭ই শ্রাবণ ১৮০৩ শক)।
২. তদেব, ৭ম খণ্ড (১৫ই ফাল্গুন, ১৭৯৮ শক)।

এখন আর মরিতে হয় না, কিন্তু বিশ্বাস-চক্ষু উন্মীলিত হইলে এই পৃথিবীতেই তাঁহাদিগকে দেখা যায়, তাঁহাদিগের সাধু আত্মা জীবন্ত চরিত্রের আকারে এই পৃথিবীর পথে পথে বেড়াইতেছেন।"[১] এছাড়া নববিধান ঘোষণার কয়েক-দিন আগে ১৮০১ শকের ২৮শে পৌষ, রবিবার ব্রহ্মমন্দিরে স্বর্গীয় মহাত্মাদিগের উৎসব বিষয়ে যে উপদেশ দেন তাতেও সাধুসমাগম সম্বন্ধে কেশবচন্দ্রের মূল ধারণাটি প্রকাশিত হয়েছে। নববিধান ঘোষণার পরেই স্বর্গীয় সাধুদের ভাবে ভাবিত হয়ে সাধনা ও সেই ঘনীভূত ভাব নিয়ে উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে এক-একটি বিশেষ সাধু মহাজনের জীবন কয়েকদিন ধরে পাঠ, আলোচনা, ধ্যান ও উপাসনা করা হয়; এবং এই সাধনার মধ্য দিয়ে সেই বিশেষ সাধুর সঙ্গে একটা আত্মিক যোগের সৃষ্টি হয়, তারপর নির্দিষ্ট দিবসে তীর্থযাত্রীর মত সকলে গভীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে অন্তর-জগতে সেই সাধুদের সান্নিধ্যলাভ করেন। এটি ধর্মসাধনার ইতিহাসে নিঃসন্দেহে অভিনব। 'সাধুসমাগমের' ব্যাপারটি অন্তরজগতের ধ্যান-জগতের হলেও Indian Mirror পত্রিকার সংবাদে বিষয়টি প্রচারিত করা হয়েছিল—"It is proposed to promote communion with departed saints among the more advanced Brahmos. With a view to achieving this object successfully, ancient prophets and saints will be taken one after another on special occasions and made the subject of close study, meditation and prayer. Particular places also will be assigned to which devotees will resort as pilgrims. Therefore hours together they will try to draw inspiration from particular saints."[২]

২২শে ফেব্রুয়ারী, ৮৮০ খ্রীঃ থেকে ৩রা অক্টোবর ১৮৮০ খ্রীঃ মধ্যে প্রায় নিয়মিতভাবে সাধুসমাগমের আটটি অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়। এই অনুষ্ঠানগুলি সকল ভক্তের কাছে খুবই আকর্ষণীয় হয়েছিল। এরপর থেকে প্রতি ভাদ্রোৎসবে সাধুসমাগম উৎসবটি অত্যন্ত আগ্রহে অনুষ্ঠিত হত। এই উৎসবগুলির বিস্তারিত বিবরণ তৎকালীন 'ধর্মতত্ত্ব' ও 'মিরর' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই অনুষ্ঠানে আচার্যের বেদী থেকে

১. আচার্য কেশবচন্দ্র সেন, আচার্যের উপদেশ, বিধানমাহাত্ম্য, পৃ ২২৩-২২৫। ২. Indian Mirror, ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৮৮০ খ্রীঃ।

কেশবচন্দ্র সেন যে প্রার্থনাগুলি করেন সেগুলিই সাধুসমাগম গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

এই গ্রন্থটির দুটি অংশ—প্রথম অংশ—(১) মুসা সমাগম, (২) সক্রেটিস সমাগম, (৩) শাক্য সমাগম, (৪) ঋষিদিগের সমাগম, (৫) খ্রীষ্ট সমাগম, ৬) মোহম্মদ সমাগম. (৭) চৈতন্য সমাগম, (৮) বিজ্ঞানবিৎ সমাগম। ১৮০১ শকের ১১ই ফাল্গুন থেকে ৯ই চৈত্র পর্যন্ত মুসা, সক্রেটিস, শাক্য ঋষিগণ ইত্যাদি মহাত্মাদের আগমন-উৎসব সম্পন্ন হয়। ইতিমধ্যে কেশবচন্দ্র সেন নৈনিতালে স্বাস্থ্য-উদ্ধারের জন্য যান। সেখান থেকে ফিরে এসে ২৫শে শ্রাবণ থেকে ১৮ই আশ্বিন পর্যন্ত খ্রীষ্ট, মোহম্মদ, চৈতন্য ও বিজ্ঞানবিদ্ সমাগম হয়। এই গ্রন্থের উত্তরাংশে আছে—(১) জগজ্জননী এবং তাঁহার সাধু সন্তানগণ, (২) পৃথিবীর মহাজনগণ, (৩) স্বর্গীয় সাধুদের জীবনসাধন, (৪ সাধু সম্মান, (৫) সাধু ও মনীষিগণের সমাগম, (৬) সাধু দর্শন।

প্রতি বছর ভাদ্রোৎসব ও সাম্বৎসরিক মাসোৎসবের সময় সাধুসমাগম অনুষ্ঠানটি যে যে প্রার্থনার মধ্য দিয়ে পালিত হয়েছে সেই প্রার্থনাগুলিই এই পর্যায়ে সংকলিত হয়েছে।

সাধুদের সমাগম চিন্তার মধ্যে যেমন অভিনবত্ব আছে, তেমনি প্রার্থনাগুলির ভঙ্গীটিতেও নতুনত্ব আছে। মহাপুরুষগণকে অতীতের জীবন থেকে উদ্ধার করে আপন অন্তরে মহাপুরুষদিগের ভাব ও তাঁহার ধর্মের উপলব্ধি ঘটাতে হবে। তার জন্য প্রস্তুতি চাই। খ্রীষ্ট সমাগমের জন্য সাতদিন ধরে প্রাস্তুতিক উপাসনা হয়েছিল। সাতদিন বাদে "৮ই আগষ্ট রবিবার, ব্রাহ্ম যাত্রিকগণ আঠার শত বৎসর ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইয়া, জাতীয় ভাবসহকারে ভ্রমণ করিতে করিতে পবিত্রভূমিতে আসিয়া উপস্থিত। এখানে তাঁহারা তাঁহাদের জাতীয় ভাব পরিত্যাগ করিলেন এবং য়িহুদীদিগের সঙ্গী হইয়া য়িহুদী হইলেন এবং তাঁহাদের দেশ আপনার দেশ করিয়া লইলেন। এইরূপে ভারতবর্ষের যাত্রিকগণ ঈশার জন্য ভাবে পরিবর্তিত হইয়া তাঁহার প্রিয়পুত্র ঈশাকে দেখাইবার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন।"[১]

প্রার্থনার মধ্যে ঈশার মাহাত্ম্যকীর্তন, "ঈশা কেবল স্বর্গরাজ্যের অন্বেষণ করিতেন, লোকের নিকট স্বর্গরাজ্য আবিষ্কার করিতেন, আত্মার মধ্যে স্বর্গরাজ্য দর্শন করিতেন।...ঈশার বিশ্বাস এবং আধ্যাত্মিকতা তাঁহার শিষ্যগণ

১. কেশবচন্দ্র সেন, সাধুসমাগম, পৃ. ৪১।

## নব চেতনার উদ্গাতা, ধারক ও বাহক

রাজা রামমোহন রায়

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন

নববিধান-সাধকাষ্টক

ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার

ভাই গৌরগোবিন্দ রায়

ভাই গিরিশচন্দ্র সেন

ভাই অঘোরচন্দ্র গুপ্ত

## নববিধান-সাধকাষ্টক

ভাই উমানাথ গুপ্ত

ভাই মহেন্দ্রনাথ বসু

ভাই কান্তিচরণ মিত্র

ভাই প্রসন্নকুমার সেন
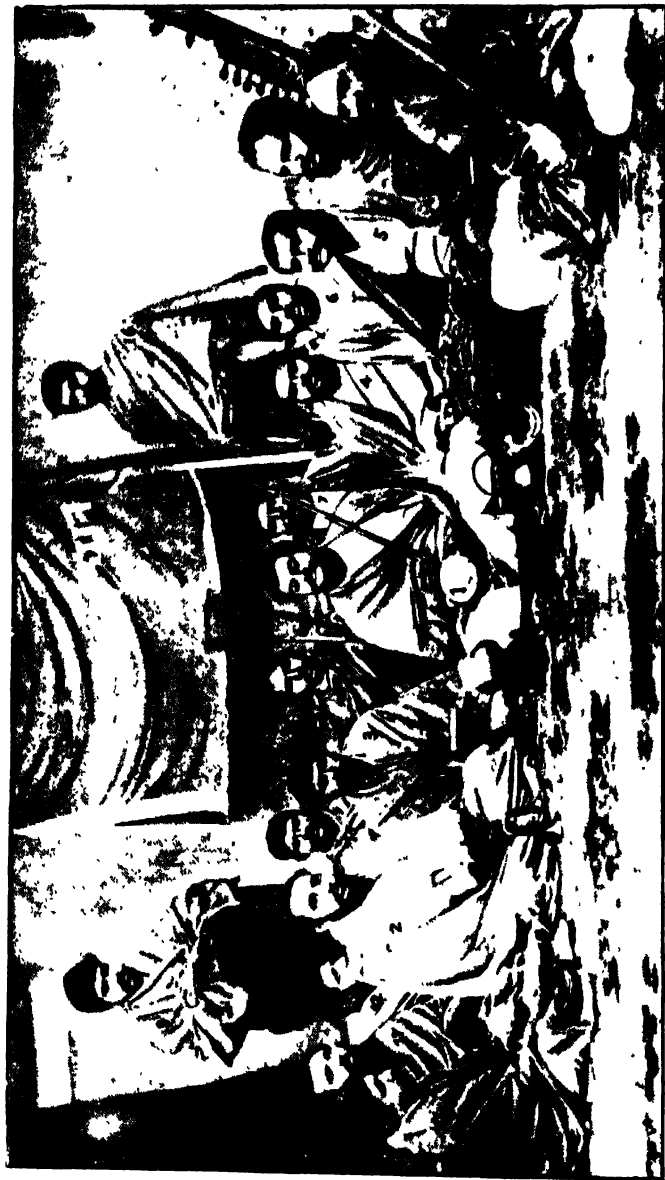
নববিধান সাধকমণ্ডলী

1 কেশবচন্দ্র সেন 2. প্রতাপচন্দ্র মজুমদার 3 গিরিশচন্দ্র সেন 4 অমৃতলাল বসু 5 দীননাথ মজুমদার 6. প্রসন্নকুমার সেন
7 রামচন্দ্র সিংহ 8 মহেন্দ্রনাথ বসু 9 প্যারীমোহন চৌধুরী 10 গৌরগোবিন্দ রায় 11. কেদারনাথ দে 12. বঙ্গচন্দ্র রায়

ভাল বুঝিতে পারিলেন না, এই দেখিয়া তুমি বর্তমান বিধানের মধ্যে পুনর্বার ঈশা-চরিত্রকে আনয়ন করিলে। আমরা যেন তাঁহার নিকট গমন করিয়া বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করি।"[১]

কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁর অনুগামী ভক্তরা সব তীর্থযাত্রী, তাঁরা যেন তীর্থভ্রমণে বের হয়েছেন—"য়িহুদী নগর। চল ভাই যাত্রীগণ, চল। একি? সমুদায় দৃশ্যের পরিবর্তন যে? এ কোন্ দেশ? হিন্দু দেশ তো নহে? য়িহুদীদের দেশ। আমরা সকলে আজ য়িহুদী। এই দেশে কে একজন নবজন্ম গ্রহণ করিয়াছেন? ...সেই শিশু নাকি কাণাকে চক্ষু দেয়, রোগীকে ঔষধ দেয়? সে নাকি একটা নূতন রাজ্য নির্মাণ করিতেছে?"[২] এই ভাবে তাঁরা যাত্রী হয়ে সমস্ত বাইবেলের যীশু-মাহাত্ম্য অবলোকন করেছেন ও অতীতের ধর্ম ও সমাজ ইতিহাসের মধ্যে খ্রীষ্টকে নূতন করে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেছেন। প্রতিটি মহাপুরুষের সমাগমের প্রার্থনায় এই 'ষ্টাইলটি' মেনে চলা হয়েছে। রচনা অত্যন্ত আবেগাত্মক, মাঝে মাঝে যুক্তি হারিয়ে যায়—আবেগে আন্তরিকতায় সাধু গদ্য ও চলিত গদ্যের মিশ্রণ ঘটেছে। "এক গালে চড় মারিলে, অন্য গাল ফিরাইয়া দাও।...ঐ লোকগুলা ওঁকে গালাগালি দেয় কেন? বলে—ধূর্ত্ত, মদখেগো! উনি তো কিছু বলছেন না। রাস্তা দিয়া যে একটি মেষশাবক যাইতেছে। দেশটা কি শাসন করেছেন? নরম ভাবে পৃথিবী পূর্ণ।"[৩]

সুদীর্ঘ আবেগ ও উচ্ছ্বাস-পরিপূর্ণ প্রার্থনার মধ্য দিয়ে কেশবচন্দ্র সেন সমবেত ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে যেন কিছুটা মাদকতা বিস্তার করেছেন আর যাদুকরের মত যেন মন্ত্রবলে তাঁর আকাঙ্ক্ষিত মহাপুরুষের সান্নিধ্যসুখ লাভে সকলকে ধন্য করেছেন।

"ঈশা আমাতে, আমি ঈশাতে, নববিধানে আমরা সকলে ঈশার ভিতরে, আমরা সকলে আবার ঈশাশুদ্ধ ব্রহ্মের ভিতরে। এই ভাঁড়, এই জল। লাগ ভেল্কী, লাগ ভেল্কী লাগ; ঈশার কথা পূর্ণ হল। যে বাঙ্গালী অন্ন খায়, সে ঈশার মাংস খায়। ঈশার রক্ত প্রত্যেক জলের ভিতর। ঈশা আমাদের শরীর হইয়া গেলেন। দেবগণ শঙ্খধ্বনি কর। পৃথিবীর সমস্ত লোকের সঙ্গে ঈশার মিলন হইল।"[৪]

---

১. কেশবচন্দ্র সেন, সাধুসমাগম, পৃ: ৪৫। ২. তদেব পৃ. ৪৬। ৩. তদেব, পৃ. ৪৮। ৪. তদেব, পৃ. ৫৬।

'মোহম্মদ-সমাগমে' ব্রাহ্মরা নূতন শিক্ষা পেলেন। একেশ্বরবাদী মোহম্মদ-মুসলমানরা কাফের-বিরোধী, কাজেই পৌত্তলিকতাকে দূর করতে শক্তি যোগাবেন। মোহম্মদের আদর্শ বেঁচে থাকতে কোন্ পাষণ্ডের সাধ্য ব্রহ্ম-নিন্দা করে? ঈশ্বর-বিরোধী ব্রাহ্মের কাছে শত্রুতুল্য, তাদেরই বিরোধী হবে ব্রাহ্মরা।

শ্রীচৈতন্যদেব প্রেমের পরমপুরুষ। 'চৈতন্য-সমাগমে' সেই প্রেমিক পুরুষের প্রেমে সশিষ্য কেশবচন্দ্র সেন মেতে উঠেছেন। "তুমি ধর্ম দিলে, সুখ দিলে। তুমি তো বলিলে না, ওরে তোরা বৈরাগ্য সাধন কর্। নিজে কৌপীন নিলে, অন্যকে হাসালে। যাকে তোমার মন্ত্রে দীক্ষিত করিলে তাহার হাসি-হাসি মুখ, নাচা-নাচা পা আর হৃদয়ে যোগীর প্রেমানন্দ।...ভাই, তোমার গুণে আমরাও হাসিতেছি। ওহে, হরি-সন্তান, এই দেখ খোল তোমার, চিরকাল তুমি আমাদিগকে মাতাও। তুমি বাহিরে নাচিয়াছ নবদ্বীপে, আমাদের বুকের ভিতর আসিয়া নাচ।"[১] (সাধুসমাগম, পৃ. ৮১, ৮২)।

'খ্রীষ্ট-সমাগম' ও 'চৈতন্য-সমাগম' রচনা হিসাবে শ্রেষ্ঠ। রচনায় আবেগ ও উচ্ছ্বাসের প্রাবল্য সত্ত্বেও স্থানে স্থানে ভাষা সুকুমার শিল্পসৌন্দর্যের পরিচয় দেয়। কেশবচন্দ্রের গদ্য সহজ অলংকরণে অপার্থিব সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে সক্ষম। শ্রীচৈতন্য সম্পর্কে বলছেন, "নারী তোমাকে দেখিবার জন্য সোনার গহনা ফেলিয়া দেয়। সুবর্ণের স্বর্ণ, তুমি জড় সোনা, আর তুমি মানুষ সোনা, তোমাকে ছাড়িয়া লোকে সোনা লইবে কেন?"[২] কিংবা "তোমার ঐ চক্ষের জল হইতে বৈরাগ্যের জন্ম।"[৩] 'খ্রীষ্ট-সমাগমে' ঈশা সম্পর্কে বলছেন, "মাটি তবুও গরম হয়, তুমি ফুলের ন্যায় নরম।"[৪] এইসব অংশ বাঙ্গালা গদ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হতে পাবে। সহজ বর্ণনার মধ্য দিয়ে অলংকার প্রয়োগ করা হয়েছে। অতি নিপুণভাবে কাব্যের বহিঃসৌন্দর্য অন্তরের ভাবটিকে ব্যঞ্জিত করতে সক্ষম হয়েছে। কোথাও বা ভাষা লিরিক কবিতার মত মধুর

---

১. প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে বিখ্যাত বৈষ্ণব ভক্ত পরিবারে কেশবচন্দ্র সেনের জন্ম হয়েছিল। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে খোলকরতাল-সহ সংকীর্তন তিনিই প্রবর্তন করেন। এমন কি 'নগর-কীর্তনে' ঊর্ধ্ববাহু হয়ে মাতৃনামে শহর ও শহরতলি মুখর করে তুলতেন। নরনৃত্যেরও প্রচলন কেশবচন্দ্রই করেন। শ্রীচৈতন্যের মত ভাবে বিভোর হয়ে কীর্তনের সময় তিনি নৃত্যে মত্ত হয়ে উঠতেন। ২. সাধুসমাগম, চৈতন্য-সমাগম, পৃ. ৭৭। ৩. তদেব, পৃ. ৭৯। ৪. তদেব, খ্রীষ্টসমাগম, পৃ. ৫৮।

কবিত্বমণ্ডিত—তাঁহার গৃহ ছিল না, তাঁহার গৃহের প্রয়োজন কি? বিশ্বাস রাজ্য, আত্মার রাজ্যই তাঁহার গৃহ। তিনি গোলাপের দিকে দৃষ্টি করিলে সে তাঁহার মস্তকে ছত্র দিয়া রৌদ্র হইতে রক্ষা করিত। তিনি পদ্মের দিকে দৃষ্টি করিলে সে নিজ বক্ষের মধ্যে তাঁহার জন্য আরামশয্যা প্রস্তুত করিত।... তিনি বৃক্ষেতে, পুষ্পেতে, আকাশেতে, মেঘেতে, পক্ষীতে আত্মার রাজ্যের আশ্চর্য ব্যাপারসকল দর্শন করিতেন।"[১] 'চৈতন্যসমাগম' রচনায় আছে—পৃথিবী অন্ধকার, নবদ্বীপ অমাবস্যাচ্ছন্ন, নবদ্বীপে পূর্ণ চন্দ্রোদয়। শিশু হাসিতেছিল যখন শচীমাতার গর্ভে ছিল। তুমি বিরলে বসিয়া যত সৌন্দর্য তাহার প্রাণের ভিতর ঢালিলে। আকাশের চাঁদকে লজ্জা দিবে বলিয়া এমন সুন্দর চন্দ্রকে গঠন করিলে।"[২]

**ব্রহ্মগীতোপনিষদ:** ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের বারোটি বাঙালা গ্রন্থের ভেতর ব্রহ্মগীতোপনিষদ একটি। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি যোগ ও ভক্তি বিষয়ে যে সব উপদেশ দেন সেগুলি এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। যোগ ও ভক্তির বিভিন্ন আলোচ্য বস্তু এই গ্রন্থটির বিষয়বস্তু—ভক্তি কি? যোগ কি? যোগের গতি, ভক্তির মূল, সাধন ও করুণার ঐক্য, ভক্তির উচ্ছ্বাস, স্থায়ী বৈরাগ্য, নাম-মাহাত্ম্য, নির্গুণ সাধন, ভক্তিসমুচিত বৈরাগ্য ইত্যাদি।

যোগ ও ভক্তি হিন্দুধর্মের দুই প্রধান সাধন-মার্গ। ভক্তির সাধন-গৃহে, সংসারে, পথে-বনান্তরে সর্বত্রই করা সম্ভব। যোগের সাধন কঠোর। গৃহ ত্যাগ করে বনে, গিরিগুহায়, নির্জনতায় যোগ সাধন করতে হয়। সত্যম্-শিবম্-সুন্দরম্ অবলম্বন করে ভক্তি উদিত হয়। "হৃদয়ের কোমল অনুরাগ ভক্তি। সত্য, শিব, সুন্দর এই তিনগুণ উহার উদ্দীপক। ভক্তি বিশ্বাসমূলক। বিশ্বাস ভক্তি বিনা থাকিতে পারে না।"[৩]

যোগ কি?—এ প্রসঙ্গে কেশবচন্দ্র সেন বলেন, "যোগে দুটি পদার্থের আবশ্যক এবং সেই দুই স্বতন্ত্র পদার্থের একত্র মিলন হইলে যোগ হয়। সর্ববিষয়ে দূরত্ব চলিয়া গিয়া ঈশ্বর এবং জীবাত্মার একত্ব উপস্থিত হয়, এই একত্ব বা মিলনই যোগ। এইরূপে যাঁহার ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলন হইয়াছে, তাঁহাকেই যোগী বলে।"

১. কেশবচন্দ্র সেন, সাধুসমাগম, 'খ্রীষ্টসমাগম,' পৃ. ৪২। ২. তদেব, 'চৈতন্যসমাগম', পৃ. ৭৬।
৩. কেশবচন্দ্র সেন, বিধানভঙ্গী সঙ্ঘ, পৃ. ৯।

কিন্তু কেশবচন্দ্র এখানেই থামেননি। যোগ ও ভক্তিকে তিনি মিলিয়ে দিয়েছেন তাঁর 'নববিধান' ধর্মে। "বিশ্বাসভূমি ও শ্রদ্ধাভূমি যোগী এবং ভক্তের এক। শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস বিনা ভক্তি পরিপক্ক হয় না।" দুই বিরুদ্ধ সাধনপদ্ধতির সমন্বয়-সাধনা তিনি আপন জীবনে করে গেছেন। "দশ পনের বৎসর সত্য প্রেম বৈরাগ্য সাধন করিতে লাগিলাম। ক্রমে ভক্তি প্রমত্ততায় পরিণত হইল। ভক্তি যখন বাড়িতে লাগিল, তখন বুঝিলাম, ভক্তিকে স্থায়ী করিবার জন্য যোগ আবশ্যক। হৃদয় যেমন ভক্তের হৃদয়, নয়নটাও তেমনি যোগীর নয়ন হইবে। অনেকে কঠোর যোগের ভিতর পড়িয়া ভয়ানক অদ্বৈতবাদ-সাগরে পড়িয়া গিয়াছেন। আমি দুই দিক বাঁধিলাম, আমার ভক্তি যোগকে অবলম্বন করিয়া থাকিত।"[১]

প্রকৃতপক্ষে কেশবচন্দ্রের জীবনে ত্যাগ, তপস্যার ইতিহাস কারো অবিদিত নয়। ১৮৭২ খ্রীঃ ৫ই ফেব্রুয়ারী বেলঘরিয়ায় তপোবন স্থাপন করে যোগ-অভ্যাস আরম্ভ করেন। সেখানেই পরবর্তী কালে ভারত-আশ্রমের প্রতিষ্ঠা হয়। পরে রিষড়া মোড়পুকুরে একটি উদ্যানবাড়ী কেনা হয় ( ১৮৭৬ খ্রীঃ ) ; 'সাধন-কানন' নাম দেওয়া হয় ও সকলে মিলে সেখানে ধ্যান, তপস্যা করেন। এখানে প্রতিদিন কেশবচন্দ্র ভক্তি ও যোগ বিষয়ে উপদেশ দিতেন। প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে ৩টার সময় উপদেশ আরম্ভ হত। উপদেশের শেষে প্রার্থনা ও সবশেষে কীর্তন। এই উপদেশগুলি শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় লিপিবদ্ধ করেন। গৌরগোবিন্দের অনুলিখিত উপদেশাবলী সমসাময়িক কালের 'ধর্মতত্ত্ব' পত্রিকায় এবং এর ইংরেজি সার Indian Mirror ও Liberal and the New Dispensation পত্রিকায় প্রকাশিত হত। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে এই উপদেশগুলি ব্রহ্মগীতোপনিষদ নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই উপদেশগুলিতে গীতার এক্ষে ভক্তি ও কর্মযোগ এবং উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞান ও যোগের আত্মতত্ত্ব সমন্বয় লাভ করেছে। গ্রন্থের নামটি তাই সার্থক। কেশবচন্দ্র সর্বপ্রথম গীতা ও উপনিষদের সমন্বয় করেন এবং হিন্দুধর্মের বিশিষ্ট সাধনা যোগ ও ভক্তিকে পাশ্চাত্ত্য যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানের সাধনার সঙ্গে সংযুক্ত করেন। গীতা ও উপনিষদের সমন্বয়ের পথ থেকে এক নূতন কর্মযোগ উদ্ভাসিত হল। তৎকালীন স্বাধীনতা-সংগ্রামে ও বিশ্বমৈত্রী-সৃষ্টিতে এই নবতর প্রেরণা বিশেষ কার্যকরী হয়েছিল।

---

১. কেশবচন্দ্র সেন, জীবনবেদ, পৃ. ৭৯-৮১।

**মাঘোৎসব:** মাঘোৎসব উপলক্ষে কেশবচন্দ্র সেনের উপদেশ ও প্রার্থনা —ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষে মাঘোৎসব চলিত হয়ে আসছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সময় থেকে প্রতিষ্ঠা-দিবসে মাঘোৎসব পালিত হত। কেশবচন্দ্র সেনের সময়েও প্রথমদিকে একদিন এই উৎসব প্রচলিত ছিল। পরে প্রায় একমাস-ব্যাপী এই উৎসব পালিত হত আচার্য কেশবচন্দ্রের দ্বারা।

প্রকৃতপক্ষে আচার্য কেশবচন্দ্র উৎসব বলতে শুধু একদিনের আনন্দ-অনুষ্ঠান মনে করেননি। উপরন্তু উৎসবের ভাবটিকে অন্তরে গ্রহণ করে নববিধান-ধর্মের অনুশীলন করাকেই বড় মনে করেছেন। তাই তিনি বছরে একটি দিন শুধু প্রার্থনা, উপাসনা ও সংগীতের মধ্যে দিয়ে যে প্রতিষ্ঠা-উৎসব পালিত হত তাকে সুদীর্ঘ কালব্যাপী অনুষ্ঠানে পরিণত করেন। প্রতিষ্ঠা-দিবসের পূর্বের পনের দিন ধরে প্রস্তুতিপর্ব চলত—ঈশ্বর-সান্নিধ্যের জন্য মনকে প্রস্তুত করতে হবে—ব্রহ্মানন্দ-রস পান করতে গেলে পবিত্র-আত্মা হতে হবে, তারই আয়োজন হত পনের দিন ধরে। পরবর্তী পনের দিন সমাপ্তিপর্ব চলত।

পবিত্র উৎসবের প্রস্তুতি একমাত্র পবিত্র আত্মাতেই সম্ভব। তাই উৎসবের প্রারম্ভে প্রায় পনের দিন আগে থেকে কেশবচন্দ্র সেন অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে নূতন নূতন আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করতেন। যে-দিন যে ভাবের দ্বারা তিনি ভাবিত হতেন সেই বিষয়টির উপরই তিনি প্রার্থনা ও উপদেশ দিতেন। আদি ব্রাহ্মসমাজেও তিনি মাঘোৎসব উপলক্ষে কিছু প্রার্থনা করেছেন। আদি ব্রাহ্মসমাজ ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে প্রথম থেকে জীবনের শেষ পর্যন্ত যেসব বিষয়ে উপদেশ দিয়েছেন ও প্রার্থনা করেছেন সেগুলিই 'মাঘোৎসব' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। ১৮৬২, ২৩শে জানুয়ারী আদি ব্রাহ্মসমাজ 'চিরজীবন-সখা' প্রার্থনাটি থেকে ১৮৮৪ খ্রীঃ ১লা জানুয়ারী 'দেবালয়-প্রতিষ্ঠা' প্রার্থনা পর্যন্ত মাঘোৎসবের সকল প্রার্থনাই আমরা একটি গ্রন্থের মধ্যে পাই।

তিনি 'মাঘোৎসবে' বহু ভাবে-ভাষায় ব্রহ্মবিষয়ে প্রার্থনা করেছেন ও উপদেশ দিয়েছেন—গৃহ শিশু, ভৃত্য, দীনসেবা, দুঃখীদিগের জন্য, আরতি, নববাজার ও আনন্দবাজার—প্রতিটি প্রার্থনাতেই ঈশ্বর ও মানবের সম্পর্কটি নানা উপমার মধ্য দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। কয়েকটি প্রার্থনায় রূপকের ( allegory )—মাধ্যমে ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা দিতে চেয়েছেন। যেমন—'সতী-উদ্ধার', 'পায়রা উড়ান', 'নববাজার', 'খাঁটি প্রেম', 'নবশিশুর জন্ম', 'গরীব বৈরাগী'

ইত্যাদি প্রার্থনা। দুটি প্রার্থনা—'পায়রা উড়ান' বিষয়টি মল্লিকের ঘাটে ১৫ই জানুয়ারী ১৮৮১ খ্রীঃ বক্তৃতা দেন জনসাধারণের কাছে এবং 'সতী-উদ্ধার' বিষয়টির উপর তিনি বীডন পার্কে সমবেত জনতার কাছে ২৪শে জানুয়ারী ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে বক্তব্য উত্থাপিত করেন। এ দুটির রচনারীতি অন্যান্য প্রার্থনাগুলির মত নয়। প্রথমতঃ শুধু ভক্তমণ্ডলীর কাছে মন্দিরে বা উপাসনা নিয়ে বক্তৃতা বা প্রার্থনা নয়, এখানে সমবেত জনমণ্ডলীর মাঝে ভক্ত ও অভক্ত মিশে আছে। 'পায়রা উড়ান'র বিষয়টি সকলের কাছেই পরিচিত, সকলের কাছে সমান ভাবে আকর্ষণীয় বিষয়। কেশবচন্দ্র সেনও নিপুণতার সঙ্গে অতি পরিচিত বিষয়ের রূপকেব মাধ্যমে জীবাত্মা-পবমাত্মা-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন।

এদেশের বড় মানুষ ও নবাবদের আমোদ-প্রমোদ করবার অনেক রকম উপায় আছে। পায়রা-উড়ান ধনীদের একটি প্রিয় প্রমোদ। "পায়রা-উড়ান একটা সামান্য ব্যাপার হইলেও, ইহাতে ধর্মতত্ত্ব নিহিত আছে। পায়রা দলবদ্ধ হইয়া উড়ে কেন? আমার মনে হয় এই উপস্থিত ভদ্রলোকগুলি পায়রার খাঁচা। চিন্ময় জীবাত্মা-পাখী এক খাঁচাব ভিতব থাকে, পাখী স্ত্রী-পুত্র লইয়া গৃহে থাকে না।…জীবাত্মা পক্ষী, বিবেক ও বৈরাগ্য তার দুইটি পক্ষ। পাখী ঐ দুই পক্ষ বিস্তার করিয়া আকাশে উড়িয়া যায়। পাখী, তুমি কি এখনও স্ত্রী-পুত্রে বদ্ধ থাকিবে? যোগী ঋষিদিগের আত্মা-পক্ষী উড়িয়া গিয়াছিল, কিন্তু আমাদের পাখী উড়ে না।"[১]

বিবেক ও বৈরাগ্যের প্রতীক রূপে পায়রাকে কেশবচন্দ্র দেখেছেন। পৃথিবীর দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতার বহু ঊর্ধ্বে চিদাকাশে যোগানন্দে পাখী বিচরণ করে। "হিংসা-নিন্দা নীচে, চিন্তা-দুর্ভাবনা পৃথিবীতে, কাম-ক্রোধ-স্বার্থপরতা মাটিতে বাস করিলেই হয়, আকাশে এসব কিছুই নাই।"[২] পৃথিবীতে নানা গণ্ডগোল, ধর্ম নিয়ে বিরোধ, জাতি নিয়ে বিবোধ। কিন্তু জীবাত্মাকে যদি চিদাকাশে ধ্যানের জগতে মুক্তি দেওয়া যায় তখনই কেবল আনন্দ। ভূমানন্দে সব বিরোধের সমাধান—পরম ঐক্যে মিলন। 'পায়রা উড়ান' নিবন্ধটির ভাষা উল্লেখযোগ্য। গভীর আবেগ ক্ল্যাসিক সংযমে রসঘন হয়ে উঠেছে—"চিদাকাশে আত্মাপায়রা উড়িল, জ্ঞানসূর্যের আলোক পক্ষীর পক্ষের উপর পড়িল, সত্যসূর্যের আলোকে উহা ক্রমাগত উড়িতে আরম্ভ

---

১. কেশবচন্দ্র সেন, মাঘোৎসব, পায়রা উড়ান, পৃ. ৭১। ২. তদেব, পৃ ৭৩।

করিল। যোগী হইয়া বিহঙ্গসকল উড়িতেছে। হিংসা-নিন্দা নীচে, চিন্তা-দুর্ভাবনা পৃথিবীতে, কাম-ক্রোধ-স্বার্থপরতা মাটিতে বাস করিলেই হয়, আকাশে এ সব কিছুই নাই।"[১]

'সতী-উদ্ধার' নিবন্ধটি বক্তৃতা করা হয় বীডন পার্কের সমবেত জনমণ্ডলীর কাছে। সতী সীতা-হরণ হয়েছে। এটি রূপক। ভারতের ধর্মসীতা শত্রুর হাতে পড়লেন, ব্যভিচার ও নাস্তিকতারূপ দশানন মা জানকীকে নিয়ে গেল। কিন্তু এই রাবণ-বধ কে করবে? এর জন্য প্রয়োজন হনুমানকে—জ্বলন্ত ভক্তি ও নিষ্ঠার প্রতীক। রামচন্দ্র সীতা-উদ্ধার করেছিলেন সত্য, কিন্তু তৎসঙ্গে ভাই লক্ষ্মণও ছিল। কঠোর ব্রতধারী আর্যঋষি লক্ষ্মণ চরিত্রবান্ সুতরাং ভক্তিরূপা সতী সীতাকে উদ্ধার করতে হলে আমাদের সকল লোকের ভক্তি ও অন্তরের আকুলতা দ্বারা পুনরায় ভক্তি-বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করতে হবে। হরিনামের জন্য পাগল হতে হবে, হরিনামে মাতোয়ারা হয়ে গড়াগড়ি দিতে হবে। "হরিনাম করে যে ভবপারে যায় সে।"[২] কেশবচন্দ্র সেনের হরিনামের মাহাত্ম্য প্রচারে শ্রীচৈতন্যদেবের হরিভক্তি মনে পড়তে পারে। হরিভক্তিপরায়ণ হলে চণ্ডালও দ্বিজ-শ্রেষ্ঠ হতে পারে। চৈতন্য-চরিতামৃতে আছে—

"অন্য বাঞ্ছা অন্য পূজা ছাড়ি জ্ঞানকর্ম।
আনুকূল্যে সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন॥"

কেশবচন্দ্র সেনও বলিলেন—"হরি বলি প্রাতে, হরি বলি সায়ংকালে, জলে হরি, স্থলে হরি, এইরূপে হরিনামে ও হরিভক্তিতে ভারতকে উদ্ধার কর।"[৩]

'নবশিশুর জন্ম' ভাষণে নববিধানের জন্ম বিবৃত করা হয়েছে। ব্রাহ্মসমাজ জননীর নবপ্রসূত সন্তান নববিধান। নববিধান ব্রাহ্মধর্ম ইতিহাসের সূত্র ধরেই উদ্ভূত হয়েছে। নববিধান ব্রাহ্মধর্ম-বহির্ভূত নয়। নববিধান সর্ব ধর্মমতের সমন্বয়ে গঠিত। "পঞ্চাশ বৎসর পর এক সর্বাঙ্গসুন্দর শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সেই শিশুর ভিতরে যোগ, ধ্যান, বৈরাগ্য, প্রেম, ভক্তি সমুদয় গুণ সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে।...সেই শিশুর মধ্যে বেদ বেদান্ত পুরাণ তন্ত্র বাইবেল কোরাণ সমুদয় রহিয়াছে।"[৪] শিশুর জন্ম প্রতীকের মধ্য দিয়ে নববিধান-ধর্ম অতি সহজভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। শিশুর জন্মলগ্নটি

---

১. কেশবচন্দ্র সেন, মাঘোৎসব, পায়রা উড়ান, পৃ. ৭৩। ২. তদেব, পৃ. ৮৮। ৩. তদেব, পৃ. ৮৯। ৪. তদেব, 'নবশিশুর জন্ম', পৃ. ১৬৫।

মনুষ্যকুলে অতি আদরণীয় ও আনন্দের মুহূর্ত। কাজেই 'নবশিশুর জন্ম' এই রূপকটির মাধ্যমে নীরস ধর্মতত্ত্ব সরস ও জীবনমুখী হয়ে উঠেছে।

'দেবালয়-প্রতিষ্ঠা' নিবন্ধটি নানা কারণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কেশবচন্দ্র সেনের মৃত্যুর এক সপ্তাহ আগে এটি রচিত হয়। এটিই তাঁর সর্বশেষ প্রার্থনা। সেইদিক থেকে এর একটি বিশেষ মূল্য আছে। কেশবচন্দ্র সেন ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসেব প্রথম সপ্তাহে রোগে জীর্ণ ও শীর্ণ হয়ে ভগ্নদেহে কলকাতায় প্রত্যাগমন করেন। চিকিৎসার নানারূপ ব্যবস্থা সত্ত্বেও তাঁর স্বাস্থ্য ক্রমশঃ ভেঙ্গে পড়তে লাগল। তাঁর অসুস্থতা যখন তীব্র অবস্থায় তখন তাঁর গৃহে কমলকুটীবে নব দেবালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়, ১লা জানুয়ারী ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে। জীবনের এটি তাঁর সর্বশেষ বাসনা ছিল। মায়ের মন্দিরে মায়ের প্রতিষ্ঠা। সেই সাধটি পূর্ণ হওয়াতে তিনি যেন অসুস্থ দেহে নূতন বল পেলেন। দেবালয়-প্রতিষ্ঠার দিন তিনি রুগ্ন শরীর নিয়ে দেবালয়ে উপস্থিত হন ও মায়ের কাছে প্রার্থনা করেন। "এসেছি মা তোমার ঘরে। ওরা আসতে বারণ করেছিল, কোনোরূপে শরীরটা এনে ফেলেছি। মা, তুমি এই ঘর অধিকার করেছ। এই দেবালয় তোমার ঘব, লক্ষ্মীব ঘর।"[১]

এই প্রার্থনাটির মধ্যে আসন্ন মৃত্যুর কারুণ্য যেমন ফুটে উঠেছে, তেমনি এর ভাষায় মিশ্রিত হয়েছে শিশুর সবলতা, ভক্তের আকুলতা এবং সর্বোপরি আন্তরিকতা। "ওবা আসতে বারণ করেছিল, কোনোরূপে শরীরটা এনে ফেলেছি",—যেন একটি শিশু অভিভাবকদেব ফাঁকি দিয়ে আকাঙ্ক্ষিত বস্তুটি লাভ করেছে। মা ও সন্তান যেন একান্ত হয়ে কথা বলছে, এই ভঙ্গীতে প্রার্থনাটি বচিত। "আমাব বড় সাধ ছিল, কয়েকখানা ইট কুড়াইয়া তোমাকে একখানা ঘর করে দিই। সেই সাধ মিটাইবার জন্য, মা লক্ষ্মী, তুমি দয়া করিয়া স্বহস্তে ইট কুড়াইয়া তোমার এই প্রশস্ত দেবালয় নির্মাণ করিয়া দিলে। —এই ঘবই আমার বৃন্দাবন, ইহা আমার কাশী ও মক্কা, ইহা আমার জেরুজালেম—এই স্থান ছাড়িয়া আর কোথায় যাইব? মা, আশীর্বাদ কর, তোমার ভক্তেরা এই ঘরে আসিয়া তোমার প্রেমমুখ দেখিয়া যেন অদর্শন-যন্ত্রণা দূর করেন। মা, আমার বড় সাধ, তোমার ঘর সাজাইয়া দেই।"

এই প্রার্থনাটিতে কেশবচন্দ্র সেনের ভক্তির প্রগাঢ়তা ও আত্যন্তিকতা

১। কেশবচন্দ্র সেন, মাঘোৎসব, দেবালয়-প্রতিষ্ঠা, পৃ. ১৬৩।

প্রকাশিত হয়েছে। মাতৃনামে তিনি ব্রহ্মোপাসনা করেছেন। মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত তাঁর মুখে মাতৃনামের জয় ঘোষিত হয়েছে। "মা আমার প্রাণ, মা আমার জ্ঞান, মা আমার ইহলোক-পরলোক, মা আমার সম্পদ-সুস্থতা।" তাঁর দীর্ঘকাল বিষম রোগ যন্ত্রণার মধ্যে মাতৃনাম আনন্দসুধার আকর।

"স্ত্রী-আত্মার প্রতি স্বামী-আত্মা" ও "স্ত্রীর প্রতি উপদেশ"

১৮৫৬ খ্রীঃ আঠারো বছর বয়সে কেশবচন্দ্রের বিবাহ হয়। তিনি সেই সময় ঠিক বিয়ের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। উপরন্তু প্রায় চৌদ্দ বছর বয়স থেকেই তিনি মাছ ও মাংস পরিত্যাগ করেন। প্রথম যৌবনে তিনি বৈরাগ্যের অগ্নিতে দগ্ধ হচ্ছিলেন। 'জীবনবেদে' বিস্তারিতভাবে তার বর্ণনা দিয়েছেন—নারীর প্রতি দৃষ্টি দেওয়া, প্রেমসংগীত শোনা, গল্প করা, হাসি-ঠাট্টা করাকে তিনি পাপ বলে মনে করতেন। দর্শন, নীতিবিদ্যা ও ধর্ম-পুস্তকের মধ্যে আপনাকে ঘনিষ্ঠভাবে নিবদ্ধ করেছিলেন। তাঁর বালিকা-বধূকে প্রচণ্ড ভাবে অবহেলা করতেন—কারণ তাঁর ধারণা হয়েছিল এই সংসার শ্মশানতুল্য। তিনি যখন বিশ বছরের যুবক তখন তাঁর এই অন্তর্দাহ। কিন্তু কেশবচন্দ্র যখন চল্লিশ বছরের পরিণত পুরুষ তখন তাঁর চিন্তার জগতে অনেক পরিবর্তন এসেছে। তিনি দশটি পুত্রকন্যার পিতা—তাঁর চারপাশে কত ভক্ত, অনুগত শিষ্য এবং তাঁর বামপার্শ্বে তাঁর সহধর্মিণী সতী জগন্মোহিনী দেবী। জগতের প্রতিটি বস্তুতে সেই পরমপুরুষের সান্নিধ্যের অনুভূতিতে তিনি তৃপ্ত।[১] যে সংসারকে শ্মশান করেছিলেন সেখানেই উদ্যান রচিত হল।

যে স্ত্রীকে সর্পবৎ ত্যাগ করেছিলেন, তিনিই হলেন তাঁর সাধনার সঙ্গিনী। স্বর্গীয় প্রভুর সেবায় অর্চনায় জীবনের সকল মহাকর্তব্য পালনে তাঁর স্ত্রী সহায় হলেন। "বিষয়াসক্ত ইন্দ্রিয়পরায়ণ স্বামী স্ত্রীকে যেরূপ ভালবাসে কেশবচন্দ্র ও জগন্মোহিনী দেবীর প্রেম তদ্রূপ নয়।" "বিশ্বজননীর কোলে একটি স্বামী-আত্মা ও একটি স্ত্রী-আত্মা উপাসনা ও যোগের অবস্থায় উপবিষ্ট। 'স্ত্রী-আত্মার প্রতি স্বামী-আত্মা' রচনাটির মধ্যে কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁর স্ত্রীর আদর্শ দাম্পত্যপ্রেম ব্যাখ্যাত হয়েছে। কেশবচন্দ্র ও জগন্মোহিনী

১. প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, Life & Teachings of Brahmananda Keshub Chunder Sen, ভাবানুবাদ পৃ. ৬৪।

দেবীর প্রেম দিব্য বিভা লাভ করেছিল। তিনি স্ত্রীকে ভালবাসতে পারতেন না যদি না ঈশ্বর তাঁকে ভালবাসবার শক্তি দিতেন। বিবাহ-বেদীর পাশে উভয়ের মিলন আত্মার মিলন—সনাতন ভারতীয় এই আদর্শে কেশবচন্দ্র সেন বিশ্বাসী—"বিষয়-কোলাহল ও প্রলোভনরাশির মধ্যে একটি স্বর্গীয় গৃহ, একটি ধার্মিক সুখী পরিবার, একটি তপোবন সংরচনা করিবার জন্য আমরা পরমাত্মার নিকট হইতে মহান ও সাক্ষাৎ আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি।… আমার সমক্ষে তুমি এক স্বর্গের অদৃশ্য অলংকারে ভূষিত আত্মারূপে, আমার সাধন-ভজনের প্রিয় সঙ্গিনীরূপে এবং অধ্যাত্মজগতের বিশ্বস্ত বন্ধুরূপে বিরাজমান। অতএব, তোমার স্বামী তোমাকে স্বর্গীয় প্রেমে ভালবাসিতে এবং ধর্মসঙ্গত সখ্যভাবে তোমার সহিত মিলিত হইতে বাধ্য। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটি ঈশ্বর-ভাবনির্ভর। তুমি যখন ঈশ্বরের তখন আমি তোমাকে ঘৃণা করিতে পারি না। তোমাকে সম্মান করা, তোমাকে ভালবাসা আমার কর্তব্য কর্ম। পরম পিতার সন্নিধানে তোমাকে লইয়া বসিব, তোমার সহিত প্রার্থনা করিব।" 'স্ত্রী-আত্মার প্রতি স্বামী-আত্মা' সংলাপধর্মী রচনাটি প্লেটো, দান্তে, সুইডেনবর্গের Prophetic speculations-এর সঙ্গে তুলনা করা চলে।[১] প্রকৃতপক্ষে স্ত্রীকে তিনি সাধনার সঙ্গী করে নিয়েছিলেন। নৈনিতালে থাকাকালীন স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে সাধনা করেছেন। কখনও নির্জনে, কখনও শিলাতলে পত্নীর সঙ্গে একাসনে বসে যোগে নিমগ্ন হতেন। পরনে গেরুয়া বস্ত্র, হাতে একতারা, বামপার্শ্বে সাধনসঙ্গিনী, কণ্ঠে মাতৃনাম—প্রকৃতির বুকে সত্যিই যেন আর্য ছবি—আর্য ঋষির পত্নীসহ সাধনার ছবি ফুটে উঠত।

'স্ত্রী-আত্মার প্রতি স্বামী-আত্মা' প্রবন্ধটির গ্রন্থনায় বৈশিষ্ট্য এই, এটি অনেকটা সংলাপের ভঙ্গীতে লেখা। সংলাপ অবশ্য একের—লেখকের। উত্তম পুরুষ বলার ভারটি নিয়েছে আর নীরব শ্রোতা হয়ে আছে মধ্যম পুরুষ। লেখক কেশবচন্দ্র স্ত্রীকে সম্মুখে রেখে অনেকটা স্বগতোক্তির ভঙ্গীতে বাণী রচনা করে গেছেন। যেমন—"যখন তোমার মুখের দিকে প্রথম দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম, আমার মনে এক অপূর্ব ভাবের উদয় হইল। আমার হৃদয় তোমার প্রতি আকৃষ্ট হইল। পিতাই তোমাকে আমার হৃদয়রজ্জুর দ্বারা সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছেন—আমি কি স্বর্গীয় প্রেমের কথা বলিলাম? হাঁ। পৃথিবী

১. প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, Life & Teachings of Brahmananda Keshub Chunder Sen, পৃ. ১৮৬।

বলুক, প্রকৃত দাম্পত্য-প্রেম পবিত্র অনুরাগ। স্বামী ও স্ত্রীর ভালবাসা স্বর্গীয়, ইহা কে অবিশ্বাস করিতে পারে।...আমার সমক্ষে তুমি এক স্বর্গের অদৃশ্য অলংকারে ভূষিত আত্মারূপে, আমার সাধন-ভজনের প্রিয় সঙ্গিনীরূপে এবং অধ্যাত্মজগতের বিশ্বস্ত বন্ধুরূপে বিরাজমান।" 'স্ত্রীর প্রতি প্রেম ও ঈশ্বরানুরাগ ভাষায় রোমান্টিক সৌন্দর্য বিস্তার করেছে। প্রবন্ধটির নামকরণের মধ্যেও নিগূঢ় রোমান্সের রহস্যময়তা জড়িয়ে আছে। রচনাটিতে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর বক্তব্য পরিবেশিত হয়েছে। কিন্তু এ বক্তব্য শরীরী নয়। এতে শরীরের লৌকিকতা মুছে গিয়ে রয়েছে অ-লৌকিক আত্মা। স্ত্রী-আত্মার সঙ্গে স্বামী-আত্মার মিলন—আত্মার এই রহস্যময়তা উপযুক্ত ঋদ্ধি ও অনুভূতি না থাকলে সহজে বোধগম্য হয় না। এসব কারণেই কেশবচন্দ্রের অনেক রচনার মধ্যে সাহিত্য-গুণ থাকলেও সেগুলি বিশেষ তত্ত্বের তল্পি বহন করে চলে বলে সাহিত্যরসিকগণ কেশবচন্দ্রের এই জাতীয় রচনাগুলিকে অপাংক্তেয় করে রেখেছেন।

'স্ত্রীর প্রতি উপদেশ' কেশবচন্দ্রের স্বহস্তলিখিত গ্রন্থ। সুদীর্ঘ প্রবন্ধে দ্বাদশটি উপদেশ স্ত্রীর উদ্দেশ্যে লিখিত হয়েছে। স্ত্রীর আত্মাকে সত্যের পথে, কল্যাণের পথে, ধর্মের পথে নিয়ে যাবার জন্য স্ত্রীকে তিনি উপদেশ দিয়েছেন নানা বিষয়ে। অন্তরে বিশ্বাস রাখতে হবে, একটা সার্বজনীন আবেদন রয়েছে প্রতিটি মহিলার জন্য। ('বিশ্বাসই ধর্মের জীবন, বিশ্বাসই ধর্মের প্রথম সোপান) হৃদয়ের সমস্ত প্রীতি ঈশ্বরকে অর্পণ করতে হবে, ঈশ্বরের আদেশে সব কাজ করতে হবে, নিয়মিতভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করতে হবে, শরীরকে, মনকে ও চরিত্রকে সুস্থ রাখতে হবে, সকল গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি রাখতে হবে, যত্নের সঙ্গে সন্তানদের পালন করতে হবে, কোমল ও শান্তভাবে সকলের সেবা করতে হবে। এইভাবে গৃহে মায়ের আদর্শে একটি সুখী পরিবার গড়ে উঠবে। একটি আদর্শ গৃহ একটি আদর্শ জাতির জন্ম দেবে।

'সুখী পরিবার'—সুখী পরিবার বৃহত্তর অর্থে ঈশ্বরের পরিবার। একদিকে মানব-বিশ্ব অপরদিকে প্রকৃতি-বিশ্ব। দুই বিশ্বের যাবতীয় বস্তু একটি সুন্দর শৃঙ্খলায় নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, একটি সৌন্দর্য ও সৌষম্য রক্ষা করে চলেছে। ঈশ্বর আমাদের পিতা, আমরা তাঁর সন্তান। অন্ন, বস্ত্র, জ্ঞান, ধর্ম সকলই তিনি আমাদের নিয়ত দান করছেন। সুখী পরিবারে কাম, ক্রোধ, হিংসা, দম্ভ, প্রবঞ্চনা সকল রিপুগুলি নির্বিঘ্ন। দাস-দাসীকে ঘৃণা

করা হয় না, পশুপক্ষীর উপর নির্দয় হওয়া চলে না। বাগানে বৃক্ষলতা, ফলফুল আমাদের কাছে ঈশ্বরের মহিমা ঘোষণা করে। এখানে কলহ নেই, বিবাদ নেই, অপ্রণয় নেই, শত্রুতা নেই,—আছে সকলের মধ্যে সুমিষ্ট প্রীতি ও শান্তি। এটি আমাদের শান্তিনিকেতন।

## আত্ম-উদ্ঘাটনমূলক রচনা : পত্রাবলী

কেশবচন্দ্রকে নানা কার্য উপলক্ষে বিভিন্ন প্রসঙ্গে বহু পত্রাবলী লিখতে হয়েছে। তাঁর বিস্তৃত রচনাসম্ভারে সর্বত্র যেখানে ধর্মালোচনা ও তত্ত্বজিজ্ঞাসা সেখানে একমাত্র তাঁর লিখিত পত্রাবলীর মধ্যেই আমরা ব্যক্তি কেশবচন্দ্রের ব্যক্তিজীবনের পরিচয়টুকু পাই। নানা প্রয়োজনের তাগিদে পত্র লেখা হলেও সেই পত্রের মধ্য দিয়ে রোজকার কাজের মানুষটি,—তার কি চাহিদা, কোন্ কর্মচক্রে তিনি আবর্তিত, অন্যান্য ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর কি সম্পর্ক, সবই অবগত হওয়া যায় চিঠিপাঠে। একটি মানুষকে পূর্ণভাবে জানতে সাহায্য করে তাঁর লিখিত পত্রগুচ্ছ। কেশবচন্দ্র-লিখিত পত্রাবলীতে একদিকে তাঁর ব্রহ্মগত জীবনের পরিচয়, অপর দিকে সংস্কারমূলক কার্যাবলীর বিবরণ এবং বন্ধু ও পরিবারবর্গের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্কের ইতিকথা মুদ্রিত হয়ে আছে। তাঁর লিখিত সমগ্র পত্রাবলীকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা চলে।

১. মহর্ষির সঙ্গে পত্রবিনিময় ( ১২ই মে ১৮৬১ খ্রীঃ—১৪ই জানুয়ারী ১৮৭১ )

২. ধর্মবন্ধু ও প্রচারকগণকে লিখিত পত্র ( ১২ই অক্টোবর ১৮৬৩—আগস্ট ১৮৮৩ )

৩. সহধর্মিণী সতী জগন্মোহিনীকে লিখিত পত্র ( বিভিন্ন সময়ে লেখা )

৪. পারিবারিক পত্র ( বিভিন্ন সময়ে লেখা )

৫. ইংরাজি পত্র ও ইংরাজি থেকে অনূদিত কিছু পত্র।

### ১. মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে পত্র-বিনিময় :

এ পত্রগুলির মধ্য দিয়ে কেশবচন্দ্র ও দেবেন্দ্রনাথের হার্দিক সম্পর্কটির একটা স্পষ্ট ছবি উদ্ঘাটিত হয়েছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রতি কেশবচন্দ্রের প্রগাঢ় অনুরক্তি ও ভক্তি ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়। প্রথম জীবনের প্রীতি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কটি আস্তে আস্তে নানা মতবিরোধের মধ্য দিয়ে কিছুকালের জন্য তিক্ততায় পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। ব্রাহ্মরা পৈতে ব্যবহার করবেন

কিনা, আচার্যের বেদীতে কারা বসবার অধিকারী, সমাজের আচার-অনুষ্ঠানে হিন্দুত্ব রক্ষা করা হবে কিনা, ইত্যাদি বিষয়ে উভয়ের মতবিরোধ দেখা দিল। এরই ফলস্বরূপ কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ থেকে বের হয়ে এলেন কেশবচন্দ্র, প্রতিষ্ঠা করলেন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ( ১৮৬৬ খ্রীঃ )। ১২ই মে ১৮৬১ থেকে ২রা জুলাই ১৮৬৫ খ্রীঃ পর্যন্ত লিখিত কয়েকটি পত্রাবলীতে এই বিরোধের স্পষ্ট ছবি আছে। এই পত্রগুচ্ছ মানবিক স্পর্শে উজ্জ্বল। উভয়েই মনীষী, মনস্বী এবং অধ্যাত্মরাজ্যে ঋষিতুল্য। কিন্তু সংঘাতকালে উভয়েই মানবিক ঊষ্মা, ক্রোধ, অসন্তোষের বশবর্তী হয়ে চিত্তবিক্ষোভ অনুভব করেছেন, সাধারণ মানুষের বিক্ষোভের মত সেই বিক্ষোভ মথিত হয়েছে পত্রাবলীতে। এটি অনুসন্ধিৎসু পাঠক-পাঠিকাকে তৃপ্ত করতে পারে।

২৫শে বৈশাখ ১৭৮৭ শক বা ৬ই মে ১৮৬৫ খ্রীঃ লিখিত পত্রে মহর্ষি লিখছেন, "আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইও না, আমার কথায় বিরক্ত হইও না। তোমার মনোহর কান্তি ও উজ্জ্বল মুখ যখনি মনে হয়, তখনি তোমার প্রতি আমার স্নেহ-অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া ধাবিত হইতে চায়, কিন্তু পরক্ষণেই আমার প্রতি তোমার নিষ্ঠুর নির্যাতনের চেষ্টা স্মরণ হইয়া, অমনি তাহা নির্বাণ হইয়া যায় এবং তাহা হইতে ধূম বিনির্গত হইয়া আমার হৃদয়কে ব্যথিত করিয়া তোলে।...আপনার গৌরবের জন্য আপনার দলপুষ্টির জন্য, আপনার জয়লাভের জন্য যদি ঈশ্বরের মহিমা ঘোষণা উপায়মাত্র করা হয়, তবে তাহা হইতে কালকূট গরল উৎপন্ন হইয়া সকল লোককে অভিভূত করিবে।" এর উত্তরে কেশবচন্দ্র লিখলেন ( ১৩ই মে, ১৮৬৫ খ্রীঃ ), "আমাকে আপনি বুঝিতে না পারাতেই, তত্ত্ববোধিনী সভার মত, অক্ষয়কুমার দত্তের মত, আমাকে বিঘ্ন জ্ঞান করতঃ আমাকে বিদায় করিয়া, নিশ্চিন্ত ও নিষ্কণ্টকরূপে ব্রাহ্মসমাজকে স্বীয় ইচ্ছানুসারে শাসন করিবেন, এরূপ কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। আমাকে না জানাতেই, আপনি বলপূর্বক বা কৌশলপূর্বক কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছিলেন।.. যদি আপনার এরূপ সংস্কার থাকে যে, আমার কার্য হইতে 'কালকূট গরল উৎপন্ন হইয়া সকল লোককে অভিভূত করিবে,' তবে ইহাও সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, আমি কালসর্পের ন্যায় সমুদায় ব্রাহ্মসমাজকে বেষ্টন করিয়া আছি, আমায় দূর করিবার যতই চেষ্টা হইবে, ততই আমার দংশনে সকল লোক গরলাভিষিক্ত হইবে।"

হিমাচল থেকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে লিখিত তিনখানি পত্র ও মহর্ষির প্রত্যুত্তরে দুটি পত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেশবচন্দ্রকে মহর্ষি ব্রহ্মানন্দ নামে অভিনন্দিত করেন এবং কেশবচন্দ্রও মহর্ষিকে প্রথম পরিচয়েই 'ধর্মতাত' বলে বরণ করে নেন। মহর্ষির সঙ্গে কেশবচন্দ্রের প্রগাঢ় সম্পর্ক পিতা-পুত্রের সম্পর্ক। ব্রহ্মানন্দের জীবনের শেষ অধ্যায়ে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে এই পত্রবিনিময় সংশয়াতীতভাবে প্রমাণ করেছে যে উভয় মনীষীর মতভেদের প্রবল বাত্যাঘাতেও তাঁদের সুমধুর সম্পর্কটি নষ্ট হয়নি। মহর্ষি কেশব-চন্দ্রকে 'আমার হৃদয়ের ব্রহ্মানন্দ, 'প্রাণাধিক ব্রহ্মানন্দ' কিংবা 'ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মধ্যান ব্রহ্মানন্দ রসপান' ইত্যাদি বলে সম্বোধন করেছেন। আর কেশব-চন্দ্রও মহর্ষিকে 'ভক্তিভাজন মহর্ষি' ( ৭ই জুলাই ১৮৮২ ) কিংবা 'পিতৃচরণ-কমলে ভক্তির সহিত প্রণাম' ( ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৮৮৩ খ্রীঃ ) ইত্যাদি সম্বোধনে চিঠি সুরু করেছেন।

২. ধর্মবন্ধু ও প্রচারকগণের নিকট লিখিত পত্র :

এইভাগে প্রথমতঃ রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত পত্রগুলিতে অতিশয় শ্রদ্ধা ও প্রীতি প্রকাশিত হয়েছে। রাজনারায়ণ বসুকে লেখা শেষের তিনটি পত্র আদি ব্রাহ্মসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরে লিখিত হলেও সেগুলির মধ্যে প্রীতি ও শ্রদ্ধার অভাব ঘটে নি। ৩রা মে, ১৮৬৩ খ্রীঃ রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত একটি পত্রে কেশবচন্দ্রের পারিবারিক জীবনের একটি ঘটনার বর্ণনা আছে। ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্তির জন্য কেশবচন্দ্রকে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে ; অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। নববর্ষের প্রথম দিনে তিনি তাঁর স্ত্রীকে মহর্ষির গৃহে এনেছিলেন ও ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছিলেন—সেই অপরাধে তাঁর পরিজন ও অভিভাবকগণ তাঁকে ও তাঁর স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেন ও গৃহে ফেরার পথটি বন্ধ করে দেন। সেই অবধি মহর্ষির গৃহে তিনি বহুকাল অবস্থান করেন। "যতদিন না স্বাধীনভাবে থাকিতে পারি, ততদিন হয়তো এ স্থানে অবস্থিতি করিতে হইবে।…বিষয়ত্যাগ, গৃহত্যাগ কত ত্যাগ ব্রাহ্মদিগের করিতে হইবে তাহার কিছুই স্থির নাই।" অনেক পত্রেই তিনি রাজনারায়ণ বসুকে 'ব্রহ্মপরায়ণ দাদা' সম্বোধন করেছেন। রাজনারায়ণের সঙ্গে তাঁর প্রীতির সম্পর্ক ছিল। "বিস্তীর্ণ মরুভূমির মধ্যে সুন্দর পুষ্প যেমন, ব্রাহ্মসমাজের বিবাদ-বিসংবাদের মধ্যে আপনার কোমল প্রীতিপূর্ণ পত্র আমার পক্ষে সেইরূপ।"

(২৮শে জুলাই ১৮৭১)। এই কারণেই কয়েকটি পত্রে তাঁর আন্তরিক দুঃখ—আদি ব্রাহ্মসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার দুঃখ প্রকাশ করেছেন—"সমাজ আমার অতি স্নেহের ধন, সমাজের মঙ্গলের জন্য আমার ধনমান প্রাণ সকলই বিক্রীত হইয়াছে। সেই সমাজ আমাকে বিদায় করিয়া দিলেন।" (৬ই ফেব্রুয়ারী ১৮৬৫ খ্রীঃ)।

এ ছাড়া অন্যান্য ধর্মবন্ধু ও প্রচারকগণের কাছে প্রেরিত কিছু চিঠি আছে। ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, ভাই অঘোরনাথ, ভাই দীননাথ মজুমদার, শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু সেন, শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস সেন, ভাই প্রসন্নকুমার সেন, ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ভাই উমানাথ গুপ্ত, ভাই বঙ্গচন্দ্র রায়, কালীশঙ্কর দাস-প্রমুখ ব্যক্তিকে লিখিত পত্রাবলীর মধ্যে তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা, কেশবচন্দ্র সেনের ভক্তি ও ঈশ্বরানুরাগ ও সমসাময়িক কালের কিছু তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। শ্রদ্ধেয় ভাই কান্তিচরণ মিত্রকে ও ভাই প্রসন্নকুমার সেনকে পারিবারিক ও সাংসারিক বিষয়ে কয়েকটি পত্র তিনি লিখেছিলেন। মোড়পুকুরের সাধনকাননে ধ্যানমগ্ন যোগী যখন ভাই কান্তিচরণ মিত্রকে পত্র দেন (১৮৭৬ খ্রীঃ ১০ই মে)—"এখানকার জন্য একখানা ১০ ফুট টানাপাখা অদ্যই চাই। Secondhand হইলে ভাল হয়। খবরদার, যেন অধিক দামের না হয়, অথচ দেখিতে মন্দ না হয়," তখন আমরা দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয়তার মধ্যে মানব কেশবচন্দ্রকে খুঁজে পাই। অপর একটি পত্রে ভাই কান্তি মিত্রকে লিখেছেন (২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭৬ খ্রীঃ)—"হিন্দী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত ভাষা সব একত্র, উপাসনার স্থানটি মজলিসের ন্যায়।* এখন খুব গভীর উপাসনা না হইলে কি চলে? কাল একটি লোক মাড়াইয়া আমার চশমার একখানি কাঁচ হঠাৎ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। ভাঙ্গা কাঁচ পাঠাইতেছি, Solomon কোম্পানীর দোকানে এই রকমের Steel frame-এর একখানি চশমা ক্রয় করিয়া যত শীঘ্র পার এইখানে পাঠাইবে।" একদিকে উপাসনার চিন্তা অপরদিকে প্রয়োজনের চাহিদা মেটানো—দুই-ই আছে। গাজীপুর থেকে কান্তি মিত্রকে লেখা (৯ই অক্টোবর ১৮৭৬ খ্রীঃ)—"গতকল্য ব্রাহ্মসমাজ হইতে আসিয়া চশমাটি পাইলাম। পাইয়া অত্যন্ত আহ্লাদ হইল এবং ভাবনা দূরে গেল। কিন্তু ৭৷৷০ টাকা লাগিল কেন?" কিংবা রাঁধুনী বৈদ্য ঠাকুরানীকে ও মেথরানীকে পাওনা পয়সা মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ, স্নানের

ঘরে চাবি দিয়ে রাখার নির্দেশ, আলমারি খুলে বইপত্র ঝেড়ে রাখার অনুরোধ, তাঁর নামে লিখিত পত্রাদি ভাল করে সযত্নে তুলে রাখার নির্দেশ কেশবচন্দ্রের দৈনন্দিন জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খতার উপর সজাগ দৃষ্টির প্রমাণ করে। "Keshub Chandra Sen was a model householder. His domestic life was the example of dutifulness, love and fidelity. Not all the asceticism he ever preached and practised, not all the sacrifices he made of money or of health, not all the long travels he made, could take away one jot of the intense affection he always felt for his home & family."[১]

স্ত্রীর কাছে ও পুত্রকন্যাদের কাছে চিঠিগুলির মধ্যে সত্যিই তাঁর গভীর স্নেহ ও প্রেমের পরিচয় আছে। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন স্বয়ংস্তর—আর জীবনের তুচ্ছ বিষয় থেকে মহৎ বিষয় সকল ব্যাপারেই তিনি শৃঙ্খলা ও ছন্দ মেনে চলতে অভ্যস্ত ছিলেন।

৩. সহধর্মিণী সতী জগন্মোহিনী দেবীকে লিখিত পত্র :

এই চিঠিগুলিতে কেশবচন্দ্রের ব্যক্তিসত্তা আরও বেশী মানবিক রসপুষ্টি লাভ করেছে। কেশবচন্দ্র একদিকে মহাবৈরাগী, অথচ পারিবারিক কর্তব্যনিষ্ঠ আদর্শ গৃহস্থ। মর্ত্যের সুখদুঃখ, ইহজীবনের আরাম আনন্দ কখনই তিনি অবহেলা করেন নি—সবই তিনি ঈশ্বরের দান বলে মনে করেছেন। রামকৃষ্ণদেব একদা কেশবচন্দ্র সম্পর্কে বলেছিলেন, কেশবের যোগ ও ভোগ দুইই আছে।

ব্রহ্মানন্দ সাধনার প্রথম অবস্থায় সংসারকে শ্মশানস্বরূপ মনে করলেও পরবর্তী সাধনায় সংসার ও স্ত্রী সকলকেই গ্রহণ করেছেন। তিনি একস্থানে বলেছেন, "সপরিবারে ধর্মসাধন হিন্দুস্থানের সর্বোচ্চ ভাব। ঈশ্বরের বিধি নহে, সংসার ত্যাগ করিয়া পরিবার বিসর্জন দিয়া ধর্ম সাধন করিতে হইবে। বনের ফল খাইয়া কুটীরে বাস করিয়া, রিপুগণকে বশীভূত করিয়া ঋষিগণ পরিবার দ্বারা পরিবেষ্টিত, মন শুদ্ধ, হৃদয় পবিত্র, ব্রহ্মানন্দে মগ্ন। বিষয়ের মধ্যে

১. প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, Life & Teachings of Brahmananda Keshub Chunder Sen, পৃ. ১৮৫-১৮৬।

থাকিয়াও যাহাতে বৈরাগ্যতত্ত্ব যোগতত্ত্ব প্রেমতত্ত্ব শিখা যায় সেই দিকে চল। প্রাচীন আর্যসমাজে চল, সেখানে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করার বিধি নাই, স্ত্রীকে সহধর্মিণী করিয়া যোগপথে তাহাকে প্রবৃত্ত করিবার বিধান।"[১]

তিনি আপন জীবনেও স্ত্রীকে সহধর্মিণী করেই সাধনা করেছিলেন। স্ত্রীকে লিখিত পত্রাবলীর মধ্যে অন্তরের প্রীতি, অনুরাগ ও আবেগ প্রকাশিত হয়েছে। একাধিক স্থান থেকে তিনি স্ত্রীকে নিয়মিতভাবে পত্র দিয়েছেন। বিদেশ থেকে, লণ্ডন থেকে ও লণ্ডন যাওয়ার পথে বিভিন্ন স্থান থেকে প্রায় ২৩টি পত্র পাওয়া যায়। স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা ও কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি প্রতি সপ্তাহে একটি পত্র লিখতেন। স্বদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে—হিমালয়, সাহারানপুর, মুঙ্গের, ইন্দোর, শিমলা, লাহোর, দিল্লী, বাঁকিপুর, বেলঘরিয়া, মোড়পুকুর, সাধন-কানন—প্রতিটি স্থান থেকে, যখন তিনি যেখানে অবস্থান করেছেন সেখান থেকে সংসারের খুঁটিনাটি খবর ও স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের স্বাস্থ্যের খবর জানতে চেয়ে ও নিজের বিস্তারিত কুশল-সংবাদাদি দিয়ে তিনি স্ত্রীকে পত্র দিয়ে গেছেন। পত্র দেওয়ার ব্যাপারে অনেক গৃহস্থ অপেক্ষা কেশবচন্দ্র অনেক বেশী কর্তব্যনিষ্ঠ। স্ত্রীর প্রতি শুধু কর্তব্য নয়, সস্নেহ দাম্পত্যপ্রেমের প্রগাঢ়তাও লক্ষ্য করি। তিনি চিঠির শেষে 'তোমারি কেশব,' 'তোমারি চিরদিন কেশব,' 'চিরকাল তোমারি কেশব' কিংবা একটি পত্রে (২৯শে জুলাই ১৮৭০) 'তোমারি চিরদিন' 'বিলাতি বন্ধু কেশব' ইত্যাদি স্বাক্ষর করেছেন। তবে কেশবচন্দ্র ও জগন্মোহিনী দেবীর দাম্পত্যপ্রেম দিব্য নিষ্ঠার উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রায় চিঠিতেই দিব্য উপদেশ থাকত। গার্হস্থ্য জীবনের কর্তব্য পালন করেও কিভাবে আধ্যাত্মিক সাধনায় অগ্রসর হওয়া যায় ইত্যাদি উপদেশের মধ্যে পত্র শেষ হত। "আমি প্রতিদিন প্রার্থনা করিয়া থাকি, যাহাতে তোমার হৃদয়ে আরও ভক্তিভাব হয়, পিতার চরণে তুমি আরও শান্তি লাভ কর।" (লণ্ডন, ২৯শে জুলাই ১৮৭০)। আর একটি পত্রে "আমি ধন পাইলে সে ধন তোমাদেরই, আমি সুখ পাইলে সে সুখ তোমাদেরই। তোমার মনে যে আশ্চর্য পরিবর্তন হইয়াছে, তাহা ভাবিলে আমার যে কত আহ্লাদ হয়, তাহা তোমাকে কিরূপে জানাইব। ধর্মেতে প্রেমেতে তুমি আরও সুন্দরী

---

১. কেশবচন্দ্র সেন, আচার্যের উপদেশ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৯-২৬০।

হও, এই আমার আশীর্বাদ। (এলাহাবাদ, ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৮৭৩ খ্রীঃ)। ছেলেমেয়েদের জন্য ছোট রং-করা জুতো কিনেছেন, স্ত্রীর ছবি বড় করে রং করিয়েছেন। সুখো-টুকোর জন্য অনেক খেলনা কিনেছেন, এইরকম বহু পারিবারিক মিষ্টিমধুর তথ্য চিঠিতে প্রকাশিত হয়েছে। কেশবচন্দ্র স্ত্রীর প্রতি গভীর ভালবাসার আবেগে উচ্ছ্বসিত—"তোমার যে দুইখানি ছবি রানীকে দিয়াছিলাম, সেইরূপ আবার দুইখানি রং করাইয়া লইয়াছি।" "আর কতদিন ছবি দেখিয়া তৃপ্ত হইব ? তোমার প্রসন্ন মুখ দেখিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছি।" (লণ্ডন, ৯ই সেপ্টেম্বর—১৮৭০ খ্রীঃ)। এই পত্রগুলি কর্তব্যে, প্রেমে, হৃদয়ের অনুরাগে, মধুর বিরহে অপূর্ব স্বাদ এনে দেয়। স্ত্রীর পত্র নিয়মিত পাওয়ার জন্য আকুলতা, সংসারের খুঁটিনাটি বিষয় জানবার জন্য আগ্রহ, পুত্রকন্যাদের জন্য পিতৃসুলভ চিন্তা, দায়িত্ববোধ, খাদ্য ও ভ্রমণ ব্যাপারে ব্যক্তিরুচির পরিচয় ইত্যাদির মাধ্যমে কেশবচন্দ্রকে কাছের মানুষ করে তুলেছে—শুধু তাই নয়, সহজ সরল ভাষার মাধ্যমে এই চিঠিগুলিকে সাহিত্যের সামগ্রী করে তুলেছে।

লণ্ডন থেকে ও লণ্ডন যাওয়ার পথে লেখা প্রায় ২৩টি চিঠি ভ্রমণ-বৃত্তান্ত হিসাবে বেশ মূল্যবান। বিভিন্ন স্থানের মনোহর বর্ণনায় এই পত্রগুলি সমৃদ্ধ। জাহাজে এডেন, সুয়েজ, মারসেলিস ইত্যাদি স্থান অতিক্রম করে তিনি লণ্ডনে পৌঁছেছিলেন। জাহাজের যাত্রীদের নানা উপভোগ্য বর্ণনা—

"ভোজনের পূর্বে ভেঁপু বাজান হয়—উহার ধ্বনি শুনিয়া সকলে প্রস্তুত হয়।...গত মঙ্গলবারে একটি নাটক হইয়াছিল, নাটকের পর কতকগুলি গান হইল।...আমরা যে জাহাজে আছি, তাহা অনেক সময় মনে থাকে না, ঠিক যেন কোন মহাসাগরে আছি।" (এডেন, ৭ই মার্চ, ১৮৭০ খ্রীঃ)। কখনও বা যাত্রীরা সময় কাটাবার জন্য 'মুরগীর লড়াই' খেলা করে জাহাজে থাকবার একঘেয়েমী দূর করে। জাহাজে আমোদ-প্রমোদ না করলে দিন কাটানো ভার। কখনও জাহাজ বেশী দুললে জাহাজী অসুস্থতায় ( Sea-sickness ) যাত্রীরা আক্রান্ত হয়।

মারসেলিস থেকে লেখা পত্রে (১৯শে মার্চ ১৮৭০ খ্রীঃ) প্রকৃতির বর্ণনা সহজ ভাষায় চিত্রিত হয়েছে—

"সমুদ্রের দুই তীরে আশ্চর্য শোভা দেখিলাম। একদিকে ইটালী ও অপরদিকে সিসিলি দ্বীপ। দুই দিকেই পর্বতমালা এবং ঐ পর্বততলে

সমুদ্রতটে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলি নগর ও গ্রাম প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, ঐ স্থানের লোকেরা কেমন সুখী। উহাদের একদিকে সমুদ্র, একদিকে পর্বত সর্বদাই বোধ করি নির্মল বায়ু সম্ভোগ করিতেছে।"

লণ্ডন থেকে লেখা চিঠিতে লণ্ডন শহরের দর্শনীয় স্থানের বর্ণনা ও লণ্ডন শহরের জীবনযাত্রার বিবরণ এত বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হয়েছে যে লণ্ডনে না গিয়েও লণ্ডন ভ্রমণের আনন্দটুকু উপভোগ করা যায়। ভ্রমণ-সাহিত্যের এইখানেই বৈশিষ্ট্য। বর্ণনা শুধু তথ্যমাত্র থাকবে না, লেখকের সঙ্গে পাঠকও ভ্রমণের আনন্দটুকু লাভ করবেন, খুঁটিনাটি বিবরণের মধ্য দিয়ে জীবনরসপুষ্ট হয়ে উঠবে ভ্রমণের বৃত্তান্ত। কেশবচন্দ্রের এই পত্রগুলিতে সহজ সাবলীল বর্ণনার গুণে দর্শনীয় স্থান জীবন্ত হয়ে উঠেছে—দৈনান্দিন জীবনেব নানা ঘটনা সহানুভূতির স্পর্শে মানবজীবন রস-স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে। কেশবচন্দ্র সেনের এই জাতীয় পত্রগুচ্ছ পত্র-সাহিত্যের মর্যাদা পেতে পারে।

৪. পুত্রকন্যাদের কাছে লিখিত পত্রসমূহ :

কেশবচন্দ্র কোনো কাজকেই তুচ্ছ মনে করতেন না। কর্তব্যকর্ম যত সামান্যই হোক না কেন, অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে নিপুণভাবে সম্পন্ন করতেন। সন্তানদেরও তিনি এই পরামর্শই দিতেন, "এক সপ্তাহ সময় দিলাম, ইহার মধ্যে বাটীর প্রত্যেক গৃহ সুপরিষ্কৃত করিবে। একটু জঞ্জাল কোথাও না থাকে। তোমাদের প্রত্যেকে একটু কোথাও ময়লা দেখিলেই তাহা পরিষ্কার করাইয়া লইবে। মনুষ্যজীবন খাওয়া-পরার জন্য নহে, কিন্তু দেবী-সেবার জন্য।" পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও শুদ্ধতা দেবত্বেরই অংশ—কাজেই দৈনন্দিন জীবনে শুদ্ধতাই আমাদের ঈশ্বরের কাছে পৌঁছে দেবে। তিনি আর্যনারী-সমাজে ২রা জুলাই ১৮৭৯ খ্রীঃ উপদেশ দিয়েছিলেন, "গৃহে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ম সাবধান হইয়া যত্নের সহিত করিবে। মনে করিবে, সমুদয় কার্য লক্ষ্মীর আদেশে লক্ষ্মীর নিমিত্ত করিতেছ।...অসাবধানতা বা আগোছাল হওয়াকে পাপ মনে করিবে। সাংসারিক সমুদয় কর্ম লক্ষ্মীর আদেশে সম্পন্ন করিয়া গৃহ-পরিবারে লক্ষ্মীশ্রী যাহাতে আনয়ন করিতে পার, তাহারই চেষ্টা করিবে।" কেশবচন্দ্র গৃহের সৌন্দর্য ও শ্রীর প্রতি বিশেষ যত্নবান হতে উপদেশ দিতেন, নিজেও গৃহের প্রতিটি কর্ম গুছিয়ে করতেন। অর্থব্যয় সম্পর্কে, পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে, আহার সম্বন্ধে যেখানে ঠিক যেমনটি প্রয়োজন তাকেই তিনি লক্ষ্মীর অভিমত

বলে গ্রহণ করতেন। কারণ ঈশ্বরের কোটি স্বরূপের মধ্যে লক্ষ্মীর স্বরূপ একটি ; প্রিয়তম জামাতা মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণকে লিখিত পত্রে (কলিকাতা, ৯ই নভেম্বর, ১৮৮৩ খ্রীঃ) গভীর স্নেহ-মমতা-মিশ্রিত আশীর্বাণী ও মধুর উপদেশ বর্ষিত হয়েছে।

৫. ইংরেজী পত্র ও ইংরেজী থেকে অনূদিত কিছু পত্র :

কেশবচন্দ্র বিদেশী বন্ধু, সরকারী কর্মচারী ও সরকারকে ইংরেজীতে বেশ কিছু পত্র লিখেছেন। গভর্নর-জেনারেল লর্ড নর্থব্রুককে নয়টি খোলা চিঠি দেন। শিক্ষা-সংস্কার ও শিক্ষা-ব্যবস্থার সুষ্ঠু গঠনের উদ্দেশ্যে এই পত্রগুলি। 'Nine Letters on Educational Measures'—নামে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থে এগুলি প্রকাশিত হয়েছে। শ্রী মণিকা মহলানবিশ-সম্পাদিত 'পত্রাবলী' গ্রন্থে ইংরেজী থেকে অনূদিত কিছু পত্র সংকলিত করেছেন। কিন্তু এই ধরনের পত্রগুচ্ছ (ইংরেজী পত্র ও ইংরেজী থেকে অনুদিত পত্রাবলী) আমাদের আলোচনার বহির্ভূত।

ডায়েরী জাতীয় রচনা :

কেশবচন্দ্র সেন 'ডায়েরী' রাখতেন, কিন্তু নিয়মিতভাবে নয়। বাঙালা ভাষায় কোন ডায়েরী পাওয়া যায়নি। 'দি বুক অব পিলগ্রিমেজেস' গ্রন্থে ১৮৫৯ খ্রীঃ থেকে ১৮৮৩ খ্রীঃ পর্যন্ত নানা স্থানেব ভ্রমণের ডায়েরী সংকলিত হয়েছে। সিংহলের ডায়েরী, মাদ্রাজ ও বোম্বের ডায়েরী, ইংলণ্ডের ডায়েরী, হিমালয়ের ডায়েরী। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সবই তিনি ইংরেজী ভাষায় লিখেছেন।

বাঙালায় লিখিত কৃষ্ণনগরের প্রচারের বৃত্তান্ত ১৮৬১ খ্রীঃ 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ব্রাহ্মধর্ম ও 'নববিধান' কেশবচন্দ্র সেনের জীবনে মিশে গিয়েছিল। অধিকাংশ সময়ই তিনি ব্রাহ্মধর্ম-প্রচারের উদ্দেশ্যে কর্মচঞ্চল ছিলেন। বক্তৃতা, উপদেশ, ঘন ঘন সাধারণ সভ্যদের নিয়ে কার্য-নির্ধারণ ও প্রচারকগণ সহ বিভিন্ন কর্ম-উদ্দীপনায় নতুন নতুন পরিকল্পনা-গ্রহণ তাঁর জীবনের নিত্যকার ঘটনা। এসকল ঘটনার দৈনন্দিন তালিকা রচিত হয়েছে তিনখানি গ্রন্থে—ক. সঙ্গত খণ্ড, খ. অধিবেশন ও গ. প্রচারকগণের সভার নির্দ্ধারণ বা শ্রীদরবারের নির্দ্ধারণ।

**স ঙ্গ ত :** ধর্মসাধন-বিষয়ক আলোচনা-সভা ছিল সঙ্গত। এই সময়

আচার্যদেব যে উপদেশাবলী ও ধর্মালোচনা করেছেন—তাই সঙ্গত ( ২টি খণ্ডে ) বিধৃত হয়েছে। প্রথমবৎসরের আলোচনা কেশবচন্দ্র স্বয়ং 'ব্রাহ্মধর্মের অধিষ্ঠান' নামে প্রকাশ করেছেন, প্রথমে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় পরে পুস্তকাকারে।

সঙ্গত-সভার প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৬০ খ্রীঃ। তিনটি শাখা—সিমলা, কোলুটোলা ও আচার্য কেশবচন্দ্রের কোলুটোলার বাসভবন। প্রথম দুটি শাখার কাজ অল্পদিন পরে বন্ধ হয়ে যায়। তৃতীয় শাখার কাজ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়েছিল ও সাধকমণ্ডলীর বিশেষ উপকার সাধন করেছিল। এই সভার অধিবেশন অনিয়মিতভাবে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চলেছিল। 'সঙ্গতসভা'র সভাপতিরূপে কেশবচন্দ্র সেন ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে কাজ শুরু করেন। সঙ্গত-সভাপতি কেশবচন্দ্র সেন ধর্মের ও নীতির নানা বিষয়ে আলোচনা করেন। 'সঙ্গত' গ্রন্থের আলোচনাগুলি সম্পূর্ণ ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মজীবন-বিষয়ক। প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে আলোচনাগুলিকে সহজ ও সরল করা হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে 'সঙ্গতসভা'র সৃষ্টি হয়েছিল সম্পূর্ণভাবেই ব্রাহ্মদিগের স্বার্থে। "স্থানে স্থানে যে সকল শাখা ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যেও ঐক্য সম্পাদন করা আশু কর্তব্য। যাহাতে আমাদিগের মধ্যে সকলে বিশুদ্ধ ভ্রাতৃসৌহার্দ্য-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া, পরস্পরের পবিত্রতা ও আনন্দ-বর্ধন করেন, এ প্রকার কোন উপায় অবধারিত করিতে হইবে। সঙ্গতসভা দ্বারা এই উদ্দেশ্য কতকদূর সিদ্ধ হইয়াছে ও হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু সঙ্গতের সভ্য-সংখ্যা অল্প।"[১]

ব্রাহ্মদের মধ্যে ঐক্য ও সৌহার্দ্য সৃষ্টি করার জন্য পরবর্তী কালে 'প্রতিনিধিসভার' প্রতিষ্ঠা হয় এবং এই প্রতিনিধি-সভা থেকেই জন্ম নেয় ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ। স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁর 'ব্রাহ্ম-সমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত' নামক গ্রন্থে সঙ্গতসভার কার্যের প্রশংসা করেছেন। "হৃদয়ের প্রীতি ব্যতীত ব্রহ্মজ্ঞান যে, সে শুষ্ক জ্ঞান; জ্ঞান ব্যতীত প্রীতি যে, সে অন্ধকার; অনুষ্ঠান ব্যতীত জ্ঞান, প্রীতি উভয়ই নিষ্ফল। আবার জ্ঞান-প্রীতি ব্যতীত অনুষ্ঠান কেবল বাহ্যাড়ম্বর মাত্র। ব্রাহ্মধর্মের এই সকল সরল সত্য যে যে ছাত্রদিগের হৃদয়কে অধিকার করিল, তাহারা ব্রাহ্মধর্মকে জীবনে ও অনুষ্ঠানে পরিণত করিবার জন্য

১. অধিবেশন, পৃ. ৬ ( ২২শে ডিসেম্বর, ১৮৬১ খ্রীঃ ব্রাহ্ম সমাজের সাধারণ সভায়, কেশবচন্দ্র সেন-কর্তৃক পঠিত )।

কৃতসংকল্প হইয়া সঙ্গত নাম দিয়া এক স্বতন্ত্র দলে আবদ্ধ হইল। এই সঙ্গতের মধ্যে অনেকেই অদ্য এই ব্রাহ্মবন্ধুসভাকে উজ্জ্বল করিয়াছেন। সঙ্গত যেন একটি কল প্রস্তুত হইতেছে, কালে ইহা মহাভার বহন করিবে।"[১] প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন তত্ত্ব আলোচনার মধ্য দিয়ে আদর্শ ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকাদের জন্য যে সুনির্দিষ্ট মত ও পথ নির্ণয় করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন কেশবচন্দ্র সেন, তাই প্রশ্নোত্তরে সঙ্গতে (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে) লিপিবদ্ধ আছে।

অধিবেশন গ্রন্থে ২২শে ডিসেম্বর ১৮৬১ খ্রীঃ থেকে ২২শে জানুয়ারী ১৮৮৩ খ্রীঃ পর্যন্ত সাধারণ সভ্যদের অধিবেশনের বিস্তারিত বিবরণ সংগ্রহ করা হয়েছে। 'প্রচাবকগণের সভার নির্দ্ধারণ' গ্রন্থে ৫ই আগষ্ট ১৮৭২ খ্রীঃ থেকে ৫ই ডিসেম্বর ১৮৮০ খ্রীঃ প্রচারকদের সভার বিস্তারিত তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। এ দুটি গ্রন্থ ব্যক্তিগত 'ডায়েরী' নয় সত্য, কিন্তু প্রতিটি অধিবেশন ও সভার পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য এতে পরিবেশন করা হয়েছে। ব্রাহ্ম সমাজের ইতিহাস রচনায় এই দুটি গ্রন্থ অত্যন্ত প্রামাণ্য ও আবশ্যক।

### সাংবাদিকতা :

সাংবাদিকতা সাহিত্য নয়, কিন্তু সাহিত্যের সঙ্গে সাংবাদিকতার যোগটি ঘনিষ্ঠ। সাংবাদিক সংবাদ পরিবেশন করেন, সেটি তাঁর প্রথম কর্তব্য, কিন্তু পরিবেশনার গুণে সংবাদ কখনও কখনও তথ্যকে অতিক্রম করে যায়, সাহিত্যের সৌন্দর্য ও সত্যের সন্ধান দেয়। "সাংবাদিকতা উচ্চাঙ্গের সাহিত্য নয় সত্য কিন্তু সাংবাদিকতার ভূমিকা ছাড়া উচ্চাঙ্গের সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব হয় না।"[২] এছাড়া বাংলা গদ্যের উদ্ভব ও বিকাশে সাময়িক পত্রিকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও সুগভীর প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকে (১৮১৮ খ্রীঃ) আজ পর্যন্ত সাময়িক পত্র বাংলা গদ্যকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছে। প্রথমযুগে বাংলা গদ্যের কাঠামোটি তৈরী হয়েছিল সংবাদপত্রের দ্বারা, তারপর সাহিত্যের কাঠামো ও মানদণ্ডটি স্থির হয়েছিল সংবাদপত্রের মাধ্যমেই। ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' কিংবা অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদনায় 'তত্ত্ববোধিনী', বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন'—প্রতিটি পত্রিকা উনবিংশ শতাব্দীর গদ্যসাহিত্য-সেবায় নিযুক্ত ছিল। সাহিত্যের ক্ষেত্রে

---

১. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রাহ্ম সমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত। ২. শ্রীপ্রমথনাথ বিশী ও শ্রীবিজিতকুমার-সম্পাদিত, বাংলা গদ্যের পদাংক, পৃ. ৪৭।

সাংবাদিকের দান নিত্য শব্দসম্ভার-সৃষ্টি। "রামমোহনের কলম শাস্ত্রানুবাদ করতে পারে, গৌড়ীয় ব্যাকরণ রচনা করতে পারে ; মৃত্যুঞ্জয়ের কলম বিদেশী ছাত্রের পাঠ্য পুস্তকের জন্য বিভিন্ন রীতির গদ্য রচনা করতে পারে। কিন্তু সাংবাদিকের কলমকে হংসের মতো জল-স্থল-অন্তরীক্ষ সর্বত্র বিচরণ করতে হয়।"[১]

বাঙলা পত্রিকা :

কেশবচন্দ্র সেনের সাহিত্য-সেবার সঙ্গে জড়িত আছে বিভিন্ন বাঙলা সংবাদপত্রের পরিচালনা ও সম্পাদনার ইতিহাস।

বা মা বো ধি নী প ত্রি কা : প্রথম প্রকাশ ১৮৬৩ খ্রীঃ আগস্ট মাসে। এর প্রথম সম্পাদক ছিলেন উমেশচন্দ্র দত্ত। মহিলাদের পাঠোপযোগী বিষয় এই পত্রিকায় স্থান পেত। স্ত্রীশিক্ষার প্রসারে ও নারীদের সাহিত্যপিপাসু করে তোলার কাজে এই মাসিক পত্রিকাটির একটি বিশেষ অবদান রয়েছে। পঞ্চাশ বছরের অধিক কাল এই পত্রিকাটি সার্থকতার সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে। ইতিপূর্বে ১৮৫৪ খ্রীঃ ১৬ই আগস্ট 'মাসিক পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার। এই পত্রিকাটি সাধারণতঃ মহিলাদের জন্যই প্রকাশিত হয়েছিল ; অবশ্য চলিত গদ্যরীতি প্রবর্তনে এর সবিশেষ মূল্য আছে। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই এটির প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। সেইদিক থেকে 'বামাবোধিনী পত্রিকা'র সুদীর্ঘ কাল সার্থকতার সঙ্গে প্রকাশ সংবাদপত্রের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। 'বামাবোধিনী পত্রিকা'র সঙ্গে কেশবচন্দ্র সেনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এই পত্রিকাটির পরিচালনার ব্যাপারে তিনি আদ্যন্ত সাহায্য করেছেন।

"যখন বামাবোধিনীর ২য় সংখ্যা মুদ্রিত হইতেছিল, তখন তাহা মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের দৃষ্টিগোচর হয়। তিনি যেরূপ সহৃদয়তার সহিত ইহা পাঠ করিলেন এবং বহু প্রশংসাবাদের সহিত ইহা প্রচারে যেরূপ উৎসাহ দান করিলেন তাহা আমরা কখনও বিস্মৃত হইব না।"[২] (বামা-বোধিনী পত্রিকা, ভাদ্র ১৩১৯)।

---

১. শ্রীপ্রমথনাথ বিশী ও শ্রীবিজিতকুমার দত্ত-সম্পাদিত, বাংলা গদ্যের পদাংক, পৃ. ৪৮।
২. শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, কেশবচন্দ্র সেন, পৃ. ৯৯।

এই পত্রিকাটিতে কেশবচন্দ্রের অনুপ্রেরণায় প্রতিষ্ঠিত 'বামাহিতৈষিণী সভা'র যাবতীয় সংবাদ প্রকাশিত হত।[১] বঙ্গরমণীগণকে সর্বপ্রকার জ্ঞানালোক দান করাই ছিল এই পত্রিকাটির উদ্দেশ্য। এই পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীর বিষয় কেশবচন্দ্র সেনের ভাবাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত। জ্ঞান-প্রচার বামাবোধিনীর প্রধান উদ্দেশ্য হলেও এই জ্ঞান যাতে ধর্মভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে নারীজীবনের শোভা ও কল্যাণ বর্ধন করতে পারে তার প্রতিও এই পত্রিকার লক্ষ্য ছিল। পাঠক-পাঠিকার অন্তরে ধর্মভাব উদ্দীপনের প্রয়াস ছিল এই পত্রিকাটির মাধ্যমে। কিন্তু কখনও কোন ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রচার এতে করা হয়নি।

১৮৭১ খ্রীঃ 'বামাহিতৈষিণী সভা' ( ১৪ই এপ্রিল ) নারীজাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতিকল্পে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি 'ভারতসংস্কারসভা'র নারী-কল্যাণ বিভাগের অন্তর্গত ছিল। এই সভার সভাপতি ছিলেন কেশবচন্দ্র সেন। এই সভার সমস্ত কার্যবিবরণী 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় প্রকাশিত হত। "মধ্যে কয়েক বৎসর এই পত্রিকা ভারতসংস্কার-সভার অন্তর্গত বামাকুলোন্নতি বিভাগ হইতে প্রচারিত হইত।"[২] ( বামাবোধিনী পত্রিকা, ভাদ্র, ১৩১৯ )।

'বামাবোধিনী' পত্রিকার প্রথম সংখ্যার উপক্রমণিকাতে আছে—
—"বামাগণের বোধ সুলভ জন্য বামাবোধিনীর বিষয়গুলি যত কোমল ও সরল সাধুভাষায় লেখা যায় আমরা তাহার চেষ্টার ত্রুটি করিব না। কথাবার্তা এবং উপন্যাস বা উদাহরণচ্ছলে অনেক বিষয় সহজে হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া যায়, অতএব অনেক স্থলে সে উপায়ও অবলম্বিত হইবে। আবশ্যক মতে ইহাতে নানাবিধ চিত্র ও প্রতিরূপও প্রকটন করা যাইবে।"[৩] 'বামাবোধিনী পত্রিকা'য় কবিতাও প্রকাশিত হত।

**ধর্মতত্ত্ব:** ১৭৮৬ শক, ইংরেজি ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ধর্মতত্ত্ব প্রকাশিত হয়। প্রথমে এটি মাসিক রূপে প্রকাশিত হয়। "ধর্মতত্ত্বের কেহ সম্পাদক ছিলেন না। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, গৌরগোবিন্দ রায় ( উপাধ্যায় ), আঘোরনাথ গুপ্ত ( সাধু ), প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি 'ধর্মতত্ত্বে' লিখিতেন।"[৪] ধর্ম ও নীতিজ্ঞান এর মুখ্য বিষয়। ধর্মকে কেন্দ্র করে

---

১. শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাময়িক পত্র, পৃ. ১৯১। ২-৩. তদেব, পৃ. ১৮৮-১৮৯।
৪. শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত. কেশবচন্দ্র ও বঙ্গ সাহিত্য, পৃ. ১৩২।

আখ্যায়িকা কিংবা মহাপুরুষের জীবনী এতে স্থান পেত। "ধর্মনীতি, ধর্মতত্ত্ব, সামাজিক উন্নতি, ব্রাহ্মধর্মের উন্নতি, নীতিগর্ভ আখ্যায়িকা, সাধুদিগের জীবন, বেদ, পুরাণ, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি ধর্মপুস্তক হইতে সত্যধর্ম-প্রতিপাদক ভাব 'ধর্মতত্ত্বে' প্রকাশিত হইত।"[১]

১৭৯০ শকে 'ধর্মতত্ত্ব' নূতন আকারে পাক্ষিক পত্রে পরিণত হয়। তৃতীয় ভাগ ১ম সংখ্যা থেকে 'ধর্মতত্ত্বে'র পুরোভাগে একটি শ্লোক লেখা থাকত।[২] শ্লোকটি বিখ্যাত। কেশবচন্দ্রের নির্দেশ অনুসারে পণ্ডিত গৌরগোবিন্দ উপাধ্যায় এটি রচনা করেন।

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং॥
বিশ্বাসো ধর্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্যতে॥

'বিশ্বই মন্দির, চিত্তই তীর্থ। সত্যই শাস্ত্র এবং বিশ্বাসই সমস্ত সাধনার মূল। স্বার্থকে বিনাশ করে প্রীতির পথেই সাধন ও কার্য সম্পাদন করতে হবে।' এই শ্লোকটি ব্রাহ্মধর্মের উদার সার্বভৌমিকতার প্রতি ইঙ্গিত করছে। এই পত্রিকায় ধর্মই মূল আলোচ্য হলেও শেষের দিকের সংখ্যাগুলিতে মাঝে মাঝে সংবাদ পরিবেশিত হত।

মাসিক 'ধর্মতত্ত্ব' দ্বিভাষিক পত্র ছিল। এতে বাংলা ছাড়া কয়েক পৃষ্ঠা ইংরেজিতেও মুদ্রিত হত। সাধারণতঃ কোন ধর্মমূলক ইংরেজি উদ্ধৃতি স্থান পেত।

'ধর্মতত্ত্ব' পত্রিকাটির নিয়মিত প্রকাশে বাধা আসে। এইজন্যই পত্রিকাটি মাসিক রূপে আত্মপ্রকাশ করলেও ১৭৮৮ শক, আষাঢ় মাসের পর থেকেই পত্রিকাটিতে মাসের পরিবর্তে সংখ্যার উল্লেখ থাকত।

'ধর্মতত্ত্ব' পত্রিকাটি শতাব্দীর অধিককাল অত্যন্ত সার্থকতার সঙ্গে পরিচালিত হয়েছে। এই পত্রিকাটিতে নিয়মিতভাবে নববিধান-গোষ্ঠীর লেখকগণের বিভিন্ন রচনা প্রকাশিত হত। উপাসনাপ্রণালী, সংগীত, আচার্যের উপদেশ, পরমহংসের উক্তির সার, প্রতাপ মজুমদার-বৃত্তান্ত, বিভিন্ন মুসলমান শাস্ত্র ও ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ, বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণের বৃত্তান্ত, মহাপুরুষদের

---

১. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, অগ্রহায়ণ, ১৭৮৬ শক। ২. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাময়িকপত্র, পৃ. ২০০।

জীবনী, নূতন কোন ধর্মপুস্তকের বিবরণ—সবই পত্রিকাটিতে প্রকাশিত হত। অন্যান্য মহাপুরুষের জীবনীর মধ্যে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ও তাঁর সহধর্মিণী, মার্টিন লুথার, কনফুসিয়াস প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত জীবনীও স্থান পেয়েছে। কখনও বা জ্ঞানগর্ভ বিষয়ের প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়েছে—'বিদ্যার প্রকৃত উদ্দেশ্য' (৯ম সংখ্যা, আষাঢ় ১৭৮৭), নববর্ষ, মানবপ্রকৃতির সাধারণ মহত্ত্ব, সৃষ্টিকার্য, জীবন্ত ধর্ম (১৯ সংখ্যা, বৈশাখ, ১৭৮৮) ইত্যাদি। ধর্মতত্ত্ব যথার্থ অর্থেই বিধানবাদী সাহিত্যিকগণের প্রতিনিধি—মুখপত্র। 'ধর্মতত্ত্ব' প্রকাশের পর থেকেই নববিধানের আচার্য ও প্রচারকগণের বিভিন্ন রচনায় ও নববিধানের সমন্বয়ী আদর্শে এর কলেবর পরিপুষ্ট হয়ে উঠল।

**সুলভ সমাচার:** ১৮৭০ খ্রীঃ নভেম্বর মাসে প্রকাশিত হয় 'সুলভ সমাচার'—'সুলভ' কথাটি এর বিক্রয়মূল্যের দ্যোতক—এক পয়সা মূল্যে এই সংবাদপত্রটি বিক্রীত হত। কিন্তু সাহিত্যের মান বিচারে এই জাতীয় পত্রিকা প্রকৃতই দুর্লভ। সংবাদপত্রের ইতিহাসে এই পত্রিকাটি এক বিস্ময়কর পরিবর্তন এনেছিল। তখনও 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হয়নি। তত্ত্ববোধিনীর মননশীল প্রবন্ধের ভাষার নীরসতার পরিবর্তে সংবাদপত্রে এই প্রথম আমরা সহজ, সাবলীল ও সরস ভঙ্গী লক্ষ্য করলাম। 'সুলভ সমাচার'-এর উপকরণ ও অলংকরণ আবাল বৃদ্ধ-বনিতা, শিক্ষিত-অশিক্ষিত-নির্বিশেষে সকলেরই মনোরঞ্জন করেছিল। 'সুলভ সমাচার' রাজপ্রাসাদে এবং মুদীর পর্ণকুটীরে, কৃতবিদ্য সভ্যসমাজে এবং অন্তঃপুরে হিন্দুমহিলাগণের হাতে শোভিত হতে লাগল। অত্যধিক জনপ্রিয় পত্রিকাগুলির মধ্যে 'সুলভ সমাচার' একটি। প্রকৃতপক্ষে এই পত্রিকাটির উদ্দেশ্য ছিল চিত্তবৃত্তির বিকাশ করা। পত্রিকাটি 'ভারতসংস্কার-সভা' নামক বিরাট কর্মযজ্ঞের অন্তর্গত ছিল। ১৮৭০ খ্রীঃ ২০শে অক্টোবর লণ্ডন থেকে প্রত্যাগমন করে কেশবচন্দ্র সেন বৃহত্তর কর্ম-বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়লেন। তিনি 'ভারত-সংস্কার সভা'র প্রতিষ্ঠা করলেন। এই সভার বহুবিধ কর্ম-উদ্যম ছিল। তার মধ্যে একটি বিভাগের কাজ ছিল, সুলভ সাহিত্য প্রচার। পাঠের আকাঙ্ক্ষা, সাহিত্য-উন্মাদনা বৃদ্ধি, সাহিত্যে সুরুচির প্রসার ও সর্বোপরি বঙ্গসাহিত্যকে সর্বজনগোচর করা ছিল এই বিভাগের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যটি 'সুলভ সমাচার' পত্রিকার দ্বারা বিশেষ রূপেই সার্থক হয়েছিল। "সুলভ যখন বাহির হইল তখন চারিদিকে আলোচনা

পড়িয়া গেল। 'সুলভ' একদিকে যেমন দেশের প্রচলিত সংবাদ দিতে লাগিল, অপরদিকে নীতিপূর্ণ প্রবন্ধের দ্বারা লোকচিত্তের সদ্ভাব উদ্দীপন ও হাস্য-রসোদ্দীপক গল্পাদি দ্বারা আমোদস্পৃহা চরিতার্থ করিতে লাগিল।"[১]

ইতিপূর্বে এক পয়সার মূল্যে কোন পত্রিকা প্রকাশিত হয়নি। সেইজন্য শুধু কলকাতায়ই নয়—শহরতলীর বহু দরিদ্র পাঠকও সহজে এই পত্রিকার রস গ্রহণ করতে পারত। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সংবাদ পরিবেশনের মধ্যে সাহিত্য-আলোচনাও থাকত। এই পত্রিকার ভাষা এত সহজ ও সরল ছিল যে সামান্য শিক্ষিত জনও আস্বাদন করতে পারত। কেশবচন্দ্র সেনের শতবার্ষিকী উপলক্ষে 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্'-আয়োজিত একটি সভায় স্যার যদুনাথ সরকার বলেন, "এর ভাষা একেবারে সহজ ভাষা, শিশু পর্যন্ত বুঝতে পারে। সে সময়ে গাড়োয়ানদেরও তা পড়তে দেখেছি। বঙ্গভাষাকে বিদ্যাসাগরী ভাষা থেকে বের করে সহজগম্য করেন তিনিই।"[২]

কেশবচন্দ্র সেন গণশিক্ষার প্রসারের জন্য দেশীয় ভাষার উপর জোর দেন। তিনি গণশিক্ষার বিস্তৃতির জন্য যে পরিকল্পনা করেন তাতে সস্তায় সংবাদপত্রের প্রকাশ ও গ্রামে গ্রামে বিনামূল্যে বিতরণের ব্যবস্থার কথা বলেন।[৩]

প্রসঙ্গত একটি জিনিস লক্ষণীয়। এই সময়ে তিনি 'দি ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকারও সম্পাদনা করতেন। একই বিষয়বস্তু যেমন শিক্ষা, নীতি, ধর্ম, জাতীয়তাবোধ ও অন্যান্য তথ্য পরিবেশিত হত 'দি ইণ্ডিয়ান মিরর' ও 'সুলভ সমাচার' পত্রিকায়; কিন্তু এ দুটি পত্রিকা দুই ভিন্ন কোটির পাঠকের জন্য প্রকাশিত হত। প্রথমটি উচ্চশিক্ষিত প্রজ্ঞাবান্ পাঠকের জন্য আর দ্বিতীয়টি অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত জনসাধারণের জন্য। কেশবচন্দ্র শিক্ষার প্রসারের প্রধান হাতিয়াররূপে বেছে নিয়েছিলেন সংবাদপত্রকে। সংবাদপত্রই পরে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ডালাকে সকলের দুয়ারে সহজে পৌঁছে দিত।

'সুলভ সমাচার' যে কতটা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল তা বুঝতে পারি ঐ পত্রিকার একটি সংখ্যার 'সম্পাদকের নিবেদন'-এ। "পথে, ঘাটে, আপিসে, রেলগাড়ীতে, নৌকাতে, ঘরে ঘরে, গ্রামে গ্রামে, কেবল 'সুলভের'ই কথা।

---

১. শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃ. ১৬৮-১৬৯। ২. শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সংকলিত ভূমিকা, সুলভ সমাচার ও কেশবচন্দ্রের রাষ্ট্রবাণী,—পৃ. ।৶০। ৩. Atul Chandra Gupta, Studies in the Bengal Renaissance, P. 85.

বৃদ্ধ. বালক, নরনারী, বড়লোক, সামান্য লোক সকলেই প্রীতির সহিত আমাদের 'সুলভ'কে গ্রহণ করিতেছেন।...প্রথমবার দুই হাজার বিক্রয় হইয়াছে, দ্বিতীয়বার প্রায় পাঁচ হাজার এবার কি আট হাজার ছাপাইতে হইবে।"[১]

এই পত্রিকা স্থায়ী হয়েছিল ১২৮৬ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত। এর পরে ১৩১৮ বঙ্গাব্দে 'সুলভ সমাচার' নবপর্যায়ে মাত্র ২৭টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়ে বন্ধ হয়ে যায়।

কেশবচন্দ্র সেন একটি সভায় বলেছেন—"নয় বৎসর অতীত হইল এই কাগজ প্রকাশিত হইয়াছে। এই অতি ক্ষুদ্র উপায়ে প্রচারের কত অধিক সাহায্য হইতেছে। এই আশ্চর্য ব্যাপার দেখিয়া পুরাণে কণিকামাত্র খাদ্য দ্বারা ষাট হাজার লোককে আহার করানো এবং পাঁচখণ্ড রোটিকাতে পাঁচ হাজার লোককে উদর পূর্ণ করিয়া আহার দেওয়ার যে আখ্যায়িকা আছে, তাহা আর কেবল কবির কল্পনা বলিয়া বোধ হয় না। ভক্তবৎসল হরি ভক্তের মান রক্ষার জন্য অদ্ভুত লীলা সম্পন্ন করিয়া থাকেন। এই কাগজ দেখিয়া কত লোক এক পয়সার কাগজ বাহির করিল, অল্প সময় মধ্যে সে সব কোথায় গেল। কেবল এই কাগজে তাঁহার গূঢ় অভিপ্রায় আছে বলিয়াই এই আশ্চর্য ব্যাপার ঘটিতেছে।"[২]

'সুলভ সমাচার' নিয়মিতভাবে কেশবচন্দ্র সেন পরিচালিত করতেন। এই পত্রিকার সম্পাদক প্রতি বৎসর পরিবর্তিত হত। কেশবচন্দ্র সেন এই পত্রিকার প্রধান কর্ণধার ও লেখক। তাঁর চিন্তা ও আদর্শের দ্বারা উদ্দীপিত হয়ে আরও কয়েকজন লেখক 'সুলভ সমাচারে' রচনা প্রকাশ করেন। কিন্তু অন্যান্য লেখকদের নামের উল্লেখ না থাকাতে ও ভাবে ভাষায় কেশবচন্দ্র সেনের হুবহু অনুকরণ করার জন্য কোন্‌টি কেশবচন্দ্রের ও কোন্‌টি অন্য লেখকদের রচনা পার্থক্য করা কঠিন।

তবে রচনার বিষয়বস্তু দেখে বোঝা যায় 'অবিচার', 'মানুষ-মারা ইংরেজ', 'কেশব সেন ও স্ত্রীশিক্ষা', 'সোমপ্রকাশের উক্তির প্রত্যুত্তর', 'কেশবচন্দ্র সেন ও সংবাদবলী', ইত্যাদি নিবন্ধগুলি অন্যান্য লেখকের লেখা। কেশবচন্দ্র ও অন্যান্য লেখকদের রচনার মধ্যে এতই মিল ছিল যে পার্থক্য ধরবার উপায়

---

১. সম্পাদকের নিবেদন, সুলভ সমাচার, ১৫ই অগ্রহায়ণ ১২৭৭ ৩য় সংখ্যা। ২. নববিধান-আচার্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, অধিবেশন, পৃ. ১৫৬ (কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ)।

ছিল না। 'সুলভ সমাচারের' একটি প্রবন্ধে অন্য লেখকদের খেদোক্তির মধ্যে ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে পড়ে।

"আমরা অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি যে অনেক অনেক ভদ্র বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি পর্যন্ত আমাদের লেখার দোষ-গুণ সব বাবু কেশবচন্দ্র সেনের ঘাড়ে ফেলিয়াছেন। আমরা হাসিলে তাঁহারা মনে করেন কেশববাবু হাসিয়াছেন, আমাদের চোখে জল পড়িলে তাঁহার চোখে জল পড়িয়াছে, আমরা রাগিলে তিনি রাগ করিয়াছেন।"[1]

'সুলভ সমাচারে'ব ঐ সংখ্যাতেই পত্রিকাটির মহৎ উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে। "সুলভ সমাচারের সম্মুখে যখন গরীবদের দুঃখ আসিয়া পড়িতেছে তখন তাঁহার লেখনী কাঁদিতেছে, কেহ কোন সৎকার্য করিলে আহ্লাদ ও উৎসাহের সহিত তাহা সকলের নিকট প্রকাশ করিতেছে। রাজা যদি অত্যাচার কবেন নির্ভয়ে তন্নিবারণের চেষ্টা করিতেছে, কপটীর কপট ও ধূর্ততা প্রকাশ করিয়া তাহাকে অপদস্থ করিতেছে, এইরূপ এক পয়সার মূল্যের কাগজ হইয়া সিংহের ন্যায় বিক্রমে আপনার স্বকার্য সাধন করিয়া আসিতেছে।"

'সুলভ-সমাচার'-এ সাম্যবাদী আলোচনা ॥

'সুলভ সমাচার' পত্রিকার স্বচ্ছ মুকুরে কেশবচন্দ্র সেনের চিত্তবৃত্তির যথার্থ প্রতিফলন ঘটেছে। ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার পরিমণ্ডলে কেশবচন্দ্র সেন নামটি বারবার আলোচিত হয়েছে। কিন্তু বিস্মিত হতে হয়—'সুলভ সমাচারে'র পাতায় সাম্যবাদী কেশবচন্দ্র সেনকে দেখে।

"কিন্তু বাস্তবিক বড় মানুষ কাহারা? আমাদের দেশে এ দেশের ছোট লোকেরা। তাহারা না থাকিলে কার বা ভাত জুটিত, কে বা গাড়ী চড়িয়া ঘোড়দৌড় দেখিতে যাইত, আর কেই বা তাকিয়া ঠেসান দিয়া গুড়গুড়ি টানিত? দেখ, সামান্য লোকেরা আমাদের সর্বস্ব দিতেছে। তাহাদেব ধনে আমরা বড়মানুষী করিতেছি। কিন্তু কয়জন তাহাদিগের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে মনে কবে? তাহারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া দিনরাত্রি কষ্ট করিয়া আমাদিগকে অন্ন দিতেছে, কিন্তু কয়জন তাহাদিগের অবস্থা একবারও মনে করে?"[2] কিংবা—

১. অবিচার, সুলভ সমাচার, ২২শে শ্রাবণ, ১২৮০, ১৪৪ সংখ্যা। ২. সুলভ সমাচার, ১ম খণ্ড ৪০ সংখ্যা, ৩১শে শ্রাবণ ১২৭৮ সাল (১৮৭১ খ্রী.) পৃ. ১৫৯ 'বড়লোক'।

"আমি গায়ের রক্ত জল করিয়া কিছু উপার্জন করিলাম, আর তুমি আসিয়া তাহা লুটিয়া লইয়া যাও, তুমি কে? আমার পুত্র-পরিবার অন্নাভাবে প্রাণে মরিতেছে আর তুমি রাশি রাশি অর্থ লইয়া সুখে বসিয়া রহিয়াছ কি জন্য?" এই প্রশ্নটি করেছিলেন 'প্রজাপীড়ন' প্রবন্ধে (সুলভ সমাচার, ৫ম সংখ্যা, ১২৭৭ সাল, ১৮৭০ খ্রীঃ)। আরও কয়েক বছর পর এই প্রশ্নটিই পুনরায় উচ্চারিত হয়েছিল 'কমলাকান্তের' বিড়ালের কণ্ঠে। (১৮৭৫ খ্রীঃ) "এ সংসারের ক্ষীর, সর, দুগ্ধ, দধি, মৎস্য, মাংস সকলই তোমরা খাইবে, আমরা কিছু পাইব না কেন? তোমরা মনুষ্য, আমরা বিড়াল, প্রভেদ কি? তোমাদের ক্ষুৎ-পিপাসা আছে, আমাদের কি নাই?…চোর দোষী বটে, কিন্তু কৃপণ ধনী তদপেক্ষা শতগুণে দোষী।" শুধু 'বিড়াল' রচনায় নয় বঙ্কিমচন্দ্রের সাম্যবাদের প্রকাশ ঘটেছে 'সাম্য' ও 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধ দুটিতেও। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদমূলক প্রবন্ধাবলী প্রকাশের পূর্বেই 'সুলভ সমাচারে' তাঁর চিন্তাধারার পূর্বাভাস পাই।

মার্কস্ ও এঙ্গেলস-এর 'কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টো' ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে 'সুলভ সমাচারে'র পাতায় ও ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিড়ালে'র কণ্ঠে যে সুর শুনি, তাতে অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, এঁরা মার্কস্ ও এঙ্গেলস-এর গ্রন্থটির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। মার্কসের মতে মানুষের উৎপাদনপ্রণালীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নূতন অর্থনৈতিক ভিত্তিতে সমাজ পুনর্বিন্যস্ত করতে হবে—এটাই সমাজতন্ত্রবাদ। কেশবচন্দ্র সেনের সুলভ সাহিত্য কিংবা অন্যান্য কর্মযজ্ঞের মধ্যে অবশ্য 'সমাজতন্ত্রবাদ'-এর কোন চিত্র বা পরিকল্পনা নেই। সাম্যবাদের যে সুরটি শোনা গেছে, সেটি নিছকই মানবপ্রেম, হিতবাদ ও মানবসেবা। তাছাড়া—"The socialism of Keshub Chunder Sen is that of a true theist, whereas the socialism of Karl Marx is that of a non-believer of God."[১]

অপরদিকে কৃষকদের দুর্দশার জন্য জলবায়ু, লোকসংখ্যা বৃদ্ধি, অল্পে সন্তোষ নামক জীবনদর্শন, লর্ড কর্ণওয়ালিশ-কৃত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রভৃতির কথা উল্লেখ করে বঙ্কিমচন্দ্র অর্থনৈতিক সমবণ্টনের উপরে গুরুত্ব

১. Atul Chandra Gupta, Studies in the Bengal Renaissance, Page 86.

দিয়েছেন। শ্রমজীবীদের মঙ্গলচিন্তা তাঁর মনকে অধিকার করলেও তিনি কোথাও পুনর্বিন্যাসের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ প্রয়াস ও প্রচেষ্টার কথা স্পষ্টতঃ বলেননি। তাঁর সমাজতন্ত্রবাদ সামাজিক কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ থেকে সামঞ্জস্যের কথা উল্লেখ করেছে।"[১]

১২৭৯ বঙ্গাব্দে 'জমিদারদর্পণ' নাটকে মীর মশারফ হোসেন জমিদারের আর্থিক ও সামাজিক অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দও সাধারণ প্রজাপুঞ্জের কথা চিন্তা করেছেন। 'বর্তমান ভারত' প্রবন্ধে বিবেকানন্দ বলেছেন, প্রজাপুঞ্জই শক্তির আধার; সমাজের নেতৃত্বে প্রজাসাধারণের সহযোগিতা প্রয়োজন। সমাজের নেতৃত্ব, বিদ্যাবল, বাহুবল অথবা ধনবলের দ্বারা অধিকৃত হোক না কেন যে সম্প্রদায় প্রজাসাধারণের সহযোগিতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন তাঁরা শক্তিহীন হন ও তাঁদের হাত থেকে সকল ক্ষমতা চলে যায়। স্বামী বিবেকানন্দের সমাজচিন্তা ইতিহাস-ভিত্তিক। কাজেই দেখা যাচ্ছে, কেশবচন্দ্র সেন, বঙ্কিমচন্দ্র, মীর মশারফ হোসেন কিংবা স্বামী বিবেকানন্দ এঁরা সকলেই সাম্যবাদ সম্পর্কে স্বাধীন চিন্তা প্রয়োগ করেছেন। মার্কসের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের শ্রেণীসংগ্রামের অপরিহার্যতা এঁদের চিন্তায় প্রকাশিত হয়নি।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য যেমন কেশবচন্দ্র সেনকে পীড়িত করেছে, ধর্ম-বিষয়েও তেমনি। তিনি বলেছেন—"বঙ্গদেশের মাটি আমাদিগের নিকট অত্যন্ত আদরণীয়। এই দেশ কিসের জন্য বিখ্যাত? কেবল প্রেম ও ভক্তির জন্য। দুঃখীদের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট ধর্ম চাই, এমন একটি সহজ ধর্ম চাই, যাহাতে সকলের অধিকার আছে। সাধারণের পক্ষে কঠোর তপস্যা কিংবা বেদ-বেদান্ত পাঠ দ্বারা ধর্ম অর্জন করা সহজ নহে।" একদা চৈতন্যদেব আচণ্ডালে মুক্তি বিতরণ করে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের বিরোধ দূর করেছিলেন। কেশবচন্দ্র সেনও চেয়েছিলেন সকলের উপযোগী ধর্মসাধন-পদ্ধতি। সেখানে নরনারীরও ভেদ ঘুচে গিয়েছিল। নরনারী সাধারণের সমান অধিকার—

"যার আছে ভক্তি পাবে মুক্তি
নাহি জাতবিচার"—ইত্যাদি

সংগীতমূর্চ্ছনায় 'ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির' প্রতিষ্ঠা দিবসে আকাশ বাতাস

১. ভবানীগোপাল সান্যাল, বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিবিধ প্রবন্ধে'র ভূমিকা—পৃ. ১৩৮।

মুখরিত হয়ে উঠেছিল। কেশবচন্দ্র সেন ছিলেন সর্বাত্মক সাম্যবাদের পক্ষপাতী —ধনের ক্ষেত্রে, ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে, এমন কি নরনারীর অধিকারের ক্ষেত্রেও। চাষী-মজুর, জনসাধারণ সকলের মঙ্গলের প্রতি ছিল তার হৃদয়ভরা স্নেহ ও শুভাকাঙ্ক্ষা। তাদের মুখে হাসি ফোটাবার জন্য, তাদের প্রতি ছিল তাঁর হৃদয়ভরা স্নেহ ও শুভাকাঙ্ক্ষা। তাদের মুখে হাসি ফোটাবার জন্য, তাদের বুকে আশা যোগাবার জন্য তাঁর ছিল অক্লান্ত প্রচেষ্টা। তিনি শিল্পবিদ্যালয় (Industrial School), কারিগরী বিদ্যালয় (Working men's Institution) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন—সমাচারের পাতায় এদের পক্ষ নিয়েই যুদ্ধ করেছেন, 'গভর্ণমেণ্ট কি গরীবদিগের প্রতি তাকাইবেন না?' প্রবন্ধে কেশবচন্দ্র লিখেছেন—

"আমরা যেরূপ দেখিলাম এবং যে প্রকার কাতর ও ব্যগ্রভাবে প্রজারা আমাদের চারিপাশে দাঁড়াইল, তাহাতে পাষাণ হৃদয়ও স্থির থাকিতে পারে না। জমিদারেরা তাহাদের বুক আচ্ছা করিয়া পাষাণ দিয়া এমন বাঁধিয়াছেন যে, গরীবসকলের ক্রন্দনধ্বনিও তাঁহাদের বক্ষস্থল ভেদ করিতে পারে না।" সমাজতন্ত্রবাদের জটিলতর তত্ত্বগুলি কত সহজে তিনি জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন—

"আশ্রিত প্রজাদিগকে খাইতে দাও, বিদ্যাদান কর, রোগ-বিপদ হইতে উদ্ধার কর, এবং দুষ্টলোকের অত্যাচার হইতে তাদের বাঁচাও। কেবল কত টাকা মুনাফা হইল তারই দিকে চাহিয়া থাকিও না, প্রজার দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী হও। উহাদের ভালবাসিতে শিক্ষা কর।"[১]

আরও কয়েকটি প্রবন্ধে, যেমন 'দুঃখীর প্রতি দয়া', 'দুঃখীদের প্রতি', 'জমিদার ও প্রজার সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত', 'প্রজাদের দুরবস্থা', 'পত্র', ইত্যাদিতে তাঁর সুচিন্তিত সাম্যবাদী মনোভাবটি প্রকাশিত হয়েছে।

"প্রজাগণের পরমবন্ধু 'সুলভ সমাচার' দরিদ্রের দুঃখ দূর করিবার জন্য বাহির হইয়াছে। সাধারণ লোকদিগের প্রতিনিধি হইয়া এই পত্রিকা দশ-সহস্র মুখে তাহাদের অবস্থা সকলের ঘরে ঘরে বলিবে। হে কৃষক! তোমার কান্না পরমেশ্বর শুনিতেছেন, তিনি কি তোমার রোদন শুনিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবেন?" ('প্রজাদিগের দুরবস্থা')[২]।

১. প্রজাপীড়ন, সুলভ সমাচার, ৪র্থ সংখ্যা, ১২৭৭ সাল। ২. সুলভ সমাচার, ১মখণ্ড, ২য় সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১২৭৭ সাল।

কৃষকদের দুঃখে তিনি কেঁদেছেন—তাঁদের দুঃখের বাণীকে সোচ্চার করে তুলবার দায়িত্ব তিনি নিয়েছেন—কৃষকদের অধিকার কেড়ে নিয়ে যারা বড়মানুষী করে তাদের ঘৃণ্য বলে মনে করেছেন।

কেশবচন্দ্র সেন দরিদ্রদের অবহেলা করেননি। যারা আমাদের মুখের অন্ন যোগায় সেই মানুষদের জাগতিক মঙ্গল ও উন্নতির কথাও কেশবচন্দ্র সেন চিন্তা করেছেন।

'ভারত-সংস্কার-সভা'র চতুর্থ বিভাগের কাজ ছিল সাধারণ লোকদের শিক্ষার সুযোগ দেওয়া। সমাজের যারা ভিত্তিস্থানীয় সেই সাধারণ লোকদের জন্য তিনি শিল্পবিদ্যালয় স্থাপন করলেন। শ্রমজীবীদের জন্য তিনি একটি বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। সেখানে শ্রমিকদের বাঙ্গালা-ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হত। 'ওয়ার্কিং মেনস ইনস্টিটিউট'-এ এ ছুতোর মিস্ত্রীর কাজ, দর্জির কাজ, ধাতুপাত্র তৈরীর কাজ প্রভৃতি নানাবিধ কুটিরশিল্প শিক্ষা দেওয়া হত। উনবিংশ শতাব্দীতে এই প্রথম বাংলার শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতি ও প্রীতি প্রকাশিত হল কেশবচন্দ্র সেনের কর্ম-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে। শুধু তাই নয়, সেবার মধ্য দিয়ে সাধারণ লোক ও ভদ্রশ্রেণীর মধ্যে প্রীতি ও সৌহার্দ্য জাগাবার জন্য 'ভারত-সংস্কার-সভা'র দ্বিতীয় বিভাগ 'দাতব্য বিভাগটি' খোলা হয়েছিল। উত্তর ভারতে দুর্ভিক্ষে সাহায্য দান, নিম্নবঙ্গে ম্যালেরিয়া ও মাদ্রাজে বন্যায় সাহায্য-দান ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে সমবেতভাবে 'সংকটত্রাণ বা রিলিফের ব্যবস্থা কেশবচন্দ্র সেনের উদ্যোগেই প্রথম শুরু হয়। তাঁর এই সমাজসেবার আদর্শ পরবর্তী কালের স্বামী বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ আশ্রম, ভারত-সেবাশ্রমের যৌথভাবে সংকটত্রাণের "ব্যবস্থার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। অবশ্য স্বামী বিবেকানন্দের এই সেবাধর্ম 'নরই নারায়ণ' এই মন্ত্রে বিশ্বাসী। 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের নবধর্মের মূল মন্ত্র।

'সুলভ সমাচার'-এ স্বদেশপ্রেম ও স্বাজাত্যবোধ ॥

কয়েকটি প্রবন্ধে কেশবচন্দ্র সেনের সুগভীর স্বদেশপ্রেম ও স্বাজাত্যবোধের প্রকাশ ঘটেছে। 'ভারতবাসীদিগের মধ্যে একতালাভের উপায় কি?', 'আমরা কি স্বাধীন', 'আর্যজাতির উন্নতি না অবনতি', 'কেন, সাহেব হইতে এত দোষই বা কি?' ইত্যাদি নিবন্ধগুলিতে সহজবোধ্য ভাষায় জাতীয়তাবাদ

ও স্বদেশপ্রেমের ব্যাখ্যা ও স্বদেশীদের বিজাতীয় আচরণের সবিদ্রূপ সমালোচনা করা হয়েছে।

"জাতীয় বন্ধন ঠিক রাখিয়া যদি কেহ সাহেব হইতে পারিতেন, তবে আমরা কেবল পোষাক কি খাওয়া প্রভৃতি কার্যের জন্য তাহাকে তত দোষ দিতাম না। জাতীয় স্বভাবকে লোপ করিয়া যাহারা ফিরিঙ্গী হইবে, তাহাদের দ্বারা দেশের কোন আশা নাই। অতএব যাহা কিছু করিবে তাহার সঙ্গে জাতীয়তাভাবের যোগ রাখ।"[১]

'ভারতবাসীদিগের মধ্যে একতালাভের উপায় কি?' নিবন্ধে ঐক্যলাভের উপায় হিসেবে ভাষাকে তিনি গ্রহণ করেছেন। "সমস্ত ভারতবর্ষে এক ভাষা ব্যবহার করাই উপায়। এখন যতগুলি ভাষা ভারতে প্রচলিত আছে তাহার মধ্যে হিন্দিভাষা প্রায় সর্বত্রই প্রচলিত। এই হিন্দিভাষাকে যদি ভারতবর্ষের একমাত্র ভাষা করা যায়, তবে অনায়াসে কাজ শীঘ্র সম্পন্ন হইতে পারে।"[২]

কেশবচন্দ্র সেনের দূরদর্শী ভাবনা ভারতের বহু বৈচিত্র্যের মধ্যে একতার সূত্রটি ঠিকই নির্ধারণ করেছিল। কারণ বহু বছর পরে স্বাধীনতা-উত্তর ভারত হিন্দিভাষাকেই জাতীয় ভাষার মর্যাদা দিয়েছে।

পরাধীনতার গ্লানি তাঁকে পীড়িত করেছে। তিনি জীবনের সার্বিকক্ষেত্রে স্বাধীনতাকামী। স্বাধীনতা-হীনতায় তিনি বাঁচতে চাননি, আধ্যাত্মিক আচরণের ক্ষেত্রেও তিনি কোন বিধি বা সংস্কারের দাসত্ব করতে চাননি। "দাসত্ববিধি সকলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সকলকে একেবারে পোড়াইয়া মারিতেছে। হা বিধাতঃ! স্বাধীনতা যে মুক্তি, অধীনতা যে নরক! স্বাধীনতার জয়পতাকা উড়াইয়া অধীনতার দুর্গকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিতে হইবে।"[৩] 'আমরা কি স্বাধীন' ও 'আর্যজাতির উন্নতি না অবনতি' নিবন্ধে তিনি স্বাধীনতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে উনবিংশ শতাব্দীর আকাশ কেশবচন্দ্র সেনের নির্ভীক ও তেজোপূর্ণ বক্তৃতায় ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল। ব্রহ্মোপলব্ধি তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হলেও তাঁর ধর্মব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে তৎকালীন যুবকেরা আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণা ছাড়াও আরও একটি বস্তুর সন্ধান পেয়েছিল; সেটি স্বদেশপ্রেম। "...ধর্মচিন্তার সঙ্গে তারা পেয়েছিল জাতীয়ভাবে জেগে ওঠার

১. কেন সাহেব হইতে এত দোষই বা কি?, সুলভ সমাচার, বৈশাখ, ১২৮০। ২. সুলভ সমাচার, ৩ই চৈত্র, ১২৮০ সাল। ৩. কেশবচন্দ্র সেন, জীবনবেদ, পৃ. ৩৮।

প্রেরণা। তাঁর ভারত-পরিভ্রমণের বক্তৃতামালায় তিনি তাঁর দেশবাসীকে বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, স্বর্গের আলোকে ভারতে নতুন উষার আবির্ভাব হয়েছে, সেই আলোক ক্রমে ক্রমে যাতে মধ্যাহ্নসূর্যের কিরণে পরিণত হয়, তার জন্যেই সকলকে নব নব কর্মে আত্মনিয়োগ করতে হবে, নতুন শক্তিতে বলীয়ান্ হতে হবে।"[১]

এ স্বর্গের আলোক জাতীয়তাবাদের আলোক, এ শক্তি জাতীয় ভাবধারার শক্তি। 'সুলভ সমাচারে' তাই তিনি দেশবাসীকে নিজেদের 'দুঃখ ও ব্যর্থতার কথা, দেশের দুরবস্থার কথা' শোনানো প্রয়োজন বোধ করেন। তাই তিনি এই পত্রিকায় মাঝে মাঝে তদানীন্তন শাসকগোষ্ঠীর তীব্র সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছিলেন। 'প্রজাপীড়ন' 'কানমলাতেও মন ওঠে না', 'মানুষ মারা ইংরেজ', 'বাঙ্গালীর ধাঙ্গড় হওয়াই ভাল' ইত্যাদি রচনায় কেশবচন্দ্র সেনের নির্ভীক কণ্ঠ বিঘোষিত হয়েছে। ভারতীয়দের উপর ইংরেজের পাশব মনোবৃত্তি ও ঘৃণ্য অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি কঠোর ভাষায় প্রতিবাদ করেছেন। "ফলে অনেক ছোটলোক ইংরেজের এদেশীয় লোকের প্রতি অত্যাচার আর সহ্য হয় না।"[২] ইংরেজ জাতির অন্যবিধ গুণের দ্বারা আকৃষ্ট হলেও এই স্বভাবের ইংরেজদের তিনি 'পশুতুল্য ছোটলোক ইংরেজ' মনে করেন। "বিলাতের ইংরাজেরা কিসে বাঙ্গালীর ভাল হয় এবং কিসে তাহাদের সঙ্গে সদ্ভাব হয় তাহার চেষ্টা করিতেছেন, আর এখানকার মহাপুরুষেরা তাহার বিপরীত। ভারতবর্ষের চারিদিক হইতে কেবল ইংরাজের মারখেগো বাঙ্গালীর চিৎকারধ্বনি শোনা যাইতেছে। এ কি? কে এত অন্যায় সহিবে?"[৩] পরবর্তীকালে 'কালান্তরে' (১৯৩৭ খ্রীঃ) রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ জাতির স্বভাবে এই পার্থক্যটুকু দেখে ইংরেজদের দুইভাগে ভাগ করেছিলেন 'ছোট ইংরেজ' আর 'বড় ইংরেজ'।

'সুলভ সমাচার'-এ শিক্ষামূলক প্রবন্ধ ॥

'সুলভ সমাচারে'র পাতায় কিছু শিক্ষামূলক প্রবন্ধও আছে—'সামান্য লোকদিগের বিদ্যাশিক্ষা', 'বিশ্ববিদ্যালয় ও কারিকরদের জন্য বিদ্যালয়', 'কেশব

১. অরবিন্দ পোদ্দার, উনবিংশ শতাব্দীর পথিক, পৃ. ৮৮-৮৯। ২. মানুষ মারা ইংরেজ, সুলভ সমাচার, ১০ই চৈত্র, ১২৭৭, ২০ সংখ্যা। ৩. কানমলাতেও মন উঠে না, সুলভ সমাচার, ১২৭৮, ৪১ সংখ্যা, ৯ই ভাদ্র।

সেন ও স্ত্রীশিক্ষা', 'শিক্ষাপ্রণালী' ইত্যাদি। 'বাঙ্গলাভাষা' নিবন্ধে বঙ্গ ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে।

এ ছাড়া দেশ-বিদেশের নানা সংবাদ—'বিলাত কেমন?' কিম্বা 'বিক্রমপুরে বালিকাপহরণ', 'দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস', 'কলিকাতাব পাড়ায় পাড়ায় নগরবাসীদের সভা' থাকত সমাচারের পাতায়। নানা সামাজিক বিষয়ের উপরও মনোজ্ঞ প্রবন্ধ থাকত—'ব্যবসায়', 'মদ্যপান', 'ভৃত্যশিক্ষা', 'দায়', 'মিষ্ট বাক্য', 'স্ত্রীলোকাদগেব উপর অত্যাচার'—সকল বিষয়ই এই পত্রিকার আলোচ্য ছিল। কোন কোন সময়ে সংবাদপত্রের কাটতি বাড়াবার জন্যে কিছু কিছু নতুন নতুন 'ফীচার' যোগ করা হত। যেমন 'বিক্রমপুর নাটক' (২৫ অগ্রহায়ণ ১২৮০) কিম্বা—'মজাব কথা' সুলভ সমাচারের আকর্ষণ বৃদ্ধি করত।

'সুলভ সমাচার'-এ মাদকতা ও অশ্লীলতা নিবাবণ ॥

যে-কোন অবক্ষয়িত সমাজে অশ্লীলতা সমাজ-মানসকে দূষিত করে তোলে। মধ্যযুগের বাংলার সমাজে ও সাহিত্যে তারই প্রভাব পড়েছিল। এমন কি ভারতচন্দ্রের মত বিদগ্ধ মনন-প্রধান কবির কাব্যও অশ্লীলতামুক্ত নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর কবিগণ কিংবা উনিশ শতকেব প্রারম্ভপটের বাস্তববাদী কবি ঈশ্বর গুপ্তের রুচি ও রসবোধ স্থূল ও ভাঁড়ামি পর্যায়ের। রবীন্দ্রনাথের মতে বাঙ্গলা সাহিত্যের 'শুভ্র নির্মল হাস্যরস' বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম আনেন। নীতিবান্, সুরুচিসম্পন্ন বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যকে অশ্লীলতামুক্ত করলেন। নীতি ও বিবেকের উপর ভিত্তি করে জাতীয় চরিত্রগঠনে কেশবচন্দ্র সেন প্রথমাবধি জোর দিয়েছিলেন।[১] ১৮৭০ খ্রীঃ যখন 'ভারত সংস্কার সভা' প্রতিষ্ঠিত হল তখন তিনি সর্বসাধারণের জন্য শিক্ষার আয়োজনেব সঙ্গে সঙ্গে মাদক দ্রব্য ও অশ্লীলতার বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচেষ্টা শুরু করেন।

'ভারত-সংস্কার-সভা'র একটি বিভাগ খোলা হল—'সুরাপান ও মাদকদ্রব্য নিবারণ' এই নামে। ইংরেজদের প্রভাবে প্রকাশ্যে মদ্যপান শিক্ষিত যুবকদের অভ্যাসে পরিণত হয়। "Excessive indulgence in the use of alcoholic liquors characterised the educated community;

১. কেশবচন্দ্র অশ্লীলতা নিবারণী সভা ১৮৭০ খ্রীঃ প্রতিষ্ঠা করেন। রাজা কালীকৃষ্ণ দেববাহাদুর এই সভার সভাপতি ছিলেন।

concomitant vices showed themselves, and premature mortality began to rage amongst the rising generations".[১]

সুরাপান ও মাদকদ্রব্যের ব্যবহার দেশে প্রবল বিভীষিকা হয়ে দাঁড়াল। ১৮৬৪ খ্রীঃ প্যারীচরণ সরকার মাদকদ্রব্যের বিরোধকল্পে যে সভা গঠন করেন তার অন্যতম সভ্য ছিলেন কেশবচন্দ্র সেন। 'সুরাপান ও মাদকদ্রব্য নিবারণ' বিভাগের মুখপত্র ছিল—'মদ না গরল'।

সুরাপানের বিরোধী তরুণ ছাত্রদের নিয়ে 'আশালতা বাহিনী' গঠিত হয়েছিল। এই দলের মুখপত্র ছিল 'বিষ-বৈরী'। নন্দলাল সেন এই পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন। ১২৮৭ বৈশাখে মাসিক-পত্ররূপে এর আবির্ভাব। 'মদ না গরল' পত্রিকাটির মতই জনসাধারণের মঙ্গলার্থে এই পত্রিকাটিও বিনামূল্যে বিতরিত হত।

'সুলভ সমাচারে'র পাতাতেও অশ্লীলতা ও মাদক দ্রব্যের বিরুদ্ধে কেশবচন্দ্রের বিরুদ্ধ-মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে 'গালাগালি', 'জঘন্য ভাষা' ও 'গাজনের সঙ' রচনায়। "যে দেশে ভদ্রলোকেরা পর্যন্ত আমোদ ও ক্রোধপরবশ হইয়া অতি কুৎসিত বাক্য স্ত্রী-পুরুষ-বালকবালিকার উপরে প্রয়োগ করিতে পারে, যে দেশে বালকেরা এবং স্ত্রীলোকেরা অবধি সহজে ঐ সকল পাপকথা মুখে আনিতে কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করে না, সে দেশের জঘন্যতা কতদূর ?... যদি শহরের দুর্গন্ধ ও ময়লা নিবারণের জন্য কোটি অর্থ ব্যয় হইতে পারে, তবে মনুষ্যের উপর মনুষ্য প্রতি মুহূর্তে যে এই নিষ্ঠুরতা করিতেছে, অশ্লীলতার দুর্গন্ধে সমুদয় জনসমাজের স্বাস্থ্য ধর্ম বিলোপ হইতেছে ইহার প্রতিবিধান জন্য কেন না একটু যত্ন হইবে ?"[২]

'সুলভ সমাচার'-এর সাহিত্যগুণ ॥

শুধু সংবাদ পরিবেশনের মধ্যেই 'সুলভ সমাচারে'র দায়িত্ব ফুরিয়ে যায়নি—স্থানে স্থানে সাহিত্যও হয়ে উঠেছে। এমন কি দু-একটি নিবন্ধ পাণ্ডিত্য ও তথ্যের বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে বিশুদ্ধ সাহিত্যের আস্বাদনও আনে। 'খোদার উপর খোদকারি' (সুলভ সমাচার ২৯।৮।১২৭৭) শিশু-

---

১. P. C. Mazoomdar, The Life and Teachings of Keshub Chunder Sen. P. 5. ২. গালাগালি, সুলভ সমাচার, ৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৮০।

সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত হতে পারে। ছোট্ট একটি গল্প একটি নীতিশিক্ষা বা 'মর‍্যাল'-এর মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে, যেমনটি আমরা ঈশপের গল্পে দেখেছি। 'কেরানী ও রাজপথ' রচনায় বাস্তবের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা সুগভীর জীবনরসে সিক্ত হয়ে উঠেছে। এক বৃষ্টির বিকেলে কেরানী বাবু অফিসের ছুটী শেষে বাড়ী ফিরছে। বহুপ্রত্যাশিত বৃষ্টি তাকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। রাজপথে বড় ভীড়। কেউ বা ঝগড়া করছে। হিন্দুস্থানীদের সন্তান ও বন্ধু-বান্ধব নিয়ে ফুটপাতের উপর বসে তামাক খাওয়া, সরস প্রেমালাপ করা; কোথাও বা তাদের প্রেয়সীরা পেঁয়াজ ছাড়াচ্ছে, কোথাও মোচা কাটছে, কোথাও বা ছেঁড়া মাদুরে ছেলেকে শুইয়ে রেখেছে।—কিছুই তাঁর দৃষ্টিবহির্ভূত নয়—'যখন পাহারাওয়ালা ভায়ার চোখে, চ্যুতফলের লোভে পূজাবাড়ীর কুকুরের' মত প্রলুব্ধ আকাঙ্ক্ষা দেখেন, কিংবা কেরানীবাবুকে আমের রস থেকে গায়ের চাপকান বাঁচিয়ে চলতে দেখেন ( কারণ, 'শনিবার অবধি ঐটিই চালাইতে হইবে, এত শীঘ্র ময়লা হইলে চলিবে কেন ?' ) তখন সহানুভূতি ও বাস্তববোধের স্পর্শে কেশবচন্দ্র সেন নিঃসন্দেহে সুসাহিত্যিকের পর্যায়ে উন্নীত হন। নববিধান-প্রবর্তক কেশবচন্দ্র সেন সমগ্রতার সাধক। তাঁর ধর্ম-সাধনায় ও কর্মযজ্ঞে সর্বত্রই সার্বিকতার সাধনা লক্ষ্য করেছি। রাজপথের বর্ণনা দিতে গিয়েও তাই তাঁর বাস্তববোধ শুধু মানবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি—ফুটপাথের মুরগী, শায়িত কুকুর এবং বেড়ালের ম্যাও ম্যাও ধ্বনি তাঁর বর্ণনার সম্পূর্ণতা দান করেছে।

আর একটি জিনিস লক্ষণীয়। 'কেরানী ও রাজপথ' ( 'সুলভ সমাচার', ২৫শে আষাঢ়, ১২৮০ ) রচনায় তৎকালীন কলকাতার রাজপথের একটি হুবহু প্রামাণ্য চিত্র পাই। "ড্রেনেজ, গ্যাস, জলের কলে শহরের অনেক উপকার করিয়াছে সত্য বটে, কিন্তু বিধিমতে বাঙ্গালীটোলাতে পথ চলিবার যে কি দুর্দশা ঘটাইয়াছে যাহারা পদব্রজে পথ চলে তাহারাই জানে, একটা স্থান না একটা স্থান খুঁড়িয়া রাখিয়াছে।"

বাস্তবের খুঁটিনাটি বর্ণনায়, সাধারণ মানুষ ও নগণ্য জীবের প্রতি সহ-অনুভূতিতে ও তৎকালীন জনজীবনের হুবহু প্রতিচ্ছবি রূপায়ণে 'কেরানী ও রাজপথ' নিবন্ধটি সাহিত্যের সার্থক নিদর্শন। এটিকে প্রবন্ধ না বলে 'রচনা সাহিত্য'-এর ( Essay Literature ) পর্যায়ে স্থান দেওয়া চলে।

'সুলভ সমাচারে'র ভাষা সহজ ও সর্বজনবোধ্য। ক্রিয়াপদগুলি সাধুরীতির

হলেও পরিবেশনের 'ষ্টাইলে' আগাগোড়া কথ্য গদ্যরীতি মানা হয়েছে। "মানুষ বৃষ্টি বৃষ্টি করিয়া পাগল হইয়াছিল, এতদিনের পর বৃষ্টি পড়িল। ইহা অপেক্ষা অধিক পড়িলে আমরাও সন্তুষ্ট হই, চাষীরাও সন্তুষ্ট হয়; কিন্তু কলিকাতার কেরানীবাবুরা সন্তুষ্ট হয়েন কিনা সন্দেহ।"[১]

কোথাও বা সংস্কৃত শব্দ—অতি সাধারণ বাংলা শব্দের পাশাপাশি অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে ব্যবহৃত হয়ে ভাবের স্বচ্ছন্দ প্রকাশ ঘটিয়েছে।

"পাহারাওয়ালা ভায়াও দুই একটা চ্যুতফলের লোভে পূজাবাড়ীর কুকুরের মত এদিক ওদিকে ফিরিতেছেন।"[২]

এসকল স্থানে কেশবচন্দ্রের স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা স্পষ্ট। কিন্তু একই সময়ে রচিত কোন কোন নিবন্ধের গদ্যে সংস্কৃত ভাষার প্রাচুর্য দেখা যায়।

"হে বালাম! বঙ্গদুহিতে, বাখরগঞ্জেশ্বরী চাল হণ্ডিকাবিলাসিনি! তুমি কত বেশে, কত বাহনে, আশ্রিত বাঙ্গালীর নয়ন-মন আকর্ষণ কর, গৃহস্থের ঘরে কদলীপত্রে, তুমি শ্বেতাঙ্গ ঢালিয়া শয়ন কর, মাঝির নৌকাতে কৃষ্ণবর্ণ শানকে তুমিই লোহিত মূর্তি ধারণ কর, ঘোড়ার আস্তাবলে অঙ্গে হরিদ্রা মাখিয়া, পলাণ্ডু সঙ্গে তুমি সহীসদিগের চীৎকারজীবী রসনার রসাকর্ষণ কর, টেবিলে আরোহণ করিয়া টেবিল রাইস নামে তুমি শাসনকর্তাদিগের উদরের সংবাদ লও।"[৩]

'সুলভ সমাচারে' মাঝে মাঝে কবিতাও প্রকাশিত হত। 'ভারতবাসীর প্রতি নিবেদন' ( সু. স. ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা ) কবিতাটিতে পরাধীনতার গ্লানি, বাঙ্গালীর কর্মবিমুখতা ও ক্লীবত্বের জন্য লজ্জা এবং স্বাজাত্যবোধের উদ্বোধন ঘটেছে। 'মাতালের পরিবার' ( সু. স. ২৯শে চৈত্র, ১২৭৭ ) কবিতাটিতে সমাজসংস্কারের উদ্দেশ্যে মদ্যপানের কুফল বর্ণিত হয়েছে। "বর্তমানে বাংলা দেশের পত্র-পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যা প্রকাশিত হওয়া একটা রেওয়াজে পরিণত হইয়াছে। ইহার সূচনা দেখি 'সুলভ সমাচারে'র মধ্যে। শারদীয়া পূজা উপলক্ষে লঘু রচনা ও লঘু চিত্রাবলী-সমন্বিত হইয়া সমাচারের একখানি ক্রোড়পত্র বাহির হইত।"[৪]

**মদনাগরল:** ভারতসংস্কার-সভার অন্তর্গত 'সুরাপান ও মাদক

১. কেরানী ও রাজপথ, সুলভ সমাচার, ২৫শে আষাঢ়, ১২৮০। ২. তদেব। ৩. বাঙ্গালা আবা, সুলভ সমাচার, ১৮ই বৈশাখ, ১২৮০। ৪. যোগেশচন্দ্র বাগল, কেশবচন্দ্র সেন, পৃ. ১১।

দ্রব্য নিবারণ' বিভাগের মুখপত্র। এই পত্রিকাটির সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী। ১২৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বৈশাখ মাসে এটি মাসিক পত্রিকা রূপে প্রথম প্রকাশিত হয়। সমাজসংস্কারের জন্য পত্রিকাটির হাজার হাজার কপি বিনামূল্যে জনসাধারণের মধ্যে বিতরিত হত।

**ধর্ম সাধন:** ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে সাপ্তাহিক পত্র রূপে এটি প্রকাশিত হয়। এটি ছিল 'সঙ্গত সভা'র মুখপত্র। সম্পাদক ছিলেন উমেশচন্দ্র দত্ত। এটিও এক পয়সা মূল্যের পত্রিকা। 'সঙ্গত সভা' মূলতঃ ধর্মালোচনার জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কাজেই এই পত্রিকার বিষয় ধর্মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। 'সঙ্গতে'র কার্যবিবরণ ও উপদেশের সারমর্ম এই পত্রিকায় প্রকাশিত হত। 'ধর্মসাধন' পত্রিকায় শিরোভাগে লেখা থাকত—"ভবে সাধন বিনা সে ধন মেলে না, কর সাধন, পূর্ণ হবে মনস্কাম।"

**বালকবন্ধু:** এটি ছিল পাক্ষিক পত্র। ১৮৭৮ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন কেশবচন্দ্র সেন স্বয়ং। এই পত্রিকাটির কলেবর বালকদের পাঠোপযোগী বিভিন্ন বিষয়ে পরিপূর্ণ থাকত। ১৮০০ শকের ১৫ই আষাঢ় প্রকাশিত পত্রিকার বিষয়সূচীটি লক্ষ্য করা যাক: (১) কিসে কি না হয়? (২) সাহসে কি না হয়? (৩) ইংরাজী মাসে কত দিন? (৪) বৃষ্টির দ্বারা উপকার (৫) বড় ও ছোট দিন (৬) মৎস্য (৭) অশিষ্ট বালক (৮) জিহ্বা (৯) ব্যাকরণ (১০) ঘূর্ণজল (ছবি-সহ) (১১) নিদ্রা (১২) হেঁয়ালি (১৩) মানসাংক (১৪) অংক। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় শিশুমনের উপযোগী করে লেখা হত। আনন্দ দানের জন্য থাকত—বালকদের চিত্রগ্রাহী ধাঁধা ও মানসাংক। এটির মূল্য ছিল এক পয়সা। গল্প, কবিতা, নীতিকথা, হেঁয়ালি ও মানসাংকে সমৃদ্ধ পত্রিকাটি তৎকালে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হলেও কিছুদিনের মধ্যে পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়; পরে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র সেন পুনরায় প্রকাশের ব্যবস্থা করেন।

**পরিচারিকা:** ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে প্রথম প্রকাশ। 'বামাবোধিনী' পত্রিকাটি আর্যনারীর কল্যাণার্থে নিযুক্ত ছিল। কিন্তু ঐ পত্রিকার সম্পাদক উমেশচন্দ্র দত্ত যখন 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজে'র সঙ্গে সংসর্গ পরিত্যাগ করে 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে' যোগ দিলেন তখন কেশবচন্দ্র

নারীদের জন্য অপর একটি স্বতন্ত্র পত্রিকার প্রয়োজন অনুভব করলেন। প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায় 'পরিচারিকা' পত্রিকাটি সেই প্রয়োজন মেটাল। ১৮৭৯ খ্রীঃ মে মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'আর্যনারী সমাজ'। পরবর্তী কালে 'আর্যনারী সমাজ' এই পত্রিকাটির পরিচালনার ভার আপন হাতে গ্রহণ করল। 'ভারতসংস্কার-সভা' নারী জাতির মঙ্গলের জন্য যেসব কার্যসূচী গ্রহণ করেছিল তার প্রতিটি বিষয়েরই অনুপুঙ্খ বিবৃতি 'পরিচারিকা' পত্রিকাটিতে থাকত।

বিষ-বৈরী: কেশবচন্দ্র সেন ১৮৭৮ খ্রীঃ ২৪শে জানুয়ারী 'আশালতা দল' গঠন করেন—এদের আশা সুরাপানের বিভীষিকা বন্ধ হবে, তরুণ-সম্প্রদায়ের জাগরণ ঘটবে। এই সভারই মুখপত্র—'বিষ-বৈরী' নামটি খুব ব্যঞ্জনাপূর্ণ; মদ্যপান বিষতুল্য, তারই শত্রু হচ্ছে 'আশালতা দলে'র মুখপত্র 'বিষ-বৈরী'। সংবাদপত্রের ইতিহাসে এ জাতীয় নামকরণে অভিনবত্ব আছে। এই পত্রিকাটির নাম কাব্যশ্রীমণ্ডিত হয়ে উঠলেও তৎকালীন সমাজে মদ্যাসক্ত ব্যক্তির প্রতি মুদ্গর হিসেবেই ব্যবহৃত হয়েছিল। এটি বিনামূল্যে সাধারণের মধ্যে বিতরিত হত।

কেশবচন্দ্র-প্রবর্তিত সাময়িক পত্রিকাগুলি প্রায় সবই বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই প্রচারিত হত। লণ্ডন থেকে ফিরে এসে তিনি ভারতসংস্কার-সভার বিরাট কর্মকাণ্ডের ব্যবস্থা করলেন। ধর্মপ্রচারের সঙ্গে এই সভার আরও কাজ ছিল। সাধারণ নরনারীর জাগতিক উন্নতির উদ্দেশ্য নিয়ে একদিকে শিক্ষার প্রসার অপর দিকে সমাজ-সংস্কার শুরু হল। যে-কোন কর্মের প্রচারের বাহন সাময়িক পত্রিকা। এই কারণেই দেখি, 'বামাহিতৈষিণী সভা'র মুখপত্র 'বামাবোধিনী পত্রিকা', 'সুরাপান ও মাদক দ্রব্য নিবারণে'র মুখপত্র 'মদ না গরল', 'সঙ্গত সভা'র মুখপত্র 'ধর্মসাধন', 'ভারতসংস্কার সভার নারী-কল্যাণ বিভাগের মুখপত্র 'পরিচারিকা' ও 'আশালতা দলে'র মুখপত্র 'বিষ-বৈরী'। কিন্তু বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে প্রকাশিত হলেও বাঙলা গদ্যের উন্নতির মূলে পত্রিকাগুলির যথেষ্ট অবদান আছে। ভাষা ক্রমশ বিদ্যাসাগরী রীতি পরিত্যাগ করে সহজ ও সাবলীলতা পেয়েছে। সকলেই জানেন, "এঁরা সাহিত্য করবার জন্য কখনও কলম ধরেননি, অলস অবকাশে রসসৃষ্টির বিলাসিতা এঁদের কর্মযোগী চরিত্রে আদৌ খাপ

খেত না।"[১] তথাপি কেশবচন্দ্রের মধ্যেই সাহিত্যের বীজ নিহিত ছিল। 'সুলভ সমাচার' ও 'বালকবন্ধু' পত্রিকায় কেশবচন্দ্র সেন সহজ সরল বাক্-ভঙ্গিমার মধ্য দিয়ে চলিত গদ্যরীতির প্রয়োগের পথটিকে আরও প্রশস্ত ও মসৃণ করে দিলেন। কেশবচন্দ্র সেনের মনীষা ধর্ম ও সমাজ সংস্কারগত প্রয়োজনে নিযুক্ত হলেও সংবাদপত্র-পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি লোকোত্তর প্রজ্ঞার সার্থক নিদর্শন রেখে গেছেন।

---

১. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, পৃ. ৫৮৩।

# তৃতীয় অধ্যায়

## নববিধান-সাহিত্য

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে 'নববিধান' ঘোষিত হল। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ এই সময় থেকে 'নববিধান সমাজ' নামে বিখ্যাত হল। "ঐ সমাজের লোকেরা আপনাদিগকে 'নববিধান সমাজে'র লোক বলিয়া পরিচয় দিতে আরম্ভ করিলেন।"[১] নববিধান প্রচারিত হবার পরে সর্বধর্ম, সর্বশাস্ত্র ও সকল সম্প্রদায়ের সাধুদের প্রতি কেশবচন্দ্র বিশেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করলেন। 'সাধুসমাগম' গ্রন্থের আলোচনায় এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। কেশবচন্দ্রের উৎসাহে ও অনুপ্রেরণায় প্রেরিত প্রচারকগণ নানা শাস্ত্র আলোচনার মধ্য দিয়ে 'নববিধানের' একটি সুষ্ঠু ও সুন্দর প্রতিমূর্তি স্থাপন করলেন। এঁদের মধ্যে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, গৌরগোবিন্দ রায়, সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত, গিরিশচন্দ্র সেন, মহেন্দ্রনাথ বসু ও ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ আলোচনার মাধ্যমে নববিধানের সারসত্য প্রচার করতে শুরু করেন।

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র নববিধান-সমাজের প্রচারক সভার নাম রাখলেন 'প্রেরিত দরবার'। পূর্ব-উল্লিখিত ব্যক্তিগণ এই দরবারের সভ্য ছিলেন এবং তাঁরা ঈশ্বরপ্রেরিত প্রচারক বলে ব্রাহ্মসমাজে গণ্য হতেন। এঁরা সকলে একই ঈশ্বরের সন্তান, সেইজন্য এঁরা পরস্পর 'ভাই' সম্পর্কে আবদ্ধ। এসব লেখকদের নামের আগে 'ভাই' শব্দ ব্যবহার করা হত। সমাজের প্রচারকগণ সর্বস্ব ত্যাগ করে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে 'নববিধান' প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। প্রচারকগণের অন্তরে ধর্মপিপাসা এতই তীব্র ছিল যে প্রায় সকলেই সু-উপায়ী জীবিকা পরিত্যাগ করে বৈরাগীর ভিক্ষার ঝুলি বরণ করে নিয়েছিলেন। কেশবচন্দ্রের ব্যক্তিগত ত্যাগ ও কর্মোদ্দীপনা এইসকল প্রচারকগণের পথের সম্বল ছিল। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, "তাঁহার অপর একটি প্রধান কার্য, ঈশ্বরের করুণাতে বিশ্বাস স্থাপনপূর্বক তাঁহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম প্রচার ও ব্রাহ্মসমাজের

১. যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, কেশবচন্দ্র ও বঙ্গসাহিত্য, পৃ. ৭৩।

সেবাতে দেহ-মন-প্রাণ নিয়োগ করিতে পারেন, এরূপ এক প্রচারকদল সৃষ্টি করা।"১

এই প্রেরিত প্রচারকগণ ধর্ম-আলোচনা, ধর্ম-উপদেশ ও নানা শাস্ত্র আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন মহাপুরুষের জীবনী, আলেখ্য, আত্মজীবনী, চিঠিপত্র, ডায়েরী, পত্রিকা-সম্পাদনা, নাটক ও কাব্য-রচনা সুরু করলেন। অপরদিকে ধর্ম সংগীত ও কীর্তনের নবদিগন্ত সূচিত হল। যদিও ধর্মপ্রচার ও আধ্যাত্মিক উদ্দীপনা-জাত এইসব প্রচেষ্টা, তথাপি এঁদের সাধনায় বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের এক নতুন দিক সমৃদ্ধ হয়ে উঠল। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, গৌরগোবিন্দ, সাধু অঘোরনাথ, গিরিশচন্দ্র সেন, মহেন্দ্রনাথ বসু ও সাহিত্যিক ও সংগীতশিল্পী ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল বাঙ্গালা সাহিত্যে এক নতুন গোষ্ঠীর সাধক বলে চিহ্নিত হলেন। দেবেন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত ব্রাহ্ম-সাহিত্য ধারায় মূলতঃ উপদেশ ও ধর্মালোচনার সঙ্গে কিছু আত্মজীবনী রচিত হয়েছিল, কিন্তু কেশবচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের প্রভাব ও প্রতিভার দ্বারা প্রচারকগণ ধর্মকে কেন্দ্র করেই নানা দিক থেকে বাঙ্গালা সাহিত্যকে পুষ্ট করে তুললেন। এই কারণেই এঁদের ব্রাহ্ম সাহিত্যিকদের থেকে স্বতন্ত্র করে 'নববিধান-সাহিত্যিক'গোষ্ঠী নামে পরিচয় দেওয়া সমীচীন। নববিধানের প্রেরিত প্রচারকগণের দ্বারা রচিত সমগ্র গ্রন্থাবলী ও গদ্য-রচনাতে কয়েকটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। ১. নাটক ও কাব্য ২. কীর্তন ও সংগীত ৩. জীবনী ও আত্মজীবনী ৪. চিঠিপত্র ও ডায়েরী ৫. ধর্ম ও উপদেশ ৬. পত্রিকা-পরিচালনা ও সম্পাদনা।

### ১. নাটক ও কাব্য :

কেশব-মণ্ডলীর অন্যতম সাহিত্যিক ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল ; কীর্তন ও সংগীতের ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিভার বিস্ময়কর পরিচয় পাওয়া যায়। নাটক ও কাব্যরচনার ক্ষেত্রেও তিনি কৃতিত্বের পরিচয় রেখেছেন। চিরঞ্জীব শর্মা ছদ্মনামে তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যে বিশেষ পরিচিত। "ভক্তিচৈতন্যচন্দ্রিকা প্রণয়নকালে ত্রৈলোক্যনাথ চিরঞ্জীব নামটি গ্রহণ করেন।"২ ধর্মালোচনা ও ধর্মপ্রচার তাঁর জীবনের লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি যেমন অজস্র

১ শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত। ২. যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, কেশবচন্দ্র ও বঙ্গসাহিত্য, পৃ. ২৫৭।

সংগীতাবলী রচনা করেছেন, কেশবচন্দ্র সেনও সাধু অঘোরনাথের জীবনী রচনা করেছেন, 'ঈশাচরিতামৃত' মন্থন করেছেন, তেমনি ধর্মপ্রচারের লক্ষ্য নিয়েই 'বিধানভারত' মহাকাব্য, 'গরলে অমৃত' ও 'ইহকাল পরকাল' উপন্যাস এবং 'নববৃন্দাবন', 'কলিসংহার' ও 'যুগলমিলন' নাটক রচনা করেছেন।

'বিধান-ভারত' কাব্যগ্রন্থটি প্রথমোল্লাস এবং দ্বিতীয়োল্লাস এই দুই খণ্ডে ১৮০২ শকাব্দে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে নববিধানের জয় ঘোষিত হয়েছে। মর্ত্যে নববিধানের প্রচারে স্বর্গে দেবতাদের উল্লাস ও নববিধানের মাহাত্ম্য কীর্তিত করা হয়েছে। এটি মহাকাব্যের আকারে লেখা হলেও এর মধ্যে মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের রীতিটি ফুটে উঠেছে। প্রথমে মঙ্গলাচরণ—

"যুগধর্মপতি যিনি বিধানবিধাতা
ভবভারহারী হরি মঙ্গলনিদান,
তাঁর পদে বারবার করি আগে নমস্কার,
বরাভয় তিনি মোরে করুন প্রদান,
হউন প্রসন্ন দেব, সর্বসিদ্ধিদাতা।"

সর্বসিদ্ধিদাতার বন্দনা সর্বাগ্রে করে অন্যান্য ধর্মের সাধু ও যোগীদের বন্দনা করে নববিধানের বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।—

"স্বদেশে বিদেশে কিম্বা ইহ পরলোকে,
যথায় যেভাবে যিনি করেন বিহার,
হিন্দু বুদ্ধ খৃষ্টীয়ান, পার্সি কিম্বা মুসলমান,
সকলেই ভগবদ্‌ভক্ত পরিবার,
দিন সবে পদধূলি আমার মস্তকে।"

এরপর 'পবিত্রাত্মা ও আদ্যাশক্তির বন্দনা'—মঙ্গলকাব্যের প্রারম্ভে এইরূপ দেবদেবী বন্দনার রীতি আছে। মহাপ্রলয়ে ভীত হয়ে দেবগণ কর্তৃক ভগবানের স্তব ও নববিধানের জন্ম—নববিধানের রাজ্যাভিষেকের পর 'নববিধানের দিগ্বিজয় যাত্রা'।

"বিধান-ভারতে ভক্তভোজন উৎসব,
ভক্তিভাবে যেইজন মন দিয়া শুনে,
অনায়াসে হয় তার স্বর্গসুখভোগ
ইহলোকে, ভগবৎচরণ প্রসাদে।"

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে যখন বাঙালা গদ্য উন্নত মননশীলতার সঙ্গে

হৃদয়ভাব মিশ্রিত করে একটা সুষ্ঠু লাবণ্যময়ী রূপ পেয়েছে, তখন ধর্ম-প্রচারের উদ্দেশ্যে পাঁচালীর ছন্দে ও ঢংগে এই জাতীয় কাব্য-রচনা অভিনব হলেও কতটুকু যুগানুকূল সেটা ভাববার বিষয়। বারমাস্যার রীতিতে পুরঞ্জনের আত্মবিলাপ, কিংবা কালকেতুর ভোজনের অনুসরণে সাধুভোজনের বর্ণনা—মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যকেই বার বার মনে করিয়ে দেয়। অপরদিকে, মহাপ্রলয়, দেবাসুরের সংগ্রাম, সৃষ্টিলীলা-বর্ণনা, ভাগবততত্ত্ব ব্যাখ্যা, পাষণ্ড দলন ও শাক্যসিংহ, দেবর্ষি মুশা ও যীশুচরিত আলোচনার মধ্য দিয়ে মহাযোগ-সমন্বয়ের যে প্রচেষ্টা, এ সবের মধ্যে আছে এক মহাকাব্যিক বৈচিত্র্য ও প্রসারতা। তাছাড়া পাশ্চাত্ত্য মহাকাব্যের বস্তুনিষ্ঠতা 'বিধান-ভারত' কাব্যটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মহাকাব্য—তন্ময় কাব্য, কবির আত্মমগ্নতা নয়। চিরঞ্জীব শর্মার বিষয়-তন্নিষ্ঠ বৃত্তি এই কাব্যে প্রধান হয়ে উঠেছে। মহাকাব্যের এই বস্তু উপাদান প্রধানতঃ পুরাণ থেকে আহৃত হয়। ঈশ্বরের মহিমা ঘোষণা, মানব-দানব ও দেবদেবীর চরিত্র সমাবেশে অতিলৌকিক পরিবেশ সৃষ্টি এক শ্রেণীর মহাকাব্যের বিশেষ লক্ষণ। সেইদিক থেকে অবশ্য 'বিধান-ভারত' মহাকাব্য নামে অভিহিত হবার যোগ্য। যুগধর্ম, মহাপ্রলয়, দেবগণ কর্তৃক ভগবানের স্তব, দেবাসুরের সংগ্রাম, সৃষ্টিলীলা, ভাগবততত্ত্ব, হিমালয়ের যোগশিক্ষা, মহাযোগ-সমন্বয় ইত্যাদি বহু জটিল ঘটনাবর্তে ঈশ্বরের মহিমা ঘোষিত হয়েছে—স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল ত্রিভুবনে ঐশীশক্তির জয়গান করে 'বিধান-ভারত' মহাকাব্যোচিত গুণে ভূষিত হয়েছে। এ ছাড়া ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল বনমালা (১৮৮১ খ্রীঃ), বাল্যসখা (১৮৮৩) ও যৌবনসখা (১৮০৯ শক) তিনটি কাব্যগ্রন্থ চিরঞ্জীব শর্মা ছদ্মনামে প্রকাশ করেন। এই তিনটি কাব্যগ্রন্থই ছোট ছোট লিরিক কবিতার সংকলন। 'বনমালা' কাব্যগ্রন্থে ২৬টি কবিতা সংকলিত হয়েছে। 'বাল্যসখা'তে ৩২টি আর 'যৌবনসখা'তে ৪১টি কবিতা সংকলিত হয়েছে। ঈশ্বরমুখী গীতিকবিতা এইগুলি। ঈশ্বরপ্রেমের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিপ্রেমও প্রকাশিত হয়েছে কয়েকটি কবিতায়—প্রভাত, প্রজাপতি, ফুলবাগান, পূর্ণিমার চাঁদ, আকাশ, ফুলের আদর, প্রকৃতির পরিচর্যা ইত্যাদি কবিতায়।

'পথের সম্বল' (প্রথম প্রকাশ ১৩১৭ বঙ্গাব্দ) গ্রন্থটির 'কবিতাকদম্ব' অংশে ৬৬টি কবিতা আছে। এই কবিতাগুলির রচনার উদ্দেশ্য গ্রন্থটির 'নিবেদন' অংশে কবি বর্ণনা করেছেন—"সম্প্রদায়-নির্বিশেষে পরিবার মধ্যে সন্তানসন্ততির

সহিত স্বদেশের নরনারীগণ যাহাতে সহজে ভগভক্তি উপার্জন করিতে পারেন তদুপযোগী সহজ ভাষায় সরল ভাবের কতকগুলি প্রার্থনা-সংগীত ও ধর্মচিন্তা এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইল।"

চিরঞ্জীব শর্মার উপন্যাস 'গরলে অমৃত' ও 'বিংশশতাব্দী আশাকাব্য'। 'গরলে অমৃত'কে (১৮১১ শকাব্দ) লেখক মহারসোপন্যাস বলেছেন। ভূমিকায় লেখক বলেছেন—"সকল রসের সার মাধুর্যরস, ইহাকে বৈষ্ণব সাধুরা পঞ্চম মহারস বলিয়া থাকেন। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মাধুর্য—পাঁচ রসের সমষ্টি এই মহারস। এই পঞ্চবিধ রসের সাহায্যে নির্বিশেষ নিরুপাধি সত্তা অতীন্দ্রিয় নিরাকার পরব্রহ্মের প্রকট লীলা সাকার রূপে প্রকাশিত হইয়া দেহধারী জীবকে তাঁহার কথঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করে।" নানা নৈসর্গিক অবস্থারূপ গরলের মধ্যে তিনি মহারসরূপ অমৃতের সন্ধান করেছেন। উপন্যাসটির উদ্দেশ্য—ভগবদ্‌ভক্তি শিক্ষা ও সকল প্রেমের উৎসস্থল মহাপ্রেমময় পুরুষের সান্নিধ্যসুখ-লাভ। বাঞ্ছারাম ও সন্তোষিণীর জাগতিক প্রেমকে সেই আধ্যাত্মিক প্রেমের পথে উত্তরণ করিয়েছেন। বাঞ্ছারাম পণ্ডিতও তত্ত্বদর্শী, সংসার-জ্ঞানহীন উদাসী। সন্তোষিণীর ঐকান্তিক অনুগত প্রেমপূজা তাঁকে বিচলিত করেনি, বরং ত্যাগের পথের, ধর্মের পথের সহায়ক হয়েছে। উপন্যাসটির প্রথম অংশটিতে কিছু সামাজিক চিত্র ও দুই-একটি চরিত্র সুষ্ঠভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে। এমন কি মৃতদার বনমালী পুনর্বার বিয়ে করবে কিনা এই বিষয়ে তার অন্তর্দ্বন্দ্বের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্কিমী রীতিতে ঔপন্যাসিক চিরঞ্জীব শর্মা পঞ্চম পরিচ্ছেদে বনমালীর যুক্তির সঙ্গে হৃদয়দৌর্বল্যের দ্বন্দ্বটি বিস্তারিতভাবে অংকন করেছেন। "বনমালী মায়ার ফাঁদে পড়িয়া গেলেন। শাশুড়ীর প্রস্তাবটাই তখন মনে সর্বাগ্রে উদিত হইল। যে সময় প্রস্তাব প্রথমে শ্রবণ করেন, তখন আমাদের মনে হইয়াছিল—বুঝি বা কথাটা ভাসিয়া গেল; কিন্তু তাহা একেবারে ভাসিয়া যায় নাই। হৃদয়কে ঈষৎ স্পর্শ করিয়াছিল, সুযোগ পাইয়া এখনে মস্তক উত্তোলন করিল।"[১] বঙ্কিম-যুগবলয়ে বসে উপন্যাস রচনা করতে গিয়ে বঙ্কিমের প্রভাব এড়িয়ে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। উপন্যাসটির প্রতিটি পরিচ্ছেদের নামকরণ বঙ্কিমের উপন্যাসগুলিকেই মনে পড়িয়ে দেয়। এমন

১. চিরঞ্জীব শর্মা, গরলে অমৃত পৃ. ২০।

কি প্রথমাংশের কোথাও কোথাও পাঠক-পাঠিকাকে সম্বোধন করে চরিত্র ও ঘটনার ব্যাখ্যা ও কিছু উপদেশ দান বঙ্কিমেরই শিল্পরীতিতে গঠিত। "পাঠক মহাশয় এখানে শিক্ষা করুন, একবার বন্ধন শিথিল হইলে মানুষ কোথায় গিয়া শেষ দাঁড়ায়। সাধনের অপরিপক্কাবস্থায় অন্য দিকে একবার যদি মন গেল, তবে জানিবে যে আর তাহাকে পূর্বস্থানে সহজে ফিরাইয়া আনিতে পারিবে না। এইজন্যই শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন—চর্মপাত্রে যদি একটি মাত্র ছিদ্র থাকে তাহার ভিতর দিয়া সমস্ত জল বিনিঃসৃত হইয়া যায়।'[১] উপন্যাসটির পরিসমাপ্তিতে গৃহিণী সন্তোষিণীকে যোগিনী ও তত্ত্বজ্ঞানী সাধক বাঞ্ছারামকে মহামিলনের রাজ্যে অনন্ত শান্তিবক্ষে টেনে এনেছেন। "তথায় স্বামী-আত্মা স্ত্রী-আত্মা একাত্মা হইয়া পরমাত্মার সঙ্গে নিত্য যোগে বিহার করিতে লাগিল।"[২] 'গরলে অমৃত' গ্রন্থটির মধ্যে উপন্যাসের সমস্ত আয়োজনই ছিল—কাহিনী, নায়কচরিত্র, নায়ক-নায়িকার প্রেম, প্রেমের সার্থকতার পথে প্রতিবন্ধকতা, জীবনদর্শন ; কিন্তু লেখকের ধর্মীয় প্রেরণা ও ধর্মপ্রচার প্রথমাবধি এতই প্রবল যে উপন্যাসের কাহিনীর বিন্যাসও জটিলতার অভাবে চারিত্রিক দ্বন্দ্ব কিংবা বহির্ঘটনা-সংঘাতের অনুপস্থিতিতে ও নায়ক-নায়িকার অনৈসর্গিক প্রেমাকুলতায় উপন্যাস রচনার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।[৩]

'বিংশ শতাব্দী' ( আশা কাব্য ) ( ১২৯৮ বঙ্গাব্দ ) কাহিনীটি পূর্ববিভাগ ও উত্তরবিভাগ দুই খণ্ডে সমাপ্ত। উনবিংশ শতাব্দীতে বসে গ্রন্থকার বিংশ শতাব্দীর কাহিনী রচনা করছেন। ভূমিকায় বলেছেন, "বিংশ শতাব্দীর শেষভাগের ইতিহাস বর্ণন করিলাম। বিশ্বাসের রাজ্যে মরণও নাই, বর্ষ, যুগ, শতাব্দী প্রভৃতি কালেরও ব্যবধান নাই। অধিকন্তু নামটি আবার চিরঞ্জীব। বস্তুত ভূত-ভবিষ্যতের প্রভেদ গণনা কোন কাজেরই নয়। অখণ্ড

---

১. চিরঞ্জীব শর্মা, গরলে অমৃত, পৃ. ২১। ২. তদেব পৃ. ১৭৫। ৩ এই উপন্যাসটি নববিধান সমাজের অন্যতম ব্রাহ্মভ্রাতা গৌরগোবিন্দ রায়ের দ্বারা নিন্দিত হয়েছে। তৎকালীন ধর্মতত্ত্বের সম্পাদক গৌরগোবিন্দ রায়ের উপন্যাসটিতে "পরস্ত্রীর প্রতি প্রেম" প্রকাশিত হয়েছে মনে করে অনেকে কঠোর সমালোচনা করেন। উপন্যাসটি ব্রাহ্ম পরিমণ্ডলে কুভাব ও কুরুচি প্রকাশক। শুধু তাই নয়, লেখক "ব্রাহ্মসমাজের প্রতি লোকের বিরক্তি জানাইবার জন্য গ্রন্থ রচনা" ( ধর্মতত্ত্ব, ১৬ই চৈত্র ১৮১০, পৃ. ৬৬ ) করেছেন বলে ধর্মতত্ত্বের সম্পাদক মত প্রকাশ করেছেন। অবশ্য এই জাতীয় মতামত নিঃসন্দেহে কিছুটা পারস্পরিক মতবিরোধ ও বিদ্বেষপ্রসূত।

অনন্ত ঈশ্বরের দিকে চাহিলে সমস্তই এক জায়গায় দেখিতে পাওয়া যায়। ধ্যানস্থ হইয়া একবার চাহিয়া দেখ, বিংশ শতাব্দীকে এ বেলা ও বেলা মনে হইবে।"

এই গ্রন্থে কয়েকটি নরনারীর চরিত্র আছে—নলিনীকান্ত ও নিরঞ্জন, দিবাকর ও উল্লাসিনী, দীনেশ ও উর্মিলা। সম্পূর্ণ কাল্পনিক নানা ঘটনা ও দুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে কাহিনী বিস্তারের কষ্টকর প্রচেষ্টা ও উল্লিখিত চরিত্রগুলির পুনর্মিলন ও বিবাহ-উৎসবের মধ্য দিয়ে গ্রন্থটি সমাপ্ত হয়েছে। কিন্তু এটিকে উপন্যাস বলা চলে কিনা সন্দেহ। তিনি এটিকে 'আশাকাব্য' নামে অভিহিত করতে চান। প্রকৃতপক্ষে এটি যেমন উপন্যাস নয়, তেমনি কাব্যও নয়—তবে এতে ভবিষ্যতের একটি আশাব্যঞ্জক আদর্শমূলক চিত্র পরিকল্পিত হয়েছে। "বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আমার এই কাব্যকাহিনী আরম্ভ হইল, অন্তভাগে শেষ হইবে।"[১] গ্রন্থকার কল্পনার পাখায় ভর করে আগামী ভবিষ্যতের আকাশে বিচরণ করেছেন। নববিধান সমাজের বর্তমান অবস্থা বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ও শেষে কি পরিবর্তিত রূপ গ্রহণ করবে তারই একটি কাব্যময় রূপ 'আশাকাব্যে' উপস্থিত করেছেন। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের একদল সভ্য কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ার ফলে স্বতন্ত্র একটি সমাজ—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গঠিত করেন। সেই থেকে ব্রাহ্মসমাজ তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে গেল। আদি ব্রাহ্মসমাজ, নববিধান ব্রাহ্মসমাজ ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ। এই তিনটি দলের ব্রাহ্মদের মধ্যে মত ও পথের বিরোধিতা ও আদর্শগত কলহ প্রচণ্ড তিক্ততার সৃষ্টি করেছিল। 'আশাকাব্যে' এই তিক্ততার অবসানেরই আশা করা হয়েছে।

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা মহানগরীতে জাতীয় মহাসমিতির বার্ষিক উৎসব অত্যন্ত ঘটার সঙ্গে পালিত হল। তিনদল ব্রাহ্ম একত্রিত হয়ে এক মহাশক্তির সৃষ্টি করল। "ভাদ্রের মহাবেগশালিনী পদ্মানদীর বিঘূর্ণিত আবর্ত যেরূপ দুর্জয় বলে বহু দূর হইতে তরণীসকলকে আকর্ষণ করে, ব্রাহ্মসমাজ এখন সেইরূপ পরাক্রমশালী হইল।"[২] লক্ষ্য করবার বিষয়, নববিধানের প্রচারক বিভিন্ন সমাজের ব্রাহ্মদের মধ্যে বিরোধের অবসান করে মিলনের ছবি কল্পনা করেছেন আদি কিংবা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ অনুযায়ী

---

১. চিরঞ্জীব শর্মা, আশাকাব্য, পৃ. ৩। ২. তদেব, পৃ. ৩০৭।

নয়। বরং সম্পূর্ণভাবে কেশবচন্দ্র সেন-প্রবর্তিত নববিধানের আদর্শেই মিলনের ছবিটি চিরঞ্জীব শর্মার চোখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। ব্রাহ্মসমাজ এখন সকলের প্রিয়, আর্যের আর্যত্ব, খ্রীষ্টিয়ানের খ্রীষ্টত্ব, বিচিত্রতার ভেতরে একতা, যোগ, ভক্তি, কর্ম ও জ্ঞান মিলিত হয়ে নববিধানরূপ নববৃন্দাবনের সৃষ্টি করেছে।

"চল যাই নববৃন্দাবনে
আনন্দমনে হরি হরি বলে বদনে।
বিধাননিশান ধরি বাজায়ে বিজয়ভেরী
নরনারী মিলে এক প্রাণে।"[১]

সংগীতটির মধ্য দিয়ে গ্রন্থটির সমাপ্তি সূচিত হয়েছে।

ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল শুধু উপন্যাস ও কাব্যের ক্ষেত্রে নয়, নাটকের ক্ষেত্রেও পদচারণা করেছেন। তাঁর রচিত তিনটি নাটক 'নববৃন্দাবন' নাটক, ( ১৮০৪ শকাব্দ ) ও 'যুগলমিলন' নাটক ( ১২৯৩ বঙ্গাব্দ ) ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল। নববিধান-প্রবর্তক কেশবচন্দ্র সেনও অভিনয়কে ধর্মপ্রচারের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁরই অনুপ্রেরণায় প্রচারক ভাই ত্রৈলোক্যনাথ তাঁর সাহিত্যানুরাগ ও ধর্মৈষণার সমন্বয় ঘটালেন উপন্যাস, কাব্য ও নাটকে। আচার্যের প্রার্থনায় কেশবচন্দ্র অভিনয়ে প্রচার সম্পর্কে বলেছেন, "ইতিপূর্বে অন্যান্য উপায়ে তোমার রাজ্য যাহাতে জগতে প্রচার হয়, তাহা করিয়াছি। এবার রঙ্গভূমিতে প্রচার। আমোদ আর ধর্ম মিশিল। এবারকার এই বিধি। রঙ্গভূমিতে যদি ধর্মপ্রচার হয়, তা হলে মন্দ কি? আমোদ-আহ্লাদ করে যদি স্বর্গে যাওয়া যায়, মন্দ কি? ইহা কি যথার্থ, ধর্মপ্রচারের জন্য তুমি এই বিধি করিলে? অভিনেতা যারা তারা তবে ধর্মপ্রচারক। নাট্যভূমিতে সকল লোক, ছোট হইতে বড় সকলেই তবে ধর্মপ্রচারক।

না, আমরা আমোদ করি বটে, কিন্তু ইহা নববিধান প্রচারের একটা উপায় স্বরূপ। এই নববৃন্দাবন নাটক নববিধান প্রচারের একটা উপায় স্বরূপ হোক।"[২] স্বয়ং কেশবচন্দ্র সেনের এই স্বীকারোক্তির পরে বুঝে নিতে হয় যে 'নববৃন্দাবন' নাটকটি নববিধান প্রচারের যন্ত্রস্বরূপ। আরো দুটি

১. চিরঞ্জীব শর্মা, আশাকাব্য, পৃ. ৩২১-৩২২। ২. কেশবচন্দ্র সেন, আচার্যের প্রার্থনা, পৃ. ১০০৯, ৩য় ভাগ। "অভিনয়ে প্রচার," ৩ই সেপ্টেম্বর ১৮৮২ খ্রীঃ।

প্রার্থনায় আচার্য কেশবচন্দ্র সেন 'নববৃন্দাবন' নাটকটি সম্পর্কে আনন্দ প্রকাশ করেছেন।[১] ছয় অঙ্কের 'নববৃন্দাবন' নাটকটির গঠন পাশ্চাত্ত্য নাটক রচনার রীতি অনুসরণ করেছে। প্রতিটি অংশ কয়েকটি গর্ভাংকে বিভক্ত হয়ে সন্নিবেশিত হয়েছে। পাশ্চাত্ত্য নাটক সাধারণতঃ পঞ্চাঙ্কে বিভক্ত থাকে— প্রারম্ভ, প্রবাহ, উৎকর্ষ, গ্রন্থিমোচন, উপসংহার। প্রথম অংকে সূচনা, দ্বিতীয় অংকে জটিলতা সৃষ্টি, তৃতীয় অংকে নাটকীয় ঘটনার চরম উৎকর্ষ, চতুর্থ অংকে জটিলতার মুক্তি ও পঞ্চমাংকে উপসংহার। কিন্তু এই নাটকের ছয়টি অংক হলেও তৃতীয় অংকে কাহিনীর জটিলতা চরম অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে। পঞ্চমাংকে পরিসমাপ্তি এলেও আরও একটি অংক যোজিত করে অযথা কাহিনীর বিস্তার ঘটান হয়েছে।

অবিনাশের অতিরিক্ত মদ্যাসক্তির ফলে সুখী একটি পরিবার কিভাবে বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে, অবিনাশের স্ত্রীর একান্ত পতিভক্তি ও ঈশ্বরনিষ্ঠা ও অবিনাশের ভাই হরিসুখের ব্রহ্মগত প্রাণ ও ব্রাহ্ম আদর্শ কিভাবে অবিনাশকে পাপপঙ্ক থেকে নববিধানের আদর্শে উজ্জীবিত করে নববৃন্দাবনের পথ নির্দেশ করে দিল, তাই নিয়েই মূল কাহিনী রচিত হয়েছে। মাঝে নববিধান প্রচারের জন্য ধর্ম উপদেশ ও আদর্শের আতিশয্য থাকলেও সামাজিক অনেকগুলি ছবিই বাস্তবমুখী ও জীবন্ত। অতিরিক্ত মদ্যপানে পরিবার ও সমাজ কি ভয়ঙ্কর পরিণতি পায় তারই জীবন্ত ছবি নববৃন্দাবনে অঙ্কিত হয়েছে। এছাড়া জাল, জুয়াচুরি, মিথ্যা প্রতারণা, স্বার্থপরতা, হিংসা ইত্যাদি মানবিক বৃত্তিগুলি ঘটনার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে বর্ণিত হয়েছে বলে নাটকটি পূর্বোক্ত উপন্যাসগুলির মত নিষ্প্রাণ হয়ে ওঠেনি। নাটকটি সম্পূর্ণভাবে নববিধানের ব্যাখ্যা ও প্রচারকল্পে রচিত হয়েছিল। প্রথম দিকে নাটকীয়তা কিছু জমে উঠলেও শেষের দিকে প্রচারধর্মিতা অত্যন্ত প্রকট হয়ে উঠেছে। নববিধান সমন্বয়ের ধর্ম। "অভেদানন্দ—বর্তমান যুগধর্ম লীলার অভিপ্রায়ই এই যে, জীব গৃহে থাকিয়াই যোগ ভক্তি বৈরাগ্য সমাধি সাধন করে জীবন্মুক্তি প্রাপ্ত হবে। এক ব্রহ্মবস্তু হইতেই ঘরে বসিয়া তুমি সমুদয় লাভ করিবে, তাঁহারই মধ্যে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড দেখিবে।"[২] নববিধান শুধু সমন্বয়েরই ধর্ম

---

১. কেশবচন্দ্র, আচার্যের প্রার্থনা, (ক) অভিনয়ে নববৃন্দাবন, ১ সেপ্টেম্বর ১৮৮২, ৩য় ভাগ, পৃ. ৯৯৬। তদেব (খ) 'অভিনয়' পৃ. ১৮৯, ২৭ আগস্ট ১৮৮২ খ্রীঃ। ২. চিরঞ্জীব শর্মা, নববৃন্দাবন, পৃ. ২৮।

নয়, নববিধান গৃহীর ধর্ম—বনে-জঙ্গলে গিয়ে বিবাগী হবার প্রয়োজন নেই—সুখী পরিবার তৈরী করে নববিধানের চর্যা ও নীতি।

ধর্মপ্রচার, ঘটনার আতিশয্য, পাপপুরুষ ও বিবেক ও বৈরাগ্যের উপস্থিতি (পঞ্চম অংক ৮ দ্বিতীয় গর্ভাংক) এবং অনেক স্থলে ঘটনার স্বাভাবিক গতি রহিত হয়ে পূর্বপরিকল্পিত ঘটনা বিন্যাসের মধ্য দিয়ে (মন্দকে ভাল করার একটা সংকল্প পূর্ব থেকে পরিকল্পিত) নাটকটি কিছুটা কৃত্রিম প্রচারযন্ত্র-স্বরূপ হয়ে পড়েছে। যাত্রার প্রভাবে বিবেক, বৈরাগ্য ও সঙ্গে পাপপুরুষের দ্বন্দ্বটিতে ত্রৈলোক্যনাথের কিশোর বয়সের যাত্রা-অভিনয়ের প্রভাব কিছুটা পড়েছে বললে অসঙ্গত হবে না।[১] এই নাটকটির সাহিত্যগুণের ঘাটতি পূরণ করেছে নাটকটির অভিনয়গুণ। বহুবার নাটকটি অত্যন্ত সার্থকতার সঙ্গে বহু দর্শকের সম্মুখে সু-অভিনীত হয়েছে।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বর কেশবভবন 'কমলকুটীর' প্রাঙ্গণে নববৃন্দাবন নাটকের প্রথম অভিনয় হয়। কেশবচন্দ্র স্বয়ং, ত্রৈলোক্যনাথ ও প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ত্রয়ী ঋত্বিকের বেশে সুমধুর সঙ্গীতে সকলকে মুগ্ধ করেন।[২] কমলকুটীরে ১৬ই সেপ্টেম্বর ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে এই নাটকের দ্বিতীয় অভিনয় হয়। এই অভিনয়ে দর্শক হিসেবে তৎকালীন অনেক গণ্যমান্য অতিথিব সমাবেশ হয়েছিল। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, মহেন্দ্রলাল সরকার, মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন ও কৃষ্ণদাস পাল তাঁদের মধ্যে অন্যতম।[৩] আবার ঐ বছরেই যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের আমন্ত্রণে পাথুরিয়াঘাটা রাজবাড়ীতে নাটকটি তৃতীয়বার অভিনীত হয়।[৪]

নববৃন্দাবন নাটকটিকে সুষ্ঠু ও সর্বাঙ্গসুন্দর রূপে মঞ্চাভিনয় করবার জন্য স্বয়ং কেশবচন্দ্র অসুস্থ অবস্থাতেও প্রচুর পরিশ্রম করেছিলেন ও নাটকটি সার্থকতার সঙ্গে মঞ্চস্থ হওয়ার পর ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালকে একটি পত্রে জানান—

"এখানে ঘোরঘটা করিয়া কয়বার নাটকের অভিনয় হইয়া গেল। তজ্জন্য শরীরটা একটু অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক, পরিশ্রম সফল হইয়াছে;

১. ত্রৈলোক্যনাথ কিশোর বয়সে একটি যাত্রাদলে যোগ দেন। তাঁর সুকণ্ঠের জন্য যাত্রাদলের অধিকারীর নিকট তিনি বিশেষ প্রিয়পাত্র হয়েছিলেন—যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, কেশবচন্দ্র ও বঙ্গসাহিত্য, পৃ. ২৫৪। ২. 'নববৃন্দাবন নাটক অভিনয়।' ধর্মতত্ত্ব, ১ আশ্বিন, ১৮০৪ শক। ৩. The Liberal, 1st October, 1882. ৪. The Liberal, 10th Dec, 1882,

লোকমুখে সুখ্যাতি আর ধরে না। সকলেই সন্তুষ্ট ও মোহিত। আশ্চর্য এই, যাহারা একবার দেখিয়াছে, তাহারা আবার আসিয়া দেখিতেছে।··· নাটকের ছলে আমাদের মত এবং কীর্তিকাহিনী সাধারণের কাছে প্রচার করিবার খুব সুবিধা হইয়াছে।"[১]

'নববৃন্দাবন' নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে পাহাড়ী বাবার ভূমিকায় কেশবচন্দ্র, পাদরির ভূমিকায় প্রতাপচন্দ্র, মৌলবীর ভূমিকায় গিরিশচন্দ্র সেন, অভেদানন্দের রূপসজ্জায়, গৌর-গোবিন্দ ও নরেন্দ্রনাথ দত্তের ( স্বামী বিবেকানন্দ ) একবার বিবেকের ভূমিকায় অভিনয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এমন কি স্বয়ং রামকৃষ্ণদেব পর্যন্ত কমলকুটীরে 'নববৃন্দাবন' নাটকের অভিনয় দর্শন করেন।[২] ( ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারী তারিখে )। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই, ১৭ই ও ২২শে মার্চ যথাক্রমে রাধাকান্ত দেবের গৃহে খেলাতচন্দ্র ঘোষের বাড়ীতে ও গ্রেট ইণ্ডিয়ান সার্কাস মণ্ডপে নাটকটি তিনবার অভিনীত হয়ে দর্শকদের জনপ্রিয়তার প্রমাণ দেয়। পরে আরও কয়েকবার নববৃন্দাবন নাটকটি অভিনীত হয়। যেমন কুচবিহার মহারাজার নূতন প্রাসাদ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ১৮০৮ শকে ৮ই বৈশাখ এটি অভিনীত হয়।

যে কোন নাটকের দুটি বৈশিষ্ট্য থাকে। কাব্যগুণ ও দৃশ্যগুণ। অর্থাৎ নাটকে অভিনয়গুণ না থাকলে সেটি কখনই সাফল্য লাভ করতে পারে না। সেই যুগে বহুবার সফলতার সঙ্গে অভিনীত হয়ে নববৃন্দাবন নাটকখানি যে কতদূর লোক-মনোরঞ্জনে সফল হয়েছিল ও জনপ্রিয় হয়েছিল সেটি প্রমাণ করেছে। স্বয়ং কেশবচন্দ্র নববৃন্দাবন নাটকের সফলতার জন্য প্রার্থনা করেছেন।

ত্রৈলোক্যনাথের দ্বিতীয় নাটক 'কলিসংহার' ( ১৮৮৪ খ্রীঃ প্রকাশিত )। এই নাটকটিও কয়েকবার মঞ্চে সার্থকতার সঙ্গে অভিনীত হয়। ১৮৮৬ খ্রীঃ অ্যালবার্ট হলে, ১৮০৮ শকাব্দে কুচবিহারের মহারাজার নূতন প্রাসাদ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ৭ই বৈশাখ কুচবিহারে নাটকটি অভিনীত হয়। ঐ সালেই ২০শে আশ্বিন রংপুরের কাকিনায় ব্রাহ্মসমাজের শারদীয়া উৎসব উপলক্ষে কলিসংহার নাটক আবার অভিনীত হয়।[৩]

চার অংকের এই নাটকটির দৃশ্যগুণ ছাড়া কাব্যগুণও লক্ষ্য করা যায়।

---

১. চিরঞ্জীব শর্মা, কেশবচরিত, পৃ. ১০৫। ২. The Liberal, 18th Feb. 1883.
৩. ধর্মতত্ত্ব, ১৬ই কার্তিক ১৮০৮ শকাব্দ, পৃ. ২১৯।

নাটকটির জীবনমুখীনতা—শঠতা, নীচতা, ভণ্ডামি ইত্যাদি মানুষের ইতর বৃত্তিগুলির মধ্যে বেশ বাস্তবমুখী। খলেন্দ্রের শঠতা ও প্রতারণার কাছে ধর্ম ও ধর্মপুত্র দেবদত্তের পরাজয় কলিযুগেরই সত্য পরিচয়। কিন্তু নাটকটির নাম কলিসংহার। কাজেই ধর্মের জয় আর অধর্মের পরাজয়। অর্থাৎ কলির নিধনের মধ্য দিয়ে নাটকটি পরিসমাপ্ত। নাটকের প্রচ্ছদপটে শিরোনামার নীচে লেখক গীতার একটি শ্লোক মুদ্রিত করেছেন—

'যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥"

কলিকে সংহার করবার জন্য 'নববিধানে'র আবির্ভাব। 'নববিধানে'র মন্ত্র— সত্যমেব জয়তে', 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' এবং 'ব্রহ্মকৃপা হি কেবলম্' ধ্বনির মধ্য দিয়ে সত্যযুগের প্রতিষ্ঠা ও ধর্মের জয়। এটিই এই নাটকের মূল বিষয় হলেও এই নাটকটি নববৃন্দাবন নাটক অপেক্ষা অনেক বেশী সাহিত্যগুণ-সমৃদ্ধ। স্ত্রৈণ রমণীকান্তের পত্নীর প্রতি আসক্তি, বাবা-মায়ের প্রতি স্বার্থপর নিষ্ঠুর আচরণ, বন্ধুর বেশে দেবদত্তের সঙ্গে খলেন্দ্রের শঠতা ও প্রতারণা, লাঠিয়াল সহযোগে সুমিত্রার শ্লীলতা-হানির চেষ্টা ও গহনা-লুঠের চেষ্টা, রানী লম্বোদরীর রূপের মিথ্যা গরব ও গরীব মানগোবিন্দ ও তাঁর স্ত্রী কনকলতার চরিত্র সম্পূর্ণ বাস্তবধর্মী এবং জীবনরস-সমৃদ্ধ।

চতুর্থ অংকে সমাপ্ত 'যুগলমিলন' নাটকটিকে (১২৯৩ বঙ্গাব্দ লেখক নিজেই দাম্পত্য প্রেমের নাটক বলেছেন। অধ্যাত্মরাজ্যে পৌঁছবার জন্য বনে যাবার প্রয়োজন নেই। এই সংসারই কঠিন সাধনার উপযুক্ত ক্ষেত্র। "বিশেষতঃ দাম্পত্য প্রেম-সাধনে সংসারে যে উচ্চ আধ্যাত্মিক যোগধর্ম লাভ হয়, সেটা তো আর উপেক্ষা কত্তে পার না।"[১] "পুরুষে প্রকৃতি এবং প্রকৃতিতে পুরুষ— অর্থাৎ ভগবানেতে যেমন পুরুষ-প্রকৃতির মিলন আছে, তেমনি সেই দুইটি ভাব একত্রিত হলে তবে পূর্ণ যোগ হবে। প্রত্যেক নরনারীর চরিত্রে এই যুগল প্রকৃতির মিলনকে পূর্ণাবস্থা বলা যায়।"[২] যোগ মানে দুটিতে এক হওয়া। ভক্তরাজ শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ এবং মহাযোগী ঈশার জীবনে এটি ঘটেছিল। পুরুষের বীরত্ব, মহত্ব আর নারীর মাধুর্য, কোমলতা এই উভয়ের মিলন না হলে কেউ যোগী হতে পারে না। নববিধান সমস্ত ভাব সমস্ত ভবের

---

১. চিরঞ্জীব শর্মা, যুগলমিলন, পৃ. ৭০। ২. তদেব, পৃ. ৭১।

মিলনক্ষেত্র। দম্পতির মিলনের মধ্যে সেই 'তিনি'কে পুরুষ-প্রকৃতির মিলনের ছায়া অনুভব করে ভক্ত তৃপ্ত হন।

"তোমার রূপের ছায়া পড়ে যায় হৃদিদর্পণে।
দেখে সে যুগলরূপ অপরূপ নিজ জীবনে।
আহা তার কিবা সুকৃতি, পুরুষে মিলে প্রকৃতি
ধরে সুন্দর প্রকৃতি, যথা দম্পতি মিলনে।"

"যুগলমিলন" নাটকের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টি হল এরকম। কিন্তু বৃদ্ধের বিবাহ-আকাঙ্ক্ষা, বীরেন্দ্রের প্রেয়সী সুরমাকে বিন্দিপিসীর সাহায্যে বলপ্রয়োগ করে বিবাহের চেষ্টা ও বাধাপ্রাপ্ত হয়ে রসময়ের বিকার-জ্বর ইত্যাদি ঘটনার মধ্য দিয়ে কাহিনী ধর্মপ্রচার ছাড়াও জীবনরস-সমৃদ্ধ একটি স্বতন্ত্র নাটকের মর্যাদা পেতে পারে। এই নাটকের ভাষাও অনেকটা জীবনানুগ।

তবে এই নাটকটিকে অনেক স্থলেই দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ ও বিয়ে-পাগলা বুড়ো'র নাটকের প্রতিভাস বলে মনে হয়। বিন্দিপিসীর চরিত্রটি হুবহু পদী ময়রানীর চরিত্রের অনুরূপ। এমন কি স্কুল-বালকদের বিন্দিপিসীর পিছুলাগা ও "বিন্দে দূতীর মা, ব্যাং-পোড়া খা, যমের বাড়ী যা।" (যুগল-মিলন, পৃঃ ২৪) নীলদর্পণ নাটকের পদী ময়রানীর পিছনে বালকদের নাচতে নাচতে "ময়রানী লো সই নীল গেঁজেছ কই" মনে করিয়ে দেয়। ক্ষেত্রমণিকে রোগসাহেবের কক্ষে নিয়ে গিয়েছিল পদী ময়রানী—এই নাটকে বিন্দীপিসী সুরমাসুন্দরীকে রসময়ের গৃহে পৌঁছে দিয়েছে। 'যুগলমিলন' নাটকের রোগ সাহেবের ভূমিকাটি রসময়ের দ্বারা সু-অভিনীত হয়েছে। নারীজাতির প্রতি পুরুষের অত্যাচার ও শ্লীলতা-হানির চেষ্টা সব মিলিয়ে একটি চিরন্তন দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে। কিন্তু সুরমার মধ্যে স্বয়ং ভৈরবী শক্তি আবির্ভূত হয়ে সুরমাকে রক্ষা করলেন। নীলদর্পণে অত্যাচারের দৃশ্যের পর অত্যাচারিত ক্ষেত্রমণি বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। সেটি ছিল অনেক বেশী বাস্তব ও জীবনধর্মী। এই নাটকে অত্যাচারী রসময় অসুস্থ হয়েছে ও বিকারগ্রস্ত হয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় দিন গুনছে।

'নীলদর্পণ' নাটকটির প্রভাব চিরঞ্জীব শর্মার উপরে বেশ গভীর ভাবেই মুদ্রিত হয়েছিল মনে হয়। কারণ 'নববৃন্দাবন' নাটকের অংশ, দ্বিতীয় গর্ভাংকে অবিনাশের গ্রেপ্তার, আলুলায়িত-কেশে অলকার প্রবেশ ও শোকে উন্মাদিনী চারুশীলা, 'নীলদর্পণ' নাটকের শেষের দৃশ্যগুলি মনে করিয়ে দেয়। এমন কি

দীনবন্ধুর ভাষাও 'কলিসংহার' নাটকে প্রথম অংশ দ্বিতীয় গর্ভাংকে প্রভাব বিস্তার করেছে। "মোর ডবকা ছালে দুডোরে কি খাতে দেবো। তারা যে মাঠেতে আস্তে চারডে নাস্তা কত্তিও পাবে না।"[১]

চিরঞ্জীব শর্মার নাটকগুলির ধর্মীয় আবেদন বাদ দিলেও এগুলির সামাজিক নাটক হিসেবে মূল্য আছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সমাজের নানা কুপ্রথাকে অবলম্বন করে সমাজসংস্কারের উদ্দেশ্যে উমেশচন্দ্রের বিধবা-বিবাহ নাটক, দীনবন্ধুর সধবার একাদশী, বিয়েপাগলা বুড়ো, জামাইবারিক, নীলদর্পণ রচিত হয়েছিল ; এই নাটকগুলির মতই বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহের দোষ কীর্তন করা হয়েছে চিরঞ্জীব শর্মার নাটকে ; আর সমাজে নারীদের পুরুষের পাশে সুযোগ্য স্থানটি নির্ণয় করতেও চিরঞ্জীব শর্মার নাটক তিনটি সাহায্য করবে।

চিরঞ্জীব শর্মার নাটকে ও উপন্যাসে প্রচুর সংগীতের ব্যবহার দেখা যায়। সংগীতই ত্রৈলোক্যনাথের আপনক্ষেত্র। প্রতিটি সংগীতের প্রারম্ভে রাগরাগিণীর উল্লেখ আছে। সংগীতগুলি সুললিত ও সুপ্রযুক্ত।

চিরঞ্জীব শর্মা যখন বাঙলা নাটকের ক্ষেত্রে আবির্ভূত হন তখন গিরিশচন্দ্রের যুগ শুরু হয়ে গেছে। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ন্যাশন্যাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে বাঙলা নাটকের জগতে প্রাণশক্তি ও জীবন-চাঞ্চল্য দেখা দিল। ইতিমধ্যে গিরিশচন্দ্র ঘোষ নানা পৌরাণিক নাটক—সীতার বনবাস ( ১২৮৮ ), লক্ষ্মণবর্জন (১২৮৮ ), সীতার বিবাহ ( ১২৮৯ ), সীতাহরণ ( ১২৮৯ ) ও নিমাই-সন্ন্যাস ( ১২৮৯ ) রচনা করেছেন। রামায়ণ ও পুরাণের ভক্তিমূলক কাহিনী নিয়ে জনপ্রিয় নাটক-সৃষ্টিতে গিরিশচন্দ্র অদ্বিতীয়তা প্রমাণ করেছেন। এই যুগে বসেই নববিধান-প্রচারকগণ, বিশেষতঃ ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল বিধান-মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে ধর্মমূলক নাটক সৃষ্টি করলেন। গীতা, উপনিষদ ও বেদান্তের ধর্মের নবমূল্যায়ন হল। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে হিন্দু পুনর্জাগৃতির যুগে কেশবচন্দ্রের অনুগামী শিষ্যবর্গ হিন্দুধর্মের সঙ্গে ব্রাহ্মচিন্তার আপস করে নববিধানের আদর্শ প্রচার করতে চেয়েছিলেন। এই কারণে তাঁরা যেমন প্রবন্ধ লিখেছেন, জীবনী-আত্মজীবনী রচনা করেছেন, সংবাদপত্র

১. চিরঞ্জীব শর্মা, কলিসংহার নাটক, পৃ. ৮।

সম্পাদনা করেছেন, তেমনিই কাব্য,-কবিতা, উপন্যাস-নাটক ও সংগীত রচনার মধ্য দিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশক বাঙলা সাহিত্যের পুষ্টি ও ব্যাপ্তি সাধন করেছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে বঙ্কিমযুগের অবসানে রবীন্দ্রযুগের সূচনা আব বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা মধ্যগগন স্পর্শ করেছে—এই যুগের বলয়ে আছেন সবুজপত্রের হোতা তীক্ষ্ণ মননের অধিকারী প্রমথ চৌধুরী; কাব্যের ক্ষেত্রেও মোহিতলাল, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও নজরুলের কবিতায় সরাসরিভাবে আধুনিকতার বিজয়-বাণী ঘোষিত হয়েছে; এমনই একটি বিস্ময়কর বৈচিত্র্যের যুগে বসে ব্রাহ্ম সাহিত্যিকবৃন্দ গণ্ডীবদ্ধ সীমিত সাহিত্য সৃষ্টিতে নিজেদের প্রতিভাকে সীমাবদ্ধ করে রেখেছিলেন। নববিধানের মাহাত্ম্য কীর্তন, কিংবা গোষ্ঠীর কারও জীবনী-বচনা, কিংবা আত্মজীবনী-রচনায় ভগবৎকৃপা ও অধ্যাত্ম-অনুভূতির প্রগাঢ় পরিচয় দান ব্যতীত এঁদের রচনার বিষয় ভিন্নতর হতে পাবত না। যেমন মধ্যযুগে রচিত হয়েছিল মঙ্গলকাব্যের ধারা, বৈষ্ণবদের দ্বারা রচিত হয়েছিল বৈষ্ণব সাহিত্য, তেমনি উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে দেখলাম ব্রাহ্ম-সাহিত্যের ধারা। দেবেন্দ্রনাথ ও রাজনারায়ণ বসু এধারার প্রবর্তক হলেও কেশবচন্দ্রের অসাধারণ প্রতিভা, জ্ঞানের গভীরতা ও অনুভূতির প্রগাঢ়তা এই ব্রাহ্ম-সাহিত্যের মন্দাকিনীতে ভাবের জোয়ার এনেছিল। কেশবচন্দ্রের সাহিত্যপ্রীতি ও সাহিত্যশৈলীর পরিচয় ইতিপূর্বে পেয়েছি। এইখানেই তাঁর কৃতিত্বের পরিসমাপ্তি নয়, তাঁকে কেন্দ্র করে বাঙলা সাহিত্য ও সমাজে বিরাট এক পরিবর্তন ও বিপ্লব সূচিত হয়েছিল। একদিকে ভারতসংস্কার-সভার মাধ্যমে কর্ম-উদ্দীপনা পেয়েছিল তৎকালীন সমাজবাসী, অপরদিকে আধ্যাত্মিক মার্গে যোগ-ভক্তি-কর্ম-জ্ঞানের নতুন সমন্বয়ের পথে প্রচারকদের মাঝে বিবেক-বৈরাগ্যের অগ্নি জ্বলে উঠেছিল। কেশবকে কেন্দ্র করে তাই নববিধানের প্রচারকমণ্ডলী বেঁচে ছিলেন। "কেশবমণ্ডলী ও কেশবচন্দ্রের মাঝখানে আমি কোন সীমারেখা টানতে পারিনি। কেশব-সাহিত্যের কতটা যে কার প্রাপ্য তার নির্ধারণ করা কঠিন। তাঁরা নিজেদের নাম গোপন করে সংবাদপত্রে লিখেছেন, বই রচনা করেছেন। এই মণ্ডলীকে যদি স্বতন্ত্র করেও ধরি, তবে বাংলা সাহিত্যে এই মণ্ডলীর দানটিও অসাধারণ। কিন্তু ঐ কার্যে কেশবচন্দ্রই ছিলেন তাঁদের নেতা। কেশবচন্দ্র ছিলেন বাংলা

সাহিত্যের অদ্বিতীয় নায়ক।"[১] সেইজন্য কেশবচন্দ্র শুধু নন, তাঁর প্রধান প্রচারকবর্গ ও কেশবমণ্ডলী-রচিত সাহিত্যই 'নববিধান সাহিত্য'। নববিধান-ব্রাহ্মদের সাহিত্যিক কৃতিত্ব আজ পর্যন্ত ব্রাহ্ম ব্যাপার বলে সাহিত্যালোচনায় অপাঙ্‌ক্তেয় করে রাখা হয়েছে। কিন্তু কেশবচন্দ্র সেন ও কেশবমণ্ডলীর সাহিত্যকে বাদ দিয়ে বাঙলা গদ্য-সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিহাস রচিত হতে পারে না। ধর্মালোচনা মুখ্য বিষয় হলেও স্বামী বিবেকানন্দের রচনা ও শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের কথামৃত সাহিত্যের মর্যাদা পেয়েছে ও বাঙালা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাসে তার মূল্যায়নও হয়েছে। কাজেই প্রায় ছয়-সাত দশক ধরে কেশবচন্দ্র সেন ও কেশবমণ্ডলী-রচিত যে গদ্য-কবিতা, সংগীত-কীর্তন, নাটক-উপন্যাস, জীবনী-আত্মজীবনী, পত্রসাহিত্য ও সাংবাদিকতার অখণ্ড স্রোতোধারা, তা শুধু বিশাল বিস্তৃতি নিয়েই বাঙালা সাহিত্যের অনেকাংশ দখল করে আছে তা-ই নয়, সমসাময়িক ও পরবর্তী কালের বঙ্গসাহিত্যকেও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করেছে নিঃসন্দেহে।

## ২. কীর্তন ও সংগীত :

ব্রহ্মসংগীত/সংকীর্তন/নগরকীর্তন, স্তোত্র ও শ্লোক

"শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥"

—শ্রীমদ্ভাগত, ৭ম স্কন্ধ, ৫ম অধ্যায়, ১৮শ শ্লোক

কীর্তন—ভগবানেরই গুণকীর্তন। মুখ্যতঃ শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক সংগীত অর্থেই কীর্তন শব্দটি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বর্তমানে কালীবিষয়ক সংগীতও কালীকীর্তন নামে সুপরিচিত। প্রকৃতপক্ষে যে কোন ধর্মমূলক, ভক্তিমূলক সংগীতই কীর্তন বলে অভিহিত হয়। হিন্দীতে ভক্তিমূলক গীত-অর্থে ভজন শব্দটি প্রচলিত আছে। যদিও বাঙলার বাইরে অন্যান্য প্রদেশেও কীর্তন শব্দটির ব্যবহার আছে; যেমন, "মহারাষ্ট্র দেশে সাধক কবি তুকারাম যে সংগীত করিতেন তাহাও কীর্তন নামে কথিত হইয়াছে।"[২] তথাপি কীর্তন বলতে বাঙালা দেশের একটি বিশিষ্ট সংগীতপদ্ধতিকেই বোঝান হয়। কীর্তন বাঙালীর নিজস্ব জিনিস। কীর্তন ও বাউল-গীতে বাঙালীর আপন বৈশিষ্ট্য

১. শ্রীসজনীকান্ত দাস, ১৯শে নভেম্বর ১৯৫১ খ্রীঃ, 'ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে প্রদত্ত ভাষণ থেকে : ধর্মতত্ত্ব, ১লা ও ১৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫৮। ২. খগেন্দ্রনাথ মিত্র, কীর্তন : পৃ. ৪।

ফুটে উঠেছে। বাংলার বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীদের হৃদয়-আর্তি ও প্রেম-ভক্তি, শ্রীকৃষ্ণের রূপ ও ঐশ্বর্য বর্ণনার মধ্য দিয়েই 'কীর্তন'-এর প্রচলন হয়েছে। "কীর্তি ও কীর্তন একই ধাতু হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। কীর্তন বলিতে যে সংগীতবিশেষ বুঝায়, তাহা এই কীর্তি—বিশেষভাবে শ্রীকৃষ্ণের কীর্তি গান করিবার পদ্ধতি হইতে আসিয়াছে।"[১] এই কীর্তন বৈষ্ণবকৃষ্টি-জাত হইলেও বাঙালার সংগীতের উপর বিশেষরূপে প্রভাব বিস্তার করেছে। কীর্তন-গানের আন্তরিকতা, সুকোমল আবেদন ও সুললিত ঢং পরবর্তী কালে যাত্রা থিয়েটার ও সাধারণ সংগীতে অনুসৃত হয়েছে বারবার। এমন কি ভাবতে বিস্ময় জাগে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে নববিধান-ব্রাহ্মদের মধ্যে কীর্তন একটি, বিশিষ্ট স্থান করে নিয়েছে। "কীর্তনগানের সুকোমল আবেদন ও বৈশিষ্ট্য লইয়া বহু ব্রাহ্মসংগীত রচিত হইয়াছে।"[২]

কীর্তনের মুখ্য বিষয় প্রেমসঞ্চার। 'নববিধান' সমাজে কীর্তনের প্রচলন এক সম্পূর্ণ অভিনব বস্তু। কেশবচন্দ্র যোগ ও জ্ঞানের সঙ্গে মিশ্রিত করলেন ভক্তি। ব্রাহ্মসমাজে যখন ভক্তি এল তখন ভক্তিমূলক ব্রাহ্মসংগীতে কীর্তন অনায়াসে প্রবেশ করবার সুযোগ করে নিল। কেশবচন্দ্র সেনের প্রথম জীবনে ভক্তি আসেনি। রাজা রামমোহনের কাছ থেকে তিনি পেয়েছিলেন বিবেক আর দেবেন্দ্রনাথের কাছ থেকে লাভ করেছিলেন বৈরাগ্য ও বিশ্বাস। প্রথম জীবনে সাধনার কঠোরতা ক্রমশঃ ভক্তির কোমলতায় পরিবর্তিত হল। বিবেকের সাহারার মধ্যে ভক্তির প্রেমকমল প্রস্ফুটিত হল। 'জীবনবেদে' কেশবচন্দ্র সেন বলেছেন—"তখন বিবেকপ্রধানই ছিলাম, সেকালে ব্রাহ্মদের সকলেই প্রায় বিবেকপ্রধান ছিলেন।... শ্রীমৃদঙ্গের নাম শোনা যায় নাই, শ্রীহরিকে ডাকিতে শিখি নাই, শ্রীমতী আনন্দময়ীকে দেখা হয় নাই। শ্রীনাথ, শ্রীপতি প্রভৃতি নাম তখনও ব্রাহ্মেরা ঈশ্বরকে দেন নাই। তখন পিতা ব্রহ্ম ছিলেন, আনন্দময়ীর মন্দির হয় নাই। খোল বাজে নাই, একটিও সংকীর্তন প্রস্তুত হয় নাই।"[৩]

কেশবচন্দ্র একেশ্বরবাদী ব্রাহ্মধর্মে আকৃষ্ট হলেও জন্মসূত্রে তিনি ছিলেন কলুটোলার গোঁড়া বৈষ্ণব পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর পিতামহ রামকমল সেন ছিলেন পরিষ্কার একান্ত নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব। বাল্যকাল

১. খগেন্দ্রনাথ মিত্র, কীর্তন: পৃ. ৩। ২. তদেব, পৃ. ৪। ৩. কেশবচন্দ্র সেন, জীবনবেদ, পৃ. ৬২-৬৩।

থেকে বাড়ীতে তিনি পূজা, অর্চনা, ভোগ, আরতি ও কীর্তন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে দেবতা গিরিধারীর আরাধনা দেখে এসেছেন। যৌবনে তাই বিবেকবৈরাগ্য-শাসিত নীরস নিরাকার ব্রহ্মসাধনা করলেও প্রেম-ভক্তি তাঁর অন্তরেব গভীরে একান্তভাবেই সঞ্চিত ছিল। নববিধান ধর্মে মাতৃনামে ঈশ্বরকে ভজনা কখনও বা হরিনামে ঈশ্বরের সাধনা নীরস ব্রহ্মতাত্ত্বিক ভক্তের চোখের জলে সরস হয়ে উঠল! খোলকরতাল নিয়ে ব্রহ্মকীর্তন ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে কেশবচন্দ্র সেনই প্রথম প্রবর্তন করলেন।

বালকবয়সেই কেশবচন্দ্র সেন কীর্তনের প্রতি প্রীতি দেখিয়েছেন। 'কেশবচরিত'-লেখক জানাচ্ছেন—"বালক কেশব একদা বিজয়াদশমীর দিন বয়স্যদিগকে লইয়া এক নগরকীর্তন বাহির করেন। কলার খোলা জোড়া দিয়া তাহাতে কয়েকখানি খোল, বাতাবি-নেবুর খোসায় কর্তাল প্রস্তুত হইল, পরে বজ্ঞ-ডুম্বরের মালা গাঁথিয়া গলায় দিয়া, ছেঁড়া ন্যাকড়া দ্বারা এক একটি টিকী রচনা করিয়া একদল বালক কেশবের সঙ্গে ঐরূপ খোলকর্তাল বাজাইতে বাজাইতে পথে বাহির হইল। এই বালক কীর্তনীয়াদলের নেতা বালক কেশব।"[১] বাল্যকালে নিছক খেলাব মধ্য দিয়েই সেদিন ভবিষ্যৎ ব্রাহ্ম-সমাজের নেতা কেশবের ভবিতব্য লেখা হয়েছিল। বালক কীর্তনীয়াদলের সেই নেতা একদিন সমগ্র শিক্ষিত সহস্র বঙ্গীয় যুবককে কীর্তনের রসে মাতিয়ে তুলেছিলেন।

কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁর সুযোগ্য প্রচারকগণ যখন কঠোর সাধনায় নিমগ্ন, এমন সময়ে সাধনাকে মধুর ও আনন্দময় করার জন্য সংকীর্তনের প্রয়োজন বোধ হল। "কেহ কেহ বলিলেন সংকীর্তনের সুর অতি মনোহর, পরে স্থির হইল একজন বৈষ্ণবকে আনাইয়া সংকীর্তন শ্রবণ করা হোক। তদন্তর সকলেই বৈষ্ণবের মুখে মৃদঙ্গের সহিত সংকীর্তনের গান শ্রবণ করিয়া প্রীত হইলেন এবং তাহা আপনাদের মধ্যে প্রবর্তিত-করণের ইচ্ছা করিলেন। পরে কেশববাবু একখানি মৃদঙ্গ ক্রয় করিয়া গৃহের এক পার্শ্বে নিভৃত স্থানে রাখিয়াছিলেন, মধ্যে মধ্যে তাহা বাজাইতেন। সংকীর্তনের সুললিত সংগীত তাঁহাদের সে সময়ে বিশেষ উপযোগী হইয়াছিল।"[২]

---

১. চিরঞ্জীব শর্মা, কেশবচরিত, পৃ. ১১-১২। ২. ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত, পৃ. ৩০৬।

১৭৮৯ শকের ২৩শে আশ্বিন ( ১৮৬৭ খ্রীঃ অক্টোবর ) ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজে কীর্তন গান প্রথম আরম্ভ হয়। "প্রথমে বাবু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় কীর্তনের সুরে নিম্নলিখিত সংগীত দুইটি প্রস্তুত করেন।"[১] সর্বপ্রথম বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীই কীর্তন-সংগীত রচনা করেন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের জন্য।

১. পাপে মলিন মোরা, চল চল ভাই।
পিতার চরণ ধরি কাঁদিয়ে লুটাই রে।
পতিতপাবন পিতা, ভকতবৎসল,
উদ্ধারেন পাপী জনে দেখি অসহায়।
প্রেমের জলধি তিনি সংসার পাথারে,
পতিত দেখিয়ে দয়া তাই এত হয় রে।
বিলম্ব কর না আর ভুলিয়ে মায়ায়,
ত্বরিত লই গে চল তাঁর পদাশ্রয় রে।

২. পতিত পাবন ভকত জীবন
অখিলতারণ বল রে সবাই।
বল রে বল রে বল রে সবাই।
যাঁরে ডাকলে হৃদয় শীতল হবে।
যাঁরে ডাকলে পাপী তরে যাবে।
ওরে এমন নাম আর পাবি না রে।

কীর্তনের সুরে ব্রহ্মসংগীত সমাজের প্রত্যেকেরই প্রীতিকর হল, কিন্তু তখনও মৃদঙ্গ বাজাতে কেউ পারত না। কেশবচন্দ্র সেনের দ্বিতীয় কন্যার নামকরণ কালে যে উপাসনা হয়েছিল সেইদিন প্রকাশ্যভাবে খোলসহ কীর্তন গীত হয়।[২]

১৮৬৭ খ্রীঃ নভেম্বর মাসে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে'র উৎসবে আরাধনা, ধ্যান, প্রার্থনা, পাঠ, আলোচনা ও বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে সংগীত ও সংকীর্তন বিশেষ স্থান দখল করেছিল। পরের বছরে ১৮৬৮ খ্রীঃ সাম্বৎসরিক উৎসব অতি সমারোহের সঙ্গে পালিত হয়েছিল। প্রকাশ্য রাজপথে নগরসংকীর্তন এক অভিনব ঘটনা। বিশেষতঃ তৎকালীন বাগ্মী সুপণ্ডিত ও পাশ্চাত্য

১. ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত, পৃ. ৩০৭। ২. তদেব, পৃ. ৩০৮।

শিক্ষায় সুশিক্ষিত কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁর মণ্ডলী কর্তৃক এই জাতীয় নগরসংকীর্তন উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্ত্য-প্রভাবিত শিক্ষিত সমাজের কাছে অত্যন্ত বিস্ময়ের বস্তু হয়েছিল। সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে নগরসংকীর্তনের সংবাদ প্রচার করা হয়েছিল। নির্দিষ্ট দিনে "সুশিক্ষিত ভদ্রলোকেরা দলবদ্ধ হইয়া নগরের পথে পথে হস্তে পতাকা ধারণ পূর্বক মৃদঙ্গ করতাল তুরী ভেরীর সহিত" নিম্নলিখিত সংগীতটি কীর্তন করতে করতে প্রকাশ্যে রাজপথ পরিক্রমা করেন।[২]

তোরা আয় রে ভাই
এতদিনে দুঃখের নিশি হল অবসান,
নগরে উঠিল ব্রহ্মনাম।
কর সবে আনন্দেতে ব্রহ্মসংকীর্তন,
পাপতাপ দূরে যাবে জুড়াবে জীবন।
দিতে পরিত্রাণ করুণানিধান,
ব্রাহ্মধর্ম করিলেন প্রেরণ ;
খুলে মুক্তির দ্বার সকলেরে করেন আবাহন।
সে দ্বার অবারিত,
কেউ না হয় বঞ্চিত ;
তথায় দুঃখী ধনী মূর্খ জ্ঞানী সকলে সমান।
নরনারীর সাধারণের সমান অধিকার।
যার আছে ভক্তি,
সে পাবে মুক্তি,
নাহি জাতবিচার।

এইভাবে ব্রাহ্ম সাধনায় কীর্তন একটি প্রধান স্থান দখল করে নিল। নগর-সংকীর্তন সম্পর্কে শিক্ষিত জনের কিছুটা উন্নাসিকতা ছিল। 'নেড়ানেড়ির' ব্যাপার বলে কীর্তন সম্পর্কে তৎকালে অনেকেই ঘৃণা প্রদর্শন করেছিলেন। কিন্তু কেশবচন্দ্র তাঁর শিক্ষিত রুচি দ্বারা বুঝতে পেরেছিলেন কীর্তনই বাঙ্গালীর অন্তরের সম্পদ। "কীর্তনগানের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। কীর্তন-গান বাঙ্গালীর এক অভিনব সৃষ্টি, বাঙ্গালীর স্বকীয়তা-মাখানো বাঙ্গালার এক

২. চিরঞ্জীব শর্মা, ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত, পৃ. ৩১২-৩১৩।

অতুলনীয় সম্পদ। কথা ও সুরের মর্যাদানুরূপ মিলনে কীর্তন বাঙ্গালীর এক বিস্ময়দান।"[১] হৃদয়ের আর্তি ও অন্তরের আকুলতা কীর্তনের মধ্য দিয়ে যতটা ফুটে ওঠে, অন্য ভজনের মধ্যে দিয়ে ততটা নয়। স্বদেশীয় সংস্কৃতির প্রতি আনুগত্য ও সাহিত্যানুরাগ থেকে কেশবচন্দ্র সেন বাঙলার কীর্তনকে পুনরুজ্জীবিত করে আভিজাত্য দান করলেন। আজ প্রায় শত বৎসরের ব্যবধানে বাঙলার কীর্তন ও যাত্রা সবিশেষ মর্যাদা ও শিক্ষিতজন-রুচির নিকট অত্যধিক মাত্রায় জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। কেশবচন্দ্র সেন ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের সুমধুর কণ্ঠের সংগীতে মুগ্ধ হয়েছিলেন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে নববিধান-সমাজের সঙ্গীতাচার্য রূপে বরণ করে নিলেন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯১৫ খ্রীঃ পর্যন্ত নববিধানের সর্ববিধ সংগীত এই ত্রৈলোক্যনাথের দ্বারাই রচিত হয়েছে। নগর-সংকীর্তন, সমাজের প্রার্থনা, পারিবারিক অনুষ্ঠান সর্বত্রই তাঁর রচিত সংগীতে মুখর হয়ে উঠত।

"কেশবচন্দ্র সুকণ্ঠ গায়ক চিরঞ্জীবকে লাভ করিয়া যেন এক নবশক্তি ও প্রেরণা উপলব্ধি করিলেন। একদিকে কেশবচন্দ্রের উদাত্ত কণ্ঠের বাগ্মিতা, অপরদিকে ত্রৈলোক্যনাথের সুললিত কণ্ঠের সংগীত-রাগিণী সে যুগের ব্রাহ্ম-সমাজে এক নব আনন্দের সৃষ্টি করিয়াছিল।"[২]

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র সদলে ন প্রচার-যাত্রায় বের হন তখন বক্তৃতা-উপদেশের নীরসতা দূর করেছিল কীর্তন। -যেখানেই তাঁরা গেছেন, চন্দননগর কিংবা বিহারের নানাস্থানে সর্বত্রই নাম-কীর্তন ছিল প্রধান সম্বল। প্রচার-যাত্রায় সাধারণ লোকেদের উপর সংকীর্তনের প্রভাব সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। উপদেশের যুক্তি অপেক্ষা সংকীর্তনের আবেগ ও ভক্তি জনসাধারণের অন্তরকে মথিত করেছিল অনেক বেশী।[৩] নৌকাযোগে সংকীর্তন করতে করতে চাঁদনী রাতে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট যাওয়া ও একাধিক সময়ে ত্রৈলোক্যনাথের কণ্ঠনিঃসৃত সংগীতে দক্ষিণেশ্বরের পবিত্রভূমিকে মুখরিত করার ইতিহাস সর্বজনজ্ঞাত।

১৮৬৮ খ্রীঃ ২৪শে জানুয়ারি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাগৃহের

১. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বাঙ্গালার কীর্তন ও কীর্তনীয়া, পৃ. ৯। ২. যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, কেশবচন্দ্র ও বঙ্গসাহিত্য, পৃ. ২৫৩। ৩. Prem Sundar Basu. 'Life & Works of Brahmananda Keshub—P.65—366.

ভিত্তিস্থাপনা উপলক্ষে আয়োজিত নগর-সংকীর্তনটি ত্রৈলোক্যনাথ কর্তৃক পরিচালিত হয়েছিল। ত্রৈলোক্যনাথকে কেশবচন্দ্র সংগীত-পরিচালকের স্থানটি দেন। ১৮০১ শকের ৩০শে ভাদ্র তাঁকে সংগীতাচার্য রূপে কেশবচন্দ্র বরণ করে নেন। ত্রৈলোক্যনাথ অত্যন্ত নিষ্ঠা ও অনুরাগের সঙ্গে এই দায়িত্ব বহন করে যান। নাটক, কাব্য, উপন্যাস রচনার সঙ্গে সঙ্গে সংগীতের নিত্য-প্রবাহ বইয়ে দিলেন। এমন কি, ১৮০২ শকাব্দে ৩০শে ভাদ্র 'কমলকুটীরে' তিনি 'চৈতন্য-সন্ন্যাস' বিষয়ে কথকতার প্রবর্তন করেন।[১] প্রেরিত প্রচারক হিসেবে সংগীতবিভাগের সমস্ত দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল চিরঞ্জীব শর্মার উপরে (১৮০৩ / শক / ১২ই পৌষ)। তাঁর প্রতিটি সংগীতের প্রারম্ভে রাগ-রাগিণীর উল্লেখ থাকাতে সেগুলি গীত হবার সম্পূর্ণ সুযোগ ভাবীকালের জন্য রয়েছে "তাঁহার রচিত নগর-সংকীর্তনগুলি এক অপূর্ব জিনিষ, তাহাতে নববিধান মূর্তিমান। নবযুগধর্মের নব নব ভাব, সর্বধর্মসমন্বয়ের ভাব, সাধুসমাগমের ভাব, প্রেম-পরিবারের ভাব গভীররূপে তাহাতে স্ফূর্তি লাভ করিয়াছে। নববিধানের এই সংগীতরস যাঁহারা ভক্তিভাবে পান করিবেন, তাঁহারা ইহার মিষ্টতা ও মধুরতা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিবেন, এবং জীবনপথের বিভিন্ন অবস্থায় সংগীতগুলিকে অনুকূলে সঙ্গী করিয়া সুখী হইবেন।"[২] তাঁর রচিত সংগীত-গ্রন্থগুলি এই—

১. গীতরত্নাবলী—ব্রহ্ম-সংগীত ও সংকীর্তনের সংকলন—প্রকাশ ১৮০৬ শক।
২. পথের সম্বল—এই গ্রন্থে ১২২টি নগর-সংকীর্তন আছে। তাছাড়া আছে ১৭৪টি প্রার্থনা। প্রকাশ—১৩১৭ বঙ্গাব্দ।
৩. নগর-সংকীর্তন—১৯১৬ খ্রীঃ।
৪. চিরঞ্জীব-সংগীতাবলী—পরবর্তী কালে চিরঞ্জীবের মৃত্যুর পর একসঙ্গে ১০৬৫টি গান ও কীর্তন সংকলিত হয়েছে। এই গ্রন্থে প্রকাশিত সংগীতগুলি পূর্বের 'গীত-রত্নাবলী' ও 'পথের সম্বল' গ্রন্থ দুটিতে স্থান পেয়েছে। সংস্কৃত—'ব্রহ্মস্তোত্রম্' ও 'মাতৃস্তোত্রম্,' এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

১. ধর্মতত্ত্ব, ১ আশ্বিন, ১৮০২, পৃ. ২০৪। ২. শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূমিকা—গীত-রত্নাবলী (চিরঞ্জীব শর্মা প্রণীত)।

ব্রহ্মসংগীত ও সংকীর্তনের রচয়িতা ভক্ত কুঞ্জবিহারী দেবকে বিস্মৃত হলে চলবে না। তিনি ত্রৈলোক্যনাথের সমসাময়িক ছিলেন। তিনিও ব্রাহ্ম-সমাজের সংগীতের ইতিহাসে সহস্রাধিক সংগীত যোজনা করেছেন। কুঞ্জবিহারী দেব কেশবচন্দ্র সেনের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। তাঁরই অনুপ্রেরণায় কুঞ্জবিহারী সংগীত রচনায় প্রবৃত্ত হন। কেশবচন্দ্র কুঞ্জবিহারীকে 'বিধানের কীর্তনীয়া' নাম দিয়েছিলেন। তিনি ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র সেনেব প্রথম সাক্ষাৎ লাভ করেন ও প্রাতঃকালীন উৎসবে যোগদান করে একটি সংগীতে আচার্যদেবকে মুগ্ধ করেন। তিনি প্রায় প্রতিদিন একটি করে সংগীত রচনা করতেন। কুঞ্জবিহারী দেবের সংগীত ও সংকীর্তনের গ্রন্থ 'সাধকরঞ্জন' ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।[১]

দেশের শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মধ্যে কীর্তনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন সর্বপ্রথম কেশবচন্দ্র সেন। নববিধান প্রচারে তিনি নামকীর্তনকে একমাত্র সুযোগ্য হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করলেন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে নববিধানের হরিলীলার মাহাত্ম্য পান করতে করতে কেশবচন্দ্র কখনও রাজভবনের দ্বারে, কখনও দুঃখী গোপগৃহে, কখনও বা হিন্দু পল্লী-মধ্যে, কখনও খ্রীষ্টীয় প্রাঙ্গণে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। "হরিনামে বিভোর হইয়া মহাপ্রাণ কেশবচন্দ্র নৃত্যের সময় প্রফুল্লমনে পায়ে নূপুর ও হাতে সোনার বালা পরিয়া কখনও হাসিতেন, কখনও কাঁদিতেন, কখনও হুংকার করিতেন।"[২] প্রকৃতপক্ষে কীর্তনের সুর-মূর্ছনায় কর্মী জ্ঞানযোগী কেশবচন্দ্রের ভক্তচিত্ত প্রমত্ত হয়ে উঠত। শ্রীমদ্ভাগবতে প্রমত্ত ভক্তের লক্ষণস্বরূপ বলা হয়েছে—

'কচিদ্রুদন্ত্যচ্যুত চিন্তয়া কচিদ্ধসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ।
নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং ভবন্তি তূষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতাঃ॥'

—৭ম স্কন্ধ, চতুর্থ অধ্যায়

"ভক্তগণ সেই অবিনাশী ঈশ্বরের চিন্তনে কখন কখন রোদন করেন, কখন হাস্য করেন, কখন আনন্দিত হন, কখন অলৌকিক কথা বলেন, কখন নৃত্য করেন, কখন তাঁহার নাম গান করেন, কখন তাঁহার গুণকীর্তন করিতে করিতে অশ্রু বিসর্জন করেন।"

কীর্তনের প্রচার ও সংগীতের প্রমত্ততায় কেশবচন্দ্রের উপরে বৈষ্ণব ভাবটি

১. ধর্মতত্ত্ব পত্রিকা, ভাদ্র, ১৮২৬ শক। ২. যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, কেশবচন্দ্র ও বঙ্গসাহিত্য, পৃ. ৭৯।

লক্ষ্য করা যায়। "চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ হরিভক্তিপরায়ণঃ"।—এই মন্ত্রে আচণ্ডালে শ্রীচৈতন্যদেব মুক্তি দিয়েছিলেন। কেশবচন্দ্রও "নরনারীর সমান অধিকার, যার আছে ভক্তি সে পাবে মুক্তি" সংগীতে সকল সম্প্রদায়ের জাতি-বর্ণ-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলকে আহ্বান করেছেন হরিনামের মাহাত্ম্যে স্নাত হওয়ার জন্য। চিরঞ্জীব শর্মা 'কেশবচরিতে' বলেছেন, "কেশব-ভিখারী নগরের দ্বারে দ্বারে হরিপ্রেম-সুধা বিলাইয়া গেলেন, একথা বঙ্গদেশ যেন কখন বিস্মৃত না হয়। অনাবৃত পদে, একতন্ত্রী হস্তে, গৈরিক অঙ্গাবরণ ধারণ করিয়া তিনি পল্লীতে পল্লীতে ভ্রমণ করিতেন। নগরের পথে গান করিতে বাহির হইলে প্রায় প্রতিদিন দুই-একজন সুরাপায়ী আসিয়া জুটিত। তাহারা জগাই-মাধাইয়ের ন্যায় কীর্তনের সঙ্গে নানা রঙ্গভঙ্গ করিত, কেহ বা নাচিত গাইত।"

ব্রাহ্মধর্ম-প্রতিপাদক শ্লোক-সংগ্রহ :

কেশবচন্দ্রের সাধনার ধারায় ব্রহ্মোপাসনা-প্রণালী নূতন আকার ধারণ করে। তখন থেকে উপাসনার শেষ অংশে পৃথিবীর সকলের জন্য প্রার্থনা এবং তার পরেই পৃথিবীর সকল ধর্মের সঙ্গে সহানুভূতি ও একাত্মতা-সাধনের স্থান রাখা হয়েছিল। সেই উদ্দেশ্যেই 'শ্লোক-সংগ্রহ' বইটি সংকলিত হয়। এই গ্রন্থে বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র থেকে শ্লোক সংগৃহীত হয়েছে। শ্লোক-সংগ্রহের প্রথম সংস্করণে ( ১৮৬৬ খ্রীঃ ) হিন্দু, ইহুদী, খ্রীষ্টীয়, মুসলমান ও পারসিক শাস্ত্রের বচন ছিল—বৌদ্ধধর্মের বচন তখনও নেওয়া হয়নি। ১৮৭৯ খ্রীঃ সমন্বয় অধ্যয়ন আরম্ভ হল। 'সাধু সমাগমে' ১৮৮০ খ্রীঃ শাক্য-সমাগম হয়। ১৮৮১ খ্রীঃ সাধু অঘোরনাথের 'শাক্যমুনি-চরিত ও নির্বাণতত্ত্ব' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। ক্রমে ক্রমে 'নববিধানে' বৌদ্ধধর্ম বিশেষ প্রাধান্য লাভ করল। ১৮৮৬ খ্রীঃ 'শ্লোক-সংগ্রহে'র তৃতীয়, পরিবর্ধিত সংস্করণে বৌদ্ধশাস্ত্র 'ললিতবিস্তরে'র শ্লোক স্থান পেল। শিখ ধর্মশাস্ত্রের বচনও 'শ্লোক-সংগ্রহে'র এই সংস্করণে স্থান পেল।

'শ্লোক-সংগ্রহ' প্রকাশে গৌরগোবিন্দ রায়ের বিশেষ সাহায্য ও সহযোগিতা পাওয়া গিয়েছিল। হিন্দুশাস্ত্র আলোচনার বিশেষ ভার তাঁর উপর ন্যস্ত হয়েছিল। গৌরগোবিন্দ রায় সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। কেশবচন্দ্রের আজ্ঞা-অনুসারে গৌরগোবিন্দ নানা সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থ থেকে শ্লোক সংগ্রহ করেন। 'শ্লোক-সংগ্রহ' গ্রন্থের শীর্ষদেশে 'নববিধান' ধর্মের

উদারতা ও ব্যাপকতা-জ্ঞাপক যে শ্লোকটি উদ্ধৃত আছে সেটি উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দের দ্বারাই রচিত।—

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসোধর্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্॥
স্বার্থনাশস্ত বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

"বিশাল বিশ্ব পবিত্র ধর্মমন্দির, নির্মল চিত্তই প্রধান তীর্থ, সত্যই একমাত্র অবিনশ্বর শাস্ত্র, বিশ্বাস বা নির্ভর সর্বধর্মের মূল, প্রীতিই পরম সাধনা, স্বার্থনাশই বৈরাগ্য—ব্রাহ্মধর্ম ইহাই বলে।"

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার 'শ্লোক-সংগ্রহ' গ্রন্থের ইহুদীশাস্ত্রের অংশ সংকলন করেছিলেন। তিনি ইংরেজী শিক্ষায় সুশিক্ষিত ও ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও দখল ছিল। ১৮৭৯ খ্রীঃ যখন সর্বধর্ম-সমন্বয় সাধন শুরু হল তখন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার খ্রীষ্টধর্ম সাধনায় নিযুক্ত ছিলেন।

ইতিপূর্বে 'শ্লোক-সংগ্রহে'র মত সর্বধর্মের সম্মিলিত শাস্ত্র পাইনি। বাঙলা সাহিত্যেই প্রথম এই ধরনের গ্রন্থ প্রণীত হল। পরবর্তী কালে 'শ্লোক-সংগ্রহ' গ্রন্থটির আদর্শে বিদেশে অনেক গ্রন্থ রচিত হয়। ম্যাক্সমুলার সাহেব 'শ্লোক-সংগ্রহ' গ্রন্থটির আদর্শে পৃথিবীর সকল ধর্মশাস্ত্রের একটি ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশের ইচ্ছা অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়কে জানান। "পণ্ডিত মোক্ষমুলারের প্রতি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পৃথিবীর সমুদয় ধর্ম ইংরেজীতে অনুবাদ করিবার ভার প্রদত্ত হইয়াছে। তিনি প্রধান সম্পাদক হইয়া আর কয়েকজনের সাহায্যে এই বৃহৎ কার্য সম্পন্ন করিবেন।"[১]

অধুনাতম কালে 'শ্লোক-সংগ্রহে'র মত দুটি বিখ্যাত গ্রন্থের নাম করা যায়। একটি 'The World's Great Scriptures'—Edited by Lewis Browne, ( 1946 ); দ্বিতীয়টি The Perennial Philosophy —Edited by Aldous Huxley, ( 1949 ).

কেশবচন্দ্র সেন সংকীর্তনের মধ্য দিয়ে ব্রাহ্মসমাজে ব্রহ্মসংগীতের ক্ষেত্রকে বিস্তারিত করলেন। রাজা রামমোহন রায়ই সর্বপ্রথম ব্রহ্মসংগীত প্রচলন করেন। (এ প্রসঙ্গে প্রথম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে)।

১. ধর্মতত্ত্ব পত্রিকা, ১লা কার্তিক, ১৭৯৯ শক, ১৮৭৭ খ্রীঃ।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও ব্রহ্মসংগীতকে সমৃদ্ধ করেন। কিন্তু রামমোহনের যুগে ব্রহ্ম-সংগীতগুলির ভাষা ছিল সংস্কৃতবহুল ও সুর ক্লাসিক্যাল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্রহ্মসংগীতগুলি বিশুদ্ধ বাঙলায় রচিত হলেও সুরে ছিল ক্ল্যাসিক্যাল রীতি। কিন্তু কেশবচন্দ্র সেনের যুগে ব্রহ্মোপাসনা যেমন বিশুদ্ধ মাতৃভাষায় প্রবর্তিত হল, তেমনি ব্রহ্মসংগীতের ভাষায় ক্রমশঃ সহজ সরল বাঙলা ভাষা ও রামপ্রসাদী, বাউল ও ভাটিয়ালি সুর স্থান পেল। কেশবচন্দ্র সেনের যুগে ব্রহ্মসংগীতগুলি অধিকাংশই চিরঞ্জীব শর্মা (বা সঙ্গীতাচার্য ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল) ও ভক্ত কুঞ্জবিহারী দেব-রচিত। ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের 'গীত-রত্নাবলী' ও 'পথের সম্বল' দুটি বিখ্যাত সংগীতের গ্রন্থ। চিরঞ্জীব শর্মা সহস্রাধিক সুললিত, সুমধুর, ভক্তিব্যঞ্জক সংগীত ও সংকীর্তন রচনা করেছেন; অনেকগুলি সংগীত কেশবচন্দ্রের উপাসনাকালেই স্বর্গীয়ভাবে বিভোর হয়ে তৎক্ষণাৎ রচিত হয়েছে। নববিধান-সমাজের অধিকাংশ সংগীতই ত্রৈলোক্যনাথ রচিত।[১] 'গীত-রত্নাবলী' গ্রন্থে অধিকাংশই ব্রহ্মসংগীত আর 'পথের সম্বল' গ্রন্থে ১২২টি নগর-সংকীর্তন সংগ্রথিত হয়েছে। বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষে নগর-সংকীর্তন, ব্রহ্মারাধনা-সংকীর্তন ও নববিধানের সর্বধর্ম-সমন্বয়ের বীজমন্ত্রটি ধরে খ্রীষ্ট সংগীত, শ্রীগৌরাঙ্গ সংগীত, কালী ও জগদ্ধাত্রী সংগীত ও বিভিন্ন প্রাতঃস্মরণীয় ভক্তমালার স্তব 'পথের সম্বল' গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। নববিধানের আদর্শ প্রচারের জন্য চিরঞ্জীব শর্মা সংগীতের পথটিকেই বেছে নিয়েছিলেন—

"এসেছিনু আমি তোমার আদেশে,
বিধান-সংগীত গাহিতে এদেশে।" —ত্রৈলোক্যনাথ

অথবা—

"সংসার-আশা, বিষয়-পিপাসা দিয়ে সব বিসর্জন,
সমন্বয়ধর্ম, নিষ্কামকর্ম, করিব আমি সাধন।" —ত্রৈলোক্যনাথ

প্রকৃতপক্ষে চিরঞ্জীব শর্মা সাধনমার্গের অনেক উচ্চস্তরের ভক্ত-সাধক ছিলেন। তাঁর রচিত সংগীতগুলির মধ্যে ভক্তিভাবের সঙ্গে মাধুর্যবোধ যুক্ত হয়েছে।

চিরঞ্জীব সংগীতাবলীর মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস

১ যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, কেশবচন্দ্র ও বঙ্গসাহিত্য, পৃ. ২৫৮।

স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ব্রাহ্মসমাজে যখন যে ভাবের সাধনার প্রাবল্য দেখা দিয়েছে, তখনই সে ভাবের সঙ্গীত রচিত হয়েছে। ব্রহ্মের বিভিন্ন স্বরূপ-সাধন এবং সুনীতি, পাপবোধ, অনুতাপ, বৈরাগ্য, নির্বাণ, ভক্তি, ব্যাকুলতা, অনুরাগ বিভিন্ন ভাবের সাধনার উপযোগী সংগীত রচিত হয়েছে। ব্রাহ্মসমাজের সূচনাপর্ব থেকে 'নববিধান'-সাধনের বিভিন্ন পর্ব পর্যন্ত যে সব সংগীত রচিত হয়েছে সেগুলি ধারাবাহিক রূপে আলোচনা করলে ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মধর্মের ও নববিধান-সাধনের গূঢ় রহস্য সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি হবে। ব্রাহ্মসমাজেব সাধনার ধারায় দেখি ক্রমশ ভক্তিভাবের সঞ্চার—ক্রমে ব্রহ্মকে হরি, মা, দুর্গা, লক্ষ্মী ইত্যাদি ভক্তিসূচক নামে ডাকা হয়েছে। ঈশ্বরকে নির্গুণ থেকে সগুণ-ভাবে দেখার আকাঙ্ক্ষা জাগছে ভক্তচিত্তে। এই ভাবরসে কেশবচন্দ্র সেন অনেক প্রার্থনা ও উপদেশ বচনা করেছিলেন। সংগীতের মধ্যেও অনায়াসে এই নামগুলি অনুপ্রবিষ্ট হয়। 'হরিনাম অমূল্য নিধি হৃদয়-পরশমণি', কিংবা 'জয় জয় সচ্চিদানন্দ হরে', কিংবা 'জয় দয়াময়, দয়াময়, দয়াময়! জয় প্রভু পরব্রহ্ম, হরিলীলার সময়।''—ইত্যাদি সংগীতে 'একমেব অদ্বিতীয়ম্' ব্রহ্মকেই কখনও হরি, কখনও দয়াময় নামে অভিহিত করা হচ্ছে। যে 'ব্রহ্ম'কে শুধু পিতা নামে ডাকা হত[১] তিনি ভক্তের কাছে দয়াময় হরি ও সর্বশেষে অনন্ত স্নেহের আধার মাতৃস্বরূপা 'দয়া করে পাপীর ঘরে এলে মা ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী', কিংবা 'তুমি গো বিশ্বজননী, যোগচিত্তবিহারিণী অমরজনবন্দিনী, আমি দরিদ্র ভিখারী', (গীতরত্নাবলী, পৃ. ৬০) কিংবা 'কর মা তোমার যা ইচ্ছা হয়, কিছু নাই আমার বলিবার' (গীতরত্নাবলী, পৃ. ৭৫) ইত্যাদি সংগীতে ভক্ত চিরঞ্জীবের কাছে ব্রহ্ম মাতৃরূপে ধরা দিয়েছেন। মাতৃ-ভাবের সঙ্গে প্রাণের সুগভীর আকূতি মিশ্রিত হয়ে রচিত হয়েছে কয়েকটি সংগীত—

১. 'আদি ব্রাহ্মসমাজে' ব্রাহ্মেরা ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থের "অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়" কিংবা "রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্"—এই মন্ত্র নিয়ে ব্রহ্মোপাসনার সময়ে প্রার্থনা করতেন। (দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মচরিত, পৃ. ১৪১)। শুক্ল-যজুর্বেদের মন্ত্রে 'পিতা নোঽসি, পিতা নো বোধি, নমস্তেঽস্তু মা মা হিংসী'—ঈশ্বরকে ভজনা করেছেন আদি-সমাজের ব্রাহ্মরা। "হা জগদীশ! হে করুণানিধান বিশ্বপিতা! তুমি প্রসন্ন হও এবং কৃপা করিয়া আমাদিগের জ্ঞাননেত্র উন্মীলন কর।" ('সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজে' বক্তৃতা—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৭৮০ শকাব্দ)।

ভৈরবী—ঝাঁপতাল

মা তোর এ কেমন রীতি, দীনহীন তনয়ের প্রতি ?
মাঝে মাঝে লুকিয়ে থেকে মা, কেন বাড়াস ভাবনা ভীতি ?
অসহায় শিশু ছেলে, বনের মাঝে একলা ফেলে,
(মা) চলে যাস তুই কোন্ আক্কেলে,
এই কি গো সন্তানে প্রীতি ?
তোর জন্যে কেঁদে মরি, কত অভিমান করি, (মা)
মা হয়ে আবার কেন ধর গো কঠিন প্রকৃতি ?[১]

এই সংগীতটিকে ব্রহ্মগীতি রূপে কেউ পরিচয় না করিয়ে দিলে সহজেই 'ভক্তের আকূতি'-শীর্ষক শাক্তপদাবলীর মধ্যে স্থান করে নিতে পারে।

নববিধানের অন্যতম প্রচারক প্রতাপচন্দ্র মজুমদার কয়েকটি ব্রহ্মসংগীত রচনা করেছিলেন—

১. আজ দয়াময় হও হে সদয় —ব্রহ্মসংগীত (১২শ সংস্করণ) পৃ. ৬৭৬
২. কত আর নিদ্রা যাও ভারতসন্ততিগণ ঐ পৃ. ৬১৩
৩. কে আমায় ডাক বিদেশী সাধু ঐ পৃ. ৫৩০
৪. জয় জ্যোতির্ময় জগতাশ্রয় জীবগণ জীবন ঐ পৃ. ১৩২
৫. শুভ আশীর্বাদ দানে আশ্বাস কাতর মনে ঐ পৃ. ২৭১

সংগীতগুলির মধ্যে প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের ব্রহ্ম-প্রাণ হৃদয়টি ধরা পড়েছে। অতি কাতর আকূতি নিয়ে দীনহীন ভক্ত 'জগদাশ্রয় জীবগণের জীবনে'র নিকট আশ্রয়-ভিক্ষার্থী। ভক্তের সুগভীর বিশ্বাস ও কাতরতা—"শুভ আশীর্বাদ দানে, আশ্বাস কাতর মনে, হে পিতা করুণাসিন্ধু কাতরশরণ" সংগীতে (ব্রহ্মসংগীত, ১২ সংস্করণ পৃ. ২৭১) প্রকাশিত হয়েছে। প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের রচিত বাউল সুরে—

"কে আমায় ডাক বিদেশী সাধু মধুর ভাষে,
যেতে স্বদেশে।"

গানটি তৎকালে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল প্রমুখ তিনজন সংগীতজ্ঞ বর্তমান গুসকরা, রামচন্দ্রপুর, কামালপুর থেকে প্রচারকার্যশেষে কলকাতায় প্রত্যাগমন করলে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এই সংগীতটি রচনা

১. চিরঞ্জীব শর্মা, গীতরত্নাবলী, পৃ. ৫১।

করেছিলেন। কেশবচন্দ্র সেনের গৃহে খুব উৎসাহের সঙ্গে এই সংগীতটি গীত হয়।[১]

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ১১ই নভেম্বর ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির-গৃহে প্রবেশের দিন 'কত আর নিদ্রা যাও ভারতসন্ততিগণ—'সংগীতটি গীত হয়। এই সংগীতটি সর্বভারতীয়তা ও স্বাধীনতা-প্রতিষ্ঠার জন্য নববিধানের আদর্শকেই সত্য বলে জেনেছে।

"অধীনতা অন্ধকার, পাপতাপ দুর্নিবার
মঙ্গল-জলধিজলে হ'তেছে চিরমগন।"[২]

নববিধান-সমাজে সংগীতজ্ঞরূপে আরও কয়েকজন গায়কের উল্লেখ করা যায়। কালীনাথ ঘোষের 'নাম-সুধা', 'নগরকীর্তন', 'অনুষ্ঠান-সংগীত', 'আত্মদান' ইত্যাদি চারটি সংগীতেব গ্রন্থ। 'ব্রহ্মানন্দলহরী, 'মাদক-নিবারণী লহরী', 'দুর্গোৎসব সংগীত', 'গরীবের গান' ইত্যাদি সংগীতগ্রন্থ-রচয়িতা সংগীতজ্ঞ প্রিয়নাথ মল্লিক তৎকালীন সমাজের গায়ক হিসেবে প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। সংগীতজ্ঞ বিধানপল্লীর কয়েকটি সংগীত-গ্রন্থ—'শ্রীশ্রীহরিভক্তি তরঙ্গিণী', 'উচ্ছ্বাসতরঙ্গিণী, ও 'সদ্ভাবতরঙ্গিণী'—সংগীতের তরঙ্গে দেশকে প্রধৌত করেছিল। প্রসন্নকুমার সেনের 'বিবিধ ধর্মসংগীত' ও মহারানী সুনীতি দেবী-বিরচিত 'সজ্যশঙ্খ' নববিধান-সংগীতের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির থেকে প্রকাশিত যে 'ব্রহ্মসংগীত ও সংকীর্তনে'র গ্রন্থ—তাতে সংগীতগুলি বিভিন্ন পর্যায়ে সন্নিবেশিত হয়েছে। যেমন—উদ্বোধন, আরাধনা, ধ্যান ও প্রার্থনা। অনুতাপ, আক্ষেপ, ব্যাকুলতা, বিশ্বাস, বৈরাগ্য, প্রেম ইত্যাদি পর্যায়ের নানা সংগীতে ভক্তহৃদয়ের বিভিন্ন অবস্থা লক্ষ্য করা যায়। নানাবিধ সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে গাইবার উপযুক্ত সংগীতও রচিত হয়েছে। নামকরণ, জন্মদিন, বিবাহ, গৃহপ্রতিষ্ঠা, জলাশয়-প্রতিষ্ঠা, রাখীবন্ধন. বিদ্যারম্ভ, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া ইত্যাদি অনুষ্ঠানের উপযোগী সংগীত ব্রাহ্মরা রচনা করেছেন। সংগীত অনুষ্ঠানের মাধুর্য ও আকর্ষণকে বাড়িয়ে দেয়। সেই দিক থেকে শুধু ভক্তিগীতি নয়—বিভিন্ন অনুষ্ঠানসূচির উপযোগী সংগীত রচনা করে ব্রাহ্ম ভক্তগণ বাঙলার সংগীতের পরিধিকে বাড়িয়ে দিয়েছেন। শুধু তাই-ই নয়, সমসাময়িক যুগে বিশেষ একটি

১. ব্রহ্মসংগীত, বাদশ সংস্করণ, পাদটীকা, পৃ. ৫৩০। ২. তদেব, পৃ. ৬১২।

পরিশীলিত মার্জিত রুচি ও শিল্পবোধ সৃষ্টির সহায়ক হয়েছিল ব্রহ্ম-সংগীতগুলি। নববিধান-সমাজের রচিত ব্রহ্ম-সংগীতগুলি যদিও গোষ্ঠীগত চেতনা থেকে উদ্ভূত, কিন্তু সেই চেতনা ভাবে ও ভাষায় সম্প্রসারিত হয়ে অনির্বচনীয় ব্যঞ্জনায় এক আনন্দলোক সৃজন করতে সক্ষম হয়েছে।

### জীবনী ও আত্মজীবনী

ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে কেশবচন্দ্র সেন একটি বিস্ময়কর শক্তি। তিনি জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তিমার্গে যে কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন, তাই ছিল উনবিংশ শতাব্দীর অনেক ভক্ত সাধকের নিকট অনুপ্রেরণা। এই বাগ্মী সাধকের প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাঙলা চরিত-সাহিত্য সৃষ্টি করতে উৎসাহিত করেছিল। একদিকে কেশব-অনুগামীরা তাঁর সুমহান্ জীবনকে নিয়ে জীবনী রচনা করেন, অপর দিকে অন্যান্য ভক্তদের ব্যক্তি-জীবনে ঈশ্বরমহিমা ঘোষিত করে ভক্তজীবনী ও আত্মজীবনী লেখা হতে থাকে। এ ছাড়া ভারতীয় নানা সাধু-সন্তদের জীবনের চরিত ও উপাখ্যান রচনা করে উনবিংশ শতাব্দীর চরিত-শাখাকে নববিধান সাহিত্যিকরা নানা ভাবে সমৃদ্ধ করতে থাকেন। একদা ষোড়শ শতকে বৈষ্ণব কবিসমাজ বাঙলা চরিত-সাহিত্যের পথ নির্দেশ করেছিলেন। বৃন্দাবন দাস, জয়ানন্দ, লোচনদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও চূড়ামণি দাস প্রমুখ বৈষ্ণব ভক্তগণ বাঙলা ভাষায় চৈতন্য-চরিতকাব্য রচনা করে ষোড়শ শতকের বাঙলা-সাহিত্যে একটি নূতন শাখার উদ্বোধন করেছিলেন। ঠিক অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে। নববিধান ব্রাহ্মসমাজের ভক্তগণ জীবনী ও আত্মজীবনী রচনা করে উনিশ শতকের শেষার্ধ ও বিংশ শতকের প্রথম দুই দশকের বাঙলা সাহিত্যকে পরিপুষ্টি দান করেছিলেন।

নববিধান গোষ্ঠীর দ্বারা চারটি ধারাতে চরিত-সাহিত্য রচিত হয়েছিল।—

১. কেশবচন্দ্রের জীবনী, ২. সাধু-সন্তদের জীবনী, ৩. অন্যান্য ভক্তজীবনী, ৪. আত্মজীবনী।

১. **কেশবচন্দ্রের জীবনী:** কেশবচন্দ্রের মৃত্যুর পর কেশবচন্দ্রের কয়েকটি জীবনী প্রকাশিত হয়। তার মধ্যে প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের গ্রন্থটি ইংরেজীতে লেখা হলেও এই প্রসঙ্গে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'The Life

and Teachings of Keshub Chunder Sen'—প্রতাপচন্দ্র-রচিত গ্রন্থটির নাম। এছাড়া কেশবচন্দ্র সেনের জীবন নিয়ে বাঙলা ভাষায় রচিত সর্বপ্রথম গ্রন্থ ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যালের কেশবচরিত ( ১৮০৬ শকাব্দ )। গৌরগোবিন্দ রায় রচনা করেছেন 'আচার্য কেশবচন্দ্র'। গ্রন্থটি তিন খণ্ডে সমাপ্ত ( ১৮৯২-১৯০৫ খ্রীঃ )।

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার নববিধানের অন্যতম কর্ণধার ছিলেন। নববিধানের প্রচারকরূপে শুধু ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলেই নয়, প্রতীচ্যেও তিনি নববিধানের সমন্বয়-ধর্মের বাণী বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন কেশবচন্দ্রের আবাল্য-সঙ্গী—প্রথম জীবনে সহপাঠী, উত্তর জীবনে ধর্মক্ষেত্রে প্রধান অনুগামী। কেশবচন্দ্রকে অত্যন্ত নিকট থেকে দেখবার সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন। তাঁর গ্রন্থের তথ্যসমূহ তাই অধিকতর প্রামাণিক। জীবনী-রচনায় সর্বাগ্রে যে গুণ দুটির আবশ্যক—নিরপেক্ষতা ও নৈকট্য, প্রতাপ মজুমদারের গ্রন্থে সেটির অভাব নেই। অন্যান্য জীবনীকারদের মত তিনি কেশবচন্দ্রকে প্রগাঢ় ভক্তির দৃষ্টিতে অবতারস্বরূপ করে তোলেননি। গ্রন্থের ভূমিকাতে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বলেছেন—"মানুষ কেশবকে রূপায়িত করাই আমার উদ্দেশ্য; আবেগের বশে স্তুতি কীর্তন কিংবা বিদ্বেষপ্রসূত নিন্দা করা নয়।"[১] বাল্যের নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে মানুষ কেশব স্পষ্ট হয়ে উঠেছেন,—তাসখেলা, হ্যামলেট নাটক অভিনয়, যাত্রাগান শোনা, বৈষ্ণব সংকীর্তনের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন, পরীক্ষার হলে অপরের খাতার সঙ্গে উত্তর মেলানো ইত্যাদি নানা ঘটনার আলোকে ব্যক্তি-কেশব উজ্জ্বল হয়ে উঠেছেন। কেশবচন্দ্রের ধর্ম জীবনে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে বিচ্ছেদ, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন, নববিধান প্রচার ও প্রবল ভক্তিভাবে বিরক্ত হয়ে শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসুর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের উদ্যোগ—সমস্ত ঘটনাই তিনি নির্লিপ্তভাবে বর্ণনা করেছেন। মুঙ্গেরে কেশব-ভক্তদের খ্রীষ্টপ্রীতি, কেশবচন্দ্রের পদযুগল ধরে ক্রন্দন, 'প্রভু', 'ত্রাণকর্তা' রূপে তাঁকে সম্বোধন—কোন ঘটনাই তিনি বিবৃত করতে কুণ্ঠিত হননি। এমন কি

১. "My humble object has been to describe my friend as I have always him; concealing nothing, not setting down aught in malice". Preface—Life & Teachings of Brahmananda Keshub Chunder Sen, by Pratap Chunder Mazoomdar. P. (vi)

কেশবচন্দ্র যে অবতারবাদ বিশ্বাস করেন না (অথচ অন্যদের ভক্তির উপর কেশবচন্দ্রের সমালোচনা করার অক্ষমতা) ইত্যাদি প্রদর্শন করে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার পরোক্ষে তাঁকে দোষারোপ করতে ও "মুঙ্গেরী ভাবই" যে কেশবচন্দ্রের ধর্মমতে অন্যায়ভাবে প্রবল হয়ে উঠেছে—সেটি বলবার সাহসও দেখিয়েছেন। এই গ্রন্থটিতে সংগীত-মধুর ভাষায় একদিকে কেশব-জীবনের সত্য চিত্র উদ্ঘাটিত হয়েছে, অপরদিকে বিভিন্ন ঘটনার বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে যুক্তিনির্ভর অনুগত হৃদয়ের মাধুর্য পরিস্ফুট হয়েছে। গ্রন্থটি অবশ্য ইংরেজী ভাষায় রচিত।

নববিধান-সমাজভুক্ত প্রচারক সঙ্গীতজ্ঞ চিরঞ্জীব শর্মা রচনা করেন কেশবচরিত (১৮০৬ শকাব্দ)। কেশবচন্দ্র সেনের এটিই প্রথম জীবনী গ্রন্থ। সেইদিক থেকে গ্রন্থটির বিশেষ মূল্য স্বীকৃত হয়েছে। চিরঞ্জীব শর্ম-রচিত কেশবচন্দ্র সেনের জীবনীতে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি লেখক ভূমিকাতে দিয়েছেন। কেশবভক্ত হলেও কেশবচন্দ্রের অবতারত্ব প্রকাশ করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি কেশবচন্দ্রকে মানব রূপেই গ্রহণ করেছেন—"সাধু অভিপ্রায়ে নীত একটি চির-উন্নতিশীল চরিত্র মানবীয় বিচিত্র অবস্থার মধ্য দিয়া কিরূপে ভগবানের আদেশ পালন করিয়া হাসিতে হাসিতে স্বর্গে চলিয়া যায়, তাহারি আমূল বৃত্তান্ত এস্থলে দৃষ্ট হইবে। বহুল প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া তিনি তাঁহার স্বর্গীয় চরিত্রের দৃষ্টান্ত মনুষ্যবংশের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে সে সমুদয় দেখিলে এবং বিনীতভাবে তাহা গ্রহণ করিলে পরম মঙ্গল লাভ হইবে। কেশব-চরিত্র এক প্রকাণ্ড সংগ্রাম-ক্ষেত্র বিশেষ। যে সকল গুরুতর ঘটনা হইতে ঘটিয়াছে তাহার আনুপূর্বিক বিস্তারিত বিবরণ বর্ণনে আমি অক্ষম। ঐতিহাসিক কোন গুরুতর তত্ত্ব পরিত্যক্ত না হয়, এইজন্য যতদূর পারি তাহা সংক্ষেপে স্পর্শ করিয়া গিয়াছি।"[১]

নববিধানের প্রচারক, ভক্ত ও কেশবচন্দ্রের একান্ত অনুগত হয়েও তিনি যে নিরপেক্ষ ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে মানব কেশবচন্দ্রকে বিভিন্ন ঘটনা ও সংগ্রামের মধ্যে স্থাপন করেছেন সেটি বিশেষভাবেই প্রশংসার যোগ্য। লেখক কেশবচন্দ্রের বংশপরিচয় দান করে কৈশোর ও যৌবনলীলা বর্ণনা করে

১. চিরঞ্জীব শর্মা, কেশবচরিত, ভূমিকা ৶০।

ধর্মজীবনের বিস্তারিত পরিচয় দান করেছেন। কেশবচন্দ্রের অন্তর্জীবনের পরিচয় দিতে গিয়ে 'রোগশয্যা', 'চরমকাল' ও 'মহাসমাধি' অংশের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। "তিনি শ্রীকেশবের সহচর, অনুচর এবং সহযোগী রূপে তাঁহার অন্তরের ভাব যাহা অনুভব ও বাহিরের কার্যে যাহা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন, পবিত্রাত্মারূপিণী বাগ্দেবীর প্রেরণায় তাহাই যথাযথ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি কল্পনার তুলিতে অতিরঞ্জিত না করিয়া, দেবলোকে সে উজ্জ্বল জীবনের যে সত্য ছবিখানি তাঁহার নির্মল হৃদয়ে প্রতিভাত হইয়াছে তাহাই অবিকল চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন।"[১] গ্রন্থকার আবেগ-তাড়িত, ভক্তিবিগলিত ভাষায় নয়, অত্যন্ত সংযত অথচ কাব্যময় ভাষায় কেশব-জীবনের পরিণতি অঙ্কন করেছেন—"দিব্য শ্বেতচন্দনের চিতার উপর গগনস্পর্শী প্রজ্বলিত অনলশিখার মধ্যে যখন সে দেহ জ্বলিতে লাগিল, তৎসঙ্গে ধর্মবন্ধুগণ শোকভগ্ন উদাস মনে যখন গান করিতে লাগিলেন, তখন শ্মশান-বৈরাগ্যের জ্বলন্ত হুতাশনে সকলের প্রাণ যেন জ্বলিয়া উঠিল। যে সুন্দর কলেবর বিডন-উদ্যানে; টাউন-হলে, ব্রহ্ম-মন্দিরে, কমলকুটীরে এবং পৃথিবীর নানা স্থানে নানা দেশে পঁচিশ বৎসরকাল ক্রমাগত সূর্যের ন্যায় বিচরণ করিত, তাহা আজ শ্মশানে পুড়িয়া ভস্মসাৎ হইল। যেখানে তাঁহার উৎপত্তি সেইখানে প্রত্যাগমন করিল।"[২]

কেশবচরিত গ্রন্থের পরিশিষ্ট (১-৭৩ পৃ.) অংশটি বিশেষ মূল্যবান্। কারণ এই অংশে কেশবচন্দ্র সেনের জীবন পর্যালোচনা করেছেন লেখক। তাঁর জীবনে প্রার্থনা, ভক্তি, সদাচারনিষ্ঠা, বিনয়, ক্ষমা, ঔদার্য, কবিত্ব, প্রেম, দয়া, প্রভুত্ব, স্বাধীনতা, সমাজসংস্কার, রাজনীতি, জ্ঞান-প্রতিভা, কার্যশৃঙ্খলা ও উদ্যম ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করেন। লেখক কেশবচন্দ্রের জীবনী রচনা করতে গিয়ে বুঝেছেন—যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা এত প্রগাঢ় তাঁর জীবনী রচনা করা কঠিন। কারণ ব্যক্তিগত জীবনের ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রকৃত জীবনকে উদ্ঘাটন না করে স্তুতি ও প্রশংসায় পরিণত হতে পারে। তাই লেখক ভূমিকায় বলেছেন—"এখানে আর কোন প্রকার কল্পনার সাহায্য পাওয়া যায় না। স্বপক্ষদিগের প্রগাঢ় অনুরক্তি, বিপক্ষদিগের বিদ্বেষ-বিরক্তি, ইহারই মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া আমি প্রকৃত তত্ত্ব নির্ধারণ করিয়াছি।"[৩] লেখকের এই দাবী সঙ্গত।

---

১. যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, কেশবচন্দ্র ও বঙ্গসাহিত্য, পৃ. ২৫৯। ২. চিরঞ্জীব শর্মা, কেশবচরিত, পৃ. ১৮৮। ৩. তদেব, ভূমিকা, /০।

উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়-রচিত 'আচার্য কেশবচন্দ্র' তিন খণ্ডে ( ১৮৯২-১৯০৫ খ্রীঃ ) সমাপ্ত। এই গ্রন্থটির বিরাট কলেবর ( ২০০৭ পৃ. ), ভিক্টোরিয়ান যুগে রচিত একাধিক খণ্ডে সমাপ্ত জীবনী গ্রন্থের অনুরূপ। এই গ্রন্থটি একাধারে জীবনী, ইতিহাস, নববিধানের দর্শন ও ভাষ্য। গৌরগোবিন্দ রায় জীবনী রচনা করতে গিয়ে তাঁর সুবিশাল গ্রন্থে কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা, ডায়েরি, আত্মজীবনী, ভ্রমণবৃত্তান্ত, প্রকাশিত প্রবন্ধাদি, অনুকূল-প্রতিকূল সমালোচনা, অপরের ডায়েরি ও স্মৃতিকথা, ইত্যাদি থেকে বহুবিধ উপকরণ সংগ্রহ ও সংকলন করেছেন। পববর্তী কালের কেশবচন্দ্রের জীবন-চরিতকারগণ ( যাঁরা কেশবচন্দ্র সেনকে প্রত্যক্ষ করেননি ) তাঁদের জন্য মূল্যবান্ উপাদান রেখে গেছেন তিন খণ্ডে সমাপ্ত কেশব-জীবনীতে। চিরঞ্জীব শর্মা কিংবা প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের মত তিনি ঐতিহাসিক দৃষ্টি নিয়ে কেশবচন্দ্রের দিকে তাকাননি ; বরং "তিনি কেশবচন্দ্রের প্রত্যেকটি কার্যকে সর্বতোভাবে সমর্থন করেছেন, কেশবেব বিন্দুমাত্র সমালোচনা যাঁরা করেছেন তাঁদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়েছেন। প্রতাপচন্দ্রের সুস্থ দৃষ্টিশক্তি ও নিপুণ সৃষ্টিকৌশল কোনটিই গৌবগোবিন্দের আয়ত্তাধীন ছিল না। তবে Art না হলেও Craft হিসাবে এ গ্রন্থের মূল্য আছে।'[১] এত বিরাট জীবনী রচনা করেও লেখক অতৃপ্ত। ভূমিকায় লেখক বলেছেন, "আদি বিবরণ ২১৬ পৃষ্ঠা, মধ্য বিবরণ ১১৪৮ পৃষ্ঠা, অন্তবিবরণ ৬৪৩ পৃষ্ঠা—এই দুইসহস্রাধিক পৃষ্ঠায় আচার্য কেশবচন্দ্রেব জীবনাংশ পবিসমাপ্ত হইলেও ইহা যে তাঁহার পূর্ণজীবনী, একথা আমরা বলিতে পারিতেছি না। এতন্মধ্যে নিঃশেষরূপে তাঁহার জীবনের সমুদয় বিবরণ নিবদ্ধ রহিয়াছে, একথা কিছুতেই বলিতে পারা যায় না। যে জীবন ভগবানের আদেশ পালনে অবিচ্ছেদে ব্যাপৃত ছিল, সে জীবনের বৃত্তান্তনিচয় কোন ব্যক্তি যে সমগ্রভাবে গ্রন্থবদ্ধ করিবেন, তাহার সম্ভাবনা অল্প।"[২] কাজেই এটি স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান, গৌরগোবিন্দের নিকট কেশবচন্দ্র ঈশ্বরতুল্য এবং তাঁর জীবনী কোন ব্যক্তিবিশেষের রচনা করা অসম্ভব। এই সুবিপুল কলেবর 'আচার্য কেশবচন্দ্র' গ্রন্থটিকে 'নববিধানের মহাভারত বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। নববিধানের তত্ত্ব ও ধর্ম ব্যাখ্যার সঙ্গে সমকালীন জীবনের নানা ঘটনা, সমস্যা ও উনিশ শতকের ছোট বড়

১. দেবীপদ ভট্টাচার্য, বাংলা চরিতসাহিত্য, পৃ. ১৯৫। ২. গৌরগোবিন্দ রায়, আচার্য কেশবচন্দ্র, ভূমিকা পৃ. ।৶০।

অনেক চরিত্র গ্রন্থটিতে ভীড় করে আছে এবং পত্র, প্রবন্ধ, বক্তৃতা ইত্যাদির সংকলনে এই গ্রন্থটি সত্যই মহাকাব্যিক আকৃতি ও প্রকৃতি লাভ করেছে।

প্রিয়নাথ মল্লিকের 'ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র' প্রকাশিত হয় ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে। প্রিয়নাথ মল্লিক নববিধান সমাজের অন্যতম সাধক-ভক্ত। এটিকে ঠিক জীবনচরিত বলা চলে না। "শ্রী ব্রহ্মানন্দের মহাজীবনতত্ত্ব সমালোচনা এই পুস্তকের উদ্দেশ্য।" কতকগুলি ছোট ছোট প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে ব্রহ্মানন্দের প্রকৃত স্বরূপ ও তাঁর জীবনের বিভিন্ন কার্য ও উক্তি পর্যালোচনা করেছেন অত্যন্ত অনুগতভাবে। গ্রন্থের প্রারম্ভে 'প্রার্থনা' দিয়ে শুরু করেছেন। ব্রহ্মানন্দের প্রতি আত্যন্তিক ভক্তিই এই গ্রন্থের মূল সুর। একটি প্রবন্ধে যদিও তিনি ব্রহ্মানন্দকে অসাধারণ মানুষ বলেই অভিহিত করেছেন, তথাপি যখন তিনি তাঁকে 'অন্তর-খ্রীষ্ট বহিব্রহ্মানন্দ' বলেন, তখন কেশবচন্দ্রকে শুধু আদর্শ মানবের পর্যায়েই নয়; বরং তাঁকে দেবত্বের স্তরে স্থাপন করেছেন। "শ্রীগৌরাঙ্গ সম্বন্ধে যেমন তাঁহার ভক্তগণ বলেন, 'তিনি অন্তর-কৃষ্ণ, বহি-'গৌরাঙ্গ', তেমনি ব্রহ্মানন্দ সম্বন্ধেও নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে, 'তাঁহার অন্তরে দেবসন্তান ঋষি খৃষ্ট, বাহিরে মানব-সন্তান ব্রহ্মানন্দ'।"[১] লেখকও একটা দিব্যপ্রেরণার বশবর্তী হয়েই এই গ্রন্থটি রচনা করেছেন—"ইহার ভাষা আমার, কিন্তু ভাব পবিত্রাত্মার এবং সত্য স্বয়ং ব্রহ্মানন্দ ও তাঁর মার।"[২] এই কারণেই গ্রন্থটি গোষ্ঠীগত চেতনার উর্ধ্বে উঠতে পারেনি।

কেশবচন্দ্রের জীবন অনেক ব্রাহ্ম ভক্তকেই জীবনী-রচনায় অনুপ্রেরণা দিয়েছে। পরবর্তী কালে যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'কেশবচন্দ্র ও বঙ্গসাহিত্য' (১৩৪৩ বঙ্গাব্দ), 'বালক কেশব'; মহারানী সুনীতি দেবী-রচিত 'শিশুকেশব'; অরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কেশব-পরিচয়', মতিলাল দাসের 'শ্রীকেশব কাহিনী', 'কেশব-সমাগম'; এন. নিয়োগীর 'ভক্ত কেশব', শ্রীমতী কমলা ঘোষের 'যুগস্রষ্টা কেশবচন্দ্র', শ্রীমতী শোভা সিংহের 'ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র' এবং সতীকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'আচার্য কেশবচন্দ্রের নব অধ্যয়ন ও বৌদ্ধধর্ম পুনরাবিষ্কার' এই ধারার বিখ্যাত গ্রন্থ।

শশিভূষণ মল্লিকের কন্যা হরিপ্রভা মল্লিক, ইনি শ্রীমতী তাকেদা নামে নববিধান-সমাজে বিখ্যাত, (১৯১৩ খ্রীঃ জাপানী ব্যবসায়ী মিঃ তাকেদা

১. প্রিয়নাথ মল্লিক, শ্রী ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, পৃ. ১৬। ২. তদেব, ভূমিকা—৵০।

এদেশে আসেন ও শ্রীমতী হরিপ্রভা মল্লিকের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন, )। এঁর রচিত গ্রন্থটির নাম 'আশাচন্দ্র কেশবচন্দ্র' (১৯১৫)। লেখিকার রচনা ইংরেজী ও বাঙলায় একই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। প্রকৃতপক্ষে শ্রীব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের কথামৃতের মধ্য দিয়ে কেশবচন্দ্র সেনের দেবত্ব ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। যিনি জীবনে আশা দেন, যাঁর কাছ থেকে আমরা উৎসাহ ও উদ্দীপনা পাই, তিনিই স্বয়ং আশার চন্দ্র—কেশবচন্দ্র। গ্রন্থটির সমাপ্তি-অংশে প্রকাশকের প্রার্থনায় বলেছেন, "এই মহাঘোর নিরাশার অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন গভীর নরকের মধ্যে কেমন আশার চন্দ্রকে লইয়া তুমি মা রূপে অবতীর্ণ হইয়া মহানারকীর প্রাণে 'আমি আছি' বলিয়া আশার সঞ্চার করিতেছ।"[১] নববিধান-গোষ্ঠীর বাইরে এই গ্রন্থটির সার্বজনীন মূল্য না থাকলেও শ্রীমতী তাকেদা ব্যক্তিগত প্রয়াসে কেশবচন্দ্র সেনকে সুদূর জাপানে অনেকের কাছে পরিচিত করেছেন।

শ্রীমতী মহারানী সুনীতি দেবী-রচিত 'শিশুকেশব' অতি ক্ষুদ্রাকৃতি গ্রন্থ, মাত্র পনের পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। কেশবচন্দ্র সেনের বাল্যজীবনের দুই-একটি ঘটনার মধ্যে দিয়ে শিশু-কেশবের জীবনচিত্র রচনা করেছেন লেখিকা। কেশবচন্দ্র সেন সুনীতি দেবীর পিতা, কিন্তু গ্রন্থমধ্যে কোথাও ব্যক্তিগত সম্পর্ক অতিরিক্ত প্রশস্তি বা শ্রদ্ধার উপকরণ যোগায়নি। শৈশবেই জীবনের সূচনা, যেমন একটি প্রভাত একটি দিনের সূচনা করে। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা কেশবচন্দ্র সেনের বৈষ্ণবীয় ভক্তি ও অনুরাগের সঞ্চার হয়েছিল বাল্যজীবনেই। "কেশবচন্দ্রের আচার-ব্যবহার চিরদিনই সাত্ত্বিক ছিল। প্রতিদিন প্রাতঃস্নানের পর চেলির কাপড় পরিয়া মুখে হাতে চক্ষে চন্দনে হরিনামের ছাপ পরিতেন। রূপ দেখিয়া সকলে মোহিত হইতেন। এই কিশোর বয়সে তাঁহাকে সকলে গোঁসাঞী বলিয়া ডাকিত।"[২] কেশবচন্দ্র সেনের হ্যামলেট-প্রীতির কথাও লেখিকা জানিয়েছেন—"নাট্যাভিনয়ে তিনি সুদক্ষ ছিলেন। অল্পবয়সে তিনি সেক্সপীয়রের কোন কোন গল্প অভিনয় করিতেন। নিজে হ্যামলেট সাজিয়াছিলেন।"[৩]

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় উমানাথ গুপ্তের 'সাক্ষী'। লেখক কেশবচন্দ্র সেনের চরিত্রের বিভিন্ন দিক বিভিন্ন পরিচ্ছেদে আলোচনা করেছেন। বৈরাগী

১. শ্রীমতী তাকেদা, আশাচন্দ্র কেশবচন্দ্র, পৃ. ১১-১২। ২. সুনীতি দেবী, শিশুকেশব, পৃ. ১৩। ৩. তদেব, পৃ. ১৫।

কেশব, বিনয়ী কেশব, বিশ্বাসী কেশব, পুণ্যবান্ কেশব, প্রেমিক কেশব, সৌখীন কেশব, ভক্ত কেশব, সাবধানী কেশব, যোগী কেশব, ইত্যাদি পর্যায়ে কেশবচন্দ্র সেনের জীবনালেখ্য বর্ণিত হয়েছে ; বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে কেশবচন্দ্র সেনের একটি পূর্ণাঙ্গ মূর্তি, একটি পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বের ছবি ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন লেখক। কেশবচন্দ্র সেনের সমস্ত জীবনই ঈশ্বরময়। প্রতিটি জিনিসের মধ্যেই তিনি ঈশ্বরস্বরূপ উপলব্ধি করে প্রণাম জানাতেন। "তিনি নূতন বস্ত্র পাইলে তাহাকে নমস্কার করিতেন। তিনি ঈশ্বরের নিকট হইতে যে কোন নূতন বস্তু পাইলেই তাহা মস্তকে স্পর্শ করিতেন।"[১]

শুধু ভক্ত কেশবই নন ; এই মহাত্মার বিনয়, বিশ্বাস, প্রেম, ব্যক্তিগত জীবনে সখ-সৌখীনতা ও সাবধানী মনোভাব সব কিছুর মধ্য দিয়েই একটি ব্যক্তিত্বকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা হয়েছে ; অযথা অলৌকিক মর্যাদা আরোপের চেষ্টা লেখক করেননি। জীবনী হিসেবে এটি তাই সার্থক।

২. সাধু-সন্তদের জীবনী: নববিধান-ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক ও ভক্তগণ সাধু-সন্তদের জীবনী ও আলেখ্য রচনা করেছেন। সাধু-সন্তদের জীবনী ঠিক চরিত-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ 'The proper study of mankind is man'—এই দৃষ্টি নিয়ে সাধু ও মহাপুরুষদের জীবনী রচনা করতে কোন ভক্তই সাহস পান না। এসব ক্ষেত্রে একটা দৈব ও অলৌকিক মাহাত্ম্য সর্বত্র আরোপিত হয়। কাজেই সাধু-সন্ত, মহাপুরুষ ইত্যাদির জীবন-আলেখ্য Biography নয়, Hagiography-র শাখাভুক্ত। (Hagio শব্দের অর্থ সাধু, যিনি ধর্মের জন্য আত্মোৎসর্গ করেছেন)। এই শাখাতে জীবনীকারের নৈর্ব্যক্তিকতা অপেক্ষা ভক্তির আবেগ ও প্রাবল্য অনুভূত হয়। কেশবচন্দ্র সেন 'নববিধান' ধর্মমত প্রচার করে সর্বধর্ম সমন্বয়-চর্চায় ধর্মভ্রাতাদের নিযুক্ত করলেন। কেশবচন্দ্রের নির্দেশে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, অঘোরনাথ গুপ্ত, গিরিশচন্দ্র সেন, গৌরগোবিন্দ রায় ও মহেন্দ্রনাথ বসু যথাক্রমে, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, ইসলাম, হিন্দু ও শিখ ধর্ম ও শাস্ত্র আলোচনায় ব্রতী হলেন। এঁরা বিবিধ শাস্ত্র-গ্রন্থ আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ধর্মের মহাপুরুষ ও সাধ্বীগণের জীবনচরিত রচনা করেন। সাধু

১. উমানাথ গুপ্ত, সাক্ষী, পৃ.২১—২২।

অঘোরনাথ গুপ্ত 'ধ্রুব ও প্রহ্লাদ' (১৭৯২ শকাব্দ) 'দেবর্ষি নারদের নবজীবন লাভ' ও 'শাক্যমুনি-চরিত ও নির্বাণতত্ত্ব' (১৭৯৭ শকাব্দ, ১৮০৪ শকাব্দ) রচনা করেন। 'ধ্রুব ও প্রহ্লাদ' গ্রন্থে দুটি আলেখ্য ধ্রুবের সরল ভক্তি ও প্রহ্লাদ সংবচিত হয়েছে। 'দেবর্ষি নারদের নবজীবন লাভ' গ্রন্থটিতে দেবর্ষি নারদের হরিভক্তি সম্বন্ধে একটি পৌবাণিক কাহিনী বিবৃত হয়েছে। অঘোরনাথের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'শাক্যমুনি-চরিত ও নির্বাণতত্ত্ব'। বাঙলা ভাষায় বৌদ্ধ-শাস্ত্র নিয়ে এই-ই সর্বপ্রথম গ্রন্থ। 'শাক্যমুনি-চরিত ও নির্বাণতত্ত্ব' প্রথম খণ্ড ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড ১৮৮২ ও ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি প্রধানতঃ ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'ললিতবিস্তর' (সংস্কৃত), ড. রামদাস সেনেব 'ঐতিহাসিক রহস্য' অবলম্বনে বচিত। আনুষঙ্গিক বহু হিন্দুশাস্ত্র, বৌদ্ধশাস্ত্র, ইউরোপীয় পণ্ডিতদের গবেষণার উল্লেখ গ্রন্থটিতে আছে। ধর্মপ্রচারের জন্য অঘোরনাথ প্রধান বৌদ্ধতীর্থগুলি ভ্রমণ করেছিলেন। তাঁর বৌদ্ধ তীর্থদর্শনের অভিজ্ঞতা তাঁর গ্রন্থ প্রণয়নে সাহায্য করেছে। যদিও বাঙলা সাহিত্যের আদিতম গ্রন্থ 'চর্যাপদ' বৌদ্ধধর্মের গুহ্যতত্ত্ব বর্ণনা করেছে, কিন্তু 'চর্যাপদের' পর বাঙলা সাহিত্যে বৌদ্ধশাস্ত্র ও ধর্মের উল্লেখযোগ্য কোন আলোচনা হয়নি। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলা ভাষায় বুদ্ধের জীবন ও তত্ত্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করলেন অঘোরনাথ গুপ্ত। সমসাময়িক কালে অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁর 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় ভাগে (১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ) বুদ্ধাবতার সম্পর্কে আলোচনা করেছেন (প্রায় ৪০ পৃষ্ঠাব্যাপী তথ্য বিবৃত হয়েছে); অসুস্থ অবস্থায় তিনি গ্রন্থটি সমাপ্ত করেন। তাঁর মৃত্যুর পর গৌরগোবিন্দ রায়ের সম্পাদনায় ১৮০৪ শকাব্দে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। ৩টি ভাগে এই বিরাট গ্রন্থে শাক্যসিংহের জন্ম ও কৈশোর থেকে সিদ্ধিলাভ ও নির্বাণতত্ত্ব পর্যন্ত সবই বিস্তারিতভাবে বিবৃত হয়েছে। বৌদ্ধধর্মের তত্ত্ব ও আদর্শ ব্যাখ্যাত হয়েছে। পরবর্তী কালে কৃষ্ণবিহারী সেন 'বুদ্ধচরিত' ও 'অশোকচরিত' রচনা করে এই ধারারই পৃষ্ঠপোষকতা করেন।

ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের 'ভক্তি-চৈতন্যচন্দ্রিকা' (২ খণ্ড) ১৮০০ শকাব্দে প্রকাশিত হয়। মধ্যযুগের বৈষ্ণব ভক্তগণ কর্তৃক লিখিত চৈতন্যজীবনী গ্রন্থের অনুরূপ গদ্যে চৈতন্যচরিত লিপিবদ্ধ করেছেন। বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য-ভাগবত' ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' কবিতায় লিখিত।

উনবিংশ শতাব্দীতে ঠিক একই প্রেরণা-ভক্তি থেকেই 'ভক্তি-চৈতন্য-চন্দ্রিকা' ত্রৈলোক্যনাথ লিখলেন। 'জীবনী লেখায় বাস্তব সততা অপেক্ষা ভক্তি-ভাবই বেশী কার্যকরী ; গ্রন্থের নামকরণেই সেটি স্পষ্ট। চৈতন্য-জীবনের হরিভক্তি-ব্যাকুলতা, প্রেমোন্মত্ততা ও বৈরাগ্যে বিগলিত হয়ে লেখক গ্রন্থটি রচনা করেছেন। গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন—" 'চৈতন্য-ভাগবত', 'চৈতন্য-চরিতামৃত', 'চৈতন্য-চন্দ্রোদয়' নাটক প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা ভক্ত বৈষ্ণবগণের সাহায্য অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ লিখিত হইল। ·এই পুস্তকের মধ্যে পদ্মরাগ-মণির ন্যায় ঘনীভূত প্রেমবিজ্ঞান এবং ভক্তিরসবর্জ্জিত উজ্জ্বল হীরকসদৃশ দিব্যজ্ঞানের কঠিন সত্যসকলও ইহাতে দেখিয়া চিন্তাশীল সারগ্রাহী বিজ্ঞজনেরা আনন্দানুভব করিবেন। শ্রীমান্ গৌরচন্দ্রকে সেই সচ্চিদানন্দ প্রেমময় ঈশ্বরের অপরূপ প্রেমলীলার একখানি সুন্দর ছবি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।"

ত্রৈলোক্যনাথের জন্মভূমি নবদ্বীপ। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে নবদ্বীপের চক-পঞ্চানন গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। নবদ্বীপের ভক্তি, বিনয় ও চৈতন্য-সংস্কৃতি তিনি জন্মসূত্রে পেয়েছিলেন। তারপর তাঁর বাল্য ও কৈশোর কাটে যাত্রা, কীর্তন, পূজাপার্বণ ও ব্রতপালনের মধ্য দিয়ে। কাজেই যৌবনে যখন তিনি ব্রাহ্ম-সমাজে যোগ দিলেন তখন তিনি ভক্তি ও কীর্তনের উত্তরাধিকার নববিধান-সমাজের সমন্বয়-আন্দোলনে উজাড় করে দিলেন।

যীশুখ্রীষ্টের জীবনচরিত নিয়ে তিনি রচনা করেন 'ঈশাচরিতামৃত'। 'পূর্ববিভাগ' ১৮০৪ শকাব্দে আর 'উত্তরবিভাগ' ১৮০৫ শকাব্দে প্রকাশিত হয়। পূর্বোক্ত বৈষ্ণব সংস্কৃতির প্রভাব গ্রন্থটির নামকরণে দ্রষ্টব্য। চৈতন্য-চরিতামৃতের অনুরূপ খ্রীষ্টের জীবনচরিতামৃত। শুধু তাই নয়, গ্রন্থের শিরোনামের শীর্ষে প্রচ্ছদ-দৃশ্যে 'নমঃ সচ্চিদানন্দায় হরয়ে'—মন্ত্রে ব্রহ্মশরণে বৈষ্ণবীয় ভক্তির প্রগাঢ়তাই লক্ষ্য করা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা চলে, কেশবচন্দ্র সেন 'নববিধান' ব্রাহ্ম-সমাজে ব্রহ্মকে 'দয়াময়', 'হরি' ইত্যাদি নামে ডাকার প্রচলন করে যান। 'ঈশাচরিতামৃত'-রচনায় গভীর ভক্তি ও আত্যন্তিক ঈশ্বরপ্রীতি উদ্দীপনার কাজ করলেও এই গ্রন্থটি সাধারণ 'সন্তচরিতে'র অনুরূপ নয়। কারণ, এই গ্রন্থ-রচনায় শুধু ভক্তি নয়—অপরদিকে যুক্তি ও ঐতিহাসিক বিশ্লেষণী দৃষ্টি দিয়ে খ্রীষ্টের জীবনচরিত বিবৃত করেছেন ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল। গ্রন্থের প্রারম্ভে 'ঐতিহাসিক সমালোচনা' নামক অধ্যায়ে লেখক সুচিন্তিত বিশ্লেষণে দেখিয়েছেন—"ঈশার

জীবনচরিত এবং প্রবচনাবলী মূলতঃ যেরূপ রচিত হইয়াছিল, কালসহকারে ক্রমে ক্রমে শ্রুতি ও কল্পিত প্রবাদবাক্য দ্বারা তাহার কলেবর বহুপরিমাণে বর্ধিত হইয়াছে।"[১] মার্ক, মথি, মিউক ও সেণ্ট জন-লিখিত চারখানি গ্রন্থকেই তিনি ঈশার জীবন ও ধর্ম-বর্ণনায় বিশেষ মূল্যবান্ বলে মনে করেন। যদিও চারখানি গ্রন্থের মধ্যে বিশ্বাস ও ঘটনায় অনেক অনৈক্য দৃষ্ট হয়। আমাদের লেখক অবতারবাদে বিশ্বাস করেন না, কাজেই যীশুখ্রীষ্টের তিরোভাবের পর পুনরুত্থান অবিশ্বাস করেন; তাঁর জীবনের অলৌকিক ঘটনারাজিতে অবিশ্বাস করেন। খ্রীষ্ট ঈশ্বরের পুত্র; মানবশ্রেষ্ঠ, ঈশ্বরের বাণী শ্রবণ করেন—প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ; এইভাবেই তাঁকে রূপায়িত করেছেন। যীশুচরিত-রচনায় ভক্তি ও বিজ্ঞান, আবেগ ও যুক্তি একাকার হয়ে গেছে। চিরঞ্জীব শর্মা ইতিহাস-পরিশীলিত দৃষ্টি নিয়ে গ্রন্থখানি রচনা করেছেন। 'স্বর্গারোহণ' নামক শেষ অধ্যায়ে চিরঞ্জীব শর্মা খ্রীষ্টের প্রতি ভক্তি ও আনুগত্য রক্ষা করেও বলবার সাহস রাখলেন—

"খ্রীষ্টীয় জগতের প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, যীশু মৃত্যুর পর তিন দিনের দিন সশরীরে সমাধি হইতে উঠিলেন, শিষ্য-সহচরদিগকে দেখা দিলেন, তাহাদের সঙ্গে পুনর্বার আহারাদি আলাপ-প্রসঙ্গ করিলেন, তদনন্তর মেঘের উপর চড়িয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন। কিন্তু আমরা অন্যপ্রকার পুনরুত্থান দেখিলাম। তাঁহার শরীর আর উঠিল না, সে মাটির দেহ মাটিতে মিশাইয়া গেল; কিন্তু তিনি নিজে উঠিলেন, উঠিয়া খ্রীষ্টভক্তগণের আত্মার মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন। বিশ্বাস, বৈরাগ্য, ক্ষমা, প্রীতি, ন্যায়, পবিত্রতা, বিনয়, আত্মসমর্পণ, সেবা, ভক্তি, প্রত্যাদেশ, বাধ্যতা, পুত্রত্ব এবং মহাযোগের গুণময় আকারে রহিলেন।"[২]

"খ্রীষ্টবাদীরা যে তাঁহাকে পিতা বলেন, ইহা সম্পূর্ণ ভুল। যীশু ভগবানের পুত্র, অনুগত সৎপুত্র। পুত্র পিতার অংশ, তাঁহার মানবীয় প্রকাশ; যীশু তাহাই ছিলেন। তাঁহার মনুষ্যত্ব অপূর্ণ এবং অনন্ত উন্নতিশীল ঈশ্বরত্ব ভিন্ন আর কিছুই নহে।"[৩] বঙ্গভাষায় এই ধরনের গ্রন্থ রচনার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। বঙ্গভাষায় উনিশ শতকের প্রারম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত যত খ্রীষ্টের জীবনী লেখা হয়েছে প্রায় সবগুলিই অনুবাদ ও খ্রীষ্ট মিশনারিগণের বিকৃত বাঙলা

১, চিরঞ্জীব শর্মা, ঈশাচরিতামৃত, পৃ. ৩। ২. তদেব, পৃ. ১০৩। ৩. তদেব, পৃ. ১০১।

ভাষায় রচিত। সেইদিক থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই গ্রন্থটি রচনা করে ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল বাঙলা চরিত-সাহিত্যে সবিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে রইলেন। লেখকও এই ব্যাপারে সচেতন ছিলেন। ভূমিকাতে গ্রন্থটির রচনার উদ্দেশ্য বিবৃত করতে গিয়ে বলেছেন,—"খ্রীষ্টীয়ান ধর্মাবলম্বী মহাত্মারা যীশুর চরিতাখ্যান যেরূপ উৎসাহের সহিত পৃথিবীর সর্বত্র বিস্তার করিয়াছেন তাহা ভাবিলে আব মনে হয় না যে, এ সম্বন্ধে অন্য কাহারো কিছু করিবার আছে। এমন কোন লিখিত ভাষা দেখা যায় না যাহাতে ইহা বর্ণিত হয় নাই।...একথার উত্তরে এই মাত্র বলা যাইতে পারে—যীশুচরিত নিরপেক্ষ-ভাবে সহজ বঙ্গভাষায় লিখিবার আবশ্যকতা আছে। ইহার প্রচলিত বাঙ্গালা অনুবাদ এমন জটিল এবং অরুচিকর যে, তাহা পাঠে মনে এক প্রকার অসুখ জন্মে, ভাল বুঝিতেও পারা যায় না।"[১] লেখকের গ্রন্থ-রচনার উদ্দেশ্য সার্থক। কারণ স্বচ্ছ, স্পষ্ট ও কাব্যময় ভাষায় গ্রন্থটি রচিত হয়েছে। পরবর্তী কালে নববিধানের অপব একজন প্রচারক মহেন্দ্রনাথ বসু ঈশার জীবনচরিত বাঙলায় রচনা করেন, 'ঈশার অনুকরণ'।

উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দের উপর হিন্দুশাস্ত্র-আলোচনার গুরুভার আরোপিত হয়েছিল। সংস্কৃতে ও বাঙলায় তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়ের মহান্ কীর্তি 'সমন্বয়-ভাষ্যমালা'। "১৮৭৯ খ্রী: তিনি হিন্দুধর্ম আলোচনার জন্য অধ্যাপক-পদে ব্রতী হন। 'সমন্বয়-ভাষ্যমালা' তিনটি খণ্ডে বাঙলা ও সংস্কৃত উভয় ভাষায় প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ড শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতা-সমন্বয়-ভাষ্য (সংস্কৃতে ১৮৯৮ খ্রী. বাঙলাতে ১৯০০ খ্রী.), দ্বিতীয় খণ্ড শ্রীমদ্গীতা-প্রমুক্তি (সংস্কৃতে ১৯০২, বাঙলাতে ১৯৩০); তৃতীয় খণ্ড বেদান্ত-সমন্বয়-ভাষ্য (সংস্কৃতে ১৯০৬, বাঙলাতে ১৯১২) প্রকাশিত হয়। 'শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম (১৮৮৯) এবং 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও তাঁহার স্বভাবনিষ্ঠ যোগ' (১৯১০) এই দুইটি সমন্বয়-ভাষ্যমালার অন্তর্গত করা চলে। উপাধ্যায়ের গ্রন্থগুলিতে ভক্তি অপেক্ষা পাণ্ডিত্যের পরিচয় অধিক। সমস্ত জীবনের শাস্ত্র-অনুশীলন ও সাধনার ফল-স্বরূপ সমন্বয়-ভাষ্যমালার গ্রন্থগুলি গৌরগোবিন্দ রায়ের অধ্যবসায় ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় বহন করে।

কেশবচন্দ্রের সর্বধর্ম-সমন্বয়ী দর্শনে গিরিশচন্দ্র সেন ইসলাম ধর্ম ও শাস্ত্র আলোচনার গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। গিরিশচন্দ্র সেনের পারসিক

১. চিরঞ্জীব শর্মা, ঈশাচরিতামৃত, ভূমিকা।০।

ও আরবি ভাষায় সুপাণ্ডিত্যের কথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। চল্লিশোর্ধ বয়সে লক্ষ্ণৌ নগরে গিয়ে আরবি ভাষা শিক্ষা করে ঐ বিদেশী ভাষায় রচিত বহু মহাপুরুষের জীবনী তিনি বাঙলা ভাষায় অনুবাদ করেন। কোরান-শরীফের সটীক বাঙলা অনুবাদ তাঁকে অমরত্ব দান করেছে। মুসলমান ধর্মের বহু সাধু ও সাধ্বীদের জীবন-চরিত মূল পারসিক থেকে অনুবাদ করেছেন। (ক) 'হাফেজ' ( ১৮৭৭ খ্রী. ), (খ) 'মহাপুরুষ-চরিত' ( ১৮৮২-১৮৮৭ খ্রী. ), (গ) 'তাপসমালা' ( ১৮৮০-১৮৯৬ ), (ঘ) 'মহাপুরুষ মোহম্মদ ও তৎপ্রবর্তিত এসলাম ধর্ম' ( ১৯০৬ খ্রী. ), (ঙ) 'এমাম হাসান ও হোসায়নের জীবনী' ( ১৯০৯ খ্রী. ), (চ) 'চারিজন ধর্মনেতা' (১৯০৯ খ্রী.), (ছ) 'চারিটি সাধ্বী মুসলমান নারী ( ১৯০৯ )। এসব জীবনীর অনুবাদ ছাড়াও গিরিশচন্দ্র সেন নিজে লিখেছেন 'শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের উক্তি ও সংক্ষিপ্ত জীবনী' ( ১৮৭৮ )। 'হাফেজ' গ্রন্থটি মহাপ্রেমিক খাজা হাফেজ-প্রণীত 'দেওয়ান হাফেজ' নামক মূল পারসিক গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ।

মহাপুরুষ-চরিত তিন খণ্ডে সমাপ্ত বৃহৎ গ্রন্থ। প্রথম খণ্ডে মহাপুরুষ এব্রাহিমের জীবনচরিত, দ্বিতীয় খণ্ডে মহাপুরুষ মুসার জীবন-চরিত আর তৃতীয় খণ্ডে মহাপুরুষ দাউদের জীবনচরিত বর্ণিত হয়েছে। লেখক এইসব মহাপুরুষদের জীবনী রচনা করেছেন নানা বিদেশী গ্রন্থের সাহায্যে। আদি বাইবেল ও মোহম্মদীয় গ্রন্থ থেকে তিনি নানা বৃত্তান্ত সংকলিত করেছেন। এই গ্রন্থের ভূমিকায় গিরিশচন্দ্র সেন বলেছেন—"মানবজাতি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—মহাপুরুষ ও সাধারণ মনুষ্য। মহাপুরুষ যেসকল আধ্যাত্মিক ও মানসিক বিশেষ বিশেষ গুণ ও শক্তি লাভ করিয়া সেরূপ অসাধারণ কার্য সাধন করেন, সাধারণ মনুষ্য তদ্রূপ কখন সংসাধন করিতে সক্ষম নহে। প্রথম শ্রেণীর মহাপুরুষের অর্থাৎ ধর্মপ্রবর্তক মহাপুরুষের চরিত্র বর্ণনা করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।"[১] 'তাপসমালা' গ্রন্থটিতে ৯৬ জন মুসলমান তপস্বীর জীবন-বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। মহামান্য মৌলানা শেখ ফরিদুদ্দিন আত্তা-বিরচিত 'তেজ করতোল আউলিয়া' নামে মূল পারসিভাষায় রচিত গ্রন্থ থেকে জীবনীগুলি সংকলিত হয়েছে। খ্রীষ্টভক্তেরা যেমন Lives of the Saints সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশ করেন, অথবা কোয়েকার এবং মেথডিস্ট-পন্থীরা যে-ধরনের ভক্তচরিত রচনা করেন, বৈষ্ণবদের যেমন 'ভক্তমালা', তাবই

১. গিরিশচন্দ্র সেন, মহাপুরুষ-চরিত, পৃ. ভূমিকা ।০-৶০।

অনুসরণে কেশবচন্দ্র-পরিচালিত ব্রাহ্মসমাজ থেকে প্রকাশিত হয় গিরিশচন্দ্র সেনের 'তাপসমালা' ও 'মহাপুরুষ-চরিত'।[১]

'মহাপুরুষ মোহম্মদ ও তৎপ্রবর্তিত ইসলাম ধর্ম' গ্রন্থটি ঠিক অনুবাদ নয়। মহাপুরুষ মোহম্মদের জীবন সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ সংগ্রহ করে এই গ্রন্থটি রচনা করেন আর কোরান ও হদিস পাঠ করে তিনি ইসলামধর্মের সারবস্তু সংগ্রহ করে অতি সহজ ভাষায় এই গ্রন্থটিতে প্রকাশ করেছেন।

এমাম হাসান ও হোসায়নের জীবনীটি 'রওজতোশ শোহদা' নামক প্রসিদ্ধ প্রাচীন মূল পারসি গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত। চারিজন ধর্মনেতা—মহাপুরুষ মোহম্মদের প্রথম চারিজন খলিফা আবুবকর, ওমর, ওসমান ও আলির জীবন-বৃত্তান্ত নিয়ে রচিত। আর দেবী খাদিজা, ফতেমা, আয়েশা ও তপস্বিনী রাবেয়ার জীবনী নিয়ে 'চারিটি সাধ্বী মুসলমান নারী' গ্রন্থটি রচিত। এই সাধ্বী নারীদের জীবনচরিত লিখতে গিয়ে লেখক প্রাচীন পারসিক ভাষায় রচিত 'মেরাজোল নবুওয়ত' ও 'তেজকরতোল আউলিয়া' গ্রন্থ দুটির সাহায্য নিয়েছেন। বাঙলা চরিত-সাহিত্যে পারসিক ভাষা থেকে অনূদিত চরিতাবলী বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।

"মহাপুরুষ-চরিত, সন্ত-চরিত, ভক্তচরিত-রচনা নববিধান ব্রাহ্ম আন্দোলনের একটি অচ্ছেদ্য অঙ্গ। এগুলি হল আধুনিককালের Hagiography।"[২] নববিধান ব্রাহ্মসমাজ যেসব চরিত-প্রসঙ্গ প্রকাশ করেছিলেন তার মূলে ছিল মধ্যযুগের 'সন্ত'দের আধুনিক যুগের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখার প্রেরণা। অপরদিকে ছিল কেশবচন্দ্র সেনের সর্বধর্মসমন্বয়ের মরমী প্রেরণা। 'মহম্মদ চরিত', 'মহাপুরুষচরিত', 'তাপসমালা'—মুসলমান-ধর্মের এই ভক্তজীবনীগুলি 'নববিধান'-ধর্মকে ব্যাখ্যা করতে ও পৃষ্ঠপোষকতা দান করতে সাহায্য করেছে।

মহেন্দ্রনাথ বসু শিখধর্ম অনুশীলন করেন। গুরু নানকের জীবনচরিত ও শিখধর্মের ইতিবৃত্তসার নিয়ে তিনি রচনা করেন 'নানকপ্রকাশ' (প্রথম খণ্ড ১৮০৭ শকাব্দ, দ্বিতীয় খণ্ড ১৮১৫ শকাব্দ)। কয়েকবার ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি পাঞ্জাবে যান ও শিখধর্মের প্রতি অনুরাগী হয়ে উঠেন। বিশেষতঃ শিখ ধর্মগুরু নানকের প্রতি তিনি বিশেষরূপে আকৃষ্ট হন। এই বিষয়ে সবিশেষ

১. দেবীপদ ভট্টাচার্য, বাংলা চরিত-সাহিত্য, পৃ. ১৪৬-১৪৭। ২. তদেব, পৃ. ১৪৭।

অবগতির জন্য তিনি ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে শিখ ধর্মযাজকের কাছে 'গুরুমুখী' ভাষা শিক্ষা করে মূল 'জন্মসাক্ষী' (শিখদের ধর্মগ্রন্থ) পড়তে সক্ষম হন। 'নানকপ্রকাশ' গ্রন্থখানি সম্পূর্ণভাবে গুরুমুখী 'জন্মসাক্ষী' গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত।[১] অলৌকিক ঘটনা ও যুগের অনুপযোগী বিষয় তিনি পরিত্যাগ করে নানকের জীবনীকে উনবিংশ শতাব্দীর পাঠকগণের উপযোগী করে রচনা করেছেন। দুই খণ্ডে সমাপ্ত গ্রন্থটিতে গুরু নানকের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিস্তৃত জীবনী ও পরবর্তী আরও নয়জন ধর্মগুরুর জীবনী সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

৩. অন্যান্য ভক্ত-জীবনী: বৈষ্ণব ভক্তগণ শুধু শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী রচনা করেই তৃপ্ত হননি—তাঁরা আপন সম্প্রদায়ের ধর্মগুরুদের জীবনীকাব্যও রচনা করেন। ব্রাহ্মসমাজের ভক্তগণের মধ্যেও এই প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। নববিধান ব্রাহ্মসমাজে শুধু প্রধান আচার্যের জীবনী নয়, ব্রাহ্মভক্ত ও প্রচারকদের জীবনীও লেখা হয়েছে। ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের 'সাধু অঘোরনাথ' (১৮০৩ শকাব্দ), প্রকাশচন্দ্র রায়ের 'অঘোর-প্রকাশ' (১৯০৭ খ্রীঃ), প্রিয়নাথ মল্লিকের 'দীনচরিত' (১৯২৩ খ্রীঃ) প্রভৃতি গ্রন্থ তার নিদর্শন। এই ধারার অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে শ্রীপ্রভাত বসুর 'ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষের জীবনকথা' (১৩৫৬ সাল) ও শ্রীশরৎকুমার রায়ের দুটি গ্রন্থ 'সাধু প্রমথলাল সেন' (১৯৩৩ সাল) ও 'মহাত্মা অশ্বিনীকুমার' (১৩৩৩ সাল) উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। 'আচার্য কেশবচন্দ্র-রচয়িতা গৌরগোবিন্দ রায় 'প্রেরিত কালীশংকর দাসের জীবনচরিত' (১৯০৩ খ্রীঃ) রচনা করেন। এই গ্রন্থটিতে ঐতিহাসিক তথ্যও নববিধানের আদর্শে বর্ণিত হয়েছে।

নববিধানের ত্রৈলোক্যনাথ রচনা করেছেন 'সাধু অঘোরনাথ' (১৮০৩ শকাব্দ)। তিনি জীবনচরিত-রচনায় দক্ষ। অঘোরনাথ ত্রৈলোক্যনাথেরই সহপ্রচারক—একই সঙ্গে তাঁদের ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষা। অঘোরনাথের অকাল-মৃত্যুর পর শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে গ্রন্থটি লেখা—জীবনী বর্ণনার শেষে পরিসমাপ্তিতে তিনটি শোকগাথা সংযোজনা করেছেন। লেখক বন্ধুবিয়োগে কাতর—"বন্ধুর বাল্য-কৈশোর-যৌবনকালের মনোহর বৃত্তান্ত লিখিবার সময় মন উৎসাহিত হইল, তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভ্রমণ করিয়া যথাসাধ্য সকল অবস্থার ইতিহাস

১. মহেন্দ্রনাথ বসু, নানকপ্রকাশ, ভূমিকা, পৃ. ৫০।

লিপিবদ্ধ করিলাম, কিন্তু লক্ষ্ণৌ নগরে আসিয়া 'মৃত্যু' এই শব্দ লিখিতে গিয়া লেখনী যে দুর্বল হইয়া পড়িল। ইহা যে এখনও সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না।"[১] লেখক শোকদগ্ধ হলেও লেখকের বন্ধুপ্রেম বা ব্যক্তিগত সৌহার্দ্য জীবনচরিতের আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করেনি। লেখক গ্রন্থমধ্যে নিরপেক্ষতা রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন। "কাবো জীবনচরিত লিখিতে হইলে ঠিক যাহা স্বাভাবিক তাহাই বর্ণনা করা উচিত, অত্যুক্তি বর্ণনা সত্যের বিরোধী। একথা আমরা সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করি এবং সেই ভাবের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ইহা লিখিতে চেষ্টা করিয়াছি।"[২]

প্রকাশচন্দ্র বায়ের 'অঘোর-প্রকাশ' (১৯০৭ খ্রীঃ) বাঙলা জীবনী-সাহিত্যে একটি মূল্যবান্ সম্পদ। পশ্চিমবাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের পিতা প্রকাশচন্দ্র রায়, ব্যক্তিগত জীবনে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হলেও আদর্শবান্ উন্নত নীতিপরায়ণ ব্রাহ্ম ছিলেন। তাঁর স্ত্রী অঘোবকামিনী রায়। অঘোরকামিনী সাধারণ নগণ্য গ্রাম্য-বালিকা ছিলেন। কিন্তু অধ্যবসায়ের গুণে ও একাগ্রতার বলে নিজেকে শিক্ষিত করেন; পবিণত বয়সে লক্ষ্ণৌ শহরে মিস্ থোবর্ণেব বিদ্যালয়ে নিজেকে আদর্শ ছাত্রী করে তোলাব জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন। পরে বাঁকিপুরে অঘোরকামিনী বিদ্যালয়ে নিজেকে বিদ্যালয়ের শিক্ষকতায় উৎসর্গ করেন। "গৃহিণীরূপে, শিক্ষয়িত্রীরূপে, আত্মীয়-অনাত্মীয়ের অভিভাবিকারূপে, পত্নীরূপে সর্বত্র তাঁর সমান প্রভাব, সমান সাফল্য। এমন হবার কারণ তাঁরা স্বামী-স্ত্রীতে মিলে 'অঘোব-প্রকাশ' একটি সত্তা, তাঁদের জীবনের কেন্দ্রে অচল অটল ব্রহ্মপরায়ণতা। ব্রহ্মনিষ্ঠা অঘোর-প্রকাশের জীবনের মূল মন্ত্র।"[৩]

স্বামী প্রকাশচন্দ্র আপন সহধর্মিণী অঘোরকামিনীর জীবনী বর্ণনা কবে গ্রন্থটি রচনা করেছেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, গ্রন্থটির নাম 'অঘোর-প্রকাশ' —গ্রন্থে শুধু জায়ার নামটি নয়. পতির নামটিও উল্লিখিত হয়েছে। জায়া ও পতির মিলনে দম্পতি। অঘোর-প্রকাশ তাই প্রকৃত দম্পতির প্রেমগাথা॥ এই গ্রন্থটিতে অঘোরকামিনীর জীবনকথা বলতে গিয়ে প্রকাশচন্দ্রের আত্মজীবনীও রচনা হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, প্রকাশচন্দ্র গ্রন্থমধ্যে আগাগোড়া একটা সপ্রেম অনুভূতির নিবিড় বন্ধন সৃষ্টি করেছেন। গ্রন্থটির স্টাইল বা রচনা-

১. ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, সাধু অঘোরনাথ প. ১০৬। ২. তদেব, পৃ. ১০১।
৩. প্রকাশচন্দ্র রায়, অঘোর-প্রকাশ, ভূমিকা, প্রমথনাথ বিশী, পৃ ৫/০।

রীতিটি উল্লেখযোগ্য। অঘোরকামিনীকে সামনে রেখে মধ্যমপুরুষে আদ্যন্ত তিনি বর্ণনা করেছেন। বাঙলা জীবনীকাব্যে এই জাতীয় রচনা-কৌশল নিঃসন্দেহে অভিনব।

"এই সময় হইতে তোমার ও আমার আত্মা পরীক্ষার অনলে শুদ্ধ হইতে চলিল। তুমি এসময়ে নিজেও তোমার পত্রে তাহা স্বীকার করিয়াছ। প্রথম প্রথম মনে করিয়াছিলাম যে কয়েক দিন পরই আমি তোমাকে মতিহারী লইয়া যাইতে পারিব। কিন্তু সেখানকার কাজটি দুর্ভিক্ষেব কাজ তাই তোমাকে মতিহারী লইয়া যাওয়া হইল না।"[১] একদিকে আপন জীবনেব কথা, অপবদিকে আপন সহধর্মিণীব, উভয়ের যুগ্ম-জীবনবৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। গ্রন্থটি রচনায় লেখক অঘোরকামিনী দেবীব ডায়েরি ও চিঠিপত্র থেকে বহু তথ্যের উল্লেখ করেছেন। মধ্যে মধ্যে ঘটনাব বাস্তবতা ও সত্যতা রক্ষার জন্য কৌশলে অঘোরকামিনীর পত্রাবলী থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন—"দেবি, এসময়ে যে পত্রগুলি লিখিয়াছিলে তাহা পড়িয়া মন এখনও কাতর হইয়া উঠে। ৫ই এপ্রিল ১৮৭৪-এ লিখিয়াছিলে, 'তোমার পত্র পাইলাম। তুমি কোথায়! আমাকে ফেলে তুমি কোথায় গেলে? আমি যে অন্ধকার দেখছি। আমার যে আর কেহ নাই। তুমি কই?' এইরূপ কাতরোক্তিতেই পত্রখানি পরিপূর্ণ।"[২] চিরাচরিত প্রথার অনুসরণ নয়, একটা আবেগময় লিরিক সুর সমস্ত গ্রন্থব্যাপী বিবাজিত, অথচ গ্রন্থটি তথ্যপূর্ণ, কোথাও সত্যকে গোপন করা হয়নি। পরবর্তী কালে প্রকাশচন্দ্র রায় ও অঘোরকামিনী দেবী উভয়েই সমাজে বিশিষ্ট আসন পেয়েছেন, কিন্তু উভয়ের জীবনের নানা দোষত্রুটির কথা, দুর্বলতার কথা, সাংসারিক দারিদ্র্যের কথা কোথাও গোপন করেননি। উপরন্তু সত্যভাষণে জীবনীকাব্যের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। অঘোরকামিনী দেবী বিবাহিত জীবনের প্রথমাবস্থায় (১৮৭০) পতিকে বিদ্রূপ করেছেন, তাচ্ছিল্য করেছেন, এমন কি "বাল্যকাল হইতে গ্রামে প্রতিপালিতা বলিয়া গ্রামের লোকদের মত তুমিও ছোটছোট বিষয়ে সত্যের অপলাপ করিতে। আমার তাহাতে অত্যন্ত ক্লেশ হইত।"[৩] গ্রন্থমধ্যে আপন সহধর্মিণীকে প্রথমাবধি সাধ্বী পতিপরায়ণা ও নীতিসম্পন্না করে দেখানো হয়নি। ক্রমাগত শিক্ষার ফলে তিনি মহতী নারীতে পরিণত হন। অঘোরকামিনী তাই জীবন্ত রক্ত-মাংসের

১. প্রকাশচন্দ্র রায়, অঘোর-প্রকাশ, পৃ. ২৩। ২. তদেব, পৃ. ২৯। ৩. তদেব, পৃ. ১৯।

নারী। উভয়ের দাম্পত্যজীবন নানা কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হয়েছে। মাত্র ২৬ বৎসর বয়সে তৃতীয় এবং শেষ সন্তান বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মের পর উভয়ে সংসারে থেকেও ব্রহ্মচর্য পালন করবেন বলে সংকল্প করলেন। সন্তানের মাথায় হাত দিয়ে উভয়ে ছয় মাসের জন্য আত্মিক মিলন-ব্রত গ্রহণ করলেন। "সন্তানের মাথায় হাত দিয়া এ প্রতিজ্ঞা শক্ত করা হইল। কত ভয়ে ভয়ে তখন এই ব্রত গ্রহণ করিতেছিলাম। প্রকৃতিকে একেবারে শাসনাধীনে আনিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলাম। সাধু অঘোরনাথের সহিত আলাপের পর অনেকবার ইহার অনুরূপ সংকল্প করিয়াছি, কিন্তু হারিয়া গিয়াছি। একমাস দুই মাস তিন মাস বেশ ভাল গেল, আমার প্রতিজ্ঞার বল চূর্ণ হইয়া গেল। এইরূপ কতবার হইয়াছে। তোমার ও আমার দুর্বলতা আমরা দুজনেই অবগত ছিলাম।"[১] আপন দুর্বলতা ও দোষ-স্বীকার সত্যিই আশ্চর্যজনক। প্রথমাবধিই নিজেদের মহৎ করে দেখাবার কোন কৃত্রিম প্রচেষ্টা নেই, বরং সাধারণ মানুষের দুর্বলতা দোষ-ত্রুটি সবই তিনি অকপটে বর্ণনা করেছেন; সাধারণের স্তর থেকে ধীরে ধীরে কঠোর ব্রত ও আধ্যাত্মিক যুগল-মিলনের মধ্য দিয়ে পরমপ্রাপ্তির পথে এই দম্পতি এগিয়ে যান। তাই মনে হয়, এই গ্রন্থ সাধারণ মহাপুরুষের জীবনীর ন্যায় গুণকীর্তন করেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং মানুষটাকে দেখিয়ে জীবনরস-সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। বাঙলা জীবনী-সাহিত্যের ইতিহাসে এই গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে একটি প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য।

প্রিয়নাথ মল্লিকের 'দীনচরিত' (১৯২৩), দীননাথ মজুমদারের জীবনচরিত। ইনি বিহার-প্রদেশাচার্যরূপে নববিধান ব্রাহ্মসমাজের প্রচার-কার্য চালান। গ্রন্থটিতে দীননাথ মজুমদারের মাহাত্ম্য কীর্তন করা হয়েছে—

"প্রেরিত প্রচারক-মহাশয়গণ কেহ বা উপাসনায়, কেহ বা সংগীতে, কেহ বা অন্য কোন বিষয়ে দক্ষতা দেখাইয়াছেন। কিন্তু দীননাথ উপাসনা-সঙ্গীত, খোল-বাজনা এবং সেবা-সাধন, সর্ববিষয়েই সমভাবে সার্থকতা লাভ করিয়াছিলেন।"[২]

কেশবচন্দ্র নববিধান সমাজে প্রেরিত প্রচারক-দল গঠন করেন ১৮৭৯ খ্রীঃ, আর সমাজের নারী-সাধিকাদের নিয়ে 'ব্রাহ্মিকা-দলে'র সৃষ্টি করেন ১৮৮১ খ্রীঃ।

১. প্রকাশচন্দ্র রায়, অঘোর-প্রকাশ পৃ. ৫০-৫১। ২. প্রিয়নাথ মল্লিক, দীনচরিত পৃ. ৫।

ব্রাহ্মিকা মহিলাগণের আদর্শপূত ত্যাগদীপ্ত জীবনের ঘটনাবলী নিয়ে সুন্দর আলেখ্য রচিত হয়েছে। "খ্রীষ্ট-সেবিকাদের জীবনীর অনুসরণে সমকালীন ব্রাহ্মিকাদের জীবনী প্রকাশ ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক চরিত রচনার আরেকটি দিক।"[১] আপন সহধর্মিণীর জীবন নিয়ে গিরিশচন্দ্র সেন রচনা করেছেন 'ব্রহ্মময়ী-চরিত' ( ১৮৬৯ খ্রীঃ )। সাধ্বী স্ত্রীর বহুবিধ গুণাবলী ব্যাখ্যা করে স্বল্পপরিসরে গ্রন্থটি রচিত। ব্রহ্মময়ী ছিলেন পরনিন্দার বিরোধী, বিলাস-ব্যসনকে অন্তরে স্থান দিতেন না। তাঁর হৃদয়ে দয়াবৃত্তি অতি প্রবল ছিল। অথচ সাংসারিক কর্মে তিনি ছিলেন পটু। ব্রহ্মময়ীর বসন্তরোগে মৃত্যু হয়। গ্রন্থটির শেষে মৃত্যুর বর্ণনায় কারুণ্য সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর পর শোকদগ্ধ হৃদয়ে আপন হৃদয়ের কৃতজ্ঞতার ও অপরিমেয় ভালবাসার উৎসমুখ খুলে দেবার জন্যই গ্রন্থটির রচনা। ভূমিকায় লেখকের স্বীকারোক্তি —"যদি উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞ হইতে হয়, যদি উৎকৃষ্ট গুণের নিমিত্ত কাহারও প্রতি শ্রদ্ধা অনুরাগ স্থাপন করিতে হয়, তবে লোকান্তরনিবাসিনী আমার পরমশ্রদ্ধেয়া পত্নী ব্রহ্মময়ী দেবীকে প্রীতি শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা অর্পণ করা আমার জীবনের একটি গুরুতর কর্তব্য।" এই কারণেই এই চরিতগ্রন্থটি শ্রদ্ধাঞ্জলিমাত্র হয়ে থেকেছে, চরিত-সাহিত্য হয়ে উঠতে পারেনি।

রানী শরৎকুমারীর জীবন নিয়ে গিরিশচন্দ্র সেন রচনা করেছেন 'সতী চরিত'। কেশবচন্দ্রের সহধর্মিণীর জীবনী লিখেছেন প্রিয়নাথ মল্লিক 'ব্রহ্মনন্দিনী সতী জগন্মোহিনী দেবী' ( ১৯১৪ )। ভক্ত প্রিয়নাথ মল্লিকের কাছে জগন্মোহিনী দেবী সাধারণ নারী নন, ঈশ্বরকৃপা-ধন্যা ব্রহ্মনন্দিনী। জগন্মোহিনী দেবী নয় বৎসর বয়সে বধূরূপে যখন সেন-পরিবারে প্রবেশ করেন, তখন তাঁকে নানা বিপরীত অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। বিবাহের কালে কেশবচন্দ্রের তীব্র বৈরাগ্যের ভাব উপস্থিত। সেই সময়ে পত্নীর প্রতি কিছু অবহেলা দেখালেও পরবর্তী সমস্ত জীবন কেশবচন্দ্র সেন পত্নীকে সাধন-সঙ্গিনী রূপে গ্রহণ করে যুগলব্রত উদ্‌যাপন করে গেছেন। জগন্মোহিনী দেবী আজীবন সকল অবস্থাতেই পতির অনুগামী। নানা বিরোধী ঘটনা ও পরিবেশের সঙ্গে, অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে তিনি কেশবচন্দ্রের একান্ত অনুগত থেকেছেন। প্রিয়নাথ মল্লিকের এই গ্রন্থটিতে কেশবচন্দ্রের পারিবারিক

১. দেবীপদ ভট্টাচার্য, বাংলা চরিত-সাহিত্য, পৃ. ১৪৭।

জীবনের বহু ঘটনা ও ব্যক্তিগত জীবনের অনেক খুঁটিনাটি তথ্যের সন্ধান মেলে। সহজ সরল গদ্যে অকৃত্রিম অনুরাগ-সমৃদ্ধ এই জীবনীটি বাঙলা চরিত-শাখার একটি মূল্যবান্ যোজনা।

ক্ষেত্রমোহন দত্তের সহধর্মিণীকে নিয়ে রচিত 'কুমুদিনী-চরিত' (১৭৮৯ শক) উল্লেখযোগ্য চরিত-উপাখ্যান। কুমুদিনী ভক্তপ্রাণা নারী। তৎকালীন গ্রাম্য পরিবেশ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন পরিবার ও প্রতিবেশীদের প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে কুমুদিনীকে অনবরত যুদ্ধ করতে হয়েছে। "তিনি তত্রত্য অজ্ঞাত ও ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ললনাকুলের মধ্যে* একমাত্র জ্ঞানালোকসম্পন্ন নারীরত্ন ছিলেন।"[১] কুসংস্কার, ভ্রম, অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে বঙ্গীয় নারীকুলের মুক্তি কামনা করেছিলেন।

উল্লিখিত জীবনী-গ্রন্থগুলি কতদূর সার্থক জীবনী হয়ে উঠেছে সে বিষয়টি আলোচনা করা প্রয়োজন। মৃত ব্যক্তির জীবনচরিত রচনা করতে গিয়ে লেখক প্রশংসা ও ভাবালুতার দিকেই বেশী অগ্রসর হন। লেখক সশ্রদ্ধ চিত্তে জীবনচরিত রচনা করবেন ঠিকই, কিন্তু পরিপূর্ণ ব্যক্তিসত্তার প্রকাশই তাঁর মূল উদ্দেশ্য। এই কারণেই তিনি প্রথমাবধি বীরপূজার মোহে আচ্ছন্ন না হয়ে বর্ণিত ব্যক্তিটিকে নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে জীবনের নানা তুচ্ছতার মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণতার পথে, মহত্ত্বের পথে নিয়ে যাবেন। কাজেই জীবনী রচনা করতে গিয়ে জীবনীকার যেন পারিপার্শ্বিক না ভোলেন। কিন্তু উল্লিখিত গ্রন্থগুলিতে প্রথমাবধিই ব্রাহ্মিকা মহিলাদের সতী ও সাধ্বী রূপে কল্পনা করে নেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া এই জীবনীগুলিতে বর্ণিত মহিলাগণের মূর্তিটি পারিপার্শ্বিককে অবহেলা করে শুধুমাত্র ব্রাহ্ম ভক্তমণ্ডলীর নিকট স্পষ্ট ও সত্য হয়ে উঠেছে বলে এই জীবনীগুলি 'Perfect pattern of well-told life'—হয়ে উঠতে পারেনি, তাছাড়া আত্যন্তিক ধর্মবোধ ও তত্ত্বকথা জীবনীগ্রন্থের শিল্পসৌন্দর্য ব্যাহত করেছে।

এই জাতীয় চরিত-আখ্যানগুলি জীবনচরিত হিসেবে যত না সার্থক হয়েছে তার চেয়ে তৎকালীন সমাজে নারীজাতির অবস্থা ও নারীজাগরণের সূত্রপাতের মধ্য দিয়ে বাঙালী নারী কিভাবে শিক্ষিত ও সংস্কৃত হয়ে বহির্জগতে আপন স্থানটি অর্জন করে নিল, তার প্রামাণ্য ইতিহাস হিসাবে সার্থক হয়ে উঠেছে।

---

১. ক্ষেত্রমোহন দত্ত, কুমুদিনী-চরিত, পৃ. ৭৪।

এই ধারার অনুসৃতি পরবর্তী কালের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। দুর্গামোহন দাস, আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী ও উমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ ব্যক্তিদেব যোগ্য সহধর্মিণীদের জীবনালেখ্য পরবর্তী কালে রচিত হয়েছিল।

৪. **আত্মজীবনী**: ব্রাহ্ম ভক্ত ও প্রচাবকগণের আত্মচরিত লেখার প্রবণতা প্রথম থেকেই লক্ষ্য করা যায়। আত্মচরিত-রচনার পথটি কেশবচন্দ্রই প্রথম দেখান। 'জীবনবেদ' (১৮৮৩ খ্রীঃ) কেশবচন্দ্র সেনের জীবনের আত্মিক উদ্ঘাটন। ধর্মজগতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কেশবচন্দ্রের 'তাত' ও বাজনারায়ণ বসু 'অগ্রজ', কিন্তু মহর্ষির আত্মজীবনী প্রকাশিত হয় অনেক পবে -১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে। বাজনাবায়ণ বসুব আত্মচরিত প্রকাশিত হয় মৃত্যুব পব, ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে। "পিউরিটানেরা যেমন ডায়েরি রাখতেন, নিজেদের দোষ-ত্রুটি লিখতেন, ঈশ্বরের কাছে পাপের মার্জনা ভিক্ষা কবতেন, ব্রাহ্মসমাজের ভক্তরা প্রধানতঃ কেশবচন্দ্র সেনের যোগদানের পর থেকেই দিনলিপি রাখা, নিজেদের বাসনা-ভাবনাকে, পাপ-পুণ্য চিন্তাকে নিয়মিত লিপিবদ্ধ করাকে অবশ্য পালনীয় কর্তব্য বলে স্বীকার করেছিলেন। খ্রীষ্টান সাধকদের 'কনফেসন' পর্যায়ের রচনা (যেমন 'Confessions of St. Augustine') ব্রাহ্মভক্তদের 'আত্মজীবনী' রচনার প্রেরণা যুগিয়েছিল। আত্মচরিত-সাহিত্যের দিক থেকে এগুলির বিশেষ মূল্য আছে। ব্রাহ্ম-ভক্তদের জীবনকথা রচনায় তাঁদের আত্মজীবনী, ডায়েরি, স্মৃতিলিপি প্রভৃতির সাহায্য বহুলভাবে গ্রহণ করা হয়েছে।"[১]

এইসব আত্মচরিতে আধ্যাত্মিক উন্নতির বিবৃতি ছাড়াও সমকালীন সমাজের ও উনিশ শতকেব ব্রাহ্ম-আন্দোলনের ইতিহাসের নানা উপভোগ্য উপকরণ পাওয়া যায়।

নববিধান সমাজের প্রচারকগণ আপন আপন জীবনের বিস্তারিত আত্ম-পরিচয় ও বিবরণ দিয়ে আত্মজীবনী রচনা করে গেছেন। প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের 'আশীষ' (১৯০৫), গিরিশচন্দ্র সেনের 'আত্মজীবন' (১৩১৩), কান্তিচন্দ্র মিত্রের 'ভৃত্যের আত্মপরিচয়' (১৯১৭), বঙ্গচন্দ্র রায়ের 'আমার জীবনালেখ্য' (১৯১০), বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষের 'আমার জীবনের কথা'

১. দেবীপদ ভট্টাচার্য, বাংলা চরিত-সাহিত্য, পৃ. ১৪৯।

( ১৩৩০ সাল ), সুদক্ষিণা সেনের 'জীবনস্মৃতি" ( ১৩৩৯ )—নববিধান ব্রাহ্মদের দ্বারা রচিত কয়েকটি আত্মজীবনী। গৌরগোবিন্দ রায় আত্মজীবনী লিখেছিলেন সংস্কৃত ভাষায়।

প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের 'আশীষ' প্রকাশিত হয় ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার কেশবচন্দ্র সেনের বাল্য-সহচর ও নিকট বন্ধু ; ধর্মজীবনের প্রধান অনুগত সঙ্গী। 'আশীষ' গ্রন্থটিকে তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনা বলা চলে, যদিও গতানুগতিক ভঙ্গীতে আত্মপরিচয় ও বংশ-পরিচয় দান করে জীবনের নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে বর্ণিত তথ্যপূর্ণ আত্মচরিত এটি নয়। বরং কেশবচন্দ্র সেনেব জীবনবেদ যে রীতিতে রচিত তারই অনুশীলন করেছেন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এই গ্রন্থটিতে। ১৯০৫ খ্রীঃ প্রতাপ মজুমদারের ৬৫ বৎসর জীবনেব অবসান ঘটে। রুগ্ন-অবস্থায় বোগশয্যায় প্রতাপচন্দ্র 'আশীষ' গ্রন্থটি রচনা করেন। গ্রন্থটি প্রতাপচন্দ্রের চিন্তাশীলতাব ও সমস্ত জীবনের মননচর্যার বিশেষ ফসল। পরিণত প্রজ্ঞা ও সুগভীর ঈশ্বরানুরক্তি 'আশীষ' গ্রন্থটিতে প্রকাশিত হয়েছে।

১৮৫৭ খ্রীঃ সতের বছর বয়সে প্রতাপচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। ১৮৬১ খ্রীঃ বেঙ্গল ব্যাংকের কাজ পরিত্যাগ করে ধর্মজীবনকে বরণ করে নেন। প্রাজ্ঞ প্রতাপচন্দ্রের জীবন কর্মচঞ্চল। প্রচারকের ব্রত গ্রহণ করে তিনি ভারতের পশ্চিম প্রদেশগুলি ও ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশে সারগর্ভ বক্তৃতায় নববিধান-ধর্মমত সম্প্রসারিত করার উদ্যোগ করেন। ১৮৯৩ খ্রীঃ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সিকাগো শহরে ধর্ম-মহা-সম্মেলনে যোগদান করে ভারতের গৌরব বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরেন।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে সিকাগো শহরের যে বিরাট আন্তর্জাতিক মেলা ও বিশ্বধর্ম-মহাসভার আয়োজন করা হয়, ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দেই তার সূচনা হয়। প্রতাপচন্দ্র মজুমদারকে এর উপদেষ্টা-পরিষদ্ ও নির্বাচন-সমিতির একজন সভ্য মনোনীত করা হয়। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ব্রাহ্মধর্মের প্রতিনিধিরূপে এই সভায় যোগদান করেন এবং চারদিনে চারটি ভাষণ দান করেন। প্রথম ভাষণে প্রতাপচন্দ্র মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন—"We are Hindus still and shall always be." তাঁর ভাষণে মুগ্ধ হয়ে আমেরিকার বিস্ময়াবিষ্ট পণ্ডিত-সমাজ প্রতাপচন্দ্রকে বোস্টন শহরের 'লাওয়েল ইনস্টিটিউট'-এ আরও কয়েকটি বক্তৃতা দেবার জন্য আমন্ত্রণ করেন। তাঁর বক্তৃতায় শুধু এশিয়ার গৌরব, হিন্দুর

মাহাত্ম্যই প্রকাশিত হয়নি, গভীর ঈশ্বরানুরাগ লিরিক সুর-মূর্ছনায় ধ্বনিত হয়ে উঠেছে ১

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রতাপচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' ছিলেন। বর্তমান কলিকাতা য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা প্রতাপচন্দ্র মজুমদার। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বুঝতে পেরেছিলেন যে, কেবলমাত্র স্কুল-কলেজের শিক্ষায় পূর্ণাঙ্গ মানুষ হওয়া যায় না। পূর্ণাঙ্গ মানুষ হতে গেলে শরীর ও চরিত্র গঠন একান্ত আবশ্যক। এই কারণেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল Society for the Higher Training of Youngmen। এই সমিতিটিই য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের বীজ।

প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের জীবন বহু গৌরবময় ঘটনাপূর্ণ। কিন্তু 'আশীষ' গ্রন্থে তাঁর ব্যক্তিজীবনের কর্ম-মুখরতা স্থান পায়নি; বরং গ্রন্থটিতে ঈশ্বরের প্রতি পরম কৃতজ্ঞ একটি চিত্তের নিবেদন ও প্রার্থনার ভাব ফুটে উঠেছে। লেখক আত্ম-আলোচনায় মগ্ন—অন্তর্মুখী তাঁর দৃষ্টি; বহির্ঘটনার কোলাহল তাঁর সমাহিত আত্মমগ্নতাকে ক্ষুণ্ণ করতে পারেনি। "কালের নিঃশব্দ গতি বহিয়া ক্রমে ক্রমে ৬৩ বৎসর শেষ করিলাম। কিন্তু আজও জীবনপথে শ্রান্ত কি নিরুৎসাহিত নই। এখনও সকল সাধ পূর্ণ হয় নাই, সকল কাজ শেষ হয় নাই; যেন এখনও কত আয়ু, কত উদ্যম, কত আশা, কত যৌবন দেহমনে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। ভগবদিচ্ছা কি কে জানে—কে জানে কবে, কত বিলম্বে, কি অবিলম্বে কালান্তধামে প্রবেশ করিব? তৎপূর্বে একবার জীবনদাতার নানা আশীর্বাদ স্মরণ করিব।"২

'আশীষ' গ্রন্থের প্রণেতা জীবনদাতার আশীর্বাদ স্মরণ করেছেন জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে। শৈশব-রহস্য, শ্রীকেশবচন্দ্র সেন, ঘরকন্না, ধর্মগ্রহণ ও

---

১. ২২শে সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বধর্ম-মহাসভায় প্রদত্ত বক্তৃতার অংশ: "The book of creation is in God's hand-writing—it is His language, nature is His revelation. The roar of the hurricane is a feeble echo of His eternal voice. The thunders of the sea breaking in fury over the immovable rocks are the faintest utterances of His might. The midnight firmament with its mighty arches of light, shows His vast bosom bending over the repose of the good & the bad alike."—The World's Religious Debt to Asia. ২. প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, আশীষ, পৃ. ১।

কাজকর্ম, আমেরিকার সহানুভূতি, সিকাগো নগরে মহামেলা, ব্রাহ্মসমাজের পূর্বাপর, ইনটারপ্রেটার পত্রিকা, ধর্মশাস্ত্র, কি লাভ হইল—ইত্যাদি প্রতিটি পরিচ্ছেদেই তিনি জীবনদাতার আশীষ লাভ করেছেন—"হে ভগবান্, আমার সুদীর্ঘ জীবন-সেতু তুমি যেসকল কৃপা-স্তম্ভের উপর রচনা করিলে তাহার কিছু লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়াস করিলাম, পারিলাম কি না জানি না।'[১]

গ্রন্থটির কোথাও কোথাও পিউরিটানদের মত লেখক নিজের স্বভাবকে বিশ্লেষণ করে ঈশ্বরের কাছে আত্মনিবেদন করে মার্জনা প্রার্থনা করেছেন—"ধর্মের দোহাই দিয়া যে নিজ ক্রোধ হিংসাকে চরিতার্থ করে সে কখন সাধক বলিয়া গণিত হইতে পারে না ; কিন্তু যে ব্যক্তি অন্তরাত্মাকে সাক্ষী করিয়া প্রতিদিন আপনার ক্রোধ কুভাবকে দমন করিতে প্রাণগত চেষ্টা করিতেছে, ভাল-মন্দ সকল লোকের প্রতি সদ্ভাব পোষণ করিতে চেষ্টা করিতেছে, সে যদি ধর্মের সংস্থাপনের জন্য, অধর্মের বিনাশের জন্য, জীবের ত্রাণের জন্য সময়ে সময়ে রুষ্ট হয়, তাহাতে তাহার ধর্মসিদ্ধি আরও সম্পূর্ণ হয়। বহু দিনাবধি আমি এই আদর্শের অনুরাগী হইয়াছি। ইহাতে নিজের লাভ-ক্ষতি গণনা করি নাই, লোকের হিত ইহাই অন্বেষণ করিয়াছি। মঙ্গলময় আমার সকল ত্রুটি মার্জনা করুন।"[২]

প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের ভাষায় সহজ সরলতা ও কাব্যময়তা লক্ষণীয়। লেখক সাধু গদ্যরীতি অবলম্বন করলেও ভাষার মধ্যে কথ্য গদ্যের মেজাজ ধরা পড়েছে—"তুমিই চিরদিন আমার গম্যধাম ও জীবনের উদ্দেশ্য, তুমিই কেবলমাত্র আমার আরাধ্য, প্রার্থনীয়, পরিত্রাতা।" (আশীষ, পৃষ্ঠা ২৩)। কিংবা—"সর্বপ্রথম ও সবপ্রধান আশীর্বাদ এই যে, হে জীবনসত্তা, জীবিতেশ, তুমি আমাকে এই মহার্ঘ মানব জীবন দিলে।" (ঐ, পৃঃ ১) বাঙলা আত্মচরিত-সাহিত্যে 'আশীষ' গ্রন্থটির বিশেষ মূল্য আছে।

গিরিশচন্দ্র সেনের 'আত্মজীবন' (১৩১৩) নানা তথ্যে পরিপূর্ণ। উনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের নানা ইতিহাস ও পূর্ববঙ্গে ব্রাহ্ম-আন্দোলনের নানা উল্লেখযোগ্য তথ্যমিশ্রিত এই গ্রন্থটি। "আমি স্বীয় জীবনে প্রেমময় বিধাতার জীবন্ত প্রেমের লীলা যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি জগতে স্বয়ং তাহার সাক্ষ্য দান করার উদ্দেশ্যে এই আত্মজীবন-পুস্তক লিখিলাম"—গ্রন্থের ভূমিকায় গিরিশচন্দ্র সেন গ্রন্থ-রচনার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন। নিজের

১. প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, আশীষ, পৃ. ১৩৭। ২. তদেব, পৃ. ১১২-১১৩।

বাল্যজীবন ও ছাত্রজীবনের পর কিভাবে জীবনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা ও পরীক্ষার মধ্য দিয়ে, কখনও বৈষয়িক চরমাবস্থার মধ্য দিয়ে তাঁর জীবন অগ্রসর হয়ে চলেছে সে বর্ণনা বিস্তারিত ভাবে এতে পাওয়া যায়। এছাড়া ৪২ বৎসর বয়সে লক্ষ্ণৌ নগরে আরব্যভাষার চর্চা ও কোরাণ অনুবাদ—সকল তথ্যই এই গ্রন্থে দিয়েছেন। 'কুচবিহার বিবাহ'-সংক্রান্ত বহু বিবরণ তিনি দিয়েছেন। শেষ অংশে তৎকালীন রাজনৈতিক আন্দোলন বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করেন। নানা তথ্যের পরিবেশনে ও বহু রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনার বিস্তারিত বিবরণে গ্রন্থটির একটি ঐতিহাসিক মূল্য স্বীকৃত হয়েছে।

কান্তিচন্দ্র মিত্রের আত্মজীবনীর নাম 'ভৃত্যের আত্মপরিচয়' (১৯১৭); নববিধান ব্রাহ্মসমাজে ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র আয়-ব্যয়ের হিসেব রাখতেন; নিজেকে ভক্তদের ভৃত্য মনে করে আত্মপরিচয় দান করেছেন। অত্যন্ত বিনয়পূর্ণ তাঁর মনোভাব—"কয়েকটি সর্বত্যাগী ঈশ্বরপ্রেমিক মহাত্মার সেবাতে আমার জীবন নিতান্ত লীলায়িত. তাঁহারা উচ্চ, আমি নীচ; তাঁহারা ধার্মিক, আমি অধার্মিক; তাঁহারা ধর্মের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন, আমি কেমন করিয়া তাঁহাদিগের নিকট স্থান পাইলাম? এমন পবিত্র ভালবাসায় কে আমাকে বাঁধিলেন?"[১]

ব্রাহ্মদের সাধারণ-সভায় কান্তিচন্দ্র মিত্রকে নিয়মিত আয়-ব্যয়ের হিসাব দাখিল করতে হত। তিনি অত্যন্ত বিনীত ভঙ্গীতে সে হিসাব দান করতেন—ঈশ্বর কিরূপে আশ্চর্যভাবে সামান্য উপায়ে এতগুলি পরিবারকে ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পালন করছেন বার্ষিক সভার সেই বিবরণটি (২০শে জানুয়ারি, ১৮৮০ খ্রীঃ / ব্রাহ্মদিগের সাধারণ সভা) উল্লেখ আছে তাঁর আত্মজীবনীতে।

বঙ্গচন্দ্র রায়ের 'আমার জীবনালেখ্য' (১৯১০) আত্মচরিত-শাখার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। বঙ্গচন্দ্র রায় ঢাকা নববিধান-সমাজের উপাচার্য ছিলেন। বাল্যজীবন থেকে বৃদ্ধাবস্থা পর্যন্ত ভগবানের প্রতি তিনি কিরূপ দৃঢ়-বিশ্বাসী ছিলেন এবং নিজ জীবনে ভগবানের প্রতি দৃষ্টি রেখে সংসারের যাবতীয় কার্য কিভাবে নির্বাহ করতেন—সেসবের বর্ণনা পাওয়া যাবে তাঁর আত্ম-জীবনীটিতে। "নানা গুরুতর বিষয়ের তত্ত্বালোক প্রাপ্ত হইয়া আমি এই সাক্ষ্যদান করিতে বাধ্য যে পরিত্রাতা ভগবান্ ২৪ বৎসর বয়স হইতে

১. কান্তিচন্দ্র মিত্র, ভৃত্যের আত্মপরিচয়, পৃ. ৪৩।

বর্তমান ৭০ বৎসর বয়স পর্যন্ত আমার অন্তরে তাঁহার প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস, নির্ভর এবং জীবনে তাঁহার ইচ্ছানুগত্য বিধানপূর্বক আমাকে তাঁহার নববিধানের ক্ষুদ্র সাক্ষী করিয়াছেন।"[১] এ ছাড়া পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্ম-আন্দোলনের ইতিহাসের তথ্যগত সন্ধান মিলবে এই গ্রন্থটিতে। তিনি ছিলেন পূর্ববঙ্গের 'কেশবচন্দ্র সেন'। ঈশ্বরের প্রতি সরল ও স্বাভাবিক বিশ্বাস রেখে কেশবচন্দ্রের অনুসরণে তিনি ধর্মজীবন শুরু করেন। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা শহরে যখন 'সঙ্গত' স্থাপিত হল, তখন অনেকে মনে করেছিলেন, তিনি ঢাকাতে কেশবচন্দ্রের স্থানটি দখল করতে চান। একদল যুবকের বিরুদ্ধ মতবাদ প্রচার সত্ত্বেও বঙ্গচন্দ্র রায় পূর্ববঙ্গের আচার্যপদে কার্যনির্বাহ-সভা কর্তৃক নিয়োজিত হন। তাঁহার প্রচারকার্যে পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্ম সহযোগী ছিলেন—ভাই ঈশানচন্দ্র, দুর্গানাথ, বৈকুণ্ঠনাথ, কৈলাসচন্দ্র, বিহারীলাল। পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক 'বঙ্গবন্ধু' পত্রিকাটি পরিচালিত হত। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকায় এক বিপরীতমুখী আন্দোলন উপস্থিত হয় ও বঙ্গচন্দ্র রায়কে বেদীচ্যুত করা হয়। পরে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে নববিধান ঘোষিত হওয়ার সময় কেশবচন্দ্র সেন তাঁকে পূর্ববঙ্গে নববিধানের প্রেরিত রূপে গ্রহণ করেন। ভ্রাতৃগণ কৈলাসচন্দ্র, ঈশানচন্দ্র, বৈকুণ্ঠনাথ, দুর্গানাথ, দীননাথ এবং চন্দ্রমোহন কর্মকারকে সহকারী রূপে গ্রহণ করে পূর্ববঙ্গে সুদৃঢ়ভাবে নববিধান-ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হল। তাঁর নিজের বড়ই ইচ্ছা ছিল যে শেষজীবন পর্যন্ত জীবনের যাবতীয় ঘটনাসমূহ এই জীবনালেখ্যে লিপিবদ্ধ করবেন। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে দৃষ্টিশক্তি হ্রাস হয়ে যাওয়াতে সেই ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি।

বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষের 'আমার জীবনকথা' (১৩৩০ সাল) ভগবানের কৃপাধন্য ভক্ত-জীবনেরই কথা। "মানুষের জীবন-ভূমি শ্রীহরির লীলাক্ষেত্র তাই জীবনের স্থূল ব্যাপারসকল লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।" (ভূমিকা, 'আমার জীবনকথা') পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ জেলায় তাঁর জন্ম এবং প্রধানতঃ পূর্ববঙ্গই তাঁর কর্মস্থল। তিনি বালবিধবা শ্রীমতী সুখদাকে বিয়ে করেন। এই বিধবা-বিবাহের ব্যাপারে নানা বিপরীত ঘটনার উদ্ভব হয়েছিল—বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষকে মৃত্যুভয় পর্যন্ত প্রদর্শন করা হয়েছিল। কিন্তু এই বিবাহ ছিল ইষ্টদেবতার ইচ্ছা এবং তাঁরই রুচি। বঙ্গবন্ধু পত্রিকা, ২১

---

১. বঙ্গচন্দ্র রায়, আমার জীবনালেখ্য, পৃ. ১২৯।

পৌষ, ১২৯৩ সন ) এই বিবাহকে অভ্যর্থিত করেছিল। "আমাদের পূর্ববঙ্গে নির্লিপ্ত সংসারী জীবনের একটি সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠিত হউক।"[১] গ্রন্থটির শেষাংশে লেখক খ্রীষ্টিয়ান সাধকদের মত করুণা প্রার্থনা ( ১৩৯ পৃ. ) ও অপরাধ স্বীকার ( ১৪০ পৃ. ) করেছেন। এবং সর্বশেষে 'আশার কথা' অংশে ( ১৪২ পৃ ) নববিধানই যে পৃথিবীতে প্রেমের রাজ্য, শান্তির রাজ্য, কুশলের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করবে সে সম্পর্কে সুগভীর আশা পোষণ করে গ্রন্থটির সমাপ্তি করেছেন। গ্রন্থটি গোষ্ঠীগত প্রয়োজনের উর্ধ্বে সার্বভৌমিক সাহিত্যিক আবেদন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি।

সুদক্ষিণা সেনের 'জীবনস্মৃতি' ( ১৩৩৯ ) ব্রাহ্মমহিলার দ্বারা লিখিত একমাত্র আত্মজীবনী। সুদক্ষিণা সেনের জন্ম বিক্রমপুরের সোহাগদল গ্রামে ব্রাহ্মণ পরিবারে। বিবাহসূত্রে তিনি অম্বিকাচরণ সেনের সহধর্মিণী। এই গ্রন্থটিতে উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রাহ্মদের সামাজিক স্বীকৃতি কেমন ছিল, গ্রামের কুসংস্কারের কুজ্মটিকাজাল ভেদ করে সুদক্ষিণা সেন কিভাবে ব্রাহ্ম-সমাজে যোগ দিলেন, সহজ সরল ভাষায় তার মনোজ্ঞ বিবরণ লেখিকা বিবৃত করেছেন। লেখিকা শৈশবে অনেক ব্রত পালন করতেন। সেই বিববণ দিতে গিয়ে লেখিকা অনেকগুলি ব্রতের মন্ত্রের ( ছড়া-জাতীয় ) উল্লেখ করেছেন। ছড়াগুলির ব্যাখ্যাও করেছেন মাঘমণ্ডল-ব্রত ও যমপুকুর-ব্রত পূর্ববঙ্গে বালিকাদের মধ্যে খুব জনপ্রিয় ব্রত।

"মাঘমণ্ডল ব্রতে সম্পূর্ণ মাঘমাসের প্রতি দিবস অতি প্রত্যুষে উঠিয়া পুষ্করিণীর ধারে উপবেশন করিয়া মন্ত্র পড়িতে হয়। পূর্বকার দিন বৈকালে একখানি কাষ্ঠখণ্ডের উপর একটি মৃত্তিকার স্তূপ করিয়া তাহাতে ফুল দিয়া সাজাইতে হয়। ঐ স্তূপের নাম 'লাল' অর্থাৎ সূর্য। ছয়-সাত হইতে নয়-দশ বৎসর বয়স্কা বালিকারা সূর্য উঠিবার পূর্বে দুরন্ত মাঘমাসের শীতে শয্যাত্যাগ করিয়া পুকুরধারে যাইয়া বসে এবং সূর্যদেবকে উঠিতে অনুরোধ করে। তাহারা সেই লালটি সঙ্গে করিয়া পুকুর-ধারে লইয়া যায় ও এইরূপ কয়েকটি মন্ত্র পড়িতে থাকে :

উঠ উঠ সূর্যঠাকুর ঝিকিমিকি দিয়া,
না উঠিতে পারি মোরা হিয়ণের লাগিয়া,
হিয়ণের পঞ্চবটি শিয়রে থুইয়া।

১. বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ, আমার জীবনকথা, পৃ. ১০৩

সূর্য উঠিবেন কোন্ খান দিয়া ?
ব্রাহ্মণ বাড়ীর ঘাটা দিয়া।
বামনদের মাইয়াটি বড় সেয়ানা,
পৈতা ধোয় বেহান বেহান,
পৈতার কচলানো পানি পুকুরেতে ভাসে ;
তাই দেখে নাইকানী, তুই আমার সই
মাঘমণ্ডলের ব্রত করতে ঘাট পাব কই ?

এই ব্রতের আরও একটি মন্ত্র এই—

মাঘমণ্ডল, সোনার কুণ্ডল,
সোনার কুণ্ডলে ঢাইলা নাড়ু,
শাঁখার আগে সোনার খাড়ু,
চন্দন কাঠে রাঁধি
জিরা তুষ ফেকি,
এ ঘর থেকে ও ঘরে যাই
মাটুর মুটুর গুয়া খাই।

এ সবই গ্রাম্য সৌভাগ্যের কথা। মেয়েরা এই ব্রতের ফলে শাঁখার আগায় সোনার বলয় পরিবে। শুধু সোনার বলয় পরাই তাহাদের একমাত্র অভিলাষ নহে, তাহারা শাঁখার আগায় 'স্বর্ণবলয় পরিতে চায়'। এই ব্রতের ফলে তাহারা এতই সৌভাগ্যবতী হইবে যে সেই রন্ধন তাহারা চন্দনকাষ্ঠ দ্বারা সম্পন্ন করিবে। সুপারী খাওয়াও সধবাদিগের একটি সৌভাগ্য, তজ্জন্য—:

এ ঘর থেকে ও ঘরে যাই,
মাটুর মুটুর গুয়া খাই।[১]

মাঘমণ্ডল-ব্রত, যমপুকুর ব্রত, ইত্যাদি ব্রতগুলির উদ্দেশ্য ও মন্ত্রগুলি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে সুদক্ষিণা সেনের সাহিত্যিক রসবোধ স্পষ্টতঃই ফুটে উঠেছে। শুধু তাই নয়, ব্রতের মন্ত্রগুলির সহজ ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে লেখিকা পাদটীকাতে কয়েকটি সাধারণের কাছে অপরিচিত শব্দের অর্থও দিয়েছেন। যেমন—হিয়ণ = হিম, মাইয়াটি = মেয়েটি, বেহান = প্রত্যূষ, নাইকানী = ন্যাকা।[২] পূর্ববাংলার আঞ্চলিক দেশজ ভাষার ছাপ রয়েছে এই ছড়াগুলির মধ্যে।

---

১. সুদক্ষিণা সেন, জীবনস্মৃতি, পৃ. ১৫-১৬। ২. তদেব, পৃ. ১৩।

লৌকিক ব্রতের মধ্যে যে গ্রামীণ জীবনের ছবি ও চিরন্তন মানবিক আকাঙ্ক্ষা ফুটে উঠেছে, লেখিকার দৃষ্টিতে সেটি এড়িয়ে যায়নি। তিনি মন্ত্রগুলি ব্যাখ্যা-কালে নারীর চিরকালীন কামনা লক্ষ্য করেছেন—কুমারী মেয়ে চায় ধন. সুখ, সৌভাগ্য, পতির প্রেম, স্বামীর সৌভাগ্য আর কোলে সন্তান। পূর্ববাংলার প্রচলিত এই ছড়াগুলির মধ্যে এই 'ধনং দেহি, রূপং দেহি, যশো দেহি'র চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা ফুটে উঠেছে—গভীরতর জীবনবোধের মধ্য দিয়ে লেখিকা তার বিশ্লেষণ করেছেন।

গ্রন্থটির মধ্যে লেখিকা কোথাও কৃত্রিমতার আশ্রয় করেননি, সমগ্র ঘটনাবলী বর্ণনার মধ্যে আছে সহজ সাবলীলতা ও দ্রুততা। ঘটনার পারম্পর্য রক্ষা করে পরিণতির দিকে লেখিকা অতি সহজ ভীঙ্গতে এগিয়ে গেছেন। 'জীবনস্মৃতি' স্মৃতি-চারণের ভঙ্গীতে লেখা—প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তে এসে লেখিকা অতীতচারণ করছেন। এই গ্রন্থে সুদক্ষিণা সেন নিজের জীবনের অনভিজ্ঞতার কয়েকটি মজার ঘটনা উল্লেখ করেছেন, ব্রাহ্মসমাজে আইসক্রীম খেতে দেখে তিনি মনে করেছিলেন ব্রাহ্মরা গোমাংস খাচ্ছে (পৃ. ৬৯); গভর্নমেণ্ট হাউসে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে একজন মেমসাহেবকে স্থির হয়ে বসে থাকতে দেখে মর্মর প্রতিমূর্তি বলে ভুল করেছিলেন—এই জাতীয় ঘটনার বর্ণনা 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থটিকে শুধু ঘটনার বিবৃতিমাত্র করে রাখেনি, রচনার স্বাদ বৃদ্ধি করেছে।

'কেশব-জননী সারদাসুন্দরী দেবীর আত্মকথা' (১৯১৩ খ্রীঃ; যোগেন্দ্রলাল খাস্তগীর সম্পাদনা করেন। গ্রন্থটি সারদা দেবীর স্বহস্তলিখিত নয়। তিনি লিখতে জানতেন না। যোগেন্দ্রলাল খাস্তগীর সারদাসুন্দরীর মুখে তাঁর জীবনবৃত্তান্ত শ্রবণ করেন। তাঁর সম্মুখে বসেই খাস্তগীর মহাশয় বৃত্তান্তগুলি লিপিবদ্ধ করেন। পরবর্তী কালে উক্ত নামে গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটি কেশবচন্দ্র ও তার পরিবারের ও সমকালীন বহু ঘটনার উপর আলোকপাত করেছে। এই গ্রন্থটি কেশবচন্দ্রের জীবনী ও নববিধান ব্রাহ্ম-সমাজের নির্ভরযোগ্য প্রামাণ্য ইতিহাস-রচনায় সাহায্য করে।

বাঙলা চরিত-সাহিত্যের ইতিহাসে এই জাতীয় চরিতকাব্য ও আত্ম-জীবনীগুলির বিশেষ স্থান রয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের সমসাময়িক ব্রাহ্মজীবনের চিত্র উদ্ঘাটন করে এ চিত্রগুলি। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে

কেশবচন্দ্র সেন-পরিচালিত ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেওয়ার পর ব্রাহ্ম আন্দোলন বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়েছিল। সর্বভারতীয় রূপ নিয়ে নানা সংস্কারপন্থী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হল। পরের যুগে কেশবচন্দ্রের ধর্মভাবে খ্রীষ্টীয় ভাব, বৈষ্ণবীয় ভক্তি, আবেগ ও সমন্বয়-ইচ্ছা নববিধান প্রতিষ্ঠিত করল; অপরদিকে ধীরে ধীরে জন্ম নিল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ —একটা বিরাট যুগের ঐতিহাসিক চিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে এঁদের রচিত জীবনী ও আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থে। শুধু তাই নয়, ব্রাহ্মসমাজের কি প্রচণ্ড শক্তি ও কেশবচন্দ্র সেনের কি বিপুল প্রভাবে শিক্ষিত-অশিক্ষিত-নির্বিশেষে অনেক গৃহী ও নব্যযুবক নিজেকে উৎসর্গীকৃত করেছে, ধর্মান্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছে, আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থাবলী-ধৃত সেসব বিবরণই এ যুগের পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অবশ্য এই জাতীয় গ্রন্থে নববিধান সমাজের গোষ্ঠী-চেতনা প্রকট হয়ে উঠেছে বলে হয়তো একালের পাঠকের কাছে বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারেনি। তবুও তাঁদের জীবনের কথা অবশ্যই বাঙলা চরিত-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত, কেননা তাঁরা এ যুগেরই বিশেষ লোক।

ইতিহাস, চিঠিপত্র ও ডায়েরী :

ব্রাহ্মসমাজের নেতৃবৃন্দ ও অন্যান্য ব্রাহ্মগণ দিনলিপি রাখতেন। নিজেদের বাসনা-কামনা ও পাপের পর্যালোচনা ও তজ্জন্য অনুশোচনা করে ডায়েরী রাখাকে অবশ্যকর্তব্য বলে মনে করতেন। কেশবচন্দ্র স্বয়ং ডায়েরী রাখতেন, যদিও তাঁর লিখিত ডায়েরীগুলি সবই ইংরেজী ভাষায় রচিত। কিন্তু বাঙলা ভাষায় 'প্রচারকগণের সভার নির্ধারণ' কিংবা অধিবেশন গ্রন্থে প্রতিদিনের সভার কার্য-বিবরণী লিপিবদ্ধ করা আছে। এই সময় থেকেই কেশবচন্দ্র সেনের প্রভাবে অন্যান্য প্রচারকগণও ডায়েরী রাখতে শুরু করেন। 'আমার চুয়ান্ন বৎসর অভিজ্ঞতায় ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কে দুই চারিটি কথা' ডায়েরী-জাতীয় রচনায় বিহারীলাল সেন আপন জীবনের কয়েক বৎসরের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। উমানাথ গুপ্তের 'সাক্ষী' গ্রন্থে কেশবচন্দ্রের প্রকৃত ছবি উদ্ঘাটিত হয়েছে বলে লেখক মনে করেছেন। নববিধান সমাজের প্রচারক সংগীতজ্ঞ ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস বর্ণনা করে লিখলেন, "ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত'—প্রথম প্রকাশ ১৭৯৩ শকাব্দ। আলোচ্য পুস্তকে

১৭৫১ শকাব্দ থেকে ১৭৯২ শকাব্দে ১০ই মাঘ পর্যন্ত প্রায় ৪১ বছরের ব্রাহ্ম-সমাজের বিশেষতঃ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস বিবৃত হয়েছে। বাঙলা ভাষায় রচিত এটিই সর্বপ্রথম ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন ইংরেজী ভাষায়—Faith and Progress of the Brahmo Samaj'. ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস রচনায় গ্রন্থটির মূল্য অসাধারণ; তবে আমাদের বর্তমান আলোচনার বহির্ভূত। এ ছাড়া বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর 'আমার জীবনে ব্রাহ্মসমাজের পরীক্ষিত বিষয়', ভাই বিহারীলাল সেনের 'জীবনে ব্রহ্মকৃপা স্বীকার', শ্রীনাথচন্দ্রের 'ব্রাহ্মসমাজে চল্লিশ বছর' ও অধ্যাপক দেবেন্দ্রনাথ সেনের 'যা দেখেছি ও শুনেছি তার কিছু' ইত্যাদি গ্রন্থে ব্রাহ্ম-সমাজ, বিশেষতঃ নববিধান ব্রাহ্মসমাজের ধারাবাহিক ইতিহাস না পাওয়া গেলেও অনেক ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান মিলবে। প্রত্যেক লেখকের আপন আপন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্রাহ্মসমাজের ঘটনাবলী ও ব্যক্তি-জীবনে সেই সব ঘটনাবলীর প্রভাব আলোচিত হয়েছে বলে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কে যে-কোন পাঠকের একটি পূর্ণাঙ্গ ও নিরপেক্ষ ধারণা গড়ে তুলতে গ্রন্থগুলি সাহায্য করে।

ব্রাহ্ম প্রচারকগণের লেখা চিঠিপত্রগুলি এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কেশবচন্দ্র সেনের চিঠিপত্রগুলির উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যান্য প্রচারকগণের চিঠিপত্রের মধ্যে সাধু অঘোরনাথের চিঠিপত্র, ভাই প্রমথলাল সেনের 'নালুদার চিঠি' নববিধান-সাহিত্যের উৎকৃষ্ট সংযোজন। চিরঞ্জীব শর্মা-রচিত সাধু অঘোরনাথের জীবনচরিতের শেষাংশে সাধু অঘোরনাথ-লিখিত কয়েকটি পত্র প্রকাশিত হয়েছে। বালেশ্বর, মুঙ্গের, এলাহাবাদ, লাহোর, কুষ্টিয়া, নওগাঁ, ভাগলপুর,' গাজিপুর ইত্যাদি স্থান থেকে পত্রগুলি লিখিত। সময় ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। 'মুঙ্গেরী' ভাব ও ভক্তি নিয়ে ব্রাহ্মসমাজে যে বিরোধ ও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছিল তার আভাস এই পত্রগুলির মধ্যে আছে। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের ভাঙনের ইতিহাস-সৃষ্টিতে এই পত্রগুলি মূল্যবান্। একটি পত্রে অঘোরনাথ বলছেন,—"বিশেষতঃ মুঙ্গেরের অবস্থা এখন বড় দোলায়মান। এতদিন মুঙ্গেরের অনুকূল অবস্থা ছিল, কিন্তু আর সে দিন থাকিতে পারে না। বাহিরের ভক্তি, প্রেম, উৎসাহ ও ক্রন্দন কতদিন থাকিতে পারে? সময় সময় ভ্রাতাদের পদাঘাতে মুঙ্গেরের দুর্বল বক্ষঃস্থল ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হইতেছে ও হইবে।...মস্তকে

সহস্র বিপদের ভার আসিয়া পড়িবে, যেসকল বিপদ ব্রাহ্মদের মধ্যে কখন আগে নাই তাহাই আসিবে।" (মুঙ্গের, ৪ ফাল্গুন, ১৮৬৯)।

'নালুদার চিঠি' (চার খণ্ড)—নববিধানের একনিষ্ঠ সাধক, সকলের শ্রদ্ধেয় ও প্রিয়তম সহজ মানুষ সাধু প্রমথলাল সেন তাঁর জীবনে ছোট বড় যেসকল সুন্দর চিঠি লিখেছিলেন তারই সংকলন। তাঁর চিঠিগুলির মধ্যে তাঁর জীবনে পরীক্ষিত সত্যের কথাই বলেছেন। নববিধানেব এই সজ্জন মানুষটি সহজ ভাষায় গৃহ, পরিবার, উৎসব, পরলোক, মণ্ডলী, কেশবচন্দ্র সেনের পরিচয় ও তাঁকে গ্রহণ—এইসব বিষয়ে বহু চিঠি লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও তাঁব বহু পত্রবিনিময় হয়। প্রমথলাল সেন মোহিতচন্দ্র সেনকে লেখা একটি পত্রে উদীয়মান কবি রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর লিখিত চিঠিপত্রে সহজ মানুষটি আন্তরিকভাবে ধরা পড়েছে। চিঠির মূল্য বাগ্‌বিস্তারে নয়, পাণ্ডিত্যে নয়, আড়ম্বরপূর্ণ ও আভরণ-মণ্ডিত সৌন্দর্য সৃষ্টিতে নয়, দুইটি মানবাত্মার পরস্পবেব হৃদয়ের সংযোগ সাধনে। নালুদার সব চিঠিতেই এই অন্তরঙ্গ সুরটি বেজে উঠেছে। শ্রীমতী সুনীতি ঘোষকে লিখিত একটি পত্রে প্রমথলাল সেন লিখছেন—"তোমার চিঠি কাল পাই। ওখানে গিয়ে খুব বেড়াতে পাবে ভেবে যে আনন্দ তোমার হয়েছে, সে আনন্দের ফল দেখতে চাই। যখন শুনব, শরীর-মন সুস্থ হয়েছে, তখন বুঝব, আনন্দ সফল হয়েছে। তাতেই কি সন্তুষ্ট হব? শরীর-মন সবল হয়েছে শুনলে আরও আনন্দ হবে। তা হলেই কি হবে? যতক্ষণ না শুনি, "দেহ মনে ভাই দুজনে মেতেছে নাম কীর্তনে, ততক্ষণ আনন্দ পূর্ণ হবে না।"[১]

এই চিঠিতে তথ্যের ভার নেই, পাণ্ডিত্যের বিশ্লেষণ নেই, আছে সহজমনের আনন্দরস। রবীন্দ্রনাথ একদা বলেছিলেন, "যাঁরা ভাল চিঠি লেখেন তাঁরা যেন মনের জানালার ধারে বসে আপনমনে আলাপ করেন—কোন ভার নেই, বেগও নেই, আছে স্রোত।" ভারহীন সহজের রসই হচ্ছে চিঠির রস। এই গুণগুলি সাধারণ পত্রকে পত্র-সাহিত্যের মর্যাদায় ভূষিত করে। নালুদার চিঠি এই পর্যায়ে নিঃসন্দেহে। সারাজীবন নববিধানধর্মের একনিষ্ঠ সাধক, প্রচারক—ধর্ম-আলোচনা ও কৃচ্ছ্রসাধনা যাঁর জীবনের ব্রত ছিল, তিনি চিঠিপত্রে কত সহজ মানুষ হয়ে ধরা দিয়েছেন! তত্ত্ব-আলোচনাও কত সহজ হয়ে উঠেছে তাঁর চলতি গদ্যের অন্তরঙ্গ ভাষায়।

১. প্রমথলাল সেন, নালুদার চিঠি, পৃ. ১৩৫, ২য় খণ্ড।

শ্রীমণিকা মহলানবিশকে লিখিত একটি পত্রে রয়েছে—"আজ এখানে যাবার সময়ে হঠাৎ পায়েস দেখে সকলেই জিগ্‌গেস কত্তে লাগলেন আজ কি কারু জন্মদিন? আমিও জানতাম না পায়েস কেন? তবে মনে হল, আজ তো আমাদের সুনুর জন্মদিন (দীক্ষা), তাই নয় কি? অন্য জন্মে কাজ কি? কাল তোমার চিঠির জবাবে যে কথা লিখেছি, তার ভেতর নতুন জন্মের কথা ছিল; আজ আবার তোমার চিঠি পড়লাম, 'নেয়ে খেয়ে স্বর্গে যাব'—এই স্বর্গই ত প্রকৃত স্বর্গ—স্বর্গীয় ভাবে নাওয়া, স্বর্গীয় ভাবে খাওয়া, তার বেশী স্বর্গের জননীর কাছে কি চাইতে পারি? সেই নাওয়া, সেই খাওয়া সকলের ভাগ্যে ঘটবে এই কথাই নিজে শিখে সকলকে বলতে হবে, এই ত নববিধান। এই নববিধানের দীক্ষা রোজ রোজ নিলে আর কিছু কত্তে হবে না--তোমার এই দীক্ষা রোজ রোজ হোক।"[১]

নালুদার চিঠিগুলির মধ্যে খোলা মনের পরিচয় আছে। তাঁর জীবনের বহু ঘটনা ও তাঁর সমসাময়িক কালের বহু নরনারীর ব্যক্তিগত জীবনের নানা চিত্রে চিঠিগুলি সমৃদ্ধ। পত্র-রচনা সম্পর্কে প্রমথলাল সেন সবিশেষ অবহিত ছিলেন। তাঁর মতে, "যাদের চিঠির ভেতর খোলা ভাব আছে তাদের চিঠি পড়তে ইচ্ছে হয়, তাদের চিঠি লিখতে ইচ্ছে হয়, সমুদ্রের হাওয়া খেলে, ইঁদেরার জল খেলে যে উপকার হয়, সরল ভাবে যারা চিঠি লেখে তাঁদের চিঠি পড়ে খানিকটা সেই রকম উপকার হয় না কি?"[২]

এই কারণেই নালুদার পত্রাবলী ব্যক্তি-সত্তার স্পর্শে উজ্জ্বল, অন্তরের রসে ও রঙে সঞ্জীবিত। পত্র-সাহিত্য-রচয়িতা হিসেবে কীট্‌স, ওয়ালপোল, লুকাশ, বার্ণাড শ অসীম কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। বাঙলা পত্রসাহিত্যও সবিশেষ সমৃদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ একাই বাঙলা পত্রসাহিত্যে ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধি দান করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলী ও শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী পত্রসাহিত্যের অন্তর্গত হবার যোগ্য। কেশবচন্দ্রের পত্রাবলী ও নববিধানগোষ্ঠীর ভক্ত সাধক সাধু প্রমথলাল সেনের পত্রাবলী বাঙলা পত্রসাহিত্যে বিশেষ সমৃদ্ধি ও পুষ্টি এনেছে। ভারহীন সহজের রস সৃষ্টি করাই যদি পত্রের উদ্দেশ্য হয়, তবে কেশবচন্দ্র সেনের পত্রাবলী ও প্রমথলাল সেনের পত্রাবলী বাঙলা সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হবার যোগ্যতা রাখে।

---

১. প্রমথলাল সেন, নালুদার চিঠি পৃ. ১৩৪. ১৩৫। ২. তদেব, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ১৮৬।

ধর্ম ও উপদেশ :

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র সেন 'নববিধান' ঘোষণা করলেন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের নববিধান সমাজের প্রচারকসভার নাম রাখলেন 'প্রেরিত দরবার'। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত, গৌরগোবিন্দ রায়, ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, গিরিশচন্দ্র সেন এঁরা প্রত্যেকেই এই দরবারের সভ্য বলে পরিগণিত হন। এঁরা সাধারণ ধর্মপ্রচারক নন—ঈশ্বর-প্রেরিত প্রচারক বলে গণ্য হন। ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে কেবলমাত্র বাংলাদেশে নয়, ভারতবর্ষের নানা স্থানে ব্রাহ্মপ্রচারকগণ ঘুরে বেড়িয়েছেন ; এ কারণে বহু বক্তৃতা, উপদেশ ও ধর্ম-আলোচনা এই প্রেরিত প্রচারকগণকে করতে হয়েছে। এছাড়া কেশবচন্দ্র 'সমন্বয়-ধর্ম' প্রচারের জন্য এই প্রেরিত প্রচারকগণকে এক-একটি বিশেষ ধর্মের আলোচনা ও সাধনায় নিয়োগ করেছিলেন। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার খ্রীষ্টান ধর্ম, গৌরগোবিন্দ রায় হিন্দু শাস্ত্র, সাধু অঘোরনাথ বৌদ্ধ শাস্ত্র ও গিরিশচন্দ্র সেন মুসলমান শাস্ত্র, মহেন্দ্রনাথ বসু শিখ ধর্ম অধ্যয়ন ও সাধনায় নিযুক্ত ছিলেন। উক্ত প্রচারকগণ সমস্ত জীবন নববিধান সাধনার সঙ্গে সঙ্গে উল্লিখিত বিশেষ ধর্মশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করে বহু ধর্মীয় গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আর্যজাগৃতির ক্ষণে নববিধান ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোগে এই ধরনের সর্বশাস্ত্র অধ্যয়ন ও আলোচনা বাঙলা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল ছিল ধর্মকলহের যুগ- খ্রীষ্ট, পুরাতন হিন্দুধর্ম আর নিরীশ্বরবাদীদের ত্রিমুখী ধর্মযুদ্ধে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশক কেটে যায়। এই শতকের শেষে সমস্ত ধর্মবিরোধিতা ঘুচিয়ে নববিধান যখন তার সমন্বয়ের আদর্শ ঘোষণা করল. তখনই উদার আগ্রহ নিয়ে অন্যান্য ধর্ম আলোচনায় হিন্দু ব্রাহ্ম পণ্ডিতগণ নিযুক্ত হলেন।

কেশবচন্দ্র প্রেরিতগণকে এই মর্মে উপদেশ দিয়েছিলেন—"সকল ধর্মশাস্ত্র ও সকল ধর্মসম্প্রদায়ের সমন্বয় হইয়া উদারভাব প্রদর্শিত হইবে। কোন বিশেষ সম্প্রদায় আর থাকিবে না। ঈশা, মূসা প্রভৃতি তোমাদের উপর নির্ভর করিয়া আছেন। সকলকে সম্মানিত করিবার জন্য তোমরা নববিধান কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াছ। ক্ষুদ্র সংকীর্ণ ভাব ত্যাগ কর। উদার হইয়া উদার ধর্ম পরিপোষণ কর। উদার ধর্মেতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইবার অভিলাষ কর।...এক এক ভিন্ন ভাবের প্রতিনিধি এক এক জন

বিশেষভাবে চিহ্নিত হউন। এক এক জন এক এক ধর্মের সমস্ত ভাব গ্রহণ ও বিতরণের ভারগ্রস্ত হউন। দেখাইতে হইবে, আমাদের বাড়ীতে সমস্ত দেবদেবীরই আদর, সমস্ত মিলিয়া একটি দেহ, এক এক প্রেরিত দ্বারা এক একটি অঙ্গের পূর্ণতা হইল, সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মিলনে নববিধানে পূর্ণধর্ম প্রকাশিত। এই প্রকার উদারতাকে আহ্বান করিতেছি।"[১]

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার খ্রীষ্টধর্মের চর্চা করেছিলেন এবং তারই ফলস্বরূপ জগৎ-বিখ্যাত গ্রন্থ Oriental Christ—গ্রন্থখানি প্রকাশিত করেন। The Spirit of God, Heart Beats, The Silent Pastor—ইত্যাদি গ্রন্থগুলি ইংরাজী ভাষায় রচিত। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে জ্ঞানানুসন্ধিৎসার সঙ্গে ঈশ্বরানুরাগ মিশ্রিত হয়েছে। উপদেশমূলক ও ধর্মমূলক আলোচনা করে তিনি বাঙলা ভাষায় রচনা করেছেন, 'স্ত্রীচরিত্র' (১৮১২ শক), অখণ্ড জীবন ও চার খণ্ডে সমাপ্ত উপদেশাবলী সংগৃহীত হয়েছে 'উপদেশ' নামক গ্রন্থে। 'স্ত্রীচরিত্র' গ্রন্থখানি নারীদের চরিত্র-সংগঠন বিষয়ে উপদেশ। শুধু নীরস কতকগুলি উপদেশের সমষ্টিমাত্র নয়, উপদেশগুলিকে আকর্ষণীয় করার জন্য আছে কতকগুলি আদর্শ নারীর কাহিনী। স্ত্রীজাতিকে সুশিক্ষিত করবার জন্য তিনি ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে কয়েকটি আদর্শ রমণীর দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন। শিক্ষার উন্নত আদর্শের জন্য প্রতাপচন্দ্র মজুমদার চিরকাল চেষ্টা করে গেছেন। চরিত্রগঠন শিক্ষার প্রধান অঙ্গ। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-সদস্য নির্বাচিত হন। ১৮৯১ খ্রীঃ যুবকদের নৈতিক উন্নতির জন্য Society for the Higher Training of Youngmen নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। (পরবর্তী কালে এটিই Calcutta University Institute-এ পরিণত হয়)। তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক ছিলেন। তৎকালীন যুবকদের নির্দোষ আমোদ-প্রমোদ ও উন্নত নৈতিক মানের প্রতি তাঁর প্রখর দৃষ্টি ছিল। যুবকদের নৈতিক চরিত্রের প্রতি লক্ষ্য রেখে 'Aids to Moral Character' নামে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। "তন্মধ্যে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই পক্ষে উপযোগী মনে করি। কিন্তু বামাচরিত্র-সঙ্গত কতকগুলি বিশেষ কথা আছে, তজ্জন্য কিছু স্বতন্ত্র প্রসঙ্গ আবশ্যক। বিশেষতঃ উল্লিখিত গ্রন্থ ইংরাজী

১. কেশবচন্দ্র সেন, প্রেরিতদিগের প্রতি সেবকের নিবেদন, ১লা বৈশাখ, ১৮৮০ খ্রীঃ।

ভাষায় রচিত, তাহা সাধারণ পাঠিকাদিগের বোধগম্য হইবে এইরূপ মনে করি না। অথচ চরিত্র-বিষয়ক সকল কথা নিতান্ত সহজে বোধগম্য হওয়া উচিত। এ সমস্ত ভাবিয়া এই বর্তমান পুস্তিকা প্রকাশে প্রবৃত্ত হইলাম।"[১]

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা থেকেই এই গ্রন্থটির উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু অনুধাবন করা যায়। স্ত্রীচরিত্র অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। তিনটি সংস্করণ হয়; প্রথম সংস্করণ খুব তাড়াতাড়ি নিঃশেষিত হয়। প্রথম সংস্করণ 'স্ত্রীচবিত্র সংগঠন' নামে ১৮১২ শকে (১৮৯১ খ্রীঃ) প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে স্ত্রীচরিত্র নামে বর্ধিতাকারে প্রকাশিত হয়। জনপ্রিয়তা সাহিত্য-বিচারের মানদণ্ড নয় সত্য, তথাপি গ্রন্থটিতে স্বদেশী ও বিদেশী নারীদের কাহিনী অবলম্বনে আদর্শ নারীচরিত্রের পূর্ণ আলেখ্য অঙ্কিত হয়েছে। মোব ও তাঁহাব কন্যা, মণিকাচরিত্র, পণ্ডিতা রমাবাই, কুমারী তরু দত্ত, তপস্বিনী রাবেয়', দ্রৌপদী, কারাবাসিনী এলিজাবেথ ফ্রাই, ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল, সাধ্বী অঘোরকামিনী প্রভৃতি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মহীয়সী নারীদেব উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত লেখক সহজ ভাষায় বর্ণনা কবেছেন। তাছাড়া নারীদের বিবিধ বিষয়ে তিনি উপদেশ দান করেছেন। শুধু দৈনিক পূজা-অর্চনা নিয়েই নারীরা থাকবে না—"গৃহে তাঁর কর্তব্য অনেক। সুজননী সুসন্তান গড়ে তোলে; সন্তানের প্রতি সমগ্র কর্তব্য পালন করিতে গেলে বহু চেষ্টা স্বীকাব করিতে হয়; জ্ঞান, বুদ্ধি, নীতি, ধর্মের বিশেষরূপ অনুশীলন করিতে হয়।"[২] কুমাতা কুসন্তান প্রসব করে; লেখক নরাধম নিরো ও তার জননী এগ্রিপিনার দৃষ্টান্ত দিয়ে বক্তব্যকে সরল করেছেন। নারীকে তিনি আধ্যাত্মিক মার্গে উন্নীত করার উপদেশ দেননি, বরং বাস্তবজীবনে সংসার-পথে চলবার উপযুক্ত নীতি শিক্ষা দিয়েছেন। মেজাজ, ভদ্রতা, সামাজিকতা, সুরুচি, আমোদ ও হাস্য, অবকাশ, দানশীলতা, দাসদাসী, সাধুভক্তি, পরনিন্দা, পরসেবা ইত্যাদি অংশের উপদেশামৃত স্ত্রীজাতির চরিত্রগঠনে সহায়ক হবে। সংসারজীবনকে রুচিশীল ও কৃষ্টিসম্পন্ন করে তুলবে।

লেখকের এই গ্রন্থটি বাঙলা ভাষায় তাঁর প্রথম রচনা। প্রথম প্রচেষ্টা হলেও ভাষায় সহজ সরলতা ও সাবলীল গতিটিতে বাঙলা গদ্যের প্রাণ-স্পন্দনটুকু ধ্বনিত হয়েছে। "যেমন ছবি দেখিয়া ছবি চিত্রিত করিতে হয়,

১. প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, স্ত্রীচরিত্র, সূচনা, প্রথম সংস্করণ। ২. তদেব, পৃ ১২৩।

লেখ্যলিপি দেখিয়া হস্তাক্ষর অভ্যাস করিতে হয়, তেমনি উচ্চ চরিত্রের লোক দেখিয়া নিজের চরিত্রের রক্ষণা করিতে হয়।"[১] কিংবা "ঘরে বদ্ধ থাকিলেই শীলতা শিক্ষা করা যায় না। অবরোধের বাহির হইলেই স্বাধীনতা শিক্ষা হয় না, নিত্য বেশভূষার নূতন ব্যবস্থাতে সভ্যতার বৃদ্ধি হয় না, এবং তেল-কানী জড়িত জীর্ণ বস্ত্রেও স্বভাবের কোন উন্নতি দৃষ্ট হয় না। উন্নতি, মহত্ত্ব, স্বাধীনতা, ভদ্রতা কেবল চরিত্রের গুণে।"[২]

সাধু অঘোরনাথের ধর্ম-সম্পর্কিত পুস্তকগুলি হচ্ছে—প্রত্যাদেশ অন্তরে, ব্রাহ্মধর্ম-প্রতিপাদক শ্লোকসংগ্রহ, সত্যধর্ম অন্তরে, ধর্মসোপান ও উপদেশাবলী। অঘোরনাথ গুপ্ত শান্তিপুরে ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সাহায্যে তিনি ব্রাহ্ম-সমাজে যোগদান করেন। অঘোরনাথ অগ্নিমন্ত্রের সাধক, যোগী। 'ব্রহ্ম-গীতোপনিষদের অধিকাংশ যোগের উপদেশ অঘোরনাথকে উদ্দেশ্য করে কেশবচন্দ্র সেন প্রদান করেছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্য তাঁকে সমস্ত উত্তরভারত ও পূর্ববাংলায় ঘুরতে হয়। এই উপলক্ষে অনেক উপদেশ ও ধর্মালোচনা তাঁকে করতে হয়। তাঁর 'ধর্মসোপান' (১২৭৭ বঙ্গাব্দ) গ্রন্থে ময়মনসিংহে অবস্থানকালে সভা-সমাবেশে যে সব প্রার্থনা করেছিলেন এবং উপদেশ ও বক্তৃতা দিয়েছিলেন, সেসব সংকলিত হয়েছে। 'উপদেশাবলী' গ্রন্থে (১৯২০ খ্রীঃ) অঘোরনাথের উপদেশের সঙ্গে সঙ্গে চিরঞ্জীব শর্মা, গৌরগোবিন্দ রায়, উমানাথ গুপ্ত ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কয়েকটি উপদেশও সংকলিত হয়েছে।

'ব্রাহ্মধর্ম-প্রতিপাদক শ্লোকসংগ্রহ' (১৭৮৮ শকাব্দ) গ্রন্থটিতে বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি ও তার অনুবাদ সংকলিত হয়েছে। গ্রন্থটি পাঁচ অধ্যায়ে বিভক্ত—হিন্দুশাস্ত্র, ইহুদীশাস্ত্র, খ্রীষ্টধর্ম, কোরাণ, আবেস্তা ইত্যাদি ধর্ম ও শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি সংকলন করা হয়েছে। এই গ্রন্থে অঘোরনাথ উপনিষদ্ ও মহাভারতের ৭৭টি শ্লোকের বঙ্গানুবাদ করেন। সংকলন ও অনুবাদের কাজে অঘোরনাথের প্রধান সহকারীরূপে ছিলেন উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়।[৩] শ্লোক-সংগ্রহ গ্রন্থের শীর্ষদেশের শ্লোকটি "সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্"—ইত্যাদি গৌরগোবিন্দ রায় রচনা করেন।

গৌরগোবিন্দ রায়ের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও মনীষা ছিল। বাংলা ও

১. প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, স্ত্রীচরিত্র, পৃ. ১। ২. তদেব, পৃ. ২। ৩. দেবজ্যোতি দাশ ও সতীকুমার চট্টোপাধ্যায়, কেশব-সহচারী অঘোরনাথ গুপ্ত, ইতিহাস পত্রিকা, ৪র্থ সংখ্যা, পৃ. ৩২৭।

ও সংস্কৃত ভাষায় বহু ধর্মমূলক গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন। তিনি প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের সমসাময়িক ছিলেন। (জন্ম ১৮৪০ খ্রীঃ, পাবনা) গৌরগোবিন্দ রায় কেশবচন্দ্রের নির্দেশে হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। দিনরাত্রি অক্লান্ত অধ্যবসায়ে তিনি অল্প সময়ের মধ্যে বেদ, উপনিষদ্ ও পুরাণ পাঠান্তে সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থ রচনায় অগ্রসর হলেন। তাঁর অধিকাংশ গ্রন্থ সংস্কৃতে রচিত। আবার কতকগুলি সংস্কৃত ও বাঙলা উভয় ভাষাতেই প্রকাশিত হয়েছে। (১) সমন্বয়-ভাষ্যমালা (তিন খণ্ড: বাঙলায় প্রকাশিত হয় ১৯০০ খ্রীঃ)। (২) শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম (১৮৮৯)। (৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও তাঁহার স্বভাবনিষ্ঠ যোগ (১৯১০)। (৪) ধর্মতত্ত্ব (২ খণ্ড: প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯১১; দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৩৬)। (৫) বৌদ্ধধর্ম-প্রসঙ্গ (১৯৬০) তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা।

গৌরগোবিন্দের সংস্কৃত ভাষায় অসাধারণ দখল ছিল। মাতৃভাষার মত সংস্কৃত ভাষাতেই তাঁর পুস্তকগুলি লেখা। এমন কি তিনি যে আত্মচরিত লিখেছেন, তাও সংস্কৃত ভাষায়। কন্নড়ি ভাষাতেও তিনি বিশেষ দক্ষতা দেখান। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্রচারযাত্রায় তিনি প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ করেন। এবং তাঁর কন্নড়ি ভাষা শিখবার সুযোগ হয়। কন্নড়ি ভাষায় তিনি নববিধানের মহৎ উদ্দেশ্য বিবৃত করেছেন।

'সমন্বয়-ভাষ্যমালা' উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়ের প্রধান কীর্তি। এই সিরিজের প্রথম গ্রন্থ 'শ্রীমদ্ভগবদগীতা-সমন্বয়ভাষ্য' (সংস্কৃতে ১৮৯৮), বাঙলাতে ১৯০০ খ্রীঃ। গীতার পূর্বজ ভাষ্যকারীদের চিন্তা ও উপলব্ধির সমন্বয় করে এক অখণ্ডতা দান করেছেন। এই সিরিজের দ্বিতীয় ও তৃতীয় গ্রন্থ যথাক্রমে— শ্রীমদ্‌গীতা-প্রপূর্তি ও বেদান্ত-সমন্বয়-ভাষ্য। এই গ্রন্থ দুটির বাঙলা অনুবাদ সম্পন্ন করেন ভাই মহিমচন্দ্র সেন। 'গীতাপ্রপূর্তি' 'গীতা' ও 'ভাগবতে'র সমন্বয়। তৃতীয় গ্রন্থটিতেও সমন্বয়—ব্রহ্মতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, প্রকৃতিতত্ত্ব, সাধনতত্ত্বকে বেদান্তসূত্রের আলোকে সমন্বয় করেন। প্রকৃতপক্ষে এই বিশালাকার গ্রন্থটি নববিধান-ধর্মের সমন্বয়ের আদর্শেই রচিত। হিন্দুশাস্ত্রে লেখকের অপরিমিত জ্ঞান ও বিশ্লেষণী প্রতিভার পরিচয় আছে এই গ্রন্থগুলিতে। 'শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম' (১৮৮৯) ও 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও তাঁহার স্বভাবনিষ্ঠ যোগ' (১৯১০) গ্রন্থ দুটিতেও সমন্বয়ের চেষ্টা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণ-চরিত্রের নব ব্যাখ্যা দান করেছেন, তার পূর্বেই গৌরগোবিন্দ রায় কৃষ্ণচরিত্র

উদ্ধারে ব্রতী হয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র গৌরগোবিন্দ রায়ের 'কৃষ্ণচরিত্র' সম্পর্কে বলেছেন, "গৌরবাবু একজন সুপণ্ডিত লোক, শাস্ত্রাদির প্রতি তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা আছে। কৃষ্ণচরিত্র যেমন ঘটনাপূর্ণ হইয়াছে, তেমন যুক্তি দ্বারা তিনি সেই সমস্ত ঘটনাবলীর বাস্তবিকতা ও শাস্ত্রোদ্ধৃত বাক্যের মৌলিকতা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন নাই।"[১]

'ধর্মতত্ত্ব' ( ১৯১১-১৯৩৬ খ্রীঃ )—বিবেক ও বুদ্ধির কথোপকথন দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। বৌদ্ধ ধর্ম-সম্পর্কিত আলোচনা 'বৌদ্ধ ধর্মপ্রসঙ্গ' ( ১৯৬০ খ্রীঃ ) এই গ্রন্থ-দুটির প্রবন্ধগুলি আগে ধর্মতত্ত্ব পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এ ছাড়া ধর্মতত্ত্বে প্রকাশিত আরও কয়েকটি বাঙলা প্রবন্ধ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। (১) প্রাণ ও মন ( ১৮২৯ শকাব্দ ) ; (২) স্বরূপের প্রভাব ( ১৮২০ ) ; (৩) কেশবচন্দ্রের সামাজিক ব্যবস্থান ( ১৯৫৯ ) ; (৪) উপাসনা-প্রণালী ( ১৮১৮ শকাব্দ ) ; (৫) উৎসবান্তে বিবরণ ( ১৯৬৪ ) ইত্যাদি।

গৌরগোবিন্দ রায় ব্রহ্মানন্দের জন্মোৎসবে প্রতি বছরই বক্তৃতা দিতেন। তাঁর উপাসনা, উপদেশ ও বক্তৃতা অনর্গল খরধারা স্রোতস্বিনীর ন্যায় প্রবাহিত হত। বিষয়বস্তুর গভীরতা ও বাণীভঙ্গিমার মাধুর্যে তাঁর বাঙলাভাষা সকলের হৃদয়কে আকর্ষণ করত। অথচ তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির ভাষা ছিল সংস্কৃত-ঘেঁষা—সংস্কৃতবহুল ভাষার সাধুরীতির প্রয়োগে শাস্ত্রের জটিলতা ও গাম্ভীর্য অটুট রয়েছে সত্য, কিন্তু ভাষার কাঠিন্য ও তৎসম শব্দাবলীর জন্য তার ধর্ম-সম্পর্কিত গদ্যরচনা পাঠক-পাঠিকার মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেনি।

নববিধান-ধর্মের প্রবর্তক কেশবচন্দ্র সেনের গদ্য ছিল সাবলীল, ঝর্ণাধারার মত প্রবাহিনী ও হীরকখণ্ডের মত উজ্জ্বল। সহজ ভাষায় কবিত্বের মাধুর্য মিশ্রিত হয়ে ধর্মীয় আলোচনাকে নীরস জ্ঞানসর্বস্ব না রেখে করেছিল অতীন্দ্রিয় রহস্যঘেরা ললিত কাব্য। কেশবচন্দ্র সেনের গদ্যের এই গুণটি কিন্তু তাঁর প্রচারকবর্গের মধ্যে কেউই পাননি। প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের ইংরেজী রচনায় অবশ্য কেশবচন্দ্র সেনের প্রভাব কিছুটা লক্ষ্য করা যায়।

গিরিশচন্দ্র সেন-রচিত ইসলাম ধর্ম ও শাস্ত্রের অনুবাদ-গ্রন্থগুলি নববিধান-সাহিত্যের বিশেষ সামগ্রী। নববিধান-সাহিত্যিকগোষ্ঠী ধর্মপ্রচারে উদ্বুদ্ধ হয়ে যে নূতন সাহিত্যের সৃষ্টি করেছেন সে সাহিত্যে গিরিশচন্দ্রের প্রভূত অবদানের

১. যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, কেশবচন্দ্র ও বঙ্গ সাহিত্য, পৃ. ২৪৬।

কথা স্বীকার করতে হয়। গিরিশচন্দ্রের বয়স যখন চল্লিশের উপর, তখন তিনি কেশবচন্দ্রের নির্দেশ অনুসারে আরবি ও পারসি ভাষা অধ্যয়ন করতে শুরু করেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই নিপুণ দক্ষতা নিয়ে অনুবাদের কাজে অগ্রসর হন। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে রামমোহন রায় ইসলাম শাস্ত্র ও ধর্ম আলোচনা করেন। কিন্তু তাঁর কোন সুযোগ্য উত্তরসূরী বাঙলা সাহিত্যে ছিল না। কিন্তু গিরিশচন্দ্র সেন পরবর্তী কালে ইসলাম শাস্ত্র ও সাহিত্য-আলোচনার পথটিকে প্রশস্ত করতে পেরেছিলেন। নববিধান-ধর্মে খ্রীষ্ট, বৌদ্ধ, হিন্দু, ইহুদী, মুসলমান, সকল ধর্মের প্রতি শুধু শ্রদ্ধাই নিবেদন করা হয়নি; প্রতিটি শাস্ত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনায় প্রচারকগণ নিযুক্ত হয়েছিলেন। তারই ফলস্বরূপ গিরিশচন্দ্র সেনের আরবি ও পারসি ধর্ম ও শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে অনুবাদ-গ্রন্থগুলি বাঙলা সাহিত্যের ভাণ্ডার পূর্ণ করছে। তাঁর রচিত জীবন-চরিতের (মুসলমান সাধু ও সাধ্বীগণের) আলোচনা ইতিপূর্বে করা হয়েছে। এখন শাস্ত্রগ্রন্থগুলোর আলোচনা প্রয়োজন। নীচে এই জাতীয় গ্রন্থের অনুবাদের তালিকা দেওয়া হল :—

১. হিতোপাখ্যানমালা (১৮৫৫) ১ম ভাগ; ২. হিতোপাখ্যানমালা (১৮৭৬) ২য় ভাগ; ৩ ধর্মবন্ধুর প্রতি কর্তব্য (১৮৭৫); ৪. নীতিমালা (১৮৭৭); ৫. দরবেশী (১৮৭৮); ৬. তত্ত্বকুসুম (১৮৮১); ৭. কোরান শরীফ-এর সটীক বাঙলা অনুবাদ (১৮৮১-১৮৮৬); ৮. তত্ত্বরত্নমালা (১৮৮২-৮৭); ৯. প্রবচনাবলী (১৮৮৫); ১০. হদিস (১৮৯২-১৮৯৮); ১১. ধর্মসাধন নীতি (১৯০৬); ১২. মহাপুরুষ মোহম্মদ ও তৎপ্রবর্তিত এসলামধর্ম (১৯০৬); ১৩. মহালিপি (১৯০৮); ১৪. তত্ত্বসন্দর্ভমালা (১৯১৫); ১৫ তুহফতুল মোহদিন (রাজা রামমোহনের লিখিত মূল গ্রন্থের বাঙলা অনুবাদ ধর্মতত্ত্বে ১৮২০-২১ শকে প্রকাশিত); ১৬. হাফেজ (১৭৯৮ শক প্রথম সংস্করণ, ১৯২০ চতুর্থ সংস্করণ)।

গিরিশচন্দ্র সেনের এই বিরাট গ্রন্থতালিকা নিঃসন্দেহে প্রমাণ দেবে— আরবি ও পারসি ভাষায় তাঁর পাণ্ডিত্য ও ইসলাম ধর্মের সুগভীর অধ্যয়ন। লক্ষ্ণৌ নগরে মৌলবীর কাছে তিনি আরবি ভাষার পাঠ গ্রহণ করেন। মুসলমান ধর্মশাস্ত্রে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য দেখে কেশবচন্দ্র সেন ব্রহ্মমন্দিরের বেদী থেকে তাঁকে মোহম্মদীয় ধর্মশাস্ত্রের অধ্যাপক বলে ঘোষণা করেন। এই ব্যাপারে কেশবচন্দ্রের আগ্রহাতিশয্য ও উৎসাহের কথা গিরিশচন্দ্র সেন উল্লেখ

করেছেন ; "কমল-সরোবরে জল সংস্কারের দিন ব্রহ্মানন্দ স্বহস্তে আমার মস্তকে তৈলার্পণ করিয়া বলিলেন, 'আমি মহাপুরুষ মোহম্মদের অঙ্গে তৈল মক্ষণ করিতেছি।' যখন তাঁহার বিশেষ প্রেমোন্মত্ততার ভাব, তখন তিনি আমার নিকটে প্রেমোন্মত্ত খাজা হাফেজের গজল পড়িতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। আমি কিছুদিন তাঁহাকে দেওয়ান হাফেজ পড়াইতে বাধ্য হইয়াছিলাম। তাঁহারই আগ্রহে ও অনুরোধে হাফেজের গজল কিয়দংশ বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করা গিয়াছিল। সেই অনুবাদ দর্শনে তাঁহার বিশেষ আনন্দ হইয়াছিল। কোরাণের বঙ্গানুবাদ খণ্ডশঃ আকারে প্রথমে দুই-তিন খণ্ড প্রকাশিত হইলে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হন। কেহ অনুবাদের ভাষার বিরুদ্ধে কিছু বলিলে তিনি দুঃখিত হইয়া প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।"[১]

প্রকৃতপক্ষে কেশবচন্দ্র সেনের প্রেরণায় গিরিশচন্দ্র সেন যৌবন অতিক্রান্ত করে ইসলাম শাস্ত্র আলোচনায় জীবনের শেষ পঁয়ত্রিশ বৎসর আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

সটীক সম্পূর্ণ কোরান শরিফের সর্বপ্রথম বঙ্গানুবাদ করেন গিরিশচন্দ্র সেন। এই অনুবাদ কাজটি যেমন পরিশ্রমসাধ্য ছিল, তেমনি এই কাজে বহু বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছিল তাঁকে। কোরান মুসলমানদের মূল ধর্মগ্রন্থ। আরবি ভাষার কঠিন দুর্গে এই গ্রন্থ আবদ্ধ। অপর ধর্মাবলম্বীর কোরান স্পর্শ করার অধিকার নেই, অন্য ধর্মের লোকের কাছে কোরান বিক্রয় করা হয় না, তাছাড়া আরবি ভাষার চর্চাও বাঙালীদের মধ্যে বিশেষ হয় না—ফলে কোরানের কাহিনী ও আধ্যাত্মিক সম্পদ এতকাল বাঙালীদের কাছে অলভ্য ছিল। গিরিশচন্দ্র সেনের পক্ষে হদিস ও কোরান ক্রয় করার ব্যাপারেও ইসলাম ধর্মের উক্ত ব্যাপারটি ঘটেছিল। "এক সময়ে আমি দোকানে একখানা 'হদিস' গ্রন্থ ক্রয় করিতে গিয়াছিলাম। মোসলমান বিক্রেতা দূর হইতে কেতাবখানা প্রদর্শন করিয়াছিলেন মাত্র, আমাকে তাহা স্পর্শ করিতে দেন নাই। আমি আমাদের দপ্তরী-যোগে উহা খরিদ করিয়া আনয়ন করি এবং একজন মোসলমান জাতীয় ব্রাহ্ম বন্ধুযোগে কোরাণ ক্রয় করা হইয়াছিল।"[২]

১. গিরিশচন্দ্র সেন, মহাপুরুষ মোহম্মদ ও তৎপ্রবর্তিত ইসলামধর্ম, ভূমিকা, পৃ. ।/০
২. তদেব, ভূমিকা, পৃ. ।॥/০।

বঙ্গভাষায় কোরান অনুবাদ করে তিনি বাঙ্গালী মুসলমান ও ইসলামধর্মে অনুরাগী বাঙ্গালী পাঠকদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। কোরান-অনুবাদের ব্যাপারে গিরিশচন্দ্র যথাযথভাবে মূলের অনুসরণ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে মূল কোরান অধ্যয়ন ও বঙ্গানুবাদ করার উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি আরবি ভাষা অধ্যয়ন করেন। "যাহাতে কোরানের মূল 'আয়ত' ( প্রবচন )-সকলের শব্দে অবিকল অনুবাদ হয় তদ্বিষয়ে যথোচিত যত্ন করা হইয়াছে। তদনুরোধে বঙ্গভাষার লালিত্য-রক্ষার প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখিতে পারা যায় নাই।"[১] মূলের রসটি রক্ষা করতে গিয়ে অনেক সময় বঙ্গভাষার মাধুর্য ও লালিত্য নষ্ট হয়ে গেছে। আরবি ভাষা থেকে বঙ্গানুবাদ করার আর একটি অসুবিধা এই যে আরবি ভাষার বাক্যগঠনরীতি ও বচনবিন্যাস দক্ষিণ দিক থেকে লিখিত হয়, বাঙ্গালা ভাষা বাম দিক থেকে। এই কারণে অনেক সময় ভাষা কৃত্রিম হয়ে উঠেছে। বঙ্গভাষায় গিরিশচন্দ্র সেনই প্রথম মূল কোরান-শরিফ থেকে অনুবাদ ও ভিন্ন ভিন্ন প্রসিদ্ধ তফসির অবলম্বনে টীকা রচনা করে পথিকৃৎ হয়ে আছেন।

'হিতোপাখ্যান-মালা' প্রথম ভাগ পারসি নীতিগ্রন্থ 'গোলস্তাঁ'র অনুবাদ, দ্বিতীয় ভাগ 'বুস্তাঁ' থেকে অনূদিত। নানা বিষয়ে হিতোপদেশ সংকলিত হয়েছে। পরোপকার, কৃতজ্ঞতা, বিনয়, প্রেম, এমন কি রাজনীতির ব্যাপারেও উপদেশমূলক উপাখ্যান সংকলিত হয়েছে। মানবজীবনের নীতি ও ধর্মের পাঠ দেবার জন্য ছোট্ট ছোট্ট জীবনধর্মী উপাখ্যান সন্নিবেশিত হয়েছে। ঈশপের গল্পের মত জীবজন্তুর কাছ থেকে নীতির পাঠ নয়, বরং মানুষের জীবনের নানা ভুল-ভ্রান্তি, নীচতা, শঠতা, প্রতারণার শাস্তি ও সাধুতা, উদারতা, জীবপ্রেম ও ঈশ্বরপ্রেমের মাহাত্ম্য ঘোষণার মধ্য দিয়ে উপাখ্যানগুলি একদিকে যেমন জীবনমুখী হয়ে উঠেছে, অপর দিকে এগুলি তেমনি জীবন-চর্যায় অতি সহজে নীতি ও ধর্মবোধকে জাগ্রত করে তোলে।

'গোলস্তাঁ' শব্দের অর্থ পুষ্পোদ্যান। ফুলের বাগানে যেমন বিচিত্র সুগন্ধি নয়ন-শোভন ফুলের সমাহার, তেমনি গোলস্তাঁ গ্রন্থের পুষ্প-উদ্যানে নানা সুনীতি ও ন্যায়বাক্যের মধু সঞ্চয়ন করা হয়েছে। গিরিশচন্দ্র সেন সূচনা-অংশে জানিয়েছেন—শেখ মসালেহোদ্দিন সাদি ৬৫৬ হিজরি সালে গোলস্তাঁ গ্রন্থটি

১. গিরিশচন্দ্র সেন, কোরাণ-শরিফ, ভূমিকা, পৃ. ৵০।

প্রণয়ন করেন। সাধারণতঃ বাগানের পুষ্প পাঁচ কি ছয় দিনের অধিক থাকে না—কিন্তু এই গোলস্তাঁ চিরকাল প্রফুল্ল থাকবে। কালচক্র তার বাসন্তী আমোদ বিলুপ্ত করতে পারবে না।

হিতোপাখ্যান-মালার দ্বিতীয় ভাগ ঐ একই লেখকের প্রণীত পদ্যময় পারসি গ্রন্থ 'বুস্তাঁ' থেকে অনূদিত। ১২২০ সালে আবুবেকর সাদির শাসন-কালে মূল বুস্তাঁ গ্রন্থ রচিত হয়। গিরিশচন্দ্র সেন কবি সাদির অনুরাগী ছিলেন। সাদি গদ্যে ও পদ্যে বহু নীতি ও গভীর ধর্মমূলক কাব্য রচনা করেছেন। অবশ্য তাঁর গদ্য অপেক্ষা পদ্য অধিকতর মধুর ও ভাবপূর্ণ। কবি সাদি ছিলেন পরিব্রাজক ঋষি—তিনি সম্ভবতঃ ভারতেও এসেছিলেন। তাঁর ভ্রমণজনিত অভিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতার বিশেষ পরিচয় বহন করে 'বুস্তাঁ' গ্রন্থটি।

লেখক সাদির বক্তব্য অনুবাদ করে গিরিশচন্দ্র সেন জানাচ্ছেন—"নানা দেশ পর্যটন ও নানা প্রকার লোকের সহবাস করিয়াছি, নানা স্থানের তত্ত্ব রাখি, নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত হইয়াছি।……আবার ভাবিলাম, সেই শর্করা তো নিকটে নাই, শর্করা অপেক্ষা অধিক মধুর বাক্যাবলী, তাহাই তাঁহাদিগকে দিব। যাহা সামান্য লোকে খাইতে ভালবাসে, সেই শর্করা প্রদান করি না। যাহা জ্ঞানপ্রবীণ লোকেরা কাগজে গ্রহণ করেন, সেই বাক্যরূপ শর্করা তাঁহাদিগকে দান করিব।"

হিতোপাখ্যান-মালা ঐ বাক্যরূপ শর্করার সংকলন-গ্রন্থ। ধর্মবন্ধুর প্রতি কর্তব্য (১৮৭৫ খ্রীঃ) 'কিমিয়া সাদাত' ও 'তেজ করতোল আউলিয়া' নামে মূল পারসি গ্রন্থ থেকে সংকলিত।

নীতিমালা (১৮৭৭ খ্রীঃ) নীতি ও ধর্ম বিষয়ে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'কিমিয়া সাদাতে'র উর্দু অনুবাদ 'আক্‌সির হেদায়েত' পুস্তক থেকে নীতিমালা প্রথম ভাগের প্রবন্ধগুলি সংকলন করা হয়েছে। এটিও সর্বাংশে মূলের হুবহু অনুবাদ নয়। গিরিশচন্দ্র সেন মূল পারসি নানা ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে ইসলাম সাধকদের বৈরাগ্যতত্ত্ব ও সাধন-প্রণালী বিষয়ে লিখলেন 'দরবেশী'।

'ধর্মসাধননীতি' গ্রন্থখানি 'কিমিয়া সাদাতে'র উর্দু অনুবাদ 'তেরাজোল আবেদিন' ও 'মফহাজোল আবেদিন' গ্রন্থ দুটি থেকে অনূদিত ও সংকলিত।

'মহালিপি' (১৯০৮ খ্রীঃ) পারসি ভাষায় লেখা পত্রাবলীর অনুবাদ করেছেন এই গ্রন্থে। সুগভীর তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত ও সাধু মখ্‌দুম শরফোদ্দিন আহমদ মনিরী প্রায় একশত পত্র লিখেছিলেন। পত্রগুলি সুগভীর পাণ্ডিত্যে ও ধর্ম

উপদেশে পরিপূর্ণ। মহালিপির প্রথমাংশে মনিরীর প্রথম দশটি পত্রের বঙ্গানুবাদ করেন গিরিশ সেন। একেশ্বরনিষ্ঠা, পাপ থেকে নিবৃত্তি, ধর্মসাধনে আকাঙ্ক্ষা ও সংকল্প. প্রকাশ্য ও গুপ্ত সাধুতা ইত্যাদি বিষয়ে পত্রগুলি রচিত।

হাফেজ—ইরাণের কবি মহাপ্রেমিক খাজা হাফেজের প্রণীত 'দেওয়ান হাফেজ' নামক মূল পারসি গ্রন্থ থেকে গিরিশ সেন অনুবাদ করেন। অনুবাদকের এই গ্রন্থটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থটির চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন সংস্কৃত উপনিষদের প্রতি তেমনি পারসি গ্রন্থ হাফেজের প্রতি একান্ত অনুরাগী ছিলেন। হাফেজের অনেক গজলই দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কণ্ঠস্থ ছিল। হাফেজের কবিতার প্রেমরসে তিনি স্নিগ্ধ হতেন এবং প্রায়ই আবৃত্তি করতে ও ব্যাখ্যা করতে ভালবাসতেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনও হাফেজের প্রতি অতিশয় অনুরাগ প্রকাশ করেছিলেন। এই গ্রন্থের ভূমিকা অংশে গিরিশ সেন জানিয়েছেন—"তিনি (কেশবচন্দ্র সেন) আগ্রহেব সহিত আমার নিকটে হাফেজ পড়িতে প্রবৃত্ত হন। কিয়ৎকাল প্রতিদিন কিছু কিছু করিয়া হাফেজ পড়িয়াছিলেন, প্রতিদিনের পাঠ প্রতিলিপি ও বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। তিনি পারস্য অক্ষর অতি সুন্দরভাবে লিখিতে পারিতেন। তাঁহার পারস্য হস্তাক্ষর মুদ্রাংকিত অক্ষরের ন্যায় পরিষ্কার। হাফেজের গজল বাঙলায় অনুবাদ করিয়া মুদ্রিত করিবার জন্য এক সময় আমাব প্রতি তাঁহার বিশেষ আদেশ ও অনুরোধ হয়। তদনুসারে ১৭৯৮ শকের মাঘোৎসবের সময় কয়েকটি কবিতা অনুবাদ করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করি। হাফেজের প্রতি বঙ্গীয় পাঠকদিগের বিশেষ আগ্রহ দেখিয়া এবার তাহা নতুন আকারে প্রকাশ করা গেল। পূর্বে মূল পুস্তকের নানা অংশ হইতে কয়েকটি গজল বা গজলের অংশ নির্বাচনপূর্বক অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করা গিয়াছিল, এখন প্রথম হইতে রীতিমত অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া গেল।" হাফেজের রূপকাশ্রিত ভাষার সার্থক অনুবাদ গিবিশচন্দ্রের এই গ্রন্থটি।

'মহালিপি' (১৯০৮ খ্রীঃ) পত্রাবলীর অনুবাদ। সাধু মুখদুম শরফোদ্দিন আম্মদ মনিরী পারসিক ভাষায় প্রায় একশতটি পত্র লেখেন। সেই পত্রাবলী থেকে দশটি পত্রের বঙ্গানুবাদ করে তিনি 'মহালিপি' প্রকাশ করেন।

'তত্ত্বকুসুম (১৮৮১) 'গোলসানে আস্রার' নামে পারসিক গ্রন্থ থেকে

সংকলিত। 'তত্ত্বরত্নমালা' ( ১৮৮২-৮৭ ) 'মসনবি মৌলবী রোম' নামক মূল পারসিক গ্রন্থ থেকে সংকলন।

গিরিশচন্দ্র সেন শুধু মুসলমান শাস্ত্রই আলোচনা করেননি, তিনি হিন্দু ও বৌদ্ধ শাস্ত্রও কিছু আলোচনা করেছেন। 'বর্মাদেশ ও বর্মাদেশে বৌদ্ধধর্ম' শীর্ষক সুবৃহৎ প্রবন্ধটি ধর্মতত্ত্বে ১৮২৮-২৯ শকে প্রকাশিত হয়। তত্ত্বসন্দর্ভ-মালা'য় তাঁর ধর্মজীবনের পত্তনের কথা বলেছেন। এছাড়া 'শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংসের উক্তি ও সংক্ষিপ্ত জীবনী' ( ১৮৭৮ ) প্রকাশ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী-রচনার এটিই প্রথম প্রচেষ্টা। প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে উক্তি সংগ্রহ করে তিনি পরবর্তী কালের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত গ্রন্থের সূচনা করে দিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মের সর্বজনীনতা ও সমন্বয়ী দর্শন নববিধানের গিরিশচন্দ্র সেনকে আকর্ষণ করেছিল।

এই গ্রন্থমালার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ উমানাথ গুপ্তের 'ব্রহ্মোপাসনা'। আচার্যদেব ব্রহ্মোপাসনাপ্রণালী সম্বন্ধে যে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রণয়ন করেছিলেন তাই অবলম্বন করে ভাই উমানাথ গুপ্ত ব্রহ্মোপাসনা বা উপাসনাতত্ত্ব নামে গ্রন্থটি রচনা করেন ১৩৪০ সালে। বিশ্বাস ও নিঃস্বার্থভাব— উমানাথের জীবনের এই বিশেষত্বটুকু ব্রহ্মোপাসনায় ফুটে উঠেছে।

কালীশংকর দাসের 'ধর্মবিজ্ঞানবীজ' চার খণ্ডে সমাপ্ত। ১৮৭৫ খ্রী:, ১৮৭৮ খ্রী:, ১৮৮৭ খ্রী: ও ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে যথাক্রমে চারটি খণ্ড প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির প্রথম খণ্ডে 'জগৎ ও ঈশ্বর', দ্বিতীয় খণ্ডে 'উপাসনা', তৃতীয় খণ্ডে 'মনুষ্যত্বেই ভগবানের প্রকাশ', চতুর্থ খণ্ডে 'বিধানসমূহেব সম্বন্ধ' ও 'নববিধানে সকল বিধানের সম্মিলন'—বিষয়ে আলোচিত হয়েছে। কালীশংকর দাসের আলোচনা জ্ঞানপূর্ণ ও তত্ত্বমূলক। কবিবাজ কালীশংকর দাস প্রায় সমস্ত জীবন উপাসনা ও ধর্মালোচনায় কাল কাটিয়েছেন। 'ধর্মবিজ্ঞান-বীজ' ( ৪ খণ্ড ) ধর্মবিজ্ঞানের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। এটিকে এক কথায় ধর্মবিজ্ঞানের 'এন্‌সাইক্লোপেডিয়া' বলা চলে। তাঁর রচিত অপর দুটি গ্রন্থের নাম 'নববিধান অপরিহার্য' ( ১৮৮৩ খ্রী: ) ও 'উপাসনা-পদ্ধতি' ( ১৮৮৯ খ্রী: )। ব্রাহ্মধর্মের সমন্বয়-সাধনা, ব্রাহ্মধর্মের সারতত্ত্ব তাঁর গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। 'ধর্মবিজ্ঞান-বীজে'র ভূমিকায় লেখক বলেছেন, "জগতের পারস্পরিক সম্বন্ধ ও জগৎপ্রতিষ্ঠাতা মঙ্গলময় আদিপুরুষের সঙ্গে নিজের ও প্রত্যেক জড়, প্রাণ ও আত্মার সম্বন্ধ মানবধর্ম-বিজ্ঞানের মূল উপাদান। এই উপাদান লইয়া

ধর্মদ্রুম নির্মিত হইয়াছে। এই দ্রুমের বীজমাত্র এই গ্রন্থমধ্যে রোপিত হইল।" এই গ্রন্থে লেখক কালীশংকর দাসের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দর্শন এবং ধর্ম-সম্পর্কে গভীর জ্ঞান ও অনুধ্যানের পরিচয় আছে। কিন্তু কোথাও তাঁর পাণ্ডিত্যের অহমিকা প্রকাশিত হয়নি ; বরং সহজ ভাষায় ধর্মবিজ্ঞানের মূল অনুসন্ধান করেছেন তিনি।

পত্র-পত্রিকা পরিচালনা ও সম্পাদনা :

নববিধান ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ থেকে অনেকগুলি পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ইংরেজী ভাষায় The Indian Mirror, Sunday Mirror, Liberal Interpreter, Young-man, Theistic Annual, Liberal & New Dispensation ইত্যাদি। বাঙ্গালা ভাষায় ধর্মতত্ত্ব, সুলভ সমাচার, মহিলা, পরিচারিকা, বালকবন্ধু, ধর্মপ্রকাশ, বঙ্গবন্ধু, দেশহিতৈষিণী, বিষয়বৈরী, বামাবোধিনী পত্রিকা, মদ না গরল, ধর্মসাধন ইত্যাদি। পত্রিকাগুলির মধ্যে অধিকংশই কেশবচন্দ্র সেনের পরিচালনা ও সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল। কেশবচন্দ্রেব ভারতসংস্কার-সভাব বিভিন্ন বিভাগের কাজ চালাবার জন্য মুখপত্ররূপে অনেকগুলি পত্রিকার আবির্ভাব হয়। পূর্বেব অধ্যায়ে আমরা সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। নববিধানের প্রেরিত প্রচারকগণ বিভিন্ন ধরনের গদ্য রচনার সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকা-সম্পাদনার যে গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন, সেটি এই অধ্যায়ের আলোচ্য।

**ধর্মতত্ত্ব:** এই পত্রিকাটি নববিধান ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম মুখ্য পত্রিকা। কেশবচন্দ্রের উদ্যোগে ১৮৬৪ খ্রীঃ অক্টোবর থেকে মাসিক-পত্র রূপে পত্রিকাটি প্রকাশিত হতে থাকে। গৌরগোবিন্দ রায় অত্যন্ত নিষ্ঠাব সঙ্গে ধর্মতত্ত্ব পত্রিকাটি প্রায় চল্লিশ বৎসর সম্পাদনা করেন। ধর্মতত্ত্ব পত্রিকাটি ১৭৯০ শকে পাক্ষিক পত্রে পরিণত হয় এবং তখন থেকেই এর শিরোভূষণ স্বরূপ—'সুবিশালমিদং বিশ্বং'...ইত্যাদি শ্লোকটি স্থান পায়। স্মরণ থাকতে পারে, এই শ্লোকটি রচিত হয় নববিধান-ধর্মের উদারতার প্রতি লক্ষ্য রেখে, গৌরগোবিন্দ রায়ের দ্বারা। ব্রহ্মানন্দ প্রথম প্রথম গৌরগোবিন্দকে ধর্মতত্ত্ব পত্রিকার প্রুফ দেখবার ভার দিতেন। বহুদিন প্রুফ দেখার পর উপযুক্ত সময়ে তাঁর উপর ঐ পত্রিকা সম্পাদনার ভার দেন। গৌরগোবিন্দ রায়ের

গভীর দৃষ্টি ও একনিষ্ঠতার ফলে পত্রিকাটির মান উন্নত হয়। কেশবচন্দ্রের তিরোধানের পর পত্রিকাটি নববিধানমণ্ডলীর মুখপত্র হয়েছিল। ঐ পত্রিকায় নিয়মিত ভাবে নববিধানতত্ত্ব ও মণ্ডলীর নানা সমস্যা সুন্দররূপে আলোচনা ও ব্যাখ্যা করা হত। এই পত্রিকাটি শতাধিক বৎসর ব্যাপী সার্থকতার সঙ্গে পরিচালিত হয়ে এসেছে। ১৭৯৪ শকাব্দে (১৮৭২) খ্রীষ্টাব্দে সাময়িকভাবে ধর্মতত্ত্ব সম্পাদনার ভার অঘোরনাথ গুপ্ত ও ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের উপর ন্যস্ত হয়। ২০শে কার্তিক ১৭৯৪ শকাব্দে প্রচারকগণের সভায় স্থির হয় "ধর্মতত্ত্ব সম্পাদনের ভার বর্তমানে শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ গুপ্ত মহাশয়ের উপর থাকিল।"[১] এ বছরেই ২২ মাঘের অধিবেশনে ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালকে ধর্মতত্ত্ব সম্পাদনার ভার দেওয়া হয়।[২] গিরিশচন্দ্র সেনও কিছুদিনের জন্য ধর্মতত্ত্বের সম্পাদনা-কার্য করেছেন। বাঙলা সাময়িক পত্রের ইতিহাসে ধর্মতত্ত্ব পত্রিকাটির একটি বিশেষ মূল্য আছে। উনবিংশ শতাব্দীতে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকে কেন্দ্র করে যেমন একটি সারস্বত মণ্ডল সৃষ্ট হয়েছিল, বঙ্গদর্শন পত্রিকাকে কেন্দ্রস্থলে রেখে যেমন একটি সাহিত্যিকগোষ্ঠী তৈরি হয়েছিল, তেমনি ধর্মতত্ত্ব পত্রিকাকে কেন্দ্র করে একটি ধর্মীয় পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল। কেশবচন্দ্র সেন ও বিধানবাদী ভক্তমণ্ডলীর বিভিন্ন ধর্ম-আলোচনা, শাস্ত্র ও ধর্মতত্ত্ব-বিশ্লেষণ, নববিধানের আদর্শ প্রচার, ধর্মীয় উপদেশ ইত্যাদি বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে দেশ-বিদেশের সংবাদ পরিবেশন, প্রচারযাত্রার বিবরণ ও ভ্রমণ-বৃত্তান্ত এই পত্রিকাটিকে শুধু ব্রাহ্মমণ্ডলীর মধ্যেই আবদ্ধ রাখেনি, কিছু কিছু প্রবন্ধ জনসাধারণের মধ্যে ধর্মতত্ত্ব পত্রিকাটিকে জনপ্রিয় করে তুলেছিল। যেমন, মহাপুরুষের জীবনীর মধ্যে 'মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ও সহধর্মিণী', প্রবন্ধ কিংবা মার্টিন লুথার কিংবা কনফুসের সংক্ষিপ্ত জীবনী সাধারণ পাঠককে কাছে টেনেছিল। ধর্মতত্ত্ব শতাধিক বৎসর ধরে বাঙলা গদ্য-সরস্বতীর সেবায় নিযুক্ত। এই পত্রিকাতেই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের বক্তৃতা ও উপদেশ, গিরিশচন্দ্র সেনের বিভিন্ন গদ্য রচনা, এমন কি মোহিতচন্দ্র সেন ও বিনয়েন্দ্রনাথ সেনের গদ্যরচনাও এই পত্রিকাটিকে অলংকৃত করেছে। ধর্মতত্ত্ব শুধু বাঙলা গদ্যের অক্লান্ত সেবাই করেনি, তৎকালীন বাংলার সমাজচিত্র-উদ্ঘাটনেও যথেষ্ট সাহায্য করেছে। কবে কোথায় কোন্ প্রচারক ধর্ম

১. প্রচারকগণের সভায় নির্ধারণ, পৃ. ৫। ২. তদেব, পৃ. ২৮ ১০।

আলোচনা করলেন, কোথায় ব্রাহ্মবিবাহ সংঘটিত হল, কোথায় কার মৃত্যু ঘটল—এসব সংবাদ উনবিংশ শতাব্দীর জীবন্ত সমাজচিত্র-রচনায় উপকরণ যোগায়।

**সুলভ সমাচার:** ভারতসংস্কার-সভার সুলভসাহিত্য-বিভাগের অন্তর্গত এই পত্রিকাটি কেশবচন্দ্রের দ্বারা প্রকাশিত হয় ১২৭৮ সালের ১লা অগ্রহায়ণ। সুলভ সমাচারের প্রতি বৎসর সম্পাদক পরিবর্তিত হত। এর প্রথম সম্পাদক উমানাথ গুপ্ত। ১৮৭৫ খ্রীঃ সুলভ সমাচারের সহকারী সম্পাদক রূপে কাজ করেছিলেন অঘোরনাথ গুপ্ত।

**দেশহিতৈষিণী:** গৌরগোবিন্দ রায় নিজের গ্রামে একটি প্রেস স্থাপন করে 'দেশহিতৈষিণী' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। স্বগ্রামে তরুণ লেখকদের এই পত্রিকায় স্থান দিয়ে নবীন সাহিত্যিকদের উৎসাহিত করতেন।

**নববিধান:** ১৩০০ বঙ্গাব্দের পৌষমাসে ত্রৈলোক্যনাথের সম্পাদনায় নববিধান নামে একটি ক্ষুদ্রকায় মাসিক পত্র প্রকাশিত হতে থাকে। 'চিরঞ্জীব শর্মা' ছদ্মনামে প্রায় ১৭ বছর এটির সম্পাদনা সার্থকতার সঙ্গে একনাগাড়ে করেন। পত্রিকাটি বিনামূল্যে বিতরিত হত। প্রধানতঃ আধ্যাত্মিক বিষয় নিয়ে রচিত প্রবন্ধাবলী, সংবাদ, ধর্মকথা, উপদেশ ও বহু ব্রহ্ম সংগীত ও সংকীর্তন এই পত্রিকাটিতে প্রকাশিত হত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লেখকের নাম উল্লেখ থাকত না।[১]

**ধর্মসাধন পত্রিকা:** এটি সাপ্তাহিক পত্র। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশ। এটি কেশব-মণ্ডলীর সঙ্গত-সভার মুখপত্র। এই পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন উমেশচন্দ্র দত্ত। এটি এক পয়সা মূল্যের পত্রিকা। এই পত্রিকাটিতে কেবল সঙ্গতের বিবরণ ও ব্রাহ্মমন্দিরের উপদেশের সারমর্ম পরিবেশিত হত। ধর্মসাধনের শিরোভূষণটিই তার পরিচয় বহন করছে।

ভবে সাধন বিনা সে ধন মিলে না,
কর সাধন, পূর্ণ হবে মনস্কাম।[২]

**পরিচারিকা:** এই পত্রিকাটির প্রথম সম্পাদক ছিলেন উমেশচন্দ্র দত্ত। কিন্তু কুচবিহার বিবাহের পর সম্পাদক কেশববিরোধী দলে যোগ

১. সতীকুমার চট্টোপাধ্যায়, কেশব সহচারী ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল-ইতিহাস, দ্বিতীয় সংখ্যা পৃ. ১১৮। ২. শ্রী যোগেশচন্দ্র বাগল, কেশবচন্দ্র সেন, পৃ. ৯৯।

দেওয়াতে 'পরিচারিকা' স্বতন্ত্রভাবে মাসিকপত্র রূপে ১২৮৫, ১লা জ্যৈষ্ঠ থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার পত্রিকাটির সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। এই পত্রিকাটির প্রকাশনে গিরিশচন্দ্র সেনের উদ্যোগ উল্লেখ-যোগ্য। নারীজাতির উন্নতিমূলক নানা প্রবন্ধাবলী ও সংবাদ এই পত্রিকাটিতে থাকত। কয়েক বৎসর 'পরিচারিকা'র পরিচালনার ভাব 'আর্যনারী সমাজে'র উপর অর্পিত হয়। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ১২৯৮ সাল পর্যন্ত পত্রিকাটি পরিচালনা করেন। ১২৯৯ সাল থেকে 'আর্যনারী সমাজ' পত্রিকাটির পরিচালনার ভার নিলেন। মোহিনী দেবী ১৩০৮ থেকে ১৩০৯ সাল পর্যন্ত, সুচারু দেবী ১৩১০ থেছে ১৩১১ সাল পর্যন্ত পরিচালনা করেন। 'পরিচারিকা' পত্রিকাটি কিছুদিন বন্ধ থাকার পর আবার নবপর্যায়ে রানী নিরুপমা দেবীর পরিচালনায় ১৩২৩ বঙ্গাব্দ থেকে ১৩৩১ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। 'আর্যনারী সমাজে'ব ইতিহাসে এই পত্রিকাটির বিশেষ অবদান আছে।

বি ষ বৈ রী : আশালতা দলের মুখপত্র। কেশবচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দলাল সেনের সম্পাদনায় ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে মাসিক রূপে প্রকাশিত হয়। এখানিও বিনামূল্যে বিতরণ করা হত।

বা মা বো ধি নী প ত্রি কা : উমেশচন্দ্র দত্তের সম্পাদনায় ১২৭০ বঙ্গাব্দে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। আশুতোষ ঘোষ, উমেশচন্দ্র দত্তের অনুপস্থিতিতে ১৩১১ সালে এটি সম্পাদনা করেন। তারপর উমেশচন্দ্র দত্ত পুনরায় ১৩১৪ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত পত্রিকাটির সম্পাদনা করেন। পরবর্তী কালে সন্তোষকুমার দত্ত ১৩১৫ বঙ্গাব্দ থেকে ১৩২৯ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত সার্থক ভাবে পত্রিকাটিকে সম্পাদনা-কার্য চালিয়ে যান। এই পত্রিকায় 'বামাহিতৈষিণী সভা'র সকল সংবাদ প্রকাশিত হত ; স্ত্রীজাতির উন্নতিবিষয়ক বিবিধ সংবাদ ও প্রবন্ধ এবং ছাত্রী ও শিক্ষিকাব বিভিন্ন রচনা সাগ্রহে প্রকাশিত হত।

ম হি লা প ত্রি কা : এটি মাসিক পত্রিকা। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্র সেনের পরিচালনা ও সম্পাদনায় প্রকাশিত হল। নারীজাতির উন্নতিবিষয়ক ও শিক্ষাবিষয়ক নানা প্রবন্ধ প্রকাশিত হত। প্রতি মাসে মহিলাদেব জন্য নির্দিষ্ট একটি বিভাগে মহিলা লেখিকাদের গদ্য ও কবিতা রচনা প্রকাশিত হত। মহিলাদের দ্বারা রচিত অনেক কবিতাতেই লেখিকার নাম অনুপস্থিত। সুতরাং এই পত্রিকায় কোন্ কোন্ মহিলা কবির

আবির্ভাব হয়েছিল, সেটি গবেষণার বিষয়। কখনও বা কবিতার নীচে 'দুঃখিনী মা' কখনও বা 'কোন ভিখারিণী' বলে স্বাক্ষর আছে। বেশীর ভাগ কবিতা করুণ সুরে রচিত। মৃত্যু, শোক, সংসারের অসারতা, জীবনের নশ্বরতা কবিতাগুলির বিষয়।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রায় তিন দশক বিধানবাদী ভক্ত ও সাহিত্যিকগণ কর্তৃক একাধিক পত্রিকা পরিচালনা ও সম্পাদনা বাঙলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য পর্ব। সাময়িক পত্রিকা ও মাসিক পত্রিকাকে কেন্দ্র করে সকল দেশে সকল কালেই গদ্যচর্চা ও সাহিত্যচর্চা হয়েছে। উল্লিখিত পত্রিকাগুলি একদিকে বাঙলা গদ্যের উৎকর্ষসাধনে, অপরদিকে জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ রচনায় বিশেষ নৈপুণ্য দেখিয়েছে। শুধু তাই নয়, পত্রিকাগুলি ছিল নববিধান-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। সেই দিক থেকে সমাজ, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে এই পত্রিকাগুলির স্বতন্ত্র অবদানও স্বীকার করতে হয়। নারীশিক্ষা ও স্ত্রীজাতির উন্নতি, নববিধানের উদার ও সার্বভৌমিক সমাজ স্থাপন, মদ্যপান-নিরোধ, সর্বোপরি শ্লীলতা, সুরুচি ও নীতিবোধ প্রতিষ্ঠায় পত্রিকাগুলির বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। সাময়িক পত্রের ইতিহাসে তাই বিধানবাদী ভক্তগণের দ্বারা পরিচালিত পত্রিকাগুলি এক স্বতন্ত্র মর্যাদা লাভ করেছে।

নববিধানবাদী সাহিত্যিকমণ্ডলীর মধ্যে ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল ও গিরিশচন্দ্র সেন বাঙলা সাহিত্যে লক্ষণীয় কিছু বৈশিষ্ট্য রেখে গেছেন। ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের সাহিত্যকৃতিত্ব আলোচনা করেছি তাঁর রচনাবলীর পরিচয়দান কালে। এই অধ্যায়ের শেষে গিরিশচন্দ্র সেনের গদ্যের রূপ ও প্রকরণ-রীতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন। কারণ গিরিশচন্দ্র সেন বঙ্গভাষায় যে গ্রন্থগুলি রচনা করেন তার অধিকাংশই অনুবাদ। এখনকার দিনে কয়েকটি অপ্রচলিত ভাষা আরবি, পারসি ও উর্দু থেকে অনুবাদ করেছিলেন গিরিশচন্দ্র সেন। বাঙলা গদ্যে একদিকে সংস্কৃত ও অপরদিকে আরবি পারসি ভাষার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এই বাঙলাদেশে হিন্দু ও মুসলমানের পাশাপাশি বাস। হিন্দুদের শাস্ত্রগ্রন্থ সব সংস্কৃতে আর মুসলমানদের শাস্ত্রগ্রন্থ আরবি ও পারসিতে লেখা। কাজেই হিন্দুদের উপর সহজেই সংস্কৃত ভাষার ও মুসলমানদের উপর আরবি ও পারসি

ভাষার প্রভাব অতি সহজেই বিস্তারলাভ করেছিল। তাছাড়া মধ্যযুগে মুসলমান রাজাদের রাজত্বকালে অনেক হিন্দু আরবি ও পারসি শিখেছিলেন—কারণ সেটি ছিল রাজভাষা। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজ শাসকদেব সময়ে আরবির স্থান দখল করল ইংরেজী। ইংরেজী শিক্ষা তখন সংস্কৃতির বিশেষ মানদণ্ড। কাজেই উনিশ শতকের হিন্দুদের মধ্যে অনেকেই সংস্কৃত ভাষা চর্চার সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে দক্ষতা দেখিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে উনিশ শতকে হিন্দুরা ইংরেজী শিক্ষাকে সহজে গ্রহণ করেছিল বলে অতি সহজেই কয়েকজন বিশিষ্ট ইংরেজী শিক্ষিত হিন্দুর দ্বারা বাঙলা গদ্যেব উন্মেষ সম্ভব হয়েছিল। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভূদেব মুখোপাধ্যায় কিংবা রাজনারায়ণ বসু সকলেই যুগপৎ সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু তৎকালীন অতিরক্ষণশীল মুসলমানরা তখনও আরবি পারসি উর্দুর বেড়া অতিক্রম করতে সক্ষম হননি। ইংরেজী শিক্ষাব প্রতি বাঙালি মুসলমানদের অতি তীব্র অনীহা ইসলাম সাহিত্য সাধনায় গদ্যকে করেছিল দ্বিধান্বিত। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের আগে পর্যন্ত আরবি পারসি মিশ্রিত বাঙলা তাঁরা ব্যবহার করেছেন। মুসলমানদের দ্বারা রচিত বাঙলা গদ্যের উনিশ শতকের সতের দশকে ধীর পদক্ষেপ, যদিও কয়েক শতাব্দী ব্যাপী (ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে) আধুনিক কাল পর্যন্ত রোমান্টিক কাহিনী, কাব্য এবং ইসলাম শাস্ত্র ও তত্ত্ব রচিত হয়েছিল পদ্যছন্দে।

ইসলাম সাহিত্যের এই পটভূমিতে এলেন গিরিশচন্দ্র সেন। বহু ভাষাবিদ্ গিরিশচন্দ্র সেনের মানসলোক ছিল ব্রাহ্ম-দার্শনিকতার দ্বারা পরিমার্জিত। রামমোহন দেবেন্দ্রনাথের উপনিষদ্ ও ব্রহ্মচিন্তা এবং তৎসহ সংস্কৃত শাস্ত্র তাঁর চিন্তার রাজ্যে সদাজাগ্রত ছিল। এরই সঙ্গে মিশ্রিত হল কেশবচন্দ্র সেনের সমন্বয়ী চিন্তা। কেশবচন্দ্র সেনের অনুরোধে তিনি পাঠ করলেন মুসলমান শাস্ত্রগ্রন্থসমূহ। অবশ্য তাঁর পারসি ভাষার দক্ষতা ছিল বাল্যাবধি।[১]

---

১. গিরিশচন্দ্র সেন তাঁর আত্মজীবনীতে জানিয়েছেন—পিতৃদেব মাধবরাম রায় মহাশয় আমাকে পারস্য-ভাষার চর্চায় নিযুক্ত করেন। তাঁহার নির্দেশে একজন মোল্লা আসিয়া নামাজ পড়িয়া পারস্য বর্ণমালা আলেফ, বে, তে, ইত্যাদি পড়াইয়া যান। আমি সিন্নি দিয়া তাঁহার নিকটে রীতিপূর্বক 'বেস্মাল্লা আর রহমান আর রহিম' বচন রচন উচ্চারণ করিয়া আলেফ, বে, তে, পড়িতে ও লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। পারস্য বর্ণমালা কিঞ্চিৎ অভ্যস্ত হইলে পর পিতৃদেব

তাঁর পরিবারেও এই ভাষার চর্চা ছিল। তাই ইস্‌লামি সাহিত্যের যুগসন্ধিক্ষণের পর্বেই কোরান-শরীফের মূলানুগ সার্থক পদ্যানুবাদ গিরিশচন্দ্র সেনের পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল।

তিনিই সর্বপ্রথম ১৮৭৬ খ্রী. বঙ্গভাষায় কোরান শরিফের অনুবাদ করেন। পারসি ও ইংরেজী ভাষায় কোরান অনুদিত হয়েছে সত্য, কিন্তু গিরিশচন্দ্র সেন এই অনুবাদের কাজে মূল আরবি কোরান-শরিফ অনুসরণ করেন। শ্রদ্ধেয় মৌলানা আক্রম খাঁ গিরিশচন্দ্র সেনকে শ্রদ্ধা জানিয়ে লিখছেন—"কিন্তু তিনকোটি মুসলমানের মাতৃভাষা যে বাংলা, তাহাতে কোর-আনের অনুবাদ প্রকাশের কল্পনা ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এদেশের কোন মনীষীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই। তখন আরবী পার্শী ভাষায় সুপণ্ডিত মুসলমানের অভাব বাংলাদেশে ছিল না।…কিন্তু এদিকে মনোযোগ দেওয়ার সুযোগ তাঁহাদের একজনেরও ঘটিয়া উঠে নাই। এই গুরু কর্তব্য-ভার বহন করার জন্য সুদৃঢ় সংকল্প নিয়া সর্বপ্রথমে প্রস্তুত হইলেন বাংলার একজন হিন্দু সন্তান, ভাই গিরিশচন্দ্র সেন—বিধান-আচার্য কেশবচন্দ্রের নির্দেশ অনুসারে। গিরিশচন্দ্রের এই অসাধারণ সাধনা ও অনুপম সিদ্ধিকে জগতের অষ্টম আশ্চর্য বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে।" আরও কয়েকজন মুসলমান পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র সেনকে কোরান অনুবাদের জন্য স্বাগত অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে আছেন আহমদোল্লা, আবাদোল আলা, আবাদোল আজিজ, আলিমোদ্দিন আহমদ ও আবুয়ল মজফ্ফর আবদুল্লা। "বিশেষতঃ যখন আরব্যতুল্য পুরাতন ভাষা পৃথিবীর অন্য অন্য সকল ভাষা হইতে অতিশয় ভিন্ন"—সেইহেতু এঁরা সকলেই গিরিশচন্দ্র সেনের কোরানের বঙ্গানুবাদকে জনহিতকর কাজ বলে মনে করেছেন।

প্রথমেই বলেছি, এটি অনুবাদের অনুবাদ নয়। যাতে কোরানের অবিকল অনুবাদ হয় সেটির প্রতি গিরিশচন্দ্রকে সর্বদা লক্ষ্য রাখতে হয়েছিল। এই গ্রন্থের ভাষার কয়েকটি লক্ষণ আলোচিত হল।

---

স্বহস্তে শেখ সাদি প্রণীত 'পন্দনামা' পুস্তক লিখিয়া আমাকে পড়িতে দেন। বোধ করি সপ্তম বৎসর বয়ঃক্রম কালে আমি রীতিপূর্বক পারস্য ভাষা শিক্ষা করিতে নিযুক্ত হই।… আমার পিতামহ স্বর্গগত মোনশী রামমোহন রায় মোর্শেদাবাদের নবাব সরকারে অন্যতর উচ্চপদে ছিলেন। তাঁহার নিজপুত্র মোন্‌শী রাধানাথ রায়, মাধবরাম রায়, গঙ্গাপ্রসাদ রায় সকলেই পারস্য-ভাষাবিদ্‌ বলিয়া খ্যাত ছিলেন।"

১. আক্ষরিক অনুবাদ করতে গিয়ে সর্বত্র ভাষার লালিত্য রক্ষা করা হয়নি। যেমন—"এবং যদি তাহারা তোমার অপচয় করিতে ইচ্ছা করে, তবে, নিশ্চয় পূর্বেই ঈশ্বরের অপচয় করিয়াছে, পরে তাহাদের প্রতি সেই ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে, ঈশ্বর জ্ঞাতা ও বিজ্ঞাতা।" (পৃঃ ২১১)।

২. কোরান দুরূহ গ্রন্থ বলে তিনি যথাসাধ্য আয়তের ভাবগুলি পরিস্ফুট করতে চেষ্টা করেছেন। এই কারণে লেখক পাঠ ও টীকায় বক্তব্যকে ব্যাখ্যা করেছেন সহজভাবে।

৩. গিরিশচন্দ্র সেনের কোরানের অনুবাদে সংস্কৃত ভাষার প্রভাব আছে। সর্বত্রই প্রচুর তৎসম শব্দের সমাবেশ ও সাধু ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছেন। যেমন—"হে আমার সম্প্রদায়, ঈশ্বরকে ভজনা কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের জন্য অন্য উপাসনা নাই; সত্যই তোমাদের প্রতিপালক হইতে তোমাদের নিকটে প্রমাণ উপস্থিত হইয়াছে, অবশেষে তুল ও পরিমাণকে পূর্ণ করিও এবং লোকদিগকে তাহাদের দ্রব্যপুঞ্জ ন্যূন পরিমাণ দিও না ও পৃথিবীতে তাহার সংশোধনের পর উপদ্রব করিও না, তোমরা বিশ্বাসী হইলে তোমাদের জন্য ইহাই কল্যাণকর।" (পৃঃ ১৮১)।

কিংবা, "তোমরা পার্থিব জীবনের প্রতি প্রেম থাকা বশতঃ ঈশ্বরকে ছাড়িয়া আপনাদের মধ্যে প্রতিমাসকলকে গ্রহণ করিয়াছ এতদ্ভিন্ন নহে, তৎপর পুনরুত্থানের দিনে তোমরা পরস্পর পরস্পকে অগ্রাহ্য করিবে ও তোমরা পরস্পর-পরস্পরকে অভিশাপ দিবে এবং তোমাদের বাসভূমি অগ্নি হইবে ও তোমাদের জন্য সাহায্যকারী নাই।" (পৃঃ-৪৭৩)।

গদ্যভাষার এই সংস্কৃতগন্ধিতার জন্য সর্বত্র অল্পশিক্ষিত মুসলমানদের কাছে অনুবাদটি সুবোধ্য হয়নি—ক'লকাতা মাদ্রাসা থেকে তাই তাঁর কাছে বিনীত অনুরোধ করা হয়েছিল যদি তিনি ঐ পুস্তকের ভাষা অপেক্ষাকৃত সরল করতে পারেন তবে অল্পশিক্ষিত মুসলমানগণের বিশেষ উপকার হবে।

৪. অধিকাংশ স্থলে তৎসম শব্দ সহযোগে সাধু ক্রিয়াপদ দ্বারা দীর্ঘপদ সৃষ্টি করা হলেও স্থানে স্থানে ভাষা কবিত্বময় ও সংক্ষিপ্ত এবং পরিচ্ছন্ন। যেমন "পৃথিবীতে যেসকল বৃক্ষ আছে, যদি তাহা লেখনী হয় ও সাগর তাহার মসী হয়, তাহার পরে (অন্য) সপ্ত সাগর হয়, তথাপি ঈশ্বরসম্বন্ধীয় কথা সমাপ্ত হইবে না; নিশ্চয়ই ঈশ্বর বিজেতা ও বিজ্ঞানময়।

৫. আরবি গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ করলেও গিরিশচন্দ্র সেন হিন্দু সমাজে প্রচলিত প্রতিশব্দগুলি ব্যবহার করেছেন। যেমন তিনি 'আল্লা' শব্দের পরিবর্তে ঈশ্বর কিংবা পরমেশ্বর ; 'হদিস' শব্দের পরিবর্তে প্রেরিত পুরুষ কিংবা প্রেরিত মহাপুরুষ ও 'পানি' শব্দের পরিবর্তে সর্বত্রই তিনি 'জল' বা বারি প্রতিশব্দ ব্যবহার করেছেন। সাকিয়া—জলদাতা, হাফেজা—রক্ষয়িত্রী, রাজ্জেকা—জীবিকাদাত্রী, সালেমা—কল্যাণদাত্রী—প্রতিশব্দগুলি কাব্যময় ও সুপ্রযুক্ত।

কোরান ব্যতীত গিরিশচন্দ্র সেনের অন্যান্য গদ্যগ্রন্থগুলি অধিকাংশই ইসলাম তত্ত্ব ও শাস্ত্র সম্বন্ধীয়। এইগুলি কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যথাযথ অনুবাদ নয়—মূলের ভাবানুবাদ। কবিত্বমণ্ডিত হাফেজের গজলগুলির অধিকাংশ উক্তি রূপক। সুরা, সুরাদাতা, সুরালয়, বসন্তঋতু, উদ্যান ইত্যাদির প্রসংগ অধিকাংশ কবিতায় আছে। কিন্তু অনুবাদক অতি সহজভাবেই এই শব্দগুলির গূঢ়ার্থ উপলব্ধি করেছেন। যেমন, সুরা শব্দে প্রেম বা মত্ততা, সুরাদাতা শব্দে প্রেমোদ্দীপক গুরু কিংবা পানপাত্র শব্দে হৃদয় ব্যঞ্জিত হয়েছে। এই কারণেই কবিতাগুলির ভাবানুবাদ গদ্যবন্ধে হলেও কাব্যময় হয়ে উঠেছে। "প্রভাতিক বিহঙ্গই পুষ্পের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে জানে, সকলে পুস্তক পড়িয়া অর্থ জানে এরূপ নহে।" (হাফেজ, পৃঃ ৪০)। কিংবা "হে মন, সহিষ্ণু হও এবং দুঃখ করিও না, পরিণামে এই সন্ধ্যা উষা হইবে এবং এই রজনী প্রভাত হইবে।" (হাফেজ, পৃঃ-৭৭)।

হিতোপাখ্যানমালা কিংবা নীতিমালা কিংবা তত্ত্বরত্নমালা ইত্যাদি গ্রন্থগুলিতে লেখক অধিকাংশ স্থলে ভাবমাত্র গ্রহণ করেছেন। মূল গ্রন্থের কিছু বাক্য ও কিছু উপাখ্যান পরিত্যাগ করেছেন। এই সব গ্রন্থের ক্ষেত্রে লেখকের গদ্য স্টাইলে এসেছে স্বচ্ছন্দ গতির স্বাধীনতা। বাঙলা ভাষার মাধুর্য ও সৌষ্ঠবের প্রতি তিনি দৃষ্টি দেবার সুযোগ পেয়েছেন। গদ্যে তৎসম শব্দের ব্যবহার থাকলেও বাঙলা গদ্য স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল। যেমন "সেদিন অপরাহ্নে গ্রামপ্রান্তে বাহির হইয়া ইতস্ততঃ ক্ষুধাতুর ভিক্ষুক অন্বেষণ করিতেছেন এমন সময়ে অদূবে প্রান্তরে এক সিতশ্মশ্রু নিঃসহায় বৃদ্ধ জরা-দৌর্বল্যে ঝাউতরুর ন্যায় কম্পিত হইতেছে দেখিতে পাইলেন।" (হিতোপাখ্যানমালা, ২য় ভাগ, পৃঃ ১-২)।

সাধারণভাবে গিরিশচন্দ্র সেন দীর্ঘ বিলম্বিত বাক্যের পরিবর্তে ছোট ছোট বাক্য গঠন পছন্দ করেন। বাক্যের ছোট আধারে অধিকতর ব্যঞ্জনাপূর্ণ

শব্দ ব্যবহার করেন তিনি। যেমন "এক ব্যক্তির বিপুল ধনসম্পত্তি ছিল, কিন্তু তাহার দানোপভোগে স্পৃহা ছিল না। অর্থ ভবিষ্যতে প্রয়োজনে আসিবে বলিয়া সে দানভোগে বিরত ছিল। সর্বদা তাহার স্বর্ণ-রৌপ্য ভূগর্ভে নিহিত থাকিত। কৃপণের ধনেরই এই দশা।" (হিতোপাখ্যানমালা ২য় ভাগ, পৃঃ ১৬)।

এই গদ্যেই গিরিশচন্দ্রের নিজস্ব গদ্যরীতির সঠিক স্টাইলটি ধরা পড়ে। মৃত্যুর চার-বৎসর পূর্বে প্রকাশিত (১৯০৬ খ্রীঃ) তাঁর 'আত্মজীবন'ও এই গদ্যরীতিতে লেখা। "আমি সর্বকনিষ্ঠ বলিয়া বাল্যকালে মার অধিকতর স্নেহ ও আদরের পাত্র ছিলাম। আমি যে বিষয়ের জন্য আবদার করিতাম, মা আমাকে তাহাই দিতেন। তিনি আমাকে নানা অলংকারে সাজাইতেন।" (আত্মজীবন, পৃঃ ৩)।

ভাবতে বিস্ময় জাগে, আরবি পারসিভাষায় রচিত শাস্ত্র, জীবনী ও সাহিত্যের অবিকল অনুবাদ কোথাও বা ভাবানুবাদ করলেও কোথাও কিন্তু 'মিশ্ররীতি' অনুসরণ করেননি। ডঃ সুকুমার সেন ইসলামি বাঙলা ভাষার যে বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করেছেন—যেমন অপরিচিত আরবি-পারসি শব্দের বাহুল্য, হিন্দী শব্দের বাহুল্য, আরবি-পারসি শব্দের নামধাতুরূপে ব্যবহার, হিন্দী ধাতু ব্যবহার, কিংবা পারসি বহুবচন 'আজ' বিভক্তির ব্যবহার—এইগুলির সবকটি বৈশিষ্ট্যই গিরিশচন্দ্র সেনের গদ্যে সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। আরবি ও পারসি ভাষা মিশ্রিত বাঙলা তৎকালীন বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে অতি প্রচলন ছিল। গিরিশচন্দ্র সেন সহজেই সেটা পরিত্যাগ করে সাধু বাঙলা গদ্য রীতিতে সাহিত্যচর্চা করলেন।

গিরিশচন্দ্র সেন তাঁর গদ্যরীতি সম্পর্কে সর্বদা সচেতন ছিলেন। কোরানের ভূমিকায় 'অনুবাদকস্য' নিবেদন রেখেছেন—"অল্প কথায় বিস্তৃত ভাব ব্যক্ত করিতে আরব্য ভাষা যেরূপ অনুকূল, এমন পূর্ণ ভাষা যে সংস্কৃত, তদ্বিষয়ে অনেক স্থলে পরাস্ত। আরবীয় একটি কথার ভাব ব্যক্ত করিতে বাঙলা ভাষায় প্রায় তাহার দ্বিগুণ-ত্রিগুণ কথা প্রয়োগ করিতে হয়। এই উভয় ভাষার পদবিন্যাসপ্রণালীর ইত্যাদির বহু বিভিন্নতা হেতু কোর-আনের প্রবচনসকল আরব্য ভাষার রীতি অনুসারে বাঙলা ভাষায় আক্ষরিক অনুবাদ করিতে গেলে তাহা নিতান্ত শ্রুতিকটু ও দুর্বোধ হইয়া উঠে; অতএব আমাকে অনুবাদে বঙ্গভাষার বচনবিন্যাস-প্রণালীর অনুসরণ করিতে হইয়াছে।"

প্রকৃতপক্ষে এই কারণে গিরিশচন্দ্র সেনের গদ্যে তাই একটি নিজস্ব ভঙ্গী গড়ে উঠেছে। একদিকে বাঙ্গলা গদ্য সম্পর্কে সজ্ঞান নিষ্ঠা ও অপরদিকে রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র-প্রবর্তিত গদ্যরীতির অনুসৃতি গিরিশচন্দ্র সেনকে বাঙলা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাসে স্বতন্ত্র মর্যাদা দেবে।

# চতুর্থ অধ্যায়

## নববিধান-সাহিত্যের অন্যান্য লেখকগণ

অর্ধশতাব্দীর অধিক সময় ব্যাপী নববিধান-সাহিত্যের মূল্যায়ন করতে গিয়ে আরও কয়েকজন লেখকের নাম উল্লেখ করতে হয়। কৃষ্ণবিহারী সেন, প্যারীমোহন চৌধুরী, বিনয়েন্দ্রনাথ সেন, মোহিতচন্দ্র সেন পরবর্তী কালের নব-বিধানসাহিত্যের ধারাকে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। পূর্ববঙ্গের একাধিক প্রাবন্ধিক নববিধান-সাহিত্যের সেবায় নিজেদের নিযুক্ত রেখেছিলেন। এছাড়া নববিধান-ধর্ম ও সাহিত্যের ছায়ায় গড়ে উঠেছিল একদল মহিলা কবি ও সাহিত্যিক। এঁদের সকলের প্রসঙ্গ নববিধান-সাহিত্য আলোচনায় সম্পূর্ণতা আনবে।

কৃষ্ণবিহারী সেন ঃ

(১৮৪৭ খ্রী. ৩রা ডিসেম্বর ১৮৯৫ খ্রীঃ ২৯শে মে) কেশবচন্দ্র সেনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে তিনি বিশেষ সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি একাধিক ভাষাজ্ঞ ছিলেন। "ইংরাজী খুবই জানিতেন। ফরাসী ও পালি ভাষায় বেশ বিদ্বান্ ছিলেন। তিনি ফরাসী ও পালি ভাষা থেকে যত ভাল ভাল বিষয় পড়িয়া আমাদের সকলকে শুনাইতেন। শেষে যাইবার কিছুদিন আগে জর্মানীর ভাষা শিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন।"[১] ব্যক্তিগত জীবনে তিনি জয়পুর কলেজের অধ্যক্ষতা করেছেন, শিক্ষার উন্নতি ও প্রসারে শ্রম নিয়োগ করেছেন, কিন্তু তাঁর স্বল্প-মেয়াদী জীবনের অনেকটা সময় কেটেছে ইংরেজী ও বঙ্গভাষায় বিভিন্ন জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ রচনা করে ও পত্র-পত্রিকার সম্পাদনা করে। তাঁর বাঙলা ভাষায় রচিত উল্লেখযোগ্য রচনা—(ক) অশোকচরিত, (১৮৮১ খ্রীঃ) (খ) বুদ্ধচরিত (১৮৮১-৯২ খ্রীঃ) (গ) নববিধান কি? (১৮৯৬ খ্রীঃ)।

'অশোকচরিত' কৃষ্ণবিহারী সেনের শ্রেষ্ঠ গদ্য গ্রন্থ। সম্রাট অশোক সম্বন্ধে এটি বঙ্গভাষায় রচিত প্রথম প্রামাণ্য গ্রন্থ। লেখক এই গ্রন্থটি রচনায় যথেষ্ট পরিশ্রম ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন। গ্রন্থটির বিষয়বস্তু

১. যোগেন্দ্রনাথ খাস্তগীর-সম্পাদিত সারদাসুন্দরী দেবীর আত্মকথা, পৃ. ৮।

তিনি কয়েকটি সূত্রে উদ্ধার করেছেন—প্রথমতঃ নেপাল, সিংহল ও ব্রহ্মদেশের ধর্মসাহিত্য ও বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস থেকে ; দ্বিতীয়তঃ অশোকের শিলাস্তম্ভ ও প্রস্তরফলকের উপর লেখাগুলির অনুবাদ থেকে ( Cunningham-এর টীকা ও অনুবাদ ) ; তৃতীয়তঃ Burnouf-এর Introduction at historic du Buddhisme Indian ও Bishop Bigandet-এর Vie on Legende de Gandama ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে। কাজেই অশোকের ইতিহাস রচনা করতে লেখককে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়েছে। গ্রন্থটির ভূমিকায় লেখক এই মন্তব্য করেছেন,—"সুতরাং ইতিহাসটি রচনা করিতে বিশেষ পরিশ্রম হইয়াছে। ঘটনাগুলিকে একসূত্রে গ্রথিত করা এবং তাহাদিগের উপর মতামত প্রকাশ করা—এ দুইটি বিষয়ের দায়িত্ব লেখক সম্পূর্ণরূপে আপনার করিয়া লইয়াছিলেন।" গ্রন্থটির নাম 'অশোকচরিত' হলেও একে সাধারণ চরিত-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা চলে না। গ্রন্থটিতে ঐতিহাসিক নিষ্ঠা, সুচিন্তিত মনন ও অনুশীলিত ধর্মৈষণার পরিচয় পাওয়া যায়। 'অশোকচরিত'কে অধ্যাপক সুকুমার সেন মহাশয় সঙ্গত কারণেই বাঙলা সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ জীবনী-গ্রন্থের মর্যাদা দিয়েছেন।

'অশোকচরিতের প্রথম পরিচ্ছেদগুলিতে—'পালিভাষার প্রকাশ', 'দেশের অবস্থা', 'মৌর্যবংশ', 'বৌদ্ধদিগের মহাসভা'—ইত্যাদি অংশে ঘটনা বর্ণনা ইতিহাস তন্নিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। অশোকের জীবন নানা বিচিত্র ঘটনায় পূর্ণ। নিষ্ঠুর অশোকের শান্তশীল বৌদ্ধে রূপান্তরিত হওয়া, অশোকের দ্বিতীয়া পত্নী সুন্দরী তিষ্যরক্ষিতার পুত্র কুণালের প্রতি দুরভিসন্ধি-মূলক আচরণ ও বোধিদ্রুমের প্রতি ব্যবহার, স্তূপ ও বিহার নির্মাণ, বার্ধক্য ও মৃত্যু—অশোকের জন্মবৃত্তান্ত ও জীবনের নানা ঘটনাবলীতে একদিকে ইতিহাস, অপরদিকে কিংবদন্তীর অনুসরণে 'অশোকচরিত' নিছক পাণ্ডিত্যপূর্ণ নীরস প্রবন্ধ হয়ে থাকেনি, বরং মানবজীবনের বিচিত্র পঞ্চবিধ রস পরিবেশনে রসসমৃদ্ধ সাহিত্য হয়ে উঠেছে। ভাষা নিরাড়ম্বর, সহজ ও সাবলীল এবং সাহিত্যগুণযুক্ত হয়েছে।

অশোকের বাল্য-ইতিহাসটি মনোরম ভাষায় লিখিত। "ব্রাহ্মণ নগরে গিয়া বিন্দুসারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—'মহারাজ, আপনি আমার এই কন্যাটিকে আপনার করিয়া লউন। এটি সর্বাঙ্গসুন্দরী, সর্বপ্রকারে আপনার উপযুক্ত।' বিন্দুসার কন্যাটিকে রাজবাটীতে রাখাইয়া

দিলেন। তাহার পর অন্তঃপুরের স্ত্রীলোকেরা ভাবিল যে, এই কন্যাটি দেখিতেছি অতি সুন্দরী। যদি মহারাজ ইহার মায়ায় মুগ্ধ হন, তাহা হইলে আমাদিগের আর পূর্ব্ববৎ ক্ষমতা থাকিবে না। অতএব কোন-প্রকারে ইহাকে রানী হইতে দেওয়া হইবে না। এই মনে করিয়া তাহারা তাহাকে ক্ষৌরকার্যে নিযুক্ত করিয়া দিল।" বিন্দুসার তাঁর ক্ষৌর-কার্যে সন্তুষ্ট হয়ে তাকে বর প্রার্থনা করতে বললে—"কন্যা বলিল, 'মহারাজ, আমাকে আপনার রাজমহিষী করিয়া লউন। আমি ব্রাহ্মণকন্যা, আপনার মহিষীরা আমাকে এইরূপ অসঙ্গত কার্যে নিযুক্ত করিয়াছেন।'—এরপর বিবাহ। বিন্দুসার সেই কন্যাকে 'প্রধান রাজমহিষী করিয়া লইলেন'।"

"কালক্রমে সেই কন্যার গর্ভে ক্রমান্বয়ে দুইটি পুত্র জন্মিল। প্রথমটি ভূমিষ্ঠ হইবার কালে তাহার মাতার কোন কষ্ট হয় নাই বলিয়া তাহার নাম হইল অশোক এবং দ্বিতীয়টি প্রায় সেই কারণেই বিগতশোক নাম প্রাপ্ত হইল।"[১]

'বুদ্ধচরিত' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। প্রবন্ধগুলি 'সাধনা' পত্রিকায় (১৮৯১ খ্রীঃ—১৮৯২ খ্রীঃ) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। উনিশটি অধ্যায়ে পর্যায়ক্রমে ইহা প্রকাশিত হয়। অধ্যায়গুলি—(১) সূচনা, শাক্যজাতি ও কপিলবস্তু, (২) কপিলবস্তুর স্থান নির্ণয় এবং শাক্য বংশাবলী, (৩) বিদেশে সকলের অবস্থা, (৪) স্বদেশের অবস্থা, (৫) পূর্বজন্ম, (৬) বুদ্ধের অলৌকিক জন্ম, (৭) জন্ম, (৮) বাল্যকাল, (৯) বিবাহ, (১০) বিবাহের পর, (১১) বুদ্ধদেবের জীবনের চারিটি ঘটনা, (১২) বুদ্ধদেবের সন্ন্যাস, (১৩) মহাভিনি-ক্রমণ-বৃত্তান্ত, (১৪) বুদ্ধদেবের পর্যটন এবং শিক্ষারম্ভ, (১৫) বুদ্ধের মনের ইতিহাস, (১৬) মন্ত্রের সাধন ও শরীর পাতন, (১৭) বুদ্ধের সিদ্ধিলাভ, (১৮) নীতির ধর্ম, (১৯) ধর্মচক্র প্রবর্তন। শেষ প্রবন্ধ প্রকাশের পর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফলে প্রবন্ধগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে যেতে পারেননি।[২] 'বুদ্ধ-চরিতে'র প্রবন্ধগুলি পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও বিষয়নির্ভর। বৌদ্ধধর্মের নির্বাণতত্ত্বের সুচিন্তিত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন লেখক। সিদ্ধার্থের নির্বাণপ্রাপ্তিকে কৃষ্ণবিহারী সেন 'প্রত্যাদেশ' রূপে ব্যাখ্যা করেছেন; নববিধান-ধর্মে 'প্রত্যাদেশ' একটা বিশিষ্ট চেতনা। 'প্রত্যাদেশ' তিনিই প্রাপ্ত হন যিনি ঈশ্বর-নিযুক্ত—'প্রত্যাদেশে'র দ্বারাই মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের যোগসূত্রটি রক্ষিত হয়।

---

১. কৃষ্ণবিহারী সেন, অশোকচরিত—পৃ. ৪৯-৫০। ২. সতীকুমার চট্টোপাধ্যায়, সমন্বয়-মার্গ পৃ. ১৩১ ১৩২।

বুদ্ধদেবকে কৃষ্ণবিহারী সেন নিরীশ্বর বলেননি। তাঁহার ধর্মে ঈশ্বরের স্থান ছিল না, একথা সত্য, কিন্তু ঈশ্বর তাঁহাকে ছাড়েন নাই, একথাও সত্য। তিনি প্রত্যাদেশের দ্বারা চালিত হইতেন। বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইবার সমুদয় ইতিহাস এই কথার পরিচয় দিতেছে।"[১] এই জাতীয় ব্যাখ্যায় দার্শনিক প্রজ্ঞা অপেক্ষা ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাসই প্রবল হয়ে উঠেছে।

কৃষ্ণবিহারী সেন 'সাধনা' পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। 'সাধনা' ১২৯৯ সাল থেকে ১৩০২ সাল পর্যন্ত চার বৎসর প্রকাশিত হয়েছিল। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনার পার্শ্বে কৃষ্ণবিহারী সেনের রচনাও স্থান পেত। ধারাবাহিক 'বুদ্ধচরিত' ছাড়াও কয়েকটি রসরচনা —'পরনিন্দার জন্মবিবরণ', (সাধনা, ১২৯৯, প্রথম বর্ষ, প্রথম ভাগ, পৃষ্ঠা —৫৩৯) 'তিনটি অঙ্গুরীয়' (সাধনা, প্রথম বর্ষ, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৩৫৯) প্রকাশিত হয়। 'সাময়িক সার-সংগ্রহ' বিভাগে প্রকাশিত হয়—'বাল্যবিধবা', 'রুষ ও ইংরেজ', 'মোগল রাজপত্নী', 'অহিফেন' (সাধনা, ৩য় বর্ষ, দ্বিতীয় ভাগ)। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা চলে, এই 'সাময়িক সার-সংগ্রহ' বিভাগে জগদানন্দ রায় ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরও লিখতেন।

'সাধনা' পত্রিকার এই জাতীয় প্রবন্ধগুলির মধ্যে কৃষ্ণবিহারী সেনের মনীষা অপেক্ষা রসবোধ, বিশ্লেষণ অপেক্ষা সহাস্য ব্যঙ্গ পরিবেশিত হয়ে রচনাগুলিকে 'সহৃদয়-হৃদয়-সংবাদী' করে তুলেছে।

"যিনি এই গল্পের নায়িকা তাঁহার নাম পরনিন্দা। তাঁর বাবার নাম অহংকার শর্মা এবং মায়ের নাম হিংসা দেবী। ইহাদের যখন শুভ-বিবাহ হয় তখন পৃথিবীময় শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিয়া উঠে এবং স্বর্গ হইতে প্রচুর পরিমাণে পুষ্পবৃষ্টি হয়।"......"পৃথিবী পরনিন্দাকে পাইয়া একেবারে আপ্যায়িত হইলেন। দুইজনের এমন ভালবাসা কেহ কখনও দেখে নাই। দেবতাদিগের আদেশ অনুসারে পৃথিবীর যখনই হাই আসে, অমনি পরনিন্দা আসিয়া তাঁহার কাছে বসেন, আর যেমন কাছে বসেন, অমনি পৃথিবীর আর সে ক্লান্তি থাকে না। এইরূপে সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে, রোগে-শোকে, সকল সময়েই পরনিন্দা তাঁহার কাছে থাকেন। সুখের সময় তিনি তাঁহার সহিত কথা কহিয়া দশগুণ অধিক সুখী হন।

১. কৃষ্ণবিহারী সেন, "বুদ্ধচরিত", সাধনা ১৩০১ সাল, ৩য় বর্ষ, দ্বিতীয় ভাগ।

দুঃখের সময় তাঁহার পানে তাকাইয়া সকল দুঃখ ভুলিয়া যান। পরনিন্দার বচন-অমৃত পান করিলে রোগযন্ত্রণা পলাইয়া যায়। পৃথিবী আর হাই তুলেন না। পরনিন্দা যে কি মিষ্টি সঙ্গী, তাহা পৃথিবী জানিতে পারিয়াছেন।"[১]

'নববিধান কি?' গ্রন্থটি কৃষ্ণবিহারী সেনের সর্বশেষ রচনা। সহজ সাবলীল ভাষায় এই গ্রন্থটিতে 'নববিধানে'র মূলতত্ত্ব ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ঈশ্বরের স্বরূপ, ঈশ্বরের প্রকাশ, সমন্বয়-ধর্ম, নববিধানের আবশ্যকতা কি?—এই চারিটি পর্যায়ে বিস্তারিত আলোচনায় 'নববিধান'-ধর্মের একটি সুস্পষ্ট রূপ ধরা পড়েছে। নববিধান-ধর্ম আকস্মিকভাবে সৃষ্ট নয় —নববিধান-ধর্মের সৃজনে ঐতিহাসিক প্রস্তুতি বা ধর্মবিবর্তনের ধারাটি লেখক সচেতনভাবে লক্ষ্য করেছেন।

সাংবাদিকতা তাঁর সাহিত্যসেবার আর একটি দিক; তিনি সাংবাদিক হিসাবেই তিনটি ইংরেজী পত্রিকার সম্পাদনা করতেন। 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকা, 'লিবারেল' ও 'লিবারেল অ্যাণ্ড নিউ ডিসপেন্‌সেসান'—এই তিনটি পত্রিকায় তিনি বহুদিন নিষ্ঠার সঙ্গে সাংবাদিকতা করে গেছেন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে—তাঁর বয়স যখন মাত্র ত্রয়োদশ বৎসর, তখন থেকেই তিনি সাপ্তাহিক 'মিররের' সম্পাদনা সুরু করেন। এই পত্রিকায় ধর্ম, নীতি, সমাজ, শিক্ষা প্রভৃতি নানা বিষয়ে ওজস্বিনী ভাষায় জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশ করতেন কৃষ্ণবিহারী সেন। 'লিবারেল' (সাপ্তাহিক) পত্রিকাটির সম্পাদনার ভার কেশবচন্দ্র সেন অনুজ কৃষ্ণবিহারী সেনের উপর অর্পণ করেন (১৮৮২ খ্রী.)। কিছুদিন পরে এই পত্রিকাটিই কেশবচন্দ্র সেন-পরিচালিত 'দি নিউ ডিসপেন্‌সেসান'-এর সঙ্গে মিলিত হয়ে 'দি নিউ ডিসপেন্‌সেসান অ্যাণ্ড দি লিবারেল' নামে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় কৃষ্ণবিহারী সেনের নববিধান-ধর্ম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা প্রকাশিত হত। 'লিবারেল' পত্রিকায় (৮ই এপ্রিল, ১৮৮২ খ্রী.) কৃষ্ণবিহারী সেনের সাহিত্য-সমালোচনাও প্রকাশিত হত। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 'লিবারেল' কাগজে সমালোচনা প্রকাশিত হয়। বোধ করি, কৃষ্ণবিহারী সেনের এই আলোচনাটিতেই বঙ্কিমচন্দ্রের

---

১ কৃষ্ণবিহারী সেন, 'পরনিন্দার জন্ম বিবরণ', সাধনা, প্রথমবর্ষ, প্রথমভাগ, ১২৯৯।

'আনন্দমঠে'র সমালোচনার সূত্রপাত। "প্রকৃত হিন্দুধর্ম জ্ঞানাত্মক, সেই জ্ঞান দুই প্রকার—বহির্বিষয়ক ও অন্তর্বিষয়ক। আমাদের দেশে বহির্বিষয়ক জ্ঞান নেই— সেটি ইংরেজদের কাছ থেকে শিখতে হবে। ইংরেজ বহির্বিষয়ক জ্ঞানে ও লোকশিক্ষায় পটু। সেই কারণেই মুসলমান রাজত্বের অবসানে ইংরেজ শাসন প্রবর্তিত হওয়া প্রয়োজন ছিল। হিন্দুর দর্শনে শুধু ভক্তি ও ধর্মের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু প্রাচ্য দর্শনের সঙ্গে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান ও কর্মকে মিলিয়ে দিতে হবে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে এই সত্যটি উপন্যাসের শেষ পবিচ্ছেদে ব্যাখ্যাত হয়েছে। 'আনন্দমঠে'র এই আকস্মিক পরিণতির মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্ব প্রচাবের তাগিদটির প্রাধান্যে আমাদের শিল্পচেতনা ব্যথিত হলেও প্রজ্ঞাবান্ কৃষ্ণবিহাবী সেন সমালোচনায় কোন তর্ক বা বিচারের অবতারণা করেননি; বরং বঙ্কিমেব সমাধানকেই সমর্থন করে উপন্যাসটির সার্থকতা উপলব্ধি করেছেন।"[১]

কৃষ্ণবিহাবী সেন স্বল্পকালেব জন্য বাঙ্গলা সাহিত্যাকাশে উদিত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুব, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদানন্দ বায় প্রমুখ সাহিত্যিকগণের সঙ্গে তিনি সারস্বত সাধনার আয়োজনে সবে প্রস্তুত হচ্ছিলেন, এমনই সময় ১৮৯৫ খ্রী. অর্থাৎ 'সাধনা'র চতুর্থ বর্ষে তিনি মাত্র আটচল্লিশ বছর বয়সে মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পরে ররীন্দ্রনাথ সাধনা পত্রিকায় যে মন্তব্য করেন, সেটির উদ্ধৃতি এ স্থানে বাহুল্য হবে না।

"তাঁহার ন্যায় বহু অধ্যয়নশীল উদারবুদ্ধি সহৃদয় ব্যক্তি বঙ্গদেশে অতি বিরল। এই বন্ধুবৎসল স্বদেশহিতৈষী ঈশ্বরপ্রেমিক মহাত্মা মৃত্যুর কিছুকাল পুর্বে বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সাধনার পাঠকগণ তাহার পরিচয় পাইয়াছেন। এই মনস্বী পুরুষের সহায়তায় বঙ্গভাষা বিশেষ আশান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল, সে আশা পূর্ণ না করিয়াই তিনি অন্তর্হিত হইয়াছেন।" (সাধনা. আষাঢ়, ১৩০২)

এই উদ্ধৃতিটি সাহিত্যিক কৃষ্ণবিহারী সেনের সাহিত্যবিচারের মাপকাঠি মনে করা চলে। তিনি যদি দীর্ঘজীবী হতেন, তবে হয়তো নববিধান-সাহিত্য তাঁর প্রতিভার স্পর্শে আরও সমৃদ্ধতর হতে পারত।

---

১. 'আনন্দমঠের প্রথম (১২৮৯ সাল, ১৮৮২ খ্রী.) ও দ্বিতীয় (১২৯০ সাল, ১৮৮৩ খ্রী.) সংস্করণের ভূমিকায় 'লিবারেল' পত্রিকায় প্রকাশিত (৮ই এপ্রিল, ১৮৮২) কৃষ্ণবিহারী সেনের এই সমালোচনাটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

**প্যারীমোহন চৌধুরী :**

প্যারীমোহন চৌধুরী নববিধান-ধর্মের একান্ত অনুগত প্রচারক ছিলেন। তিনি ছিলেন কেশবচন্দ্র সেনের কাছের মানুষ। কেশবচন্দ্র সেনের প্রার্থনা, উপদেশ ও বক্তৃতার অন্যতম অনুলেখক ছিলেন প্যারীমোহন চৌধুরী। তিনি অধিকাংশ সময়ে যথাযথ শ্রুতলিপি নিতেন ; কখনও বা কেশবচন্দ্র সেনের বক্তৃতাগুলি শুনবার সময় কয়েকটি চিহ্ন রাখতেন, পরে ভাবযোগে স্মৃতির সাহায্যে তাৎপর্য লিখে প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করতেন। তাঁর এই জাতীয় রচনা 'প্রতিমা' ( ১৯১২ খ্রীঃ )। এই গ্রন্থে কালী, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও নৃত্যকালী ইত্যাদি দেবীমূর্তির কেশব সেন-কৃত ব্যাখ্যার অনুলেখন করেছেন। তিনি নিজেকে 'প্রত্যাদেশ লেখক' রূপে পরিচয় দিতেন। বক্তৃতার অনুলেখন ছাড়াও তাঁকে লেখকের নানাবিধ কাজ করতে হত। 'উপদেশ লেখকতা', 'কলিকাতা বিদ্যালয়ে নীতি শিক্ষা', 'মিরারে' পত্র লেখা, 'মিরারে'র প্রুফসংশোধন ও পাঠকতা—এই কাজগুলির ভার প্যারীমোহন চৌধুরীর উপর ন্যস্ত হয়। ১৭৯৬ শক—মঙ্গলবার ১লা পৌষের প্রচারকগণের কার্যনির্বাহক সভায় সভাপতি কেশবচন্দ্র সেনের সভাপতিত্বে উক্ত কাজগুলির দায়িত্ব প্যারীমোহন চৌধুরীর উপর অর্পিত হয়।[১]

সমাজের বিবিধ কর্মব্যস্ততার মধ্যেও তিনি কয়েকটি মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন। 'উপাসনাতত্ত্ব' ( ১৭৯৬ শক ) ; 'ব্রহ্মকন্যা', 'সুনীতিকুসুম', 'সত্যরত্ন', ( ১৯১৯ খ্রীঃ ) ; 'নবলীলা' ( ১৮০৯ শক ), 'ঈশার অনুকরণ', 'নববিধান', ও 'সংগীত-সুধালহরী'—ইত্যাদি গ্রন্থগুলি তাঁর সাহিত্য-প্রতিভার পরিচয় বহন করছে।

১৭৯৬ শকের ধর্মতত্ত্বে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি 'উপাসনাতত্ত্ব' নামে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। আরাধনা-তত্ত্বে আরাধনার নবীনতর এবং নিগূঢ়তর সত্যসকল প্রকাশিত হয়েছে। ব্রহ্মধ্যান কি ? আলোচনা করেছেন 'ধ্যান' প্রবন্ধে। "ধ্যানশীলতা-প্রভাবে তিনি আমাদের 'ধ্যেয়' এবং আমরা তাঁহার 'ধ্যাতা' এবং অন্তরের যে নিগূঢ় কার্য দ্বারা ঈশ্বরের সঙ্গে আমরা এই সম্পর্কে সাধন করি—তাহারই নাম 'ধ্যান'।" (ধ্যান—ধর্মতত্ত্ব, ১৭৯৬ শক, ১লা পৌষ)। এই প্রবন্ধগুলি প্যারীমোহন চৌধুরীর গভীর প্রজ্ঞা ও মননজাত। এ ছাড়া বিভিন্ন মাসিক

১. প্রচারকগণের সভার নির্ধারণ, পৃ. ২৮।

পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধ এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। নিঃস্বার্থ জীবন ( বিভাকর পত্রিকা—১২৭৮ ), জীবন ও সৌন্দর্য (বিভাকর—১২৭৮ ), ব্রহ্মনাম ( বঙ্গবন্ধু, ২৩ সংখ্যা ), দীনসেবা, শিশুদিগের আমোদ, সন্তান-বাৎসল্য ( সুলভ সমাচার—১২৮৩ ), পবিত্রতা ও সতী স্ত্রী ( বামাবোধিনী পত্রিকা—১৭৯৩ শক ),—ইত্যাদি প্রবন্ধাবলী বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। কথোপকথনের ভঙ্গীতে 'মোক্ষদা এবং জ্ঞানদা' ( বামাবোধিনী পত্রিকা, পৌষ, ১৭৯২ শকাব্দ ) ও 'সুরুচি এবং সুনীতি' ( অবলা-বান্ধব, ১৮৭০ খ্রীঃ ) প্রবন্ধ-দুটিতে পাত্র-পাত্রীর সংলাপের মধ্য দিয়ে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এই স্টাইলটি নববিধান-সাহিত্যে নতুন।

'সুনীতি-কুসুম' গ্রন্থে সুনীতিপূর্ণ বিষয় ও চিত্তাকর্ষক গল্পের মধ্য দিয়ে নৈতিক জীবনের শিক্ষা দিয়েছেন প্যারীমোহন চৌধুরী। এই গ্রন্থের অনেকগুলি গল্প ইতিপূর্বে 'ধর্মতত্ত্ব', 'বামাবোধিনী' ও 'সুলভ সমাচার' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। কলিকাতা বিদ্যালয়ে নীতিশিক্ষা দানের দায়িত্ব লেখক ১৮৭৪ খ্রীঃ থেকে গ্রহণ করেন। গভীরতর জীবনবোধ থেকে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, নীরস নীতি জনমানসে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। মজাদার গল্পের মধ্য দিয়ে নীতিজ্ঞান সহজেই জনসাধারণের অন্তরকে স্পর্শ করতে পারবে। 'সুনীতি-কুসুমে'র আখ্যানগুলি দেশী ও বিদেশী—কিংবদন্তী, পুরাণ, প্রচলিত কাহিনী থেকে সংগৃহীত। গল্পের শেষে নীতি ব্যাখ্যাত হয়েছে। এগুলিকে 'প্যারাবেল'-ধর্মী রচনা বলা চলে।

'সত্যরত্ন' ( ১৯১৯ খ্রীঃ )—ধর্ম ও উপদেশমূলক গ্রন্থ। ঈশ্বর, মানব ও স্বর্গ সম্পর্কে বিভিন্ন স্থানের ব্রহ্মমন্দিরে প্যারীমোহন চৌধুরী যেসব উপদেশ ও বক্তৃতা দিয়েছিলেন ( ১৮৮৫ খ্রীঃ থেকে ১৯১৯ পর্যন্ত ), সে সব সত্যবাণীও 'সত্যরত্ন' গ্রন্থে সংগৃহীত হয়েছে। বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি নির্বাচিত প্রবন্ধও এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

'নবলীলা' ( ১৮০৯ শক )—নাটক ও কীর্তনের মধ্যে নববিধান ধর্ম প্রচার শুরু করেছিলেন ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল। তাঁর রচিত 'নববৃন্দাবন' ও 'কালসংহার' নাটকের ছায়ায় প্যারীমোহন চৌধুরী রচনা করলেন 'নবলীলা' নাটক ( ১৮০৯ শক )। সম্পূর্ণরূপেই ধর্মপ্রচারের 'কল' তৈরি হয়েছে নাটকটি। নবলীলা নাটকে যত না সংলাপ, তদপেক্ষা বেশি সংগীত। রাগরাগিণীর উল্লেখ-সহ রাগসংগীত, কীর্তন, ভজন, বাউলগীত,—সব সংগীতই স্থান

পেয়েছে নাটকটিতে। এটিকে অনেকটা অপেরা-জাতীয় নাটক বলা চলে। নাটকের মূল সুরটি একটি গীতে প্রকাশিত—

আমরা ব্রহ্মের কন্যা ব্রহ্মের তনয়।
বিচিত্র ব্রহ্মের নবলীলা অভিনয়।
অনিমেষে দেখি আর প্রেমরসে ভাসি।
জানি না দুঃখের কান্না ব্রহ্মানন্দে হাসি।

—নবলীলা

'ঈশার অনুকরণ'—লেখক ইংলণ্ডে থাকালীন এই গ্রন্থের কয়েকটি অধ্যায় অনুবাদ করেন। কেশবচন্দ্র সেনের মৃত্যুর পর 'ধর্মতত্ত্বে' প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়। পরে গ্রন্থাকারে পুনর্মুদ্রিত হয়। 'ঈশার অনুকরণ' সাধকদিগের পক্ষে প্রয়োজনীয় গ্রন্থ।

'সংগীত-সুধালহরী'—সংগীত পুস্তকটিতে ২৬টি কীর্তন, একটি বাউল গীতি আছে। রাগরাগিণীর উল্লেখ-সহ ধর্মমূলক সংগীত। নববিধানের সমন্বয়ী ধর্মে বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মের মিলন কল্পিত হয়েছে একটি কীর্তনে—

দাও মা নির্বাণ, দাও মা নির্বাণ
ও মা, শাক্যের জননী।
ঢালি শান্তি-জল, নিবন্ত দুঃখানল
শান্তিদায়িনী জননী।

—সংগীত-সুধালহরী, পৃঃ ৫

প্যারীমোহন চৌধুরী কেশবচন্দ্র সেনের অনেকগুলি ইংরেজী বক্তৃতার বাংলা অনুবাদ করেছেন। ১৮৬৬ খ্রীঃ টাউন হলে প্রদত্ত কেশবচন্দ্র সেনের বিখ্যাত বক্তৃতা Great Men-এর বঙ্গানুবাদ করেছেন—'মহাপুরুষ' ( ১২৮৪ সাল )। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে ফেব্রুয়ারী কেশবচন্দ্র সেন 'নেটিভ ফিমেল ইমপ্রুভমেণ্ট' বিষয়ে কলকাতা টাউন হলে বক্তৃতা করেন। তারই অনুবাদ, 'এতদ্দেশীয় স্ত্রীজাতির উন্নতিবিষয়ক প্রস্তাব'। **Behold the Light of Heaven in India**-র বাঙ্গালা অনুবাদ 'ভারতে স্বর্গীয় জ্যোতি' ( ১৭৯৯ শক )। কেশবচন্দ্রের বক্তৃতার ১৩ নং ট্রাক্ট-এর অনুবাদ 'জ্ঞানলতিকা'। প্যারীমোহন চৌধুরী কেশবচন্দ্র সেনের জগদ্বিখ্যাত বক্তৃতাগুলি বাঙ্গালায় অনুবাদ করে বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকার পরম উপকার সাধন করেছেন।

কেশবচন্দ্র সেনের ইংলণ্ডে প্রদত্ত বক্তৃতা 'England's duties to India'র অনুবাদ করেছিলেন তিনি 'ভারতের প্রতি ইংলণ্ডের কর্তব্য।'

বিনয়েন্দ্রনাথ সেন ( ১৮৬৮ খ্রীঃ—১৯১৩ খ্রীঃ ) :

কেশবচন্দ্র ভূমি প্রস্তুত করে গিয়েছিলেন। কেশব-প্রভাবিত নব-বিধানের সুকর্ষিত, সুসংস্কৃত ভূমিতে বিনয়েন্দ্রনাথ সেনের আবির্ভাব। ইতিহাস ও দর্শনে ( এম. এ., কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ) বিশেষ দক্ষতা অর্জন করে অধ্যাপনার কাজ গ্রহণ করেন। প্রথমে ভাগলপুরে, পরে ১৮৯৩ খ্রীঃ থেকে ১৯১৩ খ্রীঃ পর্যন্ত প্রেসিডেন্সি কলেজে তিনি সর্বজনপ্রিয় অধ্যাপকরূপে কাজ করেছেন। ১৮৯৯ খ্রীঃ থেকে তিনি 'নীতিবিদ্যালয়ের কার্যভার গ্রহণ করলেন। কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুটের সঙ্গে বিনয়েন্দ্রনাথ সেন নামটি বিশেষভাবে জড়িত হয়ে আছে। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে তিনি এই সংস্থাটির সঙ্গে জড়িত। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এর সম্পাদক নিযুক্ত হন। এখানে নানা বিষয়ে বক্তৃতা দিয়ে তৎকালীন ছাত্রদের তিনি বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করতেন এবং বিভিন্ন দিক থেকে এর উন্নতিসাধন করে কলিকাতা ইউনির্ভার্সিটি ইনস্টিটিউটকে সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র-রূপে গড়ে তোলেন। মনস্বী বিনয়েন্দ্রনাথ তাঁর পাণ্ডিত্য ও মননের জন্য তৎকালীন সুধীজনের মধ্যে আপন আসনটি স্থায়ী করে নিয়েছিলেন। তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ "দি ইন্টেলেক্চুয়াল আইডিয়াল" ইংরেজীতে লেখা ; অন্যান্য বক্তৃতা, সাহিত্য এবং ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধ ( অধিকাংশই ইংরেজী ভাষায় ) তাঁর মনীষা ও গভীর ধর্মচেতনার পরিচায়ক। ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতা ও গ্রন্থ-রচনা ছাড়াও বিনয়েন্দ্রনাথ সেন দুটি বাঙলা গদ্য গ্রন্থ রচনা করেন।

'আরতি' ( ১৯১০ খ্রীঃ ) ও 'গীতা অধ্যয়ন'—এই দুটি গ্রন্থের বিষয়ই অধ্যাত্ম-চিন্তা ও ধর্ম-আলোচনা। "ব্রহ্মোপাসনাই তাঁর জীবনের অন্ন-পান ছিল। সদালাপ, ব্রহ্মসংগীত গান ও উপাসনা"[১] তাঁর জীবনের একমাত্র আনন্দ ছিল। বিনয়েন্দ্রনাথ সেনের 'আরতি'র বিষয়বস্তু ধর্ম হলেও বিশ্লেষণের বিশিষ্ট ভঙ্গীতে বক্তব্য পরিবেশনের সহজ নৈপুণ্য ও ঝর্ণাধারার মত চলমান গদ্যের সৌন্দর্যে তাঁর গ্রন্থখানি বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য। কারণ "তিনি সৌন্দর্যের উপাসক ছিলেন—সৌন্দর্যে পূর্ণতার আত্মপ্রতিষ্ঠা পুণ্যের উজ্জ্বল

১. দেবেন্দ্রনাথ বসু, মহাত্মা বিনয়েন্দ্রনাথ সেনের জীবনী, পৃ. ৭।

আত্মপ্রকাশ।"[১] তাঁর জীবনের সৌন্দর্য ও সামঞ্জস্য-চেতনা গদ্যরচনার মধ্যে ফুটে উঠেছে।—"আকাশে তারা, কাননে ফুল, অগণন দীপরাজি—জ্যোতির্ময়ে জগৎ পূর্ণ। কিন্তু কেউ তো দেখলে না তাঁকে—দেখলে কেবল তাঁর ভক্ত, তাঁর সন্তান মানুষ। এই মানুষ ব্রহ্মসন্তান, তাই ভগবান্ বললেন—'মানুষ, তোমাকে আমি এই মহোচ্চ অধিকার দিলাম—তোমার ঐ দীপের জ্যোতিতে প্রকাশিত হবে।' তাই তিনি চান মানুষের হাতে বিশ্বাস ও ভক্তির দীপ জ্বলবে।"[২] কিংবা—"কোন্ দরিদ্রের অধিকার নেই হিমালয়ের সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হ'তে? কোন্ রাজার এ ঐশ্বর্য আছে যে চোখ খুলে তাঁর ঐশ্বর্য দেখতে পায়? কোন্ সম্রাটের সেই ঐশ্বর্য আছে যা দিয়ে দরিদ্র ফুলে ফলে, আকাশে ভাই-বন্ধুর মুখে সৌন্দর্য উপভোগ করে?"[৩]

'আরতি' গ্রন্থে কয়েকটি প্রবন্ধে তিনি চলিত গদ্য ব্যবহার করেছেন। নববিধান-সাহিত্যিকদের মধ্যে এই প্রথম চলিত গদ্যের নিদর্শন পেলাম। একদিকে ভারসাম্য ও অপরদিকে বক্তৃতার গতিবেগ রক্ষিত হওয়ায় তাঁর ভাষায় চলিত-গদ্যের ধারটুকু স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ভাষায় লাবণ্য বৃদ্ধি হয়েছে। "আর এই জীবনের স্রোত ব'য়ে যাচ্ছে তার জীবনের মধ্য দিয়ে। আর এই জীবনের স্রোত যত সতেজ হয়ে বইছে, ততই সে মৃণালে, কোরকে, দলে, শীর্ষে বিকশিত হ'য়ে উঠছে। তার জীবন খুঁজছে পূর্ণতা, এই পূর্ণতা খুঁজতে গিয়ে সে সম্বন্ধ পাতিয়েছে এত জিনিষের সঙ্গে, কিন্তু সে কি জানত, কেমন করে তার মধ্যে বিচিত্র রং ফলবে, কেমন করে সূর্যের সোনার রং এসে তার বুকে পড়ে তার প্রাণটিকে সাজাবে। সে ভাবনা সে ভাবেনি, সে সুখ-বিলাস চায়নি, সে জীবনকে ফুটিয়ে তুলেছিল। তারপর, সময়ে চন্দ্র, সূর্য, সরোবর, সমীরণ আপনাদের মাধুরীরাশি দিয়ে তার শোভাকে বিচিত্র মধুময় করে দিল।"[৪] নববিধান-সাহিত্যের গদ্যে এই ভাষা অভিনব। কেশবচন্দ্র সেন বাঙলা গদ্যে যে কবিত্ব ও অতীন্দ্রিয়তার সৃষ্টি করেছিলেন বিনয়েন্দ্রনাথের গদ্যে যেন তারই পরিচয় মুদ্রিত আছে। অতীন্দ্রিয়তার সঙ্গে রবীন্দ্র-প্রভাবিত রোমান্টিসিজম মিশ্রিত হয়ে ভাষার সৌকর্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

১. বিনয়েন্দ্রনাথ সেন, আরতি, ভূমিকা, ধীরেন্দ্রনাথ সেন, পৃ. ৶০। ২. তদেব, পৃ. ১। ৩. তদেব, পৃ. ৬। ৪. তদেব, পৃ. ২২।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিনয়েন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল।[১] বিনয়েন্দ্রনাথের রচনায় জ্ঞানের সঙ্গে ভাবের অপূর্ব মিশ্রণ দেখে একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেন—"আমাদের দেশে ভাবুকশ্রেণী বিরল। জ্ঞানের সঙ্গে ভাবের সঙ্গে একেবারে নাড়ীর সম্পর্ক এমন লোক অল্প বলিয়া আমার মানস প্রকৃতি যেন ক্ষুধিত থাকে। বাহিরের প্রকৃতি হইতে যেমন অব্যবহিত নিগূঢ় ভাবে আনন্দ পাই, তেমনি মানুষের মনের অব্যবহিত সংস্পর্শ হইতে জ্ঞান ও ভাব সহজে লাভ করিবার জন্য আমার পিপাসা। আমি অধ্যয়নপরায়ণ তপস্বী সম্প্রদায়ভুক্ত নহি। আপনার গ্রন্থের মধ্যে আপনি নিজেকে বর্তমান রাখিয়াছেন বলিয়া, ইহার মধ্যে আপনার মানবহৃদয়ের সংস্রব পাইয়াছি বলিয়া এই গ্রন্থ হইতে এত উপকার পাইলাম।"[২] —এটি অবশ্য তাঁর 'ইন্‌টেলেক্‌চ্যুয়াল আইডিয়াল' গ্রন্থটি পাঠের পর লেখা, তবুও ঐ গ্রন্থটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যে রসপর্যালোচনা সেটি তাঁর বাঙ্গালা গদ্যগ্রন্থ 'আরতি' সম্পর্কেও প্রযোজ্য। প্রকৃতপক্ষে বিনয়েন্দ্রনাথ সেন জ্ঞানালোকে যেটি লাভ করতেন কবিমনীষা দিয়ে তাই ভাবের সামগ্রী, সাহিত্যের সামগ্রী করে তুলতেন। সর্বোপরি তাঁর রচনায় বিষয়ের সূচিতে তাঁর কৃতিত্ব নয়, বরং রচনায় তাঁর আপন ব্যক্তিত্ব "মানবহৃদয়-সংস্রব"[৩] টি এতই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠত যে বিনয়েন্দ্রনাথের মত ব্যক্তির সজীব স্পর্শ পাওয়ার জন্য রবীন্দ্রনাথের মত ভাববাদী সৌন্দর্যবাদী কবির "মানসপ্রকৃতি যেন ক্ষুধিত"[৪] হয়ে উঠেছিল।

'আরতি' গ্রন্থের শেষের কয়েকটি প্রবন্ধে 'নববিধান'-ধর্মের সহজ অথচ যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন লেখক। প্রবন্ধগুলির সর্বত্র পুরাণ, বেদ,

---

১. "একই ধর্মসাধকগোষ্ঠীভুক্ত প্রমথলাল সেন, মোহিতচন্দ্র সেন প্রভৃতির ন্যায় তিনি কবির একান্ত অনুরাগী ছিলেন। যুরোপ-ভ্রমণের সঙ্গীরূপে রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ সঙ্গে নাই দেখিয়া অবিলম্বে তাহা পাঠাইয়া দিতে অনুরোধ করিতেছেন, তাঁহার চিঠিপত্রে এবিষয়ে উল্লেখ দেখি। ব্রাহ্মসমাজের কাজেও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁহার যোগাযোগ ঘটিয়াছিল। ১৮৯৬ সালে ভারতবন্ধু জে. টি. সাণ্ডারল্যাণ্ড যখন 'ব্রিটিশ এ্যাণ্ড ফরেন ইউনিটারিয়ান আসোসিয়েশন'র প্রতিনিধিরূপে ভারতবর্ষে আসেন, তখন তাঁর প্রস্তাবক্রমে ঐ অ্যাসোসিয়েশনের সহিত সহযোগিতা করিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন শাখার প্রতিনিধির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ও বিনয়েন্দ্রনাথ সেন উভয়ই সদস্য ছিলেন। ১৯১১ সালে 'তত্ত্ববোধিনী সভা' পুনর্গঠনকালে রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন শাখার প্রতিনিধিদের লইয়া যে সমিতি গঠন করেন, তাহাতে বিনয়েন্দ্রনাথ সেন সদস্য নিযুক্ত হন।" বিশ্বভারতী পত্রিকা. কার্ত্তিক-পৌষ, ১৩৫৮ পৃ. ৬২। ২. বিনয়েন্দ্রনাথ সেনকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র, (বিশ্বভারতী, কার্ত্তিক-পৌষ ১৩৫৮ পৃ. ৬০)। ৩. তদেব। ৪. তদেব।

উপনিষদ ও বাইবেল ইত্যাদি শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে উল্লিখন (অ্যালিউশন) সহযোগে বক্তব্যকে সহজ করেছেন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দর্শনে সুপণ্ডিত হলেও রচনায় কোথাও পাণ্ডিত্য প্রকাশের চেষ্টা নেই। রচনার বিষয় অপেক্ষা বিষয়ীর প্রাধান্য। 'আরতি' গ্রন্থখানি নববিধান-সাহিত্যকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ যথার্থভাবেই বিনয়েন্দ্রনাথ সেন সম্পর্কে বলেছেন, "শাস্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য যে কঠোর তপস্যা চাই" এবং "শাস্ত্রকে নিজের করিয়া লইবার যে সহজ প্রতিভা," উভয়ই তাঁর মধ্যে ছিল। তিনি জ্ঞানের কথাকে কল্পনার দ্বারা দীপ্যমান করে তুলেছেন অতি সহজে।

১৩১৩ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যা বঙ্গদর্শনে 'বর্তমান যুগেব স্বাধীন চিন্তা' নামে বিনয়েন্দ্রনাথ সেনের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাঁর ঐ প্রবন্ধটিতে সমসমাজ-মানসের সুচিন্তিত, যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা করেছেন: "আমাদের বর্তমান আন্দোলনে একটা স্থানে, আমার মনে হয়, বড় একটা শূন্য ও অন্ধকার থাকিয়া গেছে, সেদিকে বড় কেহ মনোযোগ করেন নাই। এই উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সমস্ত ইতিহাসের কূলে একটা ভাব আছে যাহা পশ্চিমেরও নয়, কিন্তু যাহা এই যুগের, সে ভাব এই বর্তমান যুগের স্বাধীন চিন্তা।"[১]

বঙ্গদর্শনের সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন: "প্রবন্ধটি বিশেষ সমাদরযোগ্য হইয়াছে এবং আমার মতের সঙ্গে ইহার কোনো অনৈক্য নাই। আমি বিরোধ ও বিদ্বেষপরবশ জাতীয় ভাবের পক্ষপাতী নই—আমি বিধাতার নির্দিষ্ট স্বাভাবিক অধিকার ও অনুরাগমূলক জাতীয় ভাবের সমর্থন করিয়া থাকি।"[২]

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দেশ-বিদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে বিনয়েন্দ্রনাথ বহু পত্র লিখেছেন।[৩]

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে বিনয়েন্দ্রনাথ অজন্তাভ্রমণে বের হন। ঐ ভ্রমণের বৃত্তান্ত কয়েকটি পত্রে সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। ১৯০৫ খ্রীঃ জেনিভার ধর্মমহাসভায় যোগদান করার পথে ইউরোপ ও আমেরিকা, বিভিন্ন স্থানে 'নববিধানে

১. বিনয়েন্দ্রনাথ সেন, বর্তমান যুগের স্বাধীন চিন্তা, বঙ্গদর্শন, ১৩১৩, আষাঢ়। ২. বিনয়েন্দ্রনাথ সেনকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র, (বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্ত্তিক-পৌষ. ১৩৫৮)। ৩. 'মহাত্মা বিনয়েন্দ্রনাথ সেনের জীবনী'তে দেবেন্দ্রনাথ বসু এই জাতীয় পত্রাবলী সংকলন করেছেন।

পরবর্তী' প্রচার করেন। জাহাজ থেকে ও বিদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে (লণ্ডন, প্যারী, ভেনিস, মন্টিট্রল, বোস্টন) লেখা পত্রগুলি পাঠে ভ্রমণ-কাহিনীর স্বাদ পাওয়া যায়। চলিত ভাষায় সহজ, বিনয়ী, নম্র মানুষটির অন্তর ধরা পড়েছে। বিনয়েন্দ্রনাথ সেন তাঁব বিশাল বিনয়ী হৃদয় দিয়ে সকল স্বভাবের মানুষকে কাছের মানুষ করে নিতে পারতেন। পত্রাবলীর পত্রে পত্রে বিনম্র বিনয়েন্দ্রনাথের হৃদয়কুসুম প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। সুগভীর রবীন্দ্রপ্রীতিই হয়তো অজ্ঞাতে তাঁর পত্রগুলিব মধ্যে কবি-লিখিত 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' (১৮৮১ খ্রীঃ) ও 'য়ুরোপ-যাত্রীব ডায়ারি'র (২ খণ্ড, ১৮৯১ খ্রীঃ, ১৮৯৩ খ্রীঃ) প্রভাব বিস্তার করেছে।

মোহিতচন্দ্র সেন (১১ই ডিসেম্বর, ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ ৯ই জুন, ১৯০৬ খ্রীঃ):

অধ্যাপক জয়কৃষ্ণ সেনের সুযোগ্য পুত্র মোহিতচন্দ্র সেন দর্শন ও সাহিত্যে প্রগাঢ় অনুরাগ ও মনীষার পরিচয় রেখে গেছেন। বিধানবাদী মোহিতচন্দ্র সেন, প্রমথলাল সেন ও বিনয়েন্দ্রনাথ সেনেব সঙ্গে নববিধানের Prayer Meeting ও নীতি-বিদ্যালয়ের কাজ সুরু করেন। ইংরেজী সাহিত্য ও ইউরোপীয় দর্শনে তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিচয় বাখলেও সংস্কৃত সাহিত্য ও হিন্দুশাস্ত্রে একান্ত নিষ্ঠা ও অনুরাগ দেখিয়েছেন।[১] পাশ্চাত্য সাহিত্যিকগণের মধ্যে ওয়ার্ডস্বার্থ, ব্রাউনিং, কারলাইলি ও এমারসনের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর বিখ্যাত রচনা "এলিমেণ্টস্ অব মর‍্যাল ফিলসফি" ইংরেজী ভাষায় রচিত। এছাড়া তাঁর অধিকাংশ সাহিত্য ও সাহিত্য সমালোচনা ইংরেজী ভাষায় রচিত হলেও বঙ্গসাহিত্যে মোহিতচন্দ্র সেনের কৃতিত্ব উপেক্ষনীয় নয়। রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থাবলীর' সম্পাদনা বঙ্গসাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। শান্তিনিকেতন ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর নৈকট্য ও প্রীতি ছিল সুগভীর। তিনি বোলপুর বিদ্যালয়ে কিছুকালের জন্য অধ্যক্ষতা করেছেন।

১, তিনি মাণ্ডুক্য-উপনিষদ্ ইংরেজী কবিতায় অনুবাদ করেন। সিস্টার নিবেদিতার মোহিতচন্দ্র সেনকে লিখিত একটি পত্র তাঁর পাণ্ডিত্য ও কবিত্বশক্তির প্রমাণ হিসেবে উদ্ধৃত করছি: "I understand that the translation is absolutely accurate. And I think the beauty and smoothness of the English language and metre are extra-ordinary."

—Mohit Chandra Sen, Birth Centenary Publication,
Sept. 12, 1905, Page 63.

অসুস্থতার জন্য ক'লকাতায় ফিরে আসেন। রবীন্দ্রনাথ 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থে মোহিতচন্দ্র সেন সম্পর্কে বলেছেন : "তিনি আমার বিদ্যালয়ের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন, কিছুকাল ইহাকে তিনি চালনা করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি আমার কাব্যগ্রন্থাবলী বিস্তর পরিশ্রমে 'এডিসান' করিয়াছিলেন। সেই গ্রন্থে বিষয়ভেদ অনুসারে আমার সমস্ত কবিতাকে ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত করিয়া তিনি প্রকাশ করিয়াছেন।"[১] প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্র-রচনাসম্ভার সংগ্রহ করে তিনখণ্ড 'কাব্যগ্রন্থে'র আকারে তিনিই প্রথম প্রকাশ করেন। রবীন্দ্র-রচনাবলীর প্রথম সম্পাদনার কৃতিত্বটুকু মোহিতচন্দ্র সেনেরই প্রাপ্য। 'কাব্যগ্রন্থে'র ভূমিকায় মোহিতচন্দ্র সেনের রবীন্দ্রবীক্ষা তাঁর একদিকে যুক্তির সংহতি ও অপরদিকে কল্পনার দীপ্তির পরিচয় বহন করছে। শুধু দার্শনিকের পাণ্ডিত্য দিয়ে নয়, কাব্য-পিপাসা ও কাব্য-জিজ্ঞাসা নিয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা পাঠ করেছেন ও বিষয় অনুযায়ী কবিতাগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করেছেন, যেমন, প্রধানতঃ নয়টি ভাগে তৎকালে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের রচনাগুলিকে ভাগ করেছেন। প্রথম থেকে সপ্তম ভাগ পর্যন্ত কবিতা—কবিতাগুলি আবার বিষয় অনুযায়ী—যাত্রা, হৃদয়ারণ্য, নিষ্ক্রমণ, বিশ্ব, সোনার তরী, লোকালয়, নারী, কল্পনা, লীলা, কৌতুক, যৌবনস্বপ্ন, প্রেম, কবিকথা, প্রকৃতিগাথা, হতভাগ্য, সংকল্প, স্বদেশ, রূপক, কাহিনী, কথা, কণিকা, মরণ, নৈবেদ্য, জীবনদেবতা, মরণ ও শিশু ইত্যাদি বিষয়ে সাজান হয়েছে। অষ্টম ভাগ গান ; নবম ভাগে কাব্যনাট্য ও নাট্য 'সতী', 'নরকবাস', 'গান্ধারীর আবেদন', 'বিদায়-অভিশাপ', 'চিত্রাঙ্গদা', 'লক্ষীর পরীক্ষা', 'প্রকৃতির প্রতিশোধ', 'বিসর্জন', 'মালিনী', 'রাজা ও রানী'। এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৩০৩ সালে। 'রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলিকে একত্রে একসঙ্গে যাতে পাঠকগণ পান সেই উদ্দেশ্যেই এই জাতীয় সম্পাদনা। এই গ্রন্থের ভূমিকাটির অন্তর্গত সাহিত্য-সমালোচনা উচ্চমানের। আদর্শ কবিতার লক্ষণ তিনি বিজ্ঞানসম্মত ভাবে বিচার করেছেন : "যাহা যথার্থ কবিতা, দিব্য কল্পনা যাহাকে জন্ম দিয়াছে, অকৃত্রিম ছন্দঃ-সৌন্দর্য তাহাকে বাহিরে ভূষিত করে এবং ভাবের গভীরতা তাহাকে অন্তরে পরিপূর্ণ করিয়া থাকে। তাহার আনন্দ কল্যাণকে আবাহন করে এবং সৌন্দর্যে তাহা জগতের নিত্যসুন্দর

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আত্মপরিচয়, পৃ. ১১০-১১১।

অনির্বচনীয় পদার্থসমূহের সমতুল হয়। সাধারণভাবে সংক্ষেপে সঙ্কেতস্বরূপে বলা যাইতে পারে যে, যে কবিতা অনির্বচনীয়তায় সঙ্গীতের যত সদৃশ এবং যে কবিতায় পাঠক মানবজীবনের প্রসারতা যত অধিক অনুভব করেন, তাহা তত শ্রেষ্ঠ।...যিনি জীবনের একটি সামান্যতম সত্যকে পরিস্ফুট ও সুন্দর করিয়া তুলিতে পারেন তিনি কবি, কিন্তু উচ্চতর কবি তিনি যাঁহার কবিতায় সমগ্র জীবনের সুগভীর বিজয়গীতি শ্রুত হয়।"[১] যথার্থ কাব্য যে শুধুমাত্র ছন্দবন্ধ-সুষমায় লালিত মাত্র নয়, সেটি অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে সমালোচক মোহিতচন্দ্র সেন বুঝতে পেরেছিলেন; উচ্চতর কাব্যে কবিকল্পনা ও সৌন্দর্যের সঙ্গে মিশ্রিত হবে মানবজীবনের প্রসারতা ও বিশ্বজনীনতা। রবীন্দ্রকাব্যে শুধু সৌন্দর্যের নন্দনকানন সৃষ্টি হয়নি, অপরদিকে উদার বিশ্বচেতনা তাঁকে শ্রেষ্ঠ কবি, বিশ্বকবির মর্যাদা দিয়েছে। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে রবীন্দ্র-সাহিত্যের সমালোচনার সূচনা মোহিতচন্দ্র সেনই করেন।

তাঁর হৃদয়টি ছিল কবির হৃদয়। ওয়ার্ডস্বার্থ, ব্রাউনিং, কারলাইলি এমার্সন তাঁর প্রিয় কবি, সাহিত্যিক। দর্শনের সঙ্গে কবিত্ব মিশ্রিত হয়ে এক উজ্জ্বল সম্ভাবনা দিয়ে বঙ্গসাহিত্যে আবির্ভূত হলেও মাত্র ছত্রিশ বছরের ক্ষুদ্র পরিসরে তাঁর অনেক সাহিত্য-কর্মই অসমাপ্ত রেখে গেছেন। "মোহিতচন্দ্র বালকের মতো নবীন দৃষ্টিতে, তাপসের মতো গভীর ধ্যানযোগে এবং কবির মত সরস সহৃদয়তার সঙ্গে বিশ্বকে গ্রহণ"[২] করেছিলেন—এটিই তাঁর বড় পরিচয়। রবীন্দ্রনাথকে লিখিত একটি পত্রে (১৯০৪, ১২ই ডিসেম্বরে লিখিত) মোহিতচন্দ্র সেনের বাঙ্গালা গদ্যের নিদর্শন মেলে।

"আমি কাল আপনাদের বাড়ীর পথে পথে চলতে চলতে স্পষ্ট অনুভব করছিলুম যে, বিশ্বকে যদি জ্ঞানের সৃষ্টি বলা যায়, তবে সৌন্দর্যকে প্রেমের সৃষ্টি বললে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় হয় না।... আর যদি সৌন্দর্য প্রেমের সৃষ্টি হ'ল, তবে আনন্দও তাই, প্রেমিক না হ'লে কেই বা যথার্থ আনন্দিত হয়।"[৩] এ ভাষা নিপুণ গদ্যশিল্পীর ভাষা—সহজ স্বচ্ছতার সঙ্গে কবিচৈতন্য মিশ্রিত হয়ে এ ভাষার গদ্যের দ্যুতি ও দীপ্তি উভয়ই প্রকাশ হয়েছে। অবশ্য মোহিতচন্দ্র সেন যে রাবীন্দ্রিক প্রভাব থেকে মুক্ত নন, সেটিও স্পষ্টতঃ ধরা পড়েছে।

---

১. শ্রীমোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত, কাব্যগ্রন্থ: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভূমিকা, পৃ. ৶। ২. রবীন্দ্রনাথ, মোহিতচন্দ্র সেন, (বঙ্গদর্শন, ১৩১৩ সাল)। ৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা মোহিতচন্দ্র সেনের পত্র, ১৯০৪, ১২ই ডিসেম্বর।

রবীন্দ্র-গদ্যের ভাষা—"কাল অনেকদিন পরে সূর্যাস্তের পর, ওপারের পাড়ের উপর বেড়াতে গিয়েছিলুম। সেখানে উঠেই হঠাৎ যেন এই প্রথম দেখলুম, আকাশের আদি-অন্ত নেই, জনহীন মাঠ দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপ্ত করে হা হা করছে। কোথায় দুটি ক্ষুদ্র গ্রাম, কোথায় এক প্রান্তে সংকীর্ণ একটু জলের রেখা।" 'ছিন্নপত্রে'র এই গদ্য (রচনাকাল ১৮৯৫) মোহিতচন্দ্রকে প্রভাবিত করেছে বললে ভুল হবে না।

মহিলা কবিগণ ॥

নববিধান-সাহিত্যের মহিলা সাহিত্যিকগণের মধ্যে জগন্মোহিনী দেবী, সুনীতি দেবী, সুচারু দেবী, মৃণালিনী সেন, সুজাতা দেবী, উমা গুহ, সুদক্ষিণা সেন, রাধারানী লাহিড়ী ও মণিকা দেবীর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এঁরা প্রায় সকলেই কবিতা রচনা করে বঙ্গের মহিলা কবিগণের মধ্যে একটা বিশিষ্ট আসন দখল করেছেন। কেশবচন্দ্র সেনের পরিবারে সাহিত্য ও সংস্কৃতির আবহাওয়া গড়ে উঠেছিল। বিস্তৃত অন্তর্মুখী আধ্যাত্মিকতা পরিবারের প্রতিজনকে প্রভাবিত করেছিল। আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে, দৈবী প্রেরণার সঙ্গে কবিত্বের দ্বন্দ্ব নেই, বরং দেবভাব সৌন্দর্যের জগৎ প্রসারিত করে দেয়। এই কারণেই একই পরিবার থেকে পেয়েছি কেশবচন্দ্রের স্ত্রী জগন্মোহিনী দেবী, জ্যেষ্ঠ কন্যা সুনীতি দেবী, তৃতীয় কন্যা সুচারু দেবী, দ্বিতীয় পুত্রবধূ মৃণালিনী সেন, চতুর্থা কন্যা মণিকা দেবী ও কনিষ্ঠা কন্যা সুজাতা দেবীকে।

জগন্মোহিনী দেবী :

কেশবচন্দ্র সেনের সহধর্মিণী জগন্মোহিনী দেবী সর্ব অবস্থাতেই স্বামীর অনুগামিনী ছিলেন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে সেন-পরিবারের কুলবধূর পর্দা ত্যাগ করে কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গৃহে অনুগমন করেন। সেইদিন থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত জীবনের সর্ব অবস্থায় তিনি কেশবচন্দ্র সেনেরই মার্গ অনুসরন করেছিলেন। কেশবচন্দ্র সেন স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যুগলসাধন করেছিলেন। কেশবচন্দ্র সেনের মৃত্যুর পর ব্রহ্মমন্দিরে তিনি কিছু উপদেশ ও প্রার্থনা দিয়েছিলেন। সেগুলি গ্রন্থাকারে 'প্রার্থনা-কুসুমাঞ্জলি' নামে প্রকাশিত হয় ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে। এই প্রার্থনাগুলি ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৯৮

খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জগন্মোহিনী দেবী প্রদান করেছিলেন। প্রার্থনাগুলির মধ্যে কেশবচন্দ্র সেনের কণ্ঠস্বরই যেন শুনতে পাওয়া যায়। স্বামীর অনুবর্তিনী সতী জগন্মোহিনী দেবী কেশবচন্দ্র সেনের প্রার্থনার ভঙ্গী, কোন কোন স্থলে ভাষা পর্যন্ত অনুসরণ করেছেন। কোথাও সহজ সরল অন্তরের আকুতির গভীর প্রকাশ, কোথাও বা রূপকের সাহায্যে আত্মনিবেদন করেছেন, যেমন, 'জীবনবৃক্ষ' ( ১৯৪ পৃঃ ), 'ব্রহ্মকল্পতরু' ( ২১৭ পৃঃ ), 'উৎসব-সম্ভোগ' ( ২৮১ পৃঃ ), 'আনন্দবাজার' ( ২৯৩ পৃঃ ), 'উজ্জ্বল দর্শন' ( ২৯৫ পৃঃ )। প্রার্থনার নামগুলি যথেষ্ট কবিত্বমণ্ডিত। তাঁর ভাষায় কেশব-রচিত ভাষার মতই অতীন্দ্রিয়তা প্রকাশিত হয়েছে। "অনেক জল দিয়া তবে একটি ফুল। তোমার ভক্ত বলেছিলেন যে, সকলের মন-বাগানে মালী নিযুক্ত করা দরকার, এইরূপ যত্নে ফুল ফুটিলে পরে সুখী হইবে। বারিবর্ষণ হইলে খুব শীঘ্র শীঘ্র ফুল হবে। আমরা এই নববিধানে খুব সুখ পাইলাম।"[১] কিংবা "ব্রহ্মানন্দ সহ যাত্রী সব বাহির হইয়াছিলাম; এই শান্তিধামে কত সুখ-রত্ন আছে, প্রভুর কার্য পালন কর, কিন্তু কোথায় সে স্থান আছে? যেখানে সমুদ্র সাঁ সাঁ শব্দে আসিতেছে, সেখানে কি আর সামান্য ক্ষুদ্র খোলা ভাসিতে পারে?"[২]

জগন্মোহিনী দেবী সংগীতও রচনা করেছেন। 'জগৎহার' নামে সংগীত-গ্রন্থে তাঁর রচিত সংগীতগুলি সংকলন করা হয়েছে। ১৯১১ সালে কুচবিহার থেকে এটি প্রকাশিত হয়। ১১৪টি গান আছে। সংগীতগুলি বিবিধ বিষয়ে লেখা হলেও বেশীর ভাগই ধর্মবিষয়ক। সংগীতগুলি কাব্যগুণে সমৃদ্ধ না হলেও ভক্তি ও বিশ্বাসভাবে সহজ-সুন্দর হয়ে উঠেছে।

**সুনীতি দেবী :**

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের জ্যেষ্ঠা কন্যা সুনীতি দেবীর ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে কুচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুরের সঙ্গে বিবাহ হয়। তিনি ছিলেন কেশবচন্দ্র সেনের যোগ্যা কন্যা, নববিধান-সমাজের অগ্রগতি ও বিবিধ জনহিতকর সেবাধর্মে নিজেকে তিনি নিযুক্ত করেছিলেন। সমাজ-সংস্কার, নীতিশিক্ষা, ধর্মোপদেশ তাঁর কর্মময় জীবনকে সদা-ব্যস্ত রেখেছিল। লোকশিক্ষার মাধ্যম হিসেবে তিনি 'কথকতা' বেছে নিয়েছিলেন। তৎকালে তাঁর সুন্দর কথকতা অনেক ভক্ত-অভক্ত হৃদয়কে আকর্ষণ করত। ইংরেজী

১. সতী জগন্মোহিনী দেবী, প্রার্থনা-কুসুমাঞ্জলি, পৃ. ৫। ২. তদেব, পৃ. ২৬২।

সাহিত্যে তাঁর একাধিক গ্রন্থ থাকলেও বঙ্গ-সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল প্রবল। কবিরূপে তিনি প্রকাশিত হলেন 'অমৃতবিন্দু'র (২য় খণ্ড) মধ্যে।

সুনীতি দেবীর রচিত গ্রন্থ—(১) অমৃতবিন্দু, প্রথম খণ্ড, (১৩২৫ সাল), অমৃতবিন্দু, দ্বিতীয় খণ্ড, (১৩৩২ সাল), (৩) কথকতার গান, (১৩২৮), (৪) সঙ্ঘশঙ্খ (১৩২১), (৫) সতী (৬) শিশুকেশব।

অমৃতবিন্দু—সংগীত-পুস্তক। প্রথম খণ্ডে ১৬৪টি সংগীত সংকলিত হয়েছে। ধর্ম ছাড়াও প্রকৃতির বিভিন্ন রূপ, বিভিন্ন দেশ ও তীর্থস্থান নিয়ে তিনি সংগীত রচনা করেছেন। অন্তরের গভীর ভক্তি ও প্রকৃতির প্রেম সংগীতগুলিকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে। যে কারণে এগুলি নিছক সুরে গীত হবার জন্যই রচিত নয়, বরং এই গীতগুলির মধ্যে সুনীতি দেবীর কবিপ্রতিভা স্ফুরিত হয়েছে। সুনীতি দেবীর 'অমৃতবিন্দু'র সংগীতগুলিতে রবীন্দ্রপ্রভাব স্পষ্ট।

"কোথা সে অজানা দেশে
কোন্ বাতাসে কোন্ আকাশে
সোনার পাখী উড়ে গিয়ে—
কোন্ পাখী দলে মিশিল।
সুন্দর সে দেহরতন, অমূল্য পিঞ্জর-ধন
পাখীশূন্য খাঁচাখানি, হায় তাহাও লুকাইল।"

—অমৃতবিন্দু, সংগীতসংখ্যা, ১৩৪, পৃঃ ১০৭।

কিংবা—

"সীমার শেষে হে অশেষ তুমি আসছ কেবল এগিয়ে
অন্তের পারে হে অনন্ত, তুমি আছ দাঁড়াইয়ে।"

—অমৃতবিন্দু, সংগীতসংখ্যা, ১৪৮, পৃঃ ১১৬।

একদিকে রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক সৌন্দর্যচেতনা, 'সীমা ও অসীমে'র মিলনতত্ত্ব, অপরদিকে সুফী ও বাউল সাধকের অতীন্দ্রিয় অধ্যাত্মচেতনা সুনীতি দেবীর সংগীতগুলিকে উচ্চ পর্যায়ের কাব্যধর্ম দান করেছে।

হিন্দু পুরাণ ও মহাকাব্যের বিভিন্ন চরিত্র ও আখ্যান তাঁর রচিত কথকতার বিষয়বস্তু হয়েছে। রাজা হরিশ্চন্দ্র, ধ্রুব, ঐন্দ্রিলা, ভীষ্ম, বুদ্ধদেব, সতী, জনা ও সীতা ইত্যাদি বিষয়বস্তু-নির্বাচনে স্বদেশের ঐতিহ্যের প্রতি সুনীতি দেবীর

গভীর অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে। অপরদিকে সর্বজনপ্রিয় ধর্মীয় বিষয়গুলি তাঁর কথকতার মাধুর্য ও আকর্ষণ জনসাধারণের নিকট বাড়িয়ে তুলেছিল।

'সঙ্ঘশঙ্খ' এটিও সংগীত-পুস্তক। পুস্তকটিতে ৮৩টি সংগীত সংকলন করা হয়েছে। সবগুলি সংগীতই নববিধানধর্ম-বিষয়ক। কয়েকটি ঈশ্বর-স্তবও আছে। সংগীতগুলির শীর্ষে রাগ-রাগিণীর উল্লেখ রয়েছে। একটি সংগীতে 'নববিধানে'র তত্ত্বটি কবিত্বময় ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে।—

"তুমি প্রেমময়ী মাতা,
বিশ্বজন প্রসবিতা,
নরনারী সবে মোরা ভগিনী-ভ্রাতা,
সবে মিলে, এক প্রেমে, সুখী পরিবার হব।"[১]

অলংকারবহুল ভাষায় সুনীতি দেবীর প্রাণের আকুতি প্রকাশিত হয়েছে—

"নীরবে নয়ননীরে পূজিব তব চরণ
নীরবে প্রাণের ব্যথা করিব নিবেদন।
নিঃশব্দে জীবনপথে, চলিব তোমার সাথে,—
নিত্যধামের যাত্রী—আমি করিব স্মরণ।" —সঙ্ঘশঙ্খ, পৃঃ ৫৫

নববিধান 'সঙ্ঘশঙ্খে'র সংগীতে নিনাদিত হয়েছে। যে কারণে সুনীতি দেবী ছদ্মনামে, 'সঙ্ঘভগিনী' নামে সেই সংগীতের শঙ্খ বাজিয়েছেন। 'সতী' —গীতিকাব্য। 'গ্রন্থ মধ্যে প্রকাশের তারিখ ও গ্রন্থকর্ত্রীর নাম নাই, তবে ইহা যে সুনীতি দেবীর রচিত, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ।"[২] এটি ক্ষুদ্রাকৃতি মাত্র পনের পৃষ্ঠার গ্রন্থ। কেশবচন্দ্রের বাল্যজীবনের কয়েকটি স্মরণীয় ঘটনার মধ্য দিয়ে বালক কেশবচন্দ্রের মুর্তিটি তিনি তুলে ধরেছেন। কিশোর কেশবচন্দ্র যে একদিন বাগ্মী প্রচারক আচার্য কেশবচন্দ্র হবেন, জীবনের প্রভাতেই তার সূচনাটি লেখিকা ইঙ্গিত করেছেন।

সুনীতি দেবীর ব্যক্তিগত সাহিত্যকর্ম ছাড়াও 'নববিধান সমাজ ও সাহিত্য'তে বিশেষ অবদান রেখে গেছেন। কেশবচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর ধর্ম এবং তাঁর ও প্রচারকগণের সাহিত্য গণ্ডীবদ্ধ হয়ে পড়ে। ইহাদের গতি রুদ্ধ হয়ে যায়। সুনীতি দেবী 'নববিধান-সঙ্ঘে' যেমন নবজীবন দান করলেন, অপরদিকে কয়েকজন সহযোগী নিয়ে যেমন, প্রমথলাল সেন, গণেশপ্রসাদ ও

১. সুনীতি দেবী, সঙ্ঘশঙ্খ, পৃ. ২৬। ২. যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বঙ্গের মহিলাকবি, পৃ. ৩৮৭।

যামিনীকান্ত' কোঙার ও তিনি 'ব্রাহ্মট্রাক্ট্ সোসাইটি' সৃষ্টি করলেন। কেশবচন্দ্র ও অন্যান্য প্রচারকগণের গ্রন্থ মুদ্রণ ও প্রণয়নের দায়িত্ব তুলে দিলেন এই 'ট্রাক্ট্ সোসাইটি'র উপর। সুনীতি দেবীর প্রভাবে পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে কর্ম-উদ্দীপনা দেখা দিল; এঁরা নূতন সংগীত, উৎসব-আয়োজনের মধ্যে দিয়ে নববিধান-সাহিত্যে জোয়ার আনলেন। প্রতাপচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত 'পরিচারিকা' পত্রিকা নতুন উদ্যমে 'আর্যনারী সমাজ'-এর নারীদের দ্বারা পরিচালিত হতে শুরু করল। মোহিনী দেবী ১৩০৮ সাল থেকে সম্পাদিকার দায়িত্ব নিলেন। ১৩১০ থেকে ১৩১১ পর্যন্ত সম্পাদিকা ছিলেন সুচারু দেবী। সংগীত, কথকতা, নগরকীর্তন, এমন কি বালক-বালিকাদের দিয়ে নাটক অভিনয়, ট্যাবলো অভিনয় ইত্যাদির মাধ্যমে সুনীতি দেবী কলকাতায় এক সাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়ে তুললেন।

সুচারু দেবী :

সুচারু দেবী ছিলেন যথার্থ শিল্পী। কাব্য, সংগীত, সাহিত্য, চারু ও কারু শিল্প সর্বত্রই তিনি সহজে দক্ষতা দেখিয়েছেন। কাব্য-রচনার সমান্তরালভাবে তাঁর শিল্পরচনা চলেছে। যে ভাবটি তিনি সাহিত্যে কলমের কালিতে ফুটিয়ে তুলেছেন সেই ভাবটিই আবার পাশাপাশি রঙ তুলিতে অপূর্ব ছবি হয়ে ফুটে উঠেছে। সাহিত্যজগতে এটি সম্পূর্ণ অভিনব। তাঁর রচিত 'ভক্তি-অর্ঘ্য' (১৩১২) ও 'প্রণতি' (১৩৫৭) এই জাতীয় গ্রন্থ।' 'ভক্তি-অর্ঘ্যে' পিতা কেশবচন্দ্রের বাল্যজীবন বর্ণনা করেছেন সুচারু দেবী এবং আখ্যানভাগ চিত্রসহযোগে বর্ণরঞ্জিত হয়ে উঠেছে। সাহিত্যের সঙ্গে চিত্রকে এভাবে "ব্যবহারের রীত বঙ্গসাহিত্যে সম্পূর্ণ অভিনব। স্ব-অঙ্কিত ব্রহ্মানন্দের বাল্যজীবনের কয়েকটি চিত্র সংবলিত গ্রন্থটির উৎসর্গপত্রে আছে।

"নববিধানাচার্য ব্রহ্মানন্দ শ্রীকেশবচন্দ্র
পরমপূজনীয় পিতৃদেবের চরণে—
এই ভক্তি-অর্ঘ্য
কৃতাঞ্জলিপুটে অর্পণ করিতেছি।
সেবিকা কন্যা—সুচারু দেবী।"

তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'প্রণতি' একাধারে প্রণত হৃদয়ের ভক্তি ও আকুতি,

অপরদিকে ব্যথা-বেদনার অর্ঘ্য সাজিয়ে শোকগাথা। ব্যক্তিগত জীবনে মহারানী সুচারু দেবী অনেকগুলি বিয়োগ-ব্যথার সম্মুখীন হন। নয় বছর বয়সে পিতৃবিয়োগ, ২৩ বছর বয়সে মাতৃবিয়োগ, ৩৭ বছর বয়সে পতিবিয়োগ ( মাত্র ৭ বছরের বিবাহিত জীবন ), ১৯৪২ সালে একমাত্র পুত্র ধ্রুবেন্দ্রের অকালমৃত্যু, ১৯৪০ খ্রীঃ একমাত্র জামাতার অকাল-মৃত্যু, ১৯৫৮ খ্রীঃ একমাত্র দৌহিত্রের অকস্মাৎ মৃত্যু-বরণ, আর এরই মধ্যে প্রাণাধিক ভাই-ভগ্নীদের মৃত্যু[১] —সুচারু দেবীর জীবনকে দুঃখ ও অন্তর্বেদনার অগ্নিদহনে দগ্ধ করেছিল। পুত্র ধ্রুবেন্দ্রের মৃত্যুর পর থেকে তিনি শোকসন্তাপেই জীবিত ছিলেন। তাঁর সুদীর্ঘ ৮৫ বছরের জীবনে সুগভীর পুত্রশোকই তাঁর কাব্যসৃষ্টির প্রেরণা জুগিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে তাঁব 'প্রণতি' কাব্য ধ্রুবেন্দ্রের স্মৃতি-রোমন্থনে শোকাকুল হয়ে উঠেছে। 'প্রণতি' কাব্যগ্রন্থে অন্যান্য সুরের কয়েকটি কবিতা ( 'আত্মপরিচয়' কিংবা 'পনরই আগষ্ট ১৯৪৭' ) থাকলেও পুত্রশোকের কারুণ্য ও বিষাদের সুরটিই মূল সুর। তারই মধ্যে কবির আকুলভাবে মৃত্যুকামনা কাব্যে করুণরসকে তীব্রতর করে তুলেছে।

"বাবা ধ্রুব ধন
কতদূরে গেছ চলে ?
কেমনে ধরিব, কেমনে পাইব
তোমার নাগাল হায়।" —প্রণতি, পৃঃ ৪৭

কিংবা,
স্বপন মাঝে
কে দিলি দেখা
ধ্রুব রে আমার ?
মনে কি পড়েছে দুখিনী মায়েরে তোর ? —প্রণতি, পৃঃ ৪১

এরই সঙ্গে মিলিত হয়েছে শ্রান্তি, ক্লান্তির সুর—

দাও মা মিলায়ে
প্রিয়জন সঙ্গে মোর
সহে না, সহে না
এ জীবনভার। —প্রণতি, পৃঃ ৭৯

কবির তাই ঈশ্বরচরণে একটিই কামনা—মৃত্যুকামনা।—

১. প্রভাত বসু, মহারানী সুচারু দেবীর জীবনকাহিনী, পৃ. ১০৯।

"আর কতদূর সেই মধুপুর ?
আছি আশাপথ চেয়ে
তৃষিত নয়নে।
হয়েছি নিতান্ত শ্রান্ত
রোগভারে ভারাক্রান্ত
মতিভ্রান্ত
পড়ে' ভব-বনে।" —প্রণতি, পৃঃ ১৬১।

প্রিয়জনের মৃত্যুতে কাতর হয়ে শোকগাথা রচনা বাঙলা সাহিত্যে নতুন নয়। অক্ষয়কুমার বড়ালের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য 'এষা' (১৯১২ খ্রীঃ)। পত্নীর মৃত্যুতে শোকাহত হৃদয়ের গভীর বেদনা দিয়ে কবি এ কাব্য রচনা করেছেন। 'এষা' কাব্যের দুঃখের সঙ্গে মিলিত হয়েছে প্রতিদিনের নিবিড় সম্পর্ক। এই কাব্যে মৃত্যু, অশৌচ, শোক এবং সান্ত্বনা—এই চার পর্বে তিনি মৃত্যুশোক বর্ণনা করেছেন। 'এষা'র কবি "মরণে কি মরে প্রেম, অনলে কি পুড়ে প্রাণ ?"—এর মীমাংসা করেছেন কাব্যের সমাপ্তি অংশে—

"দাঁড়াও অভেদ আত্মা, পরলোকে বেলাভূমে,
বাড়ায়ে দক্ষিণ কর মৃত্যুর নিবিড় ধূমে।"

'প্রণতি' কাব্যে সুচারু দেবী পুত্রশোকে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে 'মৃত্যু' কামনা করেছেন ঈশ্বরের চরণে। বড়াল কবির কাব্য 'এষা'র গভীর ও মর্মস্পর্শী করুণ রাগিণীর প্রভাব সুচারু দেবীর 'প্রণতি' কাব্যে লক্ষ্য করা গেলেও তাঁর অনুভূতি বাস্তব জীবনে উপলব্ধ সত্য। কাজেই সুচারু দেবীর কাব্যে অনুভূতির কৃত্রিমতা নেই, আছে গভীর অন্তস্পর্শী বেদনার প্রগাঢ় অনুরণন। তাই 'প্রণতি' কাব্যগ্রন্থটি বাঙলা কাব্যে মহিলা কবি-রচিত শ্রেষ্ঠ শোককাব্য।

'নববিধান-সাহিত্যে' সুচারু দেবীর কাব্যেই প্রথম লক্ষণীয় পরিবর্তন সূচিত হল। এতদিন পর্যন্ত নববিধান-সাহিত্যের সব কবিতা, নাটক, সংগীত, প্রবন্ধ, জীবনী সবই ধর্মকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছিল ; ব্যক্তিজীবন সেখানে ছিল বর্জিত। কিন্তু সুচারু দেবীর কাব্যে ব্যক্তি-চেতনা ও ব্যক্তি-জীবনের শোক প্রধান হয়ে উঠেছে—

"বালিকা জীবনে আমার না পূরিল আশা !
পোষা পাখী উড়ে গেল, সাঙ্গ হ'ল পাখী পোষা।"

—প্রণতি, পৃঃ ১৩৩

আত্মপরিচয় দানে, স্বামীর মৃত্যুর পর 'মহারাজার তিরোধান স্মরণে' কবিতা লিখেছেন, 'মণিকা দেবী-প্রয়াণে' তিনি কাতর। তাছাড়া পুত্রশোকে বিহ্বল কবির ব্যক্তি-মনের করুণ ছবি লিরিক কাব্য-মূর্ছনায় প্রকাশিত। যদিও ভগবদ্-ভক্তি ও ঈশ্বরপ্রণতি কাব্যগ্রন্থটির কাঠামো, কিন্তু ব্যক্তি-জীবনের কারুণ্য ও শোক মূর্ত হয়ে কাব্যগ্রন্থটিকে 'নববিধান-সাহিত্যে' বিশেষ স্বাতন্ত্র্য দান করেছে।

'প্রণতি' কাব্যে ব্যক্তি-ভাবনার পাশে মাঝে মাঝে মিস্টিক সৌন্দর্য-চেতনার প্রকাশ ঘটেছে।

"সিন্ধু হতে বিন্দু—অনন্তেরি প্রতিকৃতি
হইবে প্রতিফলিত হৃদিকন্দরে,
যাহা ছিল পরিব্যাপ্ত অনন্ত আকাশে,
যাহার সুরভি ভাসিত বাতাসে
তাহারেও ধরিয়া আনিলে হেথায়।" —প্রণতি, পৃঃ ২১৯

'প্রণতি' কাব্যের আঙ্গিকে অভিনবত্ব আছে। 'প্রণতি' কাব্যগ্রন্থখানিতেও শিল্পীর স্ব-অঙ্কিত কয়েকটি চিত্রে কবিতার ভাবটির রূপদান করা হয়েছে। কবিতাগুলির বেশীর ভাগ স্থলেই নামকরণ করা হয়নি। কবিতাগুলির ফাঁকে ফাঁকে গদ্য রচনা আছে; একই ভাব কখনও ছন্দময় ভাষায় কবিতাকারে প্রকাশিত হচ্ছে, কখনও গদ্যে। গদ্য-পদ্যের ভেদটি সহজে ধরা পড়ে না। কারণ তাঁর রচিত গদ্য ছন্দঃস্পন্দিত। "সুখের হাসি মুখে ফুটতে না ফুটতে তা নিবে গেল। প্রদীপটি সবেমাত্র জ্বেলেছি, কোন্ কুজ্ঝটিকায় সে আলোটুকু নির্বাপিত হয়ে চারিদিক অন্ধকারে ঢেকে দিল? আমার কতদিনের কত কথা সঞ্চিত করে মনের মধ্যে জমিয়ে রেখেছিলাম, তা যে বলবারও সময় পেলাম না। ছবিখানি আঁকতে না আঁকতে তা যে শেষ হয়ে গেল। মধুর স্বপন স্বপনেই মিলাইয়া গেল।"—'প্রণতি' পৃঃ ১৩২।

'পরিচারিকা পত্রিকা'র ১৩১০ সাল থেকে ১৩১১ সাল পর্যন্ত সুচারু দেবী সম্পাদিকা ছিলেন। এই পত্রিকায় সম্পাদনা ছাড়াও পত্রিকার নিয়মিত লেখিকাও ছিলেন। ১৩১০-এর বৈশাখ সংখ্যায় 'কে আমার—আমি কার?', ১৩১১ বৈশাখ সংখ্যায় 'অনিত্য সংসার' প্রবন্ধ-দুটিতে সুচারু দেবীর রচনার বিশিষ্ট ষ্টাইলটি ধরা পড়েছে। অশ্রু দিয়ে তিনি কাব্য রচনা করেছেন আর হৃদয়জাত গভীর সৌন্দর্য-চেতনা দিয়ে সৃষ্ট হয়েছে চারুকলার জগৎ। সুচারু নাম তাই সার্থক।

**শ্রীযুক্তা মৃণালিনী সেন :**

মৃণালিনী সেন কেশবচন্দ্র সেনের দ্বিতীয় পুত্র নির্মলচন্দ্র সেনের স্ত্রী। ভিক্টোরিয়া স্কুল প্রতিষ্ঠায়, নববিধান প্রচার ও নানাবিধ সমাজসংস্কার, নারী জাতির বিবিধ উন্নতি বিষয়ে তিনি ছিলেন অগ্রগণ্যা, উৎসাহদায়িনী। তিনি ভাগলপুরের ব্রাহ্মসমাজের পরিবেশে বর্ধিত হয়েছিলেন। তাঁর প্রথম স্বামী ইন্দ্রসিংও ছিলেন কেশবভক্ত। পাইকপাড়ার ভূম্যধিকারী ইন্দ্রচন্দ্র সিংহের মৃত্যুর পর মৃণালিনী সেন কাব্যচর্চা শুরু করেন। পতিশোকের বেদনায় কাতর হয়ে তিনি কাব্য ও সাহিত্য আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। তাঁর রচিত চারখানি কাব্যগ্রন্থ—প্রতিধ্বনি ( কাব্য ) ১৩০১, নির্ঝরিণী ( কাব্য ) ১৩০২ ( ১৮৯৫ খ্রীঃ ), কল্লোলিনী ( গীতিকাব্য ) ১৩০৩ ( ১৮৯৬ খ্রীঃ ), মনোবীণা ( কাব্য ) ১৩০৬ ( ১৯০০ খ্রীঃ ) সালে প্রকাশিত।

কবি বার থেকে পনের বছর বয়স পর্যন্ত যেসব কবিতা রচনা করেছিলেন, সেগুলি 'প্রতিধ্বনি' কাব্যে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটি কয়েকটি খণ্ড কবিতার সমষ্টি। বেশীর ভাগই দুঃখমূলক কবিতা। স্বামীকে হারিয়ে স্ত্রীর যে মনোবেদনা এই কবিতাগুলিতে সেই সুর ধরা পড়েছে।

'নির্ঝরিণী'ও বেদনার কাব্য। এই কাব্যগ্রন্থে কয়েকটি বিখ্যাত ইংরেজী কবিতার অনুবাদ আছে। এই অনুবাদগুলি বেশ সুন্দর।

'মনোবীণা'র কবিতায় পরিণতির সুর আছে। বিশ্বজনীন উদার প্রেম ও অনুভূতি 'মনোবীণা'র অনেক কবিতার অবলম্বন।

"ক্ষুদ্র যশ অপযশ থাকে ক্ষুদ্র গৃহকোণে,
এ সংকীর্ণ সীমা মম দাও বাড়াইয়া,
কেবল আমারি তরে রেখো না অস্তিত্ব মম,
আমারে অনন্ত মাঝে দাও হারাইয়া।"—'নূতন রাগিণী', মনোবীণা।

'নববিধান' ধর্মের প্রতি নিষ্ঠা ও আনুগত্য তাঁকে উদার বিশ্বচেতনা দান করেছে।

"এস, অপ্রেমিকে প্রেম শিখাইয়ে
ভাই ভগ্নী সব একত্র হইয়ে
পরম দয়ালু করুণা-নিদান,
সকলের পিতা যেই বিশ্বপ্রাণ,
করিছে তাঁহার মহিমা গান।" —মন্ত্রসাধন, প্রতিধ্বনি

**শকুন্তলা সেন ও সুশীলা সেন :**

এঁরা দু'জনেই নীতিবিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নববিধান-সমাজ-বালকদের জন্য 'রবিবাসরিক নীতিবিদ্যালয়' ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে শুরু করেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে বিনয়েন্দ্রনাথ সেন 'বালিকাদিগের নীতিবিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর পত্নী শ্রীমতী শকুন্তলা দেবী ঐ বিদ্যালয়ের প্রথম সম্পাদিকা। 'ভিক্টোরিয়া বিদ্যালয়ে' প্রতি শনিবার নীতিবিদ্যালয়ের অধিবেশন বসত। অধ্যাপক মোহিতচন্দ্র সেনের স্ত্রী শ্রীমতী সুশীলা সেনও বালিকাদের শিক্ষা দিতেন। শকুন্তলা সেন ও সুশীলা সেনের সাহিত্যিক প্রতিভা এই 'নীতি-বিদ্যালয়ে'র বিভিন্ন কর্মকাণ্ডকে উপলক্ষ করে প্রকাশিত হয়। নীতি ও ধর্ম-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কেশবচন্দ্র সেন সবিশেষ উপলব্ধি করেছিলেন, ধর্মবোধে প্রচণ্ড পাপবোধই তাঁকে নীতির পথে পরিচালিত করেছিল। নববিধান-ধর্ম নীতিবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। ধর্ম-ন্যায়-নীতি জীবনের ভিত্তি। এই কারণেই কেশবচন্দ্র সেনের পরবর্তী বিধানবাদীগণ নীতিবিদ্যালয় স্থাপন করে ছোট ছেলে-মেয়েদের জীবনের কাঠামোটুকু গড়ে তোলায় দায়িত্ব নিয়েছিলেন। নীতিবিদ্যালয়ের প্রতিবৎসর বাৎসরিক পুরস্কার-বিতরণী উৎসব পালন করা হত। এই বাৎসরিক উৎসবে অভিনয় করা হত। এই উৎসব উপলক্ষে বিনয়েন্দ্রনাথ সেনই প্রথম অভিনয়ের ধারা প্রবর্তন করেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'মুকুট', 'ডাকঘর' কয়েকটি নাটক ছাড়া বালিকাদের উপযোগী নাটক ছিল না। বিনয়েন্দ্রনাথ সেনের উৎসাহে শকুন্তলা সেন কিশোর-কিশোরীর উপযুক্ত নাটিকা রচনায় অগ্রসর হলেন। (১) 'ভারতের নবজীবন' ( গীতাভিনয় ) ( প্রথম অভিনয় ১৯১৪—কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিউট হলে ) (২) সুখসন্ধান ( রূপক নাটিকা ) (৩) মহাদেশ ( গীতাভিনয় ) ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম অভিনীত হয়। (৪) ঋতুচক্র-কালসঙ্গীত (গীতাভিনয়) (৫) মীরাবাই, (৬) প্রেমের জয়। নাটকগুলি সবই গীতিনাট্য কিংবা কাব্যনাট্য। শুধু ধর্ম বা নীতি নয়, কৈশোর মনস্তত্ত্বের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে নাট্যকাব্যগুলি রচিত হয়েছে। কখনও বঙ্গের প্রকৃতি, কখনও সর্বভারতীয় চেতনা, কখনও সুগভীর স্বদেশপ্রেম, কখনও মানবিকতা, দয়া, প্রেম, নীতি, ঈশ্বরচেতনা, নববিধানের সমন্বয়-ধর্মে বিশ্বাস প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে শকুন্তলা সেন কাব্যনাট্যে রূপ দিয়েছেন সংগীত ও আবেগের প্রাচুর্য নাটকগুলির নাট্যিক ক্রিয়া নষ্ট করে বিশুদ্ধ লিরিকের মর্যাদা দিয়েছে।

বিষয়বস্তু-নির্বাচনে শকুন্তলা সেন প্রতিভার পরিচয় দিলেও পরিবেশনে রবীন্দ্র-গীতিনাট্যের প্রভাব স্বীকার্য।

'নীতিবিদ্যালয়ে'র কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে কিশোরদের জন্য 'প্রকৃতি' নামে একটি মাসিক পত্রিকা ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে প্রকাশিত হতে শুরু করল। 'প্রকৃতি' পত্রিকার চাহিদা মেটাতে গিয়ে সুশীলা সেন কবিতা ও ছোটগল্প-গুলির মধ্যে নিজেকে সাহিত্যিক রূপে প্রতিষ্ঠিত করলেন। ১৩১৪ থেকে ১৩২১ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত 'প্রকৃতি' পত্রিকায় সুশীলা সেনের বহু কবিতা ও ছোট গল্প প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাঁর কবিতাগুলি রচিত হয়েছে—'ভাইফোঁটার দিনে', 'নিবেদন', 'শিশুর অনুরোধ', 'নববর্ষে', 'সঙ্গীহীনা' ( 'লুসি গ্রে'র অনুবাদ ), 'প্রার্থনা', 'জাগরণ', 'পাখীর প্রতি', 'কাজসারা', 'প্রভাত', 'নবজীবন', 'আষাঢ়', 'পূজা', 'বৈচিত্র্য' ইত্যাদি। ছোটগল্পের মধ্যে 'সুধীরের জন্মদিন', 'শান্ত' উল্লেখযোগ্য। মানবিকতা ও নীতি গল্পের উদ্দিষ্ট বিষয়। সুশীলা সেনের রোম্যান্টিক প্রকৃতি-চেতনা, অধ্যাত্ম-অনুভূতি লিরিকের মূর্ছনায় কবিতাগুলিতে প্রকাশিত।

উমা দেবী :

নববিধান-সাহিত্যের আধুনিক ও তরুণ কবি উমা দেবী। দার্শনিক সুপণ্ডিত মোহিতচন্দ্র সেনের কন্যা ছিলেন উমা দেবী। উমা দেবীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ তাঁর চোদ্দ বছর বয়সে প্রকাশিত হয়। 'ঘুমের আগে'—শিশু ভোলানো ছড়া। 'বাতায়ন' ( ১৩৩৭ ) তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। এই কাব্যগ্রন্থে চল্লিশটি চতুর্দশপদী কবিতা আছে। দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি, তুচ্ছতা, দারিদ্র্য, আত্মগ্লানি নিয়ে বাস্তবতা উমা দেবীর কাব্যে ধরা দিয়েছে। বাস্তবতার স্পর্শে কবিতাগুলি উজ্জ্বল। নববিধানের ধর্মীয় ভাবুকতা ও আদর্শবাদ পরিত্যাগ করলেও কবিতাগুলির সাহিত্য হিসেবে স্বতন্ত্র মর্যাদা রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত তাঁর কবিতার বাস্তবতাকে অভিনন্দিত করেন। 'তোমার ঘরের কাছে মজুরেরা কাজ করে, তাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার উপর কারো চোখ পড়ে না, তোমার দৃষ্টিতে তারা উপেক্ষিত হয়নি, তোমার রচনায় তারা সমাদর পেয়েছে, এইটি আমার ভালো লাগলো।'[১]

[১] যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বঙ্গের মহিলা কবি, পৃঃ ৪১৫।

"নীরব দুপুর বেলা, পথে নাই লোক,
গেছে সব যে যাহার কাজে আপনার,
খোলা ছিল সমুখের দুয়ার আমার,
দেখিনু ঢুকিল সেথা ভিখারী বালক।
উঠানে বাসন মেলা, ছুটে কাজ ফেলে,
দাসীরে ডাকিনু তারে ক'রে দিতে দূর,
"মাগো ভাত আছে কিগো ?"—কী করুণ সুর—
বালক উঠিল কেঁদে দুটি হাত মেলে।
ওই দুটি ক্ষীণ হাত মেলিয়া কেবল
শুধালো, "ভাত কি আছে ?" —বাতায়ন।

বঙ্গের মহিলাকবিগণের মধ্যে উমা দেবীর কাব্যেই আধুনিক বাস্তবতার সূত্রপাত। অন্যান্য মহিলা সাহিত্যিকগণের মধ্যে মণিকা দেবীর 'নামমালা' ( ১৯৩৩ খ্রীঃ ) একটি উল্লেখযোগ্য পুস্তক। কেশবচন্দ্র সেন ঈশ্বরকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে অভিহিত করেছেন, বহু নামে প্রার্থনা করেছেন। কৃষ্ণের যেমন অষ্টোত্তর শতনাম তেমনি কেশবচন্দ্র সেন প্রায় আড়াই হাজারেরও বেশী নামে ঈশ্বরকে ডেকেছেন। সেই নামেরই নামাবলী—'নামমালা'। মণিকা মহলানবিশ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের পত্রাবলী সংকলন করেও বিশেষ নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। এই গ্রন্থটির ভূমিকাটিতে লেখিকার চিন্তাশক্তি ও সাহিত্যপ্রীতির পরিচয় আছে। বিষয় অনুসারে ব্রহ্মানন্দের পত্রাবলীকে সন্নিবেশিত করে তিনি আধুনিক সমালোচকের বিশ্লেষণী মননের পরিচয় রেখে গেছেন।

সরোজিনী নাইডু :

নববিধানের আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত মহিলাদের মধ্যে আরও একজন কবির নাম উল্লেখ না করলে এই আলোচনা অসমাপ্ত থাকবে। তিনি সরোজিনী নাইডু, বঙ্গের সুযোগ্যা মহিলা। হায়দ্রাবাদে বাল্য, কৈশোর ও যৌবন অতিক্রান্ত করে কবি, বাগ্মী ও দেশনেত্রী রূপে যিনি সর্ববরেণ্যা তাঁর নাড়ীর টানটুকু কিন্তু সম্পূর্ণভাবেই নববিধানের দিকে। তাঁর পিতা অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় কেশবচন্দ্র সেনের একান্ত অনুগামী। তাঁর মাতা বরদাসুন্দরী দেবী ভারতাশ্রমে বহুদিন বাস করেছেন। আর স[illegible]জিন

নাইডুর জীবনে পিতার প্রভাব সর্বাধিক। অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মাধ্যমেই সরোজিনী নাইডু যেন নববিধানের ছাঁচে নিজের ব্যক্তিগত জীবনকে গড়েছিলেন। যে 'হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট' অনুযায়ী তাঁর অসবর্ণ ও ভিন্ন প্রদেশবাসীর সঙ্গে বিবাহ সেটি কেশবচন্দ্র সেনই প্রবর্তন করেন।[১] ১৯০৬ খ্রীঃ ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনা-মন্দিরে এক ধর্মসম্মেলনে 'Personal Element in Spiritual life' বিষয়ে বক্তৃতা দেন। তাঁর ভাষণে তিনি শ্রোতাদের সকল ধর্মের ঐক্যবোধে উদ্‌বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। তিনি মূলতঃ গীতিকবি ছিলেন, তথাপি তাঁর কবিতায় যে আধ্যাত্মিক সুরটি ধ্বনিত হয়েছে, তা নববিধানের মূল সুরের অনুগামী। ধর্মসমন্বয়ের বাণী ঘোষণা করছে "Call to Evening Prayer" কবিতাটি।—ধর্মে ধর্মে বিভেদ কেন, আল্লা কিংবা নারায়ণ সবই তো সেই একই ঈশ্বর। তিনি সমস্ত জীবনই হিন্দু-মুসলিম ঐক্য-বোধে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর রাজনীতিচিন্তা সর্ব-ভারতীয়তা-চেতনার ভিত্তি তৈরী করেছিল। সরোজিনী নাইডু রাজনীতিতে না এলেও কবি হিসাবে অমরত্ব লাভ করতে পারতেন। তাঁর কবিতাবলী সবই ইংরেজী সাহিত্যের সামগ্রী। তাই বিস্তারিত আলোচনা করা হল না। তবে কেশবচন্দ্র সেন পরোক্ষে সরোজিনী নাইডুকে সমন্বয়-ধর্মী মানবতার আদর্শে, সর্ব-ভারতীয়তা ও উদার সাংস্কৃতিক চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ করেছিলেন বলেই এখানে এই কবির উল্লেখ করা হল।

---

১. কেশবচন্দ্র সেনের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ পায় কেশবচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ক'লকাতার পূর্বতন সিনেট হলে প্রদত্ত একটি বক্তৃতায়।

'I realise that the progress which India has made today step by step, generation by generation, is due in a large measure, to the great ideal of national freedom and international fellowship for which Keshab Chandra Sen stood. He broke down the barriers of ages and bondages of centuries old-fashioned loyalties and fanaticism.

The message of Keshab Chandra Sen was the message of a great democratic ideal and it is for the young generation to transmit it into action which would find manifestation in the unity of races and communities of India. It is this national solidarity which would be the most lasting memorial to the name and vision of Keshab Chandra'.

**পূর্ববঙ্গের নববিধান-সমাজের সাহিত্যিকগণ ॥**

পূর্ববঙ্গেও নববিধান-ধর্মের বিশেষ প্রভাবে ব্রাহ্ম ভক্তগণ ধর্ম ও তত্ত্ব আলোচনা করে বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেন। কিছু কিছু জীবনী ও আত্ম-জীবনীও রচিত হয়। বঙ্গচন্দ্র রায়ের 'আমার জীবনালেখ্য', বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষের 'আমার জীবনকথা', দুর্গানাথ রায়ের 'বিধান-সংগীত' ( ১৩২০ ), 'সংগীত', 'পুষ্পহার' ( ২য় খণ্ড ) ১৮০৩ শক, চন্দ্রমোহন কর্মকারের 'সংগীত-কুসুমহার' ( ১৮০০ শক ), মহিমচন্দ্র সেনের বাঙলায় 'গীতা-প্রবৃত্তি' 'পরমহংস ধর্ম' ( ১৯৩৪ ), 'শ্লোক-সংগ্রহ' ( বঙ্গানুবাদ ), 'ব্রহ্মস্বরূপের প্রকাশ', রাজেশ্বর গুপ্তের 'ভারতসৌভাগ্য' ও 'চট্টগ্রাম ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মচারী ইতিবৃত্ত' সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সমকালীন নববিধানবাদী প্রাবন্ধিকগণের মধ্যে অরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাত বসু, দেবেন্দ্রনাথ বসু ও সতীকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দর্শনের অধ্যাপক অরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কেশবপরিচয়', 'উপনিষদের সাধনপথ ও কেশবচন্দ্র', 'ধর্মপরিচয়', 'মুণ্ডক-উপনিষদ পরিচয়' ইত্যাদি গ্রন্থগুলির মধ্যে ধর্মপ্রাণ সাধকের অন্তরটি ধরা পড়েছে। সহজ-ভাষায় ধর্মতত্ত্বের গূঢ় বিষয়গুলি তিনি ব্যাখ্যা ও আলোচনা করেছেন।

নববিধান-সমাজের প্রাক্তন সম্পাদক সতীকুমার চট্টোপাধ্যায় নববিধান-বাদী সাহিত্যের সেবায় নিজেকে প্রায় অর্ধশতাব্দী ব্যাপী নিযুক্ত রেখেছেন। কেশবচন্দ্র ও অন্যান্য ভক্তমণ্ডলীর দ্বারা রচিত সমগ্র সাহিত্য যা অযত্নে ও অবহেলায় বিস্মৃত হয়ে যাচ্ছিল' সেই সমস্ত রচনাসম্ভার সতীকুমার চট্টোপাধ্যায় অত্যন্ত আগ্রহ, অধ্যবসায় ও ধৈর্য সহকারে সংগ্রথিত করেছেন। প্রায় দেড়শত গ্রন্থ তিনি সম্পাদনা করেছেন। প্রতিটি গ্রন্থের প্রারম্ভে সুচিন্তিত ভূমিকাগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তা ছাড়া নিজস্ব রচনাও আছে। সমন্বয়-মার্গ ( ১৯৬১ ), ভাই গিরিশচন্দ্র সেন ( ১৯৬১ ), উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় ( ১৯৬০ ), নীতিবিদ্যালয়ের কথা ( ১৯৬৪ ), ব্রহ্ম-গীতোপনিষদের পরিচয় ও কেশবচন্দ্রের সাধনায় হিন্দুধর্ম ( ১৯৬৭ ), ব্রহ্ম-উপাসনাপ্রণালী ( ১৯৫৮ ) ও তা ছাড়া আছে বহু ইংরেজী গ্রন্থ ও বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী। বিগত শতাব্দীর সত্য ও ন্যায়নিষ্ঠার উত্তরাধিকার নিয়ে বিংশ

শতাব্দীর সূচনায় ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জন্ম নিয়েছিলেন কলকাতায়। মাতুল বিনয়েন্দ্রনাথ সেনের প্রভাবে গড়ে উঠেছিল তাঁর মনোজগৎ। বাল্য ও যৌবনে ভাগলপুরের ব্রাহ্মসমাজের পরিবেশে অচিরে লাভ করলেন ন্যায়-নীতি-সেবার মনোভাব ও ঈশ্বরানুগত্য। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে 'নববিধানে'র সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে তিনি প্রত্যক্ষভাবে প্রমথলাল সেনের অনুরোধে গ্রন্থ-প্রকাশনার ব্যাপারে জড়িয়ে পড়লেন। সেই সময় থেকে অদ্যাবধি তাঁর নিরলস সাধনা। অক্লান্তভাবে বিধানবাদী-গ্রন্থ প্রকাশনায় তিনি উৎসাহী ও ব্যস্ত। ভাবতে বিস্ময় জাগে - -বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি তৈরীর কাজে জীবিকা নির্বাহ করলেও জীবনকে সেখানেই সীমাবদ্ধ করেননি তিনি। কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁর সর্বত্যাগী প্রচারক ভাইদের তপস্যা-লব্ধ যে সম্পদ এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল সেই মণিমুক্তা সংগ্রহ করে বাঙলা সাহিত্যের ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার তিনি পূর্ণ করে চলেছেন।

# পঞ্চম অধ্যায়

## নববিধান-সাহিত্যের মূল্যায়ন

গত শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বর্তমান শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁর অনুগামী ভক্তবৃন্দ লোকচক্ষুর অন্তরালে বাঙলা গদ্য-সাহিত্যকে সুবিশাল বিস্তার ও ভাবের গভীরতা দান করে গেছেন। উনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় একেশ্বরবাদকে কেন্দ্র করে রামমোহন বাঙলা গদ্যকে সযত্নে ও নিষ্ঠায় গ্রানাইট-স্তরে স্থাপন করে শুধু গদ্যের কাঠামোকেই তৈরী করলেন না, গদ্যকে পৌঁছে দিলেন বুদ্ধি ও মনীষার রাজ্যে। এই পথেই এসেছেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু ও কেশবচন্দ্র সেন। ধর্মালোচনা, ধর্মোপদেশ ও ধর্মপ্রচার—এই সীমারেখায় এঁদের গদ্য-লেখনী আবর্তিত হলেও এই মনস্বী-ত্রয়ীর অন্তর-উপলব্ধি ও আত্মানুভূতি প্রতিভার দ্যুতিকে প্রকাশিত করেছে। একেশ্বরতত্ত্ব ও বেদান্ত আলোচনার সূত্রপাত ঘটে রামমোহনের গদ্যে; দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত ও রাজনারায়ণ বসুর বেদান্তমূলক ধর্মচিন্তায় সাহিত্য-এষণা সংযুক্ত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্যায়ে ব্রাহ্মনেতাদের ধর্মালোচনা ও তত্ত্বজিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে বাঙলা গদ্য ধীরে ধীরে একটি সুঠাম অবয়ব লাভ করল অক্ষয়কুমার দত্তের লেখনীতে।

এই ধারারই উত্তরসাধক কেশবচন্দ্র সেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ধর্মভিত্তিক যে গদ্য-সাহিত্যের উদ্বোধন করেন তারই অনুশীলন ঘটেছে কেশবচন্দ্র সেনের গদ্যে। ধর্ম উপদেশ ও ধর্ম ব্যাখ্যান কেশবচন্দ্র সেনের গদ্য-লেখনীর মুখ্য উদ্দেশ্য হলেও বিষয়কে অতিক্রম করে তাঁর কবিচিত্ত মঞ্জু বাণীতে অনির্বচনীয় সাহিত্যের সামগ্রী হয়ে উঠেছে।

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের আচার্যপদে বৃত হবার পর থেকেই কেশবচন্দ্র সেন ধর্ম-উপদেশ দেবার জন্য বাঙলা রচনায় প্রবৃত্ত হন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে পুরাতন ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। ইতিমধ্যে বহু পত্রপত্রিকায় তাঁর ধর্মোপদেশ, ধর্মালোচনা প্রকাশিত হতে থাকে। সাহিত্য-গুণ-সমৃদ্ধ তাঁর সুবিখ্যাত পত্রিকা 'সুলভ সমাচার' ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দেই প্রকাশিত হয়ে জনচিত্ত জয় করে। কেশবচন্দ্র সেনের সুবিস্তৃত গদ্যসম্ভার আকর্ষণীয় ও উদ্দীপক ভাষায় রচিত। কিন্তু তাঁর

রচনাগুলি ধর্মালোচনার ক্ষেত্রে আবদ্ধ বলে পাঠক ও সমালোচকের নিকট প্রত্যাশানুরূপ স্বীকৃতি পায়নি।

বাঙলা গদ্য-সাহিত্যে কেশবচন্দ্র সেনের স্থানটি নির্ণয় করতে গেলে উনিশ শতকের গদ্যের ইতিহাস অনুসরণ করা প্রয়োজন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পর্ব (১৮০১ খ্রী—১৮১৫ খ্রী) বাঙলা গদ্যের প্রস্তুতিপর্ব। উইলিয়ম কেরি, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ও রামরাম বসুর রচনায় বাঙলা গদ্যের সার্থক সূচনা। রামমোহন রায়, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাংবাদিকদের প্রচেষ্টায় বাঙলা গদ্যের দ্বিতীয় পর্বের (১৮১৫ খ্রীঃ থেকে সূচনা) উদ্বোধন হল। কিন্তু গদ্যকে সর্বকার্যে নিয়োগ, সর্বজন-ব্যবহারযোগ্যতা দান, নমনীয়তা ও শব্দ-প্রাচুর্য দান বাঙলা গদ্যের দ্বিতীয় পর্বে এনে দিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তত্ত্ববোধিনী লেখকগোষ্ঠী। গদ্যের তৃতীয় পর্বের (১৮৪৭ খ্রীঃ থেকে সূচনা) প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব বিদ্যাসাগর। তিনি বাঙলা গদ্যের প্রথম যথার্থ শিল্পী। গদ্যে শুধু প্রয়োজনের নয়, গদ্যে শিল্প সৃষ্টি, সৌন্দর্য সৃষ্টি, রস সৃষ্টি সম্ভব বিদ্যাসাগরেব গদ্যে প্রথম অনুভূত হল। সংস্কৃত গদ্য রীতি ও কথ্য রীতির মিলন ঘটিয়ে বিদ্যাসাগর আবিষ্কার করলেন "মধ্যগা-গদ্য" রীতি। অ্যাডিসন যেমন অষ্টাদশ শতকে ইংরেজী সাহিত্যে 'মধ্যগা'-গদ্য-রীতি আবিষ্কার করেছিলেন, বিদ্যাসাগর তেমনি ঊনবিংশ শতাব্দীতে 'মধ্যগা গদ্য'-রীতির আবিষ্কারক। সংস্কৃত ভাষার সুরবৈচিত্র্য ও ধ্বনিগাম্ভীর্য সহজভাবে বাঙলা ভাষায় গ্রহণ করলেন আর ধ্বনিরোলের বিস্তার ও প্রতিষ্ঠা ঘটল ইংরেজী গদ্যরীতির পথে। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর-প্রবর্তিত 'মধ্যগা রীতি'কে ব্যাখ্যা করেছেন "গদ্যের পদগুলির মধ্যে একটা ধ্বনি-সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া তাহার গতির মধ্যে একটি অনতিলক্ষ্য ছন্দঃস্রোত রক্ষা করিয়া সৌম্য ও সরল শব্দগুলি নির্বাচন করিয়া বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন।"[১]

বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতির একটি নিদর্শন—

"শকুন্তলা কহিলেন, হাঁ পিসি! আজ বড় অসুখ হয়েছিল, এখন অনেক ভাল আছি। তখন গৌতমী কমণ্ডলু হইতে শান্তিজল লইয়া, শকুন্তলার সর্ব-শরীরে সেচন করিয়া কহিলেন, বাছা! সুস্থ শরীরে চিরজীবিনী হয়ে থাক।

---

১. বিদ্যাসাগরচরিত।

অনন্তর, লতামণ্ডপে, অনসূয়া অথবা প্রিয়ংবদা, কাহাকেও সন্নিহিত না দেখিয়া কহিলেন, না পিসি! আমি একলা ছিলাম না, অনসূয়া প্রিয়ংবদা বরাবর আমার নিকটে ছিল, এইমাত্র মালিনীতে জল আনিতে গেল।"[১]

বঙ্কিমচন্দ্রও প্রথম জীবনে এই রীতি অনুসরণ করেন। প্রকৃতপক্ষে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের গদ্য সৃষ্টি এই মধ্যগা রীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত কিন্তু কেশবচন্দ্র সেনের গদ্যে এই রীতির অনুসরণ চোখে পড়ে না। সাধু ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম ব্যবহার করলেও ভাষায় এসেছে কথ্য গদ্যের ভঙ্গী। সাধু গদ্যরীতির সুদীর্ঘ বাক্যবিন্যাস নয়—উপরন্তু বক্তৃতার প্রয়োজনে গদ্য সৃষ্টি হয়েছে দ্রুত লয়ে। যেমন—"আচার্য হইবার অর্থ এ নয় যে, পাপমুক্ত হইয়া আচার্য হইয়াছি, আচার্য হইবার অর্থ এ নয় যে আপনাকে নির্মল করিয়াছি, এক্ষণে অপরকে নির্মল করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমি আচার্য হইয়াছি কেন? কতকগুলি রত্ন পাই, সেইগুলি অপরকে দিবার জন্য। কতকগুলি ভাব পাইয়াই অপর সকলকে তৎসমুদয় অর্পণ করি।" (জীবনবেদ, পৃঃ ১৫৩ প্রথম প্রকাশ ১৮৮৩ খ্রীঃ) কিংবা 'সুলভ সমাচারে'র ভাষা—"সন্ধ্যা হইয়াছে, টিপটিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। কেরানী মহাশয় সমস্ত দিন সাহেবের মধুমাখা ব্যবহারে হাড় ভাজা ভাজা হইয়া বাসায় ফিরিয়া আসিতেছেন। কলারের দোষে এক পাতে আধ হাঁড়ি দধি ঢালিয়া দিলে যেমন হয়, পথের অবস্থাও তেমনি হইয়াছে…কেরানী মহাশয় চাপকানের ল্যাজ গুটাইয়া কোমর বাঁধিয়াছেন।…কেরানী ভায়ার চক্ষে জল আসে, মনে করেন পৃথিবী দু'ফাঁক হয় তো তার মধ্যে প্রবেশ করি।" (কেরানী ও রাজপথ, সুলভ সমাচার, ১২৮০)। এ ভাষার সাধু ক্রিয়াপদটুকু বাদ দিলে ভাষা কথ্য গদ্যের কাছাকাছি। 'টিপটিপ বৃষ্টি', 'চাপকানের ল্যাজ', 'পৃথিবী দু'ফাঁক' ইত্যাদি বাক্‌রীতিতে চলিত গদ্যের ঢংটি সুস্পষ্ট।

কিংবা শেষ যুগের রচনা, প্রার্থনাগুলির গদ্যরীতি লক্ষ্য করা যাক।—"হে দেব, তোমার সিংহাসনের একদিকে মহত্ত্ব, আর একদিকে পরাক্রম, সম্মুখে অনন্ত, পশ্চাতে অনন্ত। আকাশে ব্যাপ্ত মহাদেব, তাই দেখিব। মন, সংসারেতে লোভ মোহ চিত্তবিকার চিরকাল কি ভাল লাগিবে? সব ফেলে দাও, আকাশে ওঠ।" (আচার্যের প্রার্থনা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫১১-৫১২)।

---

১. বিদ্যাসাগর, শকুন্তলা, চতুর্থ পরিচ্ছেদ, পৃঃ ১৫৬, বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ।

উদ্ধৃত গদ্যাংশে কেশবচন্দ্র সেনের যুক্তি ও আবেগ মিলিত হয়েছে। সরলতা ও স্পষ্টতা যদি গদ্যের প্রধান গুণ হয়, তবে কেশবচন্দ্রের গদ্যে সেটির উপস্থিতি দুরূহ তত্ত্বালোচনাকেও সাহিত্যের সম্পদ করে তুলেছে। উদ্ধৃত অংশগুলি বিশ্লেষণ করলে গদ্যের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে।

ক. সাধু ক্রিয়াপদ থাকা সত্ত্বেও কথ্য গদ্যরীতির অনুসরণ,

খ. যুক্তির দৃঢ় কাঠামোতে আবেগ নিয়ন্ত্রিত,

গ. প্রচলিত ও ব্যবহারিক শব্দের প্রয়োগ,

ঘ. দীর্ঘ পদবন্ধ নয়, বরং ছোট ছোট বাক্যগুলি সুপ্রচুর যতিচিহ্নে সুবিন্যস্ত,

ঙ. সুপ্রযুক্ত অলংকার ও রূপকের ( allegory-র ) ব্যবহার,

চ. মধ্যম পুরুষের ব্যবহারে ভাষণে দ্রুতলয়ের সৃষ্টি,

ছ. প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপে গদ্যে সরসতা সৃষ্টি,

জ. সর্বোপরি বক্তব্যের স্পষ্টতা ও সরলতা —ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলি কেশবচন্দ্রের গদ্যকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করেছে।

এজন্যেই বঙ্কিমের যুগবলয়ে বাস করেও কেশবচন্দ্র সেন স্বাতন্ত্র্যধর্মী গদ্যকার। প্রকৃতপক্ষে দুই মনীষীর মানসিকতা দুই দিগন্তের। কেশবচন্দ্র সেন বিপ্লবী ধর্মনেতা ; কর্ম ও যোগ, জ্ঞান ও ভক্তি, ধর্ম ও বিজ্ঞানের মিশ্রণে তিনি যে নতুন বিধান উপলব্ধি করেছিলেন, সেই পথেই তাঁর সাহিত্যসাধনা, আর বঙ্কিমচন্দ্র তত্ত্বজ্ঞ হলেও মূলতঃ সাহিত্যিক, শিল্পী। তাত্ত্বিক বঙ্কিমের ধর্মবোধের চূড়ান্ত ফলশ্রুতি অনুশীলন-ধর্ম। এটি বঙ্কিমচন্দ্র হিতবাদ ও মানবতাবাদের পথে লাভ করেছেন। সাহিত্য-সরস্বতীর অবস্থান কেশবচন্দ্র সেনের কণ্ঠে, আর বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীতে সচেতন সাহিত্য-সৃষ্টি। সাহিত্য-সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের মান, মর্যাদা ও গুণাবলী সম্পর্কে সদা-জাগ্রত। আর কেশবচন্দ্রের সাহিত্যবোধ মগ্নচৈতন্ত ফল্গুধারার মত অন্তরে প্রবাহিত। ঝর্ণাধারার মত স্বতঃস্ফূর্ত তার প্রকাশ—অকম্পিত, অনায়াসলভ্য কাব্য-সৌন্দর্যমণ্ডিত। কারণ কেশবচন্দ্র সেন আগে বাগ্মী, পরে সাহিত্যিক। বাগ্মীর কণ্ঠ সরস্বতীর পীঠস্থান।

বাঙলা সাহিত্যে কেশবচন্দ্র সেন আবির্ভূত হয়েছেন প্রায় বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িককালে। এই দুই মনীষীর জন্ম ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে। সতীর্থ হিসেবে তাঁরা একই কলেজে পাঠ করেছেন। '১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে বুদ্ধি

নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে আইন পড়তে আসেন বঙ্কিমচন্দ্র। '১৮৫৮ খ্রীঃ আইন পড়া ছেড়ে দিয়ে বি. এ. পরীক্ষা দিলেন।'[১] "কেশবচন্দ্র সেনও ১৮৫৩ খ্রীঃ থেকে ১৮৫৮ খ্রীঃ পর্যন্ত প্রেসিডেন্সি কলেজের দর্শনশাস্ত্রের ছাত্র ছিলেন।"[২] কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের গৌরবের যুগের সূত্রপাত হবার আগেই কেশবচন্দ্রের গৌরব সূচিত হল। কেশবচন্দ্র সেন প্রধানতঃ বাগ্মী। আচার্য হিসেবে ধর্মোপদেশ, ধর্ম ব্যাখ্যান উপলক্ষে এবং জননেতা হিসেবে শিক্ষা, সমাজ ও ধর্মে নবতর আন্দোলন পরিচালনার জন্য তাঁকে মঞ্চ থেকে বাগ্‌বিস্তার করতে হয়েছে। শিক্ষিত-অশিক্ষিত জনতা তাঁর ভাষণের ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে আকর্ষিত হয়েছে, ভাবের গভীরতায় মুগ্ধ হয়েছে। এমন কি বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁর বক্তৃতার প্রশস্তি গেয়েছেন। "যখন তাঁহার 'দুর্গেশনন্দিনী' আলোকের মুখদর্শন পর্যন্ত করে নাই, সেই সময় কলিকাতার কোন স্থলে একদিন কেশববাবুর সঙ্গে বঙ্কিমবাবুর সাক্ষাৎ হইলে বঙ্কিমচন্দ্র কেশবচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেন—"I wish to know how far you have outgone me",—একথা কেশববাবুর নিজ মুখেই শুনিয়াছি।"[৩-৪]

নববিধান-প্রবর্তক কেশবচন্দ্র সেনকে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একজন প্রতিভাধর পুরুষ মনে করতেন, সেটি হয়তো তাঁর বাগ্মিতা ও চারিত্রিক সদ্‌গুণের জন্য। কারণ, 'ধর্মতত্ত্বে' বঙ্কিমচন্দ্র লিখছেন—

"শিষ্য—বৈদ্য কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্মণ শিষ্য, ইহা আপনি সঙ্গত মনে করেন ?

গুরু—কেন করিব না ? ঐ মহাত্মা ব্রাহ্মণগণের শ্রেষ্ঠ গুণসকলে ভূষিত ছিলেন। তিনি সকল ব্রাহ্মণেরই ভক্তির যোগ্য পাত্র।"[৫]

বঙ্কিমচন্দ্র কেশবচন্দ্র সেনের বাগ্মিতাকে অভিনন্দিত করলেও, তাঁর চরিত্র-মধ্যে সদ্‌ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ গুণাবলী নিরীক্ষণ করলেও ব্রাহ্মধর্মের প্রতি তাঁর

১. শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমজীবনী, পৃঃ ১০৬। ২. যোগেশচন্দ্র বাগল : কেশবচন্দ্র সেন, পৃঃ ১৪, সাহিত্যসাধক চরিতমালা. নবম খণ্ড। ৩. কালীনাথ দত্ত, 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রদীপ, ২য় ভাগ, ১৩০৬, ভাদ্র, নবম সংখ্যা। ৪. বঙ্কিমজীবনীতে সম্পাদক শচীশ চট্টোপাধ্যায় কালীনাথ দত্তের এই বক্তব্যকে স্বীকার করেছেন। ৪৫১ পৃষ্ঠায় শেষ অধ্যায়ে তিনি 'প্রদীপ' পত্রিকা থেকে কালীনাথ দত্তের প্রবন্ধের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে কালীনাথ দত্তকে সমর্থন করেছেন। ৫. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত ধর্মতত্ত্ব, প্রথম ভাগ, (প্রথম সংস্করণ) ১২৯৫ বঙ্গাব্দে।

কোনদিনও শ্রদ্ধা প্রকাশিত হয়নি।[১] রাজনারায়ণ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর বহু বাদবিসম্বাদ হয়।[২] কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্ম আন্দোলন, নববিধান ধর্ম ঘোষণা ও তাঁর রচিত সাহিত্য-কর্ম সম্পর্কেও তিনি উদাসীন ছিলেন। "বঙ্কিমবাবু ধর্ম-সাহিত্যের কোন ধারই ধারতেন না এবং কোন সংবাদই লইতেন না। তিনিই কেবল তাঁহার সময়ে বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রে বাস্তবিক স্যামুয়েল জনসন স্থানীয় ছিলেন। যদি তিনি বাঙ্গালার প্রচলিত সাহিত্যের রীতিমত তত্ত্ব লইতেন, তাহা হইলে বাঙ্গালা সাহিত্যের পক্ষে বড়ই মঙ্গলের হইত।"[৩]

বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে বাঙলা গদ্যের পূর্ণ যৌবনই যে ফুটে উঠেছিল, সে বিষয়ে সকলেই একমত। বঙ্কিমের সার্থকতার চাবিকাঠিটি ছিল গদ্যের ভারসাম্য এবং সরলতা ও স্পষ্টতার মধ্যে। কেশবচন্দ্র সেনের গদ্যেও আমরা সরলতা দেখেছি, দুরূহ বিষয় স্পষ্টতার গুণে হয়ে উঠেছে সহজ অনুভবগম্য। কিন্তু বঙ্কিমের অনুসৃত গদ্যরীতি কেশবচন্দ্র সেনের আদর্শ নয়, যদিও তাঁরা ছিলেন একই যুগের মনস্বী লেখক। বিদ্যাসাগরী গদ্যই বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যের আদর্শ, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথমযুগের বাঙলা গদ্য-রচনাগুলিতে বিদ্যাসাগরীয় গদ্যের অনুসৃতি লক্ষ্য করা যায়। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'দুর্গেশনন্দিনী'র বেশীর ভাগই বিদ্যাসাগরীয় রীতিতে রচিত "শ্যামোজ্জ্বল শাখাপল্লবসকল স্নিগ্ধ চন্দ্রকরে প্লাবিত, কখন কখন সুমন্দ পবনান্দোলনে পিঙ্গলবর্ণ দেখাইতেছিল,

---

১. এমন কি, উপন্যাস রচনাকালেও ব্রাহ্মধর্মের প্রতি এই অশ্রদ্ধার ভাব প্রকাশিত হয়েছে। বৃক্ষ উপন্যাসে তারাচরণ চরিত্রটির মধ্য দিয়ে ব্রাহ্মধর্মের প্রতি ব্যঙ্গাত্মক মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে। "তারাচরণ একজন গ্রাম্য দেবতার মধ্যে হইয়া উঠিলেন। বিশেষতঃ তিনি 'সিটিজেন অব দি ওয়ার্লড' এবং 'স্পেকটেটর' পড়িয়াছিলেন, এবং তিন বুক জিওমেট্রি তাঁহার পঠিত থাকার কথাও বাজারে রাষ্ট্র ছিল। এইসকল গুণে তিনি দেবীপুরনিবাসী জমিদার দেবেন্দ্রবাবুর ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইলেন, এবং বাবুর পারিষদমধ্যে গণ্য হইলেন। সমাজে তারাচরণ বিধবাবিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা এবং পৌত্তলিকবিদ্বেষাদি সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ লিখিয়া প্রতি সপ্তাহে পাঠ করিতেন। তাহার কোনটা বা তত্ত্ববোধিনী হইতে নকল করিয়া লইতেন, কোনটা বা স্কুলের পণ্ডিতের দ্বারা লেখাইয়া লইতেন। মুখে সর্বদা বলিতেন—মেয়েদের লেখাপড়া শিখাও, তাহাদের পিঞ্জরায় পুরিয়া রাখ কেন? মেয়েদের বাহির কর।—স্ত্রীলোক সম্বন্ধে এতটা লিবরালিটির একটা বিশেষ কারণ ছিল, তাহার নিজের গৃহ স্ত্রীলোকশূন্য।"—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বিষবৃক্ষ, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

২. হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, পৃ. ১৫৩। ৩. কালীনাথ দত্ত, 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রদীপ, ২য় ভাগ ১৩০৬ ভাদ্র নবম সংখ্যা—পৃ. ৩১০।

কাননতলে ঘোরান্ধকার কোথাও কোথাও শাখাপত্রাদির বিচ্ছেদে চন্দ্রালোক পতিত হইতেছে, আমোদরের স্থিরাম্বুমধ্যে নীলাম্বর চন্দ্র ও তারা সহিত প্রতিবিম্বিত, দূরে অপরপারস্থিত অট্টালিকাসকলের গগনস্পর্শী মূর্তি, কোথাও বা তৎপ্রাসাদস্থিত প্রহরীর অবয়ব। এতদ্ব্যতীত আর কিছুই লক্ষ্য করিতে পারিলেন না।" এই গদ্যরীতি বিদ্যাসাগরের সীতার বনবাসের (১৮৬০) গদ্যরীতির অনুসরণ—"এই সেই জনস্থান-মধ্যবর্তী প্রস্রবণগিরি। এই গিরির শিখরদেশ আকাশপথে সতত সঞ্চরমাণ জলধরমণ্ডলীর যোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত, অধিত্যকাপ্রদেশ ঘনসন্নিবিষ্ট বিবিধ বনপাদপসমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে, সতত স্নিগ্ধ শীতল ও রমণীয়, পাদদেশে প্রসন্নসলিলা গোদাবরী তরঙ্গ বিস্তার করিয়া প্রবলবেগে গমন করিতেছে।"

পরবর্তী কালে 'সংস্কৃত-প্রিয়তা ও সংস্কৃতানুসারিতা'র জন্য বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে অভিযুক্ত করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের গদ্য "এইরূপ সংস্কৃত-প্রিয়তা ও সংস্কৃতানুকারিতা হেতু বাঙ্গালা সাহিত্য অত্যন্ত নীরস, শ্রীহীন, দুর্বল এবং বাঙ্গলা সমাজে অপরিচিত হইয়া রহিল। টেকচাঁদ ঠাকুর প্রথমে এই বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করিলেন। ...যে ভাষায় সকলে কথোপকথন করে তিনি সেই ভাষায় 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রণয়ন করিলেন। সেইদিন হইতে বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি। সেইদিন হইতে শুষ্কতরুর মূলে জীবনবারি নিষিক্ত হইল।"[১] সংস্কৃত-প্রিয়তার অভিযোগ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথমযুগের গদ্য সম্পর্কেও প্রযোজ্য। বঙ্গদর্শনের যুগে (১৮৭২ খ্রী. থেকে) অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্য রচনায় সংস্কৃতের প্রভাবমুক্তি ঘটেছে। কারণ, তিনি জানতেন, রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন সরলতা এবং স্পষ্টতা। এই কারণেই তিনি বিদ্যাসাগরের গদ্যভাষাকে তীব্র সমালোচনা করলেও তাঁর আবিষ্কৃত মধ্যগা রীতিকেই বাঙলা গদ্যের আদর্শরূপে গ্রহণ করলেন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদর্শনের প্রকাশ এবং বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার স্থায়ী স্বাক্ষর মুদ্রিত হল। বাঙলা সাহিত্যে বঙ্কিমযুগের সূত্রপাত এইখানেই। উনিশ শতকের শেষ তিন দশক রবীন্দ্রযুগ-সূচনার পূর্ব পর্যন্ত বঙ্কিম-প্রভাবিত। বঙ্গদর্শনের আশ্রয়ে বঙ্কিম-অনুসারী গদ্যকারদের আবির্ভাব।

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনীর প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ঔপন্যাসিক হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মপ্রকাশ। ১৮৬৭ খ্রী. কপালকুণ্ডলা ও তৃতীয় উপন্যাস

১. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গভাষা, বিবিধ প্রবন্ধ।

মৃণালিনী ১৮৬৯ সালে প্রকাশিত হয়। দুর্গেশনন্দিনীর ভাষা বিদ্যাসাগরী রীতিতে গঠিত, পূর্বেই সেকথা উল্লেখ করা হয়েছে। কপালকুণ্ডলায় ভাষার গতি দ্রুততর হয়েছে, কিন্তু মোটামুটিভাবে দুর্গেশনন্দিনীর ভাষার ন্যায় মৃণালিনীতেও ভাষা উৎকর্ষ লাভ করেনি। প্রথম সংস্করণের মৃণালিনীর ভাষা অধিক সমার্জিত ছিল। অযথা সন্ধি ও সমাস অনেক স্থলে ভাষার সৌন্দর্যহানি করেছে।[১] ভাষাও সংস্কৃত-ঘেঁষা—

"সান্ধ্য গগনে রক্তিম মেঘমালা কাঞ্চনবর্ণ ত্যাগ করিয়া ক্রমে ক্রমে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল। রজনীদত্ত তিমিরাবরণে গঙ্গার বিশাল হৃদয় অস্পষ্টীকৃত হইল। সভামণ্ডলে পরিচারকহস্তজ্বালিত দীপমালার ন্যায় অথবা প্রভাতে উদ্যানকুসুমসমূহের ন্যায় আকাশে নক্ষত্রগণ ফুটিতে লাগিল। প্রায়ান্ধকার নদীহৃদয়ে নৈশ সমীরণ কিঞ্চিৎ খরতরবেগে বহিতে লাগিল। তাহাতে রমণীহৃদয়ে নায়কসংস্পর্শজনিত প্রকম্পের ন্যায় নদীবক্ষে তরঙ্গ উত্থিত হইতে লাগিল।"[২]

এরপর বঙ্গদর্শনের প্রকাশ। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদর্শনের প্রকাশের কাল থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র ক্রমে ক্রমে গদ্য রচনার নিজস্ব পদ্ধতিতে আত্মস্থ হয়েছেন। সমকালীন যুগে বসেও কেশবচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা প্রভাবিত নন ও বঙ্কিমচন্দ্রের গৌরবের যুগের পূর্বেই কেশবচন্দ্রের প্রভাবের দিন সূচিত হয়েছিল—এই প্রত্যয়ান্বিত সিদ্ধান্তে পৌঁছবার জন্যই বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যরীতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্রের 'সুলভ সমাচার'-এর প্রকাশ। নিঃসন্দেহে এক পয়সা দামের কাগজটি সে যুগের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় পত্রিকা। কিন্তু জনপ্রিয়তা সাহিত্যবিচারের মানদণ্ড নয়। সম-সমাজের চিত্তরঞ্জিনী গুণ ছাড়াও 'সুলভ সমাচার' বাঙলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে যুগান্তর এনেছে। সর্বজনকথিত, বহু-ব্যবহৃত, বহু-প্রচলিত ভাষাই 'সুলভ সমাচারে'র ভাষা। যে 'সংস্কৃত-অনুসারিতা'র দোষে বিদ্যাসাগর দোষী হয়েছেন, বঙ্কিমচন্দ্র যে সংস্কৃতের প্রভাব ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের আগে পর্যন্ত কাটিয়ে উঠতে পারেননি, 'সুলভ সমাচারে'র ভাষা সেই সংস্কৃতগন্ধিতা থেকে মুক্ত। যেমন 'সুলভ সমাচার' ১২৭৭ বঙ্গাব্দ ( ১৮৭০ খ্রীঃ ) ২৯শে চৈত্রে প্রকাশিত 'গাজনের সঙ'

১. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, পৃ. ৮৩। ২. মৃণালিনী, দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রবন্ধের ভাষা—"কিন্তু মদ খাইয়া ঢলাঢলি করা, উলঙ্গ হইয়া পথে চলা, হাজার হাজার লোকের সম্মুখে অবিশ্রান্ত অশ্লীল শব্দ উচ্চারণ করা, এই-সকল যদি লেখাপড়ার চরম মান হয় এবং ইহাই যদি সভ্যতার লক্ষণ হয়, তবে এই দুষ্ট সরস্বতীকে যতশীঘ্র শতমুখী ও কুলার বাতাস দিয়া বিদায় করা যায়, ততই দেশের মঙ্গল।"[১] এই পত্রিকার ভাষা ক্রমশই সরলতর হয়ে এসেছে। "মানুষ বৃষ্টি বৃষ্টি করিয়া পাগল হইয়াছিল, এতদিনের পর বৃষ্টি পড়িল। ইহা অপেক্ষা অধিক পড়িলে আমরাও সন্তুষ্ট হই, চাষারাও সন্তুষ্ট হয়, কিন্তু কলিকাতার কেরানীবাবুরা সন্তুষ্ট হয়েন কিনা সন্দেহ।" ('সুলভ সমাচার', ২৫শে আষাঢ়, ১২৮০)।

সাময়িক পত্রিকার প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহের ভাষা স্পষ্ট ও সরল এবং কথ্যভাষাশ্রিত হবে, সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু 'সুলভ সমাচার' প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব থেকেই কেশবচন্দ্র সেনের গদ্য তৎসম শব্দ ও ক্রিয়াপদ ত্যাগ করে কথ্য গদ্যরীতির স্বচ্ছতা ও সহজ গতিময়তাকে অনুসরণ করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। 'স্ত্রীর প্রতি উপদেশ' (১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দ) গ্রন্থে প্রথম দিকের একটি গদ্যাংশে—"যখন তোমার মুখের দিকে প্রথম দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম, আমার মনে এক অপূর্ব ভাবের উদয় হইল। আমার হৃদয় তোমার প্রতি আকৃষ্ট হইল। পিতাই তোমাকে আমার হৃদয়রজ্জুর দ্বারা সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছেন।" এখানে তৎসম শব্দ ও ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয়েছে সত্য, কিন্তু একই রচনায় সংস্কৃতানুসারিতা থেকে মুক্তি পেতে কেশবচন্দ্র সেনের বিশেষ কষ্ট হয়নি। "পৃথিবী বলুক, প্রকৃত দাম্পত্য প্রেম পবিত্র অনুরাগ। স্বামী ও স্ত্রীর ভালবাসা স্বর্গীয়, ইহা কে অবিশ্বাস করিতে পারে? ...আমার সম্বন্ধে

---

১. ইতিমধ্যে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'র প্রথম খণ্ড ও ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে প্রকাশিত হয়ে গেছে। তখনও (১৮০২ খ্রী) সাহিত্যাকাশে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব হয়নি—কালীপ্রসন্ন সিংহ সহজেই কলকাতার চলতি বুলি অবলম্বন করে ব্যঙ্গে বিদ্রূপে পরিপূর্ণ অতিশয় শক্তিশালী গদ্য রচনা করেন। সে যুগের কলকাতার ধনী, মধ্যবিত্ত ও সাধারণ সমাজের হুজুগপ্রিয়তা তিনি ব্যঙ্গ করেছেন। কেশবচন্দ্র সেনের গদ্যে আমরা চলতি গদ্যের চটুকু দেখেছিলাম আর কালীপ্রসন্নের গদ্যে আগাগোড়া একেবারে চলতি বুলি বা ক'লকাতার 'ককনি' ব্যবহৃত হতে দেখেছি। তাঁর পূর্বে টেকচাঁদ ঠাকুর তাঁর 'আলালের ঘরে দুলালে' সহজ ভাষা ব্যবহার করলেও সাধু ও চলিত রীতির সংমিশ্রণ সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন। এমন কি, বাঙলা সাহিত্যে প্রায় রবীন্দ্রনাথের আগে পর্যন্ত সব গদ্যকারই সাধুভাষা ও চলিত ভাষার রীতির মাখামাখি বর্জন করতে পারেননি।

তুমি এক স্বর্গের সদৃশ অলংকারে ভূষিত আত্মারূপে, আমার সাধন-ভজনের প্রিয়সঙ্গিনী রূপে এবং অধ্যাত্মজগতের বিশ্বস্ত বন্ধুরূপে বিরাজমান।— উদ্ধৃতাংশের এই গদ্যই পরবর্তীকালে 'সুলভ সমাচারে'র ভাষার জন্ম দিয়েছে।

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র সেনের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'জীবনবেদ' প্রকাশিত হয়েছে। নমুনা হিসেবে উদ্ধৃতি দেওয়া যাচ্ছে।—"আমি জানিতাম, প্রার্থনা করিলেই শোনা যায়। আদেশের মত এই রূপ প্রথম হইতেই হৃদয়ে নিহিত আছে। কি ধর্ম লইব, প্রার্থনা তাহার উত্তর দিতেন। আফিসের কাজ ছাড়িব কি, ধর্ম-প্রচারক হইব কি, প্রার্থনাই তাহা বলিয়া দিতেন।...প্রার্থনা করিলে উত্তর পাওয়া যায়, দেখিতে চাহিলে দেখা যায়, শুনিতে চাহিলে শোনা যায়—এই জানিতাম।...ক্রমে ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দিলাম, সাধক হইলাম, প্রচারক হইলাম, উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলাম—সব হইল। প্রার্থনা মানি বলিয়াই জীবন যাহা তাহা।"

এই সঙ্গে তুলনীয়—১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণ-চরিত্রে'র ভাষা। "মনুষ্যজীবনে যেসকল কার্য সম্পন্ন হয়, সকলই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া নির্বাহ করা যায়। তবে বিষয়ভেদে প্রমাণের অল্প বা অধিক বলবত্তা প্রয়োজনীয় হয়। যে প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া আমরা সচরাচর জীবনযাত্রার কার্য নির্বাহ করি, তাহার অপেক্ষা গুরুতর প্রমাণ ব্যতীত আদালতে একটা মোকদ্দমা নিষ্পন্ন হয় না, এবং আদালতে যেরূপ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বিচারক একটা নিষ্পত্তিতে উপস্থিত হইতে পারেন, তাহার অপেক্ষা বলবান্ প্রমাণ ব্যতীত বৈজ্ঞানিক, বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন না।"

বঙ্কিমচন্দ্রের এই গদ্য চিন্তার বাহন, যুক্তি ও বিচারপ্রধান। ভাষা দ্ব্যর্থহীন,-আতিশয্য-বর্জিত। সুদীর্ঘ বাক্য বিন্যাসে যুক্তির দৃঢ়তা প্রকাশিত, অপরদিকে কেশবচন্দ্র সেনের 'জীবনবেদে'র ভাষায় ব্যক্তিগত হৃদয়ভাবনা ও অতীন্দ্রিয় কল্পনার আবেগ উপস্থিত। সংক্ষিপ্ত বাক্যবিন্যাসে গদ্যরীতিতে এসেছে ছন্দস্পন্দ ও দ্রুততা। এ ভাষা নৈর্ব্যক্তিক, নিরাসক্ত, আবেগহীন দর্শনচিন্তামাত্র নয়—সুষম শব্দবিন্যাসে বাক্যের গঠনে একদিকে হৃদয়াবেগ, অপরদিকে কথ্য গদ্যের সুরটি ধ্বনিত হচ্ছে।

কেশবচন্দ্র সেন বাঙলা গদ্যকার হিসেবে নিঃসন্দেহে স্বকীয়তা বা ষ্টাইলের অধিকারী। ষ্টাইলের ছয়টি গুণ—স্বচ্ছতা, সরলতা, পরিমিতি, বৈচিত্র্য,

নাগরিক বৈদগ্ধ্য ও সরলতা। ষ্টাইলের মূল লক্ষ্য যদি লেখকের ব্যক্তিত্বের উদ্‌ঘাটন হয়, তবে কেশবচন্দ্র সেন গদ্যশিল্পী। "ক্রমে উষা হইতে প্রাতঃকালে আসিলাম। ক্রমে বেলা হইতে লাগিল। চারিদিক আচ্ছন্ন ছিল অন্ধকারে, পরিষ্কৃত হইয়া পড়িল। পথ ঘাট, বাড়ী ঘর, সকল দেখা গেল। এই প্রার্থনা করিতে করিতে সিংহের বল, দুর্জয় বল, অসীম বল লাভ করিতে লাগিলাম।" (জীবনবেদ, প্রার্থনা, পৃষ্ঠা ৩)।

তাঁর অধিকাংশ রচনাই উপদেশ কিংবা সাংবাদিকতা, বক্তৃতা কিংবা ধর্মব্যাখ্যান, কিন্তু সব রচনাই উপমা ও রূপকের ব্যবহারে বিষয়বস্তুর নীরসতা ত্যাগ করে সরস মাধুর্য লাভ করেছে। সাংবাদিকতা সাহিত্য নয়; কিন্তু সাংবাদিকতার ভূমিকা ছাড়া উচ্চমানের সাহিত্য ও সাহিত্যিক আজ পর্যন্ত আবির্ভূত হননি। বাঙলা গদ্যে কেশবচন্দ্র সেনের সাংবাদিকতার ভূমিকাটি সবিশেষ গৌরবপূর্ণ। গদ্য ভাষার সর্বজনব্যবহারযোগ্যতা দানে, ধর্ম-শিক্ষা-সমাজসংক্রান্ত বিষয়মুখী আলোচনায়, শ্লীলতা ও শোভনতার প্রতিষ্ঠায় কেশবচন্দ্র সেনের সাংবাদিকতা বাঙলা গদ্যকে সুনীতি ও সৌন্দর্যের দুয়ারে পৌঁছে দিয়েছে।

উনিশ শতকের বাঙলা সাহিত্যে 'মিস্টিসিজম' বা 'অতীন্দ্রিয়বাদ' নতুন করে যুক্ত করলেন কেশবচন্দ্র সেন। মধ্যযুগের বঙ্গ-সাহিত্য সুফী সাধক ও বৈষ্ণবীয় ধর্মচেতনাজাত 'মিস্টিসিজমে'র দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। কেশবচন্দ্র সেনের যোগ ও ভক্তির 'সমন্বয়ী ধর্মে' শেষভাগে ভক্তির প্রবলতা প্রধান হয়ে উঠেছিল। আত্যন্তিক আবেগ কর্মী কেশবকে, যোগী কেশবকে, পুরোপুরি 'ভক্ত কেশবে' পরিণত করেছিল। নিজ সাধনলব্ধ অনুভূতি দিয়ে জাতীয় চেতনাকে পরিশোধিত করবার কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন। শুদ্ধা ভক্তি, সমুদ্রগভীর বিশ্বাস ও ভাগবতী প্রেরণা তাঁকে অতীন্দ্রিয়বাদী করে তুলেছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পরমাত্মাকে জীবাত্মার প্রাণ-রূপেই উপলব্ধি করেছেন; কিন্তু কেশবচন্দ্র সেনের কাছে পরমাত্মা কেবল আত্মার প্রাণ নন—পরমাত্মা আত্মার চালক; জীবাত্মা পরমাত্মার প্রত্যাদেশে চালিত। "তিনি যেমন ভাবান, তেমনই ভাবি; যেমন বলান, তেমনই বলি; যেমন প্রচার করিতে বলেন, তেমনই প্রচার করি।" (জীবনবেদ, অনুক্ত খণ্ডম পৃঃ ১৫৫)।

তিনি বলেছেন—বাইরের বস্তুসকল যেমন দেখা যায়, তেমনই তিনি

ঈশ্বরকে দেখেছেন ; ভগবান্ বলে যাঁর পুজো করেন, বন্ধু বলে যাঁকে ভালবাসেন, তাঁর কথা তিনি সর্বদা শুনতে পাচ্ছেন। তিনি 'মিস্টিক' বলেই ঈশ্বরদর্শন, ঈশ্বরের বাণী-শ্রবণ তাঁর কাছে অসাধারণ কিছু নয়। "True auditions are usually heard when the mind is in a state of deep absorption without conscious thought : that is to say, at the most favourable of all moments for contact with the transcendental world." ওয়ার্ডস্বার্থও তাঁর Tintern Abbey কবিতায় বলেছেন—

> "We are laid asleep
> In body, and become a living soul ;
> While with an eye made quiet by the power
> Of harmony, and the deep power of joy,
> We see into the life of things."

কেশবচন্দ্র সেনের অতীন্দ্রিয় উপলব্ধি তাঁর রচিত প্রায় সকল গ্রন্থের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়। 'সাধু-সমাগম', 'জীবনবেদ' ও শেষ জীবনের প্রার্থনাগুলির মধ্যে অতীন্দ্রিয়তা বাণী সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে।

"ও হে যুবা গৌরাঙ্গ, তোমায় সকলেই ভালবাসে। নারী তোমাকে দেখিবার জন্য সোনার গহনা ফেলিয়া দেয়। সুবর্ণের স্বর্ণ, তুমি জড় সোনা, আর তুমি মানুষ সোনা, তোমাকে ছাড়িয়া লোকে সোনা লইবে কেন ?... এক প্রচণ্ড বোঝার ভারে আমার প্রাণের চৈতন্য কাঁদিতেছেন।" (সাধু-সমাগম, পৃ. ৭৭)। কিংবা ১৮৮৩ খ্রীঃ, ১৬ই সেপ্টেম্বরের প্রার্থনায়—"স্বর্গের গাছে, পরমাত্মা বড় পাখীর কাছে জীবাত্মা ছোট পাখী, তুমি ঠোঁটে করিয়া উহাকে খাওয়াইতেছ। ও আর আমার কথা শুনে না। বুঝিয়াছি, যতদিন পৃথিবীর কাদা পাখী খায়, ততদিন সে কথায় ভুলে। একবার স্বর্গের ফল খাইলে আর কি সে ইহা চায় ? ("উপনিষদে আছে—'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে'।" ইত্যাদি)।

কখনও বা কেশবচন্দ্র সেনের গভীর আবেগ ক্ল্যাসিক সংযমে রসঘন হয়ে উঠেছে—'চিদাকাশে আত্মা-পায়রা উড়িল, জ্ঞান-সূর্যের আলোকে উহা ক্রমাগত উড়িতে আরম্ভ করিল। যোগী হইয়া বিহঙ্গসকল উড়িতেছে। হিংসা নিন্দা

১. Evelyn Underhill. Mysticism,—পৃঃ ৩৩০।

নীচে, চিন্তা দুর্ভাবনা পৃথিবীতে, কামক্রোধ স্বার্থপরতা মাটিতে বাস করিলেই হয়, আকাশে এসব কিছুই নাই।" (মাঘোৎসব, পায়রা উড়ান, পৃঃ ৭৩)।

কেশবচন্দ্রের হৃদয়টি কবির হৃদয়। তিনি ভক্ত, তিনি কবি। "ভক্তের চক্ষে সমস্ত জীবন কবিত্ব। ভক্তির অভাব হইলে পদ্য গদ্য হয়। ভক্ত সর্বদাই আপনার প্রাণ হইতে নবপ্রসূত প্রেম-পুষ্প তুলিয়া ঈশ্বরের পাদপদ্ম পূজা করেন। যদি ভক্তের প্রাণ শুষ্ক হয়, তবে তিনি ঈশ্বরকেও আর সুন্দর এবং প্রেমপূর্ণ দেখিতে পান না।" (কেশবচন্দ্র সেন, আচার্যের উপদেশ/৮ম খণ্ড, পৃঃ ৪১)। এই কারণেই তিনি কবি হতে বাধ্য। তিনি ভক্তের হৃদয় নিয়ে চন্দ্রের লাবণ্য দেখেন, ফুলের শোভা দেখেন; আর দেখেন সমুদ্রের তরঙ্গের উপর সূর্যের কিরণ, আকাশে নক্ষত্রের ছবি, পাখীর শরীরে রঙবেরঙ। ভক্তের হৃদয়-উপলব্ধ সত্য মঞ্জুল ভাষায় কাব্য হয়ে প্রকাশিত হয়—"যিনি জড়েতে, জীবেতে মানুষেতে দেবতাতে এত সুন্দর ছবি করিলেন, না জানি তিনি কত সুন্দর। চিত্রকর, পরমেশ্বর, ভাবের ভাবুক মহাদেব, তোমাকে কেন ভাবি না?" (আচার্যের প্রার্থনা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫০৮)।

ভক্ত কেশবচন্দ্র সেন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে কবির ন্যায় মুগ্ধ হয়েছেন। শরৎকালের পূর্ণিমা প্রকৃতি, হিমালয়ের প্রশান্তি পুণ্যসলিলা গঙ্গা তাঁর কবি-চিত্তকে জাগ্রত করেছে। (কেশবচন্দ্র সেনের প্রার্থনাগুলি আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর প্রকৃতি-প্রেম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে)। কেশবচন্দ্র সেনের গদ্যে তাই পদ্য যুক্ত হয়েছে। প্রকৃতির বুক থেকে উপমাদি সংগ্রহ করে তিনি পূজার ডালি সাজিয়েছেন। তাই তাঁর ভাষা অলংকারবহুল।

সাহিত্যে অলংকারের একটি বিশেষ স্থান আছে। Longinus বলেছেন, "Dignity, grandeur and powers of persuasion are to a very large degree derived from images.—"[১] এই তিনটি গুণই লেখককে অর্জন করতে হয়; এখানেই ফুটে ওঠে গদ্যকারের নিজস্ব ষ্টাইল বা বাগ্‌ভঙ্গিমা। বঙ্কিমচন্দ্রও বলেছেন, "অলংকার প্রয়োগ বা রসিকতার জন্য চেষ্টিত হইবেন না। স্থানে স্থানে অলংকার বা ব্যঙ্গের প্রয়োজন হয় বটে, লেখকের ভাণ্ডারে এ সামগ্রী থাকিলে প্রয়োজনমতে আপনি আসিয়া পৌঁছিবে, ভাণ্ডারে না থাকিলে মাথা কুটিলেও আসিবে না। অসময়ে বা

১. Longinus, On the Sublime, Editor, Betty & Robert—P. 121.

শূন্য-ভাণ্ডারে অলংকার প্রয়োগের বা রসিকতার চেষ্টার মত কদর্য আর কিছুই নাই।"১ কেশবচন্দ্র সেনের গদ্যে ব্যবহৃত অলংকারের কয়েকটি নিদর্শন প্রমাণ করবে—এই অলংকার-প্রয়োগ চেষ্টাকৃত সযত্ন প্রয়াস নয়; বরং স্বতঃস্ফূর্ত ও সুপ্রযুক্ত। এই অলংকার শুধু বহিরঙ্গ-কলার কারুকার্যমাত্র নয়, তাঁর ব্যবহৃত প্রতিটি অলংকার বিষয়ানুগ ও ভাবানুকূল। কয়েকটি সুপ্রযুক্ত অলংকারের নিদর্শন উদ্ধৃত করা হল—

১. "অমাবস্যার অন্ধকারে না পড়িলে পূর্ণিমার আলোক ও শোভা বুঝিবে না। ধন্য দয়াময়। এ জীবন-উদ্যানে এখন ভক্তির আনন্দ-ফুল ফুটিয়াছে।" (রূপক)।

২. "একটি মহাসাগরের কাছে আমি ছোট ডোবার মত, খানার মত, প্রকাণ্ড সূর্যের কাছে আমি একটি ক্ষুদ্র দীপ, একটি সুবিস্তৃত অট্টালিকার কাছে আমি একটি ছোট্ট ঘর, আমি প্রধান কিরূপে বলিব।" (মালোপমা)।

৩. ভিত্তি-স্থাপনের সময় কে অট্টালিকার সৌন্দর্য চিন্তা করে? কি রং দিব বারাণ্ডায়, তাহা কি মানুষ ভাবে? তখন কেবল অটলভাবে ভিত্তিই স্থাপন করিতে হয়। (অর্থান্তরন্যাস)।

৪. "মাটি তবুও গরম হয়, তুমি ফুলের ন্যায় নরম।" (ব্যতিরেক)।

৫. সুবর্ণের স্বর্ণ, তুমি জড় সোনা, আর তুমি মানুষ সোনা, তোমাকে ছাড়িয়া লোকে সোনা লইবে কেন? (রূপক ও যমক)।

৬. "তুমি নবীন, আমরা নবীন, নিশান নূতন, সবই নূতন; তুমি নূতন হলে সবই নূতন। আকাশকে নূতন কর, জীবনকে নূতন কর। নূতন যৌবন দাও, নূতন উৎসাহ দাও"। (চরমোৎকর্ষ)।

৭. আকাশের চাঁদকে লজ্জা দিবে বলিয়া তুমি এমন সুন্দর চন্দ্রকে গঠন করিলে। (ব্যতিরেক)।

৮. প্রথমে মা, পরে উপমা, তাহ'র পর প্রতিমা। (সার)।

৯. "এই প্রার্থনা করিতে করিতে সিংহের বল, দুর্জয় বল, অসীম বল লাভ করিতে লাগিলাম।" (চরমোৎকর্ষ, আরোহ)।

১০. "গঙ্গার মতন, সমুদ্রের মতন, মহাসমুদ্রের মতন।" (সার ও মালোপমা)।

১. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাঙ্গালার নব্য লেখকদের প্রতি নিবেদন, বিবিধ প্রবন্ধ।

১১. "তুমি পাহাড়ে যোগেশ্বর—ভবসমুদ্রে কাণ্ডারী, ইতিহাসে বিধাতা, সংসারে মা-লক্ষ্মী।—মা-লক্ষ্মী খাটের উপর, রান্নাঘরে, ভাঁড়ারে।" (অবরোহ)।

১২. "এইস্থানে সেই স্বর্গের স্বর্ণকলস যাহা হইতে আনন্দসুধা বিনিঃসৃত হইতেছে।" (রূপক)।

১৩. "ব্রহ্ম আমার ধন, ব্রহ্মই আমার বিদ্যা ও জ্ঞান, ব্রহ্মই আমার মান ও প্রতিপত্তি।" (সার)।

১৪. "আমার জীবন যে সোনার জীবন হইল।" (উৎপ্রেক্ষা)।

কেশবচন্দ্র সেনের গদ্যের ভাষা স্থানে স্থানে ভারসাম্য রক্ষা করে ভাবটিকে নীভূত সংক্ষিপ্ততায় সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছে। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল—

১. "কেবল সত্যবাদী হইবার জন্য তো অনুরুদ্ধ নই, অমৃতভাষী হইবার জন্যও অনুরুদ্ধ।"

২. "কাঁদিতে কাঁদিতে আমি শস্য বপন করিয়াছিলাম, এখন হাসিতে হাসিতে শস্য সঞ্চয় করিতেছি।"

৩, "কাল রঙের মেঘোদয় হইলেই জানা যায়—বৃষ্টি বর্ষণ হইবে।"

৪. "বিশ্বাস লইয়া তিনি পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন, বিশ্বাসের জগতে তিনি ভ্রমণ করিয়াছেন।"

৫. "প্রার্থনা মানি বলিয়াই জীবন যাহা তাহা।"

৬. "উপবাসের ধর্ম বাস্তবিক উপহাসের ধর্ম। যিনি অন্ন সৃজন করিলেন, তাঁহার কি ইচ্ছা নহে যে আমরা সেই অন্ন আহার করি?"

৭. "প্রভু বলিয়া যত তাঁহার আজ্ঞা পালন করিবে, প্রসন্ন হইয়া তিনি তোমাকে তত সুখী করিবেন।"

কেশবচন্দ্রের গদ্যের ভাণ্ডারে ব্যঙ্গের সহাস্য বৈচিত্র্যও সুপ্রযুক্ত রূপে ব্যবহৃত হয়েছে—

১. "এই বালাম চাউলের অবস্থা যেমন, বাঙ্গালা ভাষার অবস্থাও তেমনি। দেখ, বাঙ্গালা ভাষা না কয় কে, না লেখে কে? বৈঠকখানা-নিবাসী যোহানীস সাহেবের অমানিশারূপিনী 'অর্দ্ধাঙ্গ' আপনার বিশাল বপু ক্ষুদ্র মোড়ার উপরে সংস্থাপন করিয়া দস্তার গুড়গুড়ীতে তামাক খাইতে খাইতে ইয়ারীং শোভিত গোলাকার তালফল-নিভানন হইতে প্রতিবাসিনীর সঙ্গে যখন বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় আলাপ করেন, তখন নিকটে দাঁড়াইয়া শুনিলে

কি আমাদিগের কিছু শিখিবার থাকে না? শ্রীরামপুরের সুধার্মিক পাদরী মহাশয়েরা কি বাঙ্গালা ভাষার জন্ম অল্প পরিশ্রম করিয়াছেন?...'মথি লিখিত সুসমাচার' হইতে 'ফুলমনি ও করুণার' অপরূপ বৃত্তান্ত পর্যন্ত এমনি অপূর্ব বাঙ্গালায় পরিপূর্ণ যেন সাহেব এবং মেম লোকেরা যখন ভাবে গদ্‌গদ হইয়া বিলাতী উচ্চারণে তাহা উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করেন, তখন ইচ্ছা হয় যে, পৃথিবী যদি দুই ভাগে ভাগ হয়, তাহা হইলে মাতৃভাষার সহিত তাহার মধ্যে প্রবেশ করি।"

২. "এখন তো রাস্তায় রাস্তায় স্কুল। বালকেরা ঝুরি ঝুরি পুস্তক পড়িতেছে, বি. এ., এম. এ. খেতাবও পাইতেছে। শুনিতে পাই, অশিক্ষিত লোকেরাও ইহাদের পায় পায় চলে, তাহারাও ইহাদের কথায় সায় দেয়, ইহাদের মত চিন্তা করে। সকলে বলে, এখন সভ্যতার প্রাদুর্ভাব।"

৩. "কালা বাঙ্গালী হয়ে ধবধবে সাহেবের সঙ্গে চালাকি? বিদ্যাবুদ্ধির তারতম্য থাকুক আর নাই থাকুক, কিন্তু বর্ণটায় কত তফাৎ। ধন্য হে সাহেব ভায়ারা। কি শুভক্ষণেই তোমরা জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। তোমরা যাহা কর তাহাই শোভা পায়।"

কেশবচন্দ্র সেনের গদ্য শব্দধনে সমৃদ্ধ। তিনি বঙ্গবাণীর অপূর্ব শিল্পী। বাঙলা ভাষাকে নবজাত শব্দ দ্বারা সমৃদ্ধ করেছেন—নূতন শব্দ সৃজনে তিনি সুদক্ষ। 'জীবনবেদ', 'শান্তিনিকেতন', 'যোগযান', 'নববৃন্দাবন', 'চিরজীবনসখা', 'ভাগবতী তনু' ইত্যাদি শব্দগুলি যেমন কবিত্বমণ্ডিত, তেমনই গভীর ভাবোদ্দীপক।

ঈশ্বরকে কখনও পিতৃভাবে কখনও মাতৃভাবে তিনি সাধনা করেছেন—ঈশ্বরকে বিভিন্ন নামে তিনি ডেকেছেন। ঈশ্বরের সৌন্দর্য ও শক্তি দেখে কেশবচন্দ্র সেন মুগ্ধ হয়েছেন। পরমাত্মার বিভিন্ন শক্তি ও সৌন্দর্যকে তিনি বিভিন্ন প্রার্থনা, উপদেশ ও বক্তৃতায় প্রায় আড়াই হাজার নামে অভিহিত করেছেন। মণিকা মহলানবীশ 'নামমালা' গ্রন্থে কেশবচন্দ্র সেন-প্রদত্ত ঈশ্বরের নামাবলী সংকলন করেছেন। কেশবচন্দ্র সেনের বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের উপর প্রভূত প্রভুত্ব না থাকলে তাঁর পক্ষে আড়াই হাজার শ্রুতি-মধুর নামে পরমাত্মার স্বরূপ প্রকাশ করা সম্ভব হত না। অফুরন্ত কবিত্ববোধ ও সুগভীর হৃদয়-উপলব্ধির পরিচয় আছে সহস্রাধিক নামাবলীর মধ্যে।

তাঁর ভাষায় চলতি প্রবাদ-বাক্যেরও কিছু কিছু ব্যবহার দেখি—'গবে ধন

নীলমণি', 'হাড় ভাজা ভাজা', 'হংস মধ্যে বক যথা', 'আনন্দে নৃত্য করা', "পৃথিবী ছু ফাঁক হওয়া', 'নাস্তানাবুদ', 'মাথা খাটান', 'পোকার মত বিজ বিজ করা', 'ঢলাঢলি', 'কুলার বাতাস দিয়ে বিদায় করা', 'পান থেকে চুন খসা' ইত্যাদি বহু শব্দের সুষ্ঠু প্রয়োগ কেশবচন্দ্র সেনের গদ্যকে দৈনন্দিন জীবনের কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। চলিত গদ্যরীতির ইতিহাসে বিবেকানন্দের ভূমিকা-পর্বটি কেশবচন্দ্র সেনই রচনা করেছিলেন বললে হয়তো অত্যুক্তি হয় না।

স্বামী-বিবেকানন্দের রচিত পত্রাকারে লিখিত ভ্রমণ-বৃত্তান্ত 'পরিব্রাজক'। এই গ্রন্থে তিনি চলিত গদ্য ব্যবহার করেন। এই গদ্য শুধু মুখের ভাষার কাছাকাছিই নয়, হীরকখণ্ডের মত স্বচ্ছ, দ্যুতিময়। উদাহরণ দেওয়া যাক্—

"মাফ ফরমাইয়ো ভাই, ভালা লোককে কাজের ভার দিয়েছ। রাম কহো! কোথায় তোমার সাতদিন সমুদ্রযাত্রার বর্ণনা দেবো, তাতে কত রঙ চঙ মশলা বার্নিশ থাকবে, কত কাব্যরস ইত্যাদি, আর কি না আবল-তাবল বকছি। ফলকথা, মায়ার ছালটি ছাড়িয়ে ব্রহ্মফলটি খাবার চেষ্টা চিরকাল করা গেছে, এখন খপ ক'রে স্বভাবের সৌন্দর্য-বোধ কোথা পাই বলো।"[১]

কিংবা—"একটি রঙে এত রকমারি, আর কোথাও দেখেছ? বলি, রঙের নেশা ধরেছে কখন কি—যে রঙের নেশায় পতঙ্গ আগুনে পুড়ে মরে, মৌমাছি ফুলের গারদে অনাহারে মরে?"[২]

অবশেষে আমাদের আলোচনার সারটুকু অনুধাবন করলে এই প্রত্যয়ে আমরা পৌঁছতে পারি যে, উনিশ শতকের গদ্যে কেশবচন্দ্র সেনের একটি স্বতন্ত্র স্থান রয়েছে। তাঁর গদ্যের বিষয় মিস্টিক ও আধ্যাত্মিক, গঠনরীতি সাধুভাষার কাঠামোয় চলিত গদ্য। এই ভাষা সুরেলা ও অলংকারবহুল। এর স্টাইলে আছে কাব্যভাবনা-মণ্ডিত এক স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব।

দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম-সাহিত্যের যে ধারার সূচনা করেছিলেন, কেশবচন্দ্র সেন সে ধারাকে পূর্ণতা দান করেন। বাঙলা গদ্যের জড়তা মুক্তির ইতিহাসে কেশবচন্দ্র সেনের স্বচ্ছ, সহজ, সরল, অলংকার-সমৃদ্ধ, কবিত্বমণ্ডিত গদ্য বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য।

১. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৬০। ২. তদেব, পৃঃ ৬৪।

কিন্তু এখানেই কেশবচন্দ্রের প্রতিভার শেষ কথা নয়। উনিশ শতকের ধর্মজীবনে কেশবচন্দ্র সেন মূর্তিমান্ প্রেরণা। তাঁর ভাবমূর্তি একদিকে জাতীয় জীবনে যেমন কর্ম-উদ্দীপনা এনে দিল, অপরদিকে বিধানবাদী ব্রাহ্মগণ বিভিন্ন ধারায় সাহিত্য রচনার অনুপ্রেরণা পেলেন। কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁর প্রচারক ভাইরা প্রধানতঃ 'নববিধান' প্রচার উদ্দেশ্যেই নব নব সৃষ্টির উন্মাদনায় মেতে উঠলেন। নববিধান-ব্রাহ্মধর্মে ভক্তির আগমনের সঙ্গে সঙ্গে কীর্তন একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে নিল। উনিশ শতকের সাহিত্যে নববিধানবাদী ব্রাহ্মগণ পুনরায় বিশিষ্ট মান ও আভিজাত্য দান করলেন। ব্রাহ্মদের দ্বারা রচিত সংগীত ও কীর্তনে বাঙলার সংগীতসম্পদ বৃদ্ধি পেল। দ্বিতীয়ত জীবনী ও আত্মজীবনী রচনার একটা প্রেরণা এল। স্বয়ং কেশবচন্দ্র সেনকে মহাত্মা কল্পনা করে একাধিক কেশবজীবনী রচিত হল। বিভিন্ন ধর্মালোচনার উপলক্ষে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের সাধু মহাত্মা ও সাধ্বী নারীদের অসংখ্য জীবনী রচিত হল। পূর্ব অধ্যায়ে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

নববিধান-ধর্মের মূল ভাব ছিল সকল ধর্মের প্রতি গভীর বিশ্বাস ও সর্বধর্ম-সমন্বয়। এই প্রেরণাতেই কেশবচন্দ্র সেনের জীবিতকালে ১৮৬৬ খ্রীঃ সংগৃহীত হয় 'শ্লোকসংগ্রহ।' কেশবচন্দ্র সেন হিন্দু ঐতিহ্যের সঙ্গে ব্রাহ্মচিন্তার একটি আপোষ রচনার কথা ভেবেছিলেন। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আর্য-জাগৃতির ক্ষণে জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, যাদবেশ্বর তর্করত্ন, চন্দ্রকান্ত তর্কালংকার, কালীচরণ বেদান্তবাগীশ, উমেশচন্দ্র বটব্যাল যখন বেদ, উপনিষদ্, ন্যায় ও দর্শন-আলোচনায় বাঙলা সাহিত্যকে আলোড়িত করে তুলেছেন, তখন কেশবচন্দ্র সেনের 'ব্রহ্ম-গীতোপনিষদ্', 'শ্লোকসংগ্রহ' ইত্যাদি রচনায় হিন্দু, ব্রাহ্ম ও সর্বধর্মসংস্কৃতির মিলনভূমি রচিত হয়েছিল। বিধানবাদী ব্রাহ্মগণ শুধু হিন্দুশাস্ত্র নয়, খ্রীষ্টান ধর্ম, মুসলমান ধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, শিখধর্মের গভীর ও বিস্তারিত অনুশীলন ও শাস্ত্রচর্চা করেছিলেন। বাঙলা সাহিত্যে বাঙলায় কোরাণ অনুবাদের প্রথম কৃতিত্ব নববিধানের ভক্ত প্রচারক গিরিশচন্দ্র সেনের। বৌদ্ধ ধর্মের আলোচনার সূত্রপাত ঘটে বিধানবাদী প্রচারক অঘোরনাথ গুপ্ত ও কেশবচন্দ্র সেনের অনুজ কৃষ্ণবিহারী সেনের গদ্য রচনায়। বাঙলা সাহিত্যে মহেন্দ্রনাথ বসুই প্রথম গুরু নানকের জীবন চরিত ও শিখধর্মের ইতিবৃত্ত সার রচনা করেন। বিভিন্ন ধর্ম ও শাস্ত্রের

আলোচনা ও অনুশীলনের ক্ষেত্রে বাঙলা গদ্য-সাহিত্যে নববিধানবাদী সাহিত্যিক গোষ্ঠীর বিশিষ্ট স্থান স্বীকার করতে হয়। কিন্তু ভাবতে বিস্ময় জাগে যে, বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা যখন মধ্য গগনে, তখনও এই নববিধানবাদী সাহিত্যিকগণ নিজেদের ধর্মজালের ব্যূহে আবদ্ধ হয়ে আছেন। মনে হয়, ধর্ম-আলোচনা ত্যাগ করে বিষয়ান্তরে যাবার স্থান তাঁদের ছিল না, কারণ ভক্তি ও তত্ত্বজিজ্ঞাসা তাঁদের সংসার-বিমুখ সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীতে রূপান্তরিত করেছিল। বিপিনচন্দ্র পাল মনে করেন, "ব্যক্তিগত চরিত্রের শুদ্ধতাসাধন এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রেরণায় সমাজসংস্কার আধুনিক বাংলার ব্রাহ্মযুগের প্রধান লক্ষণ ছিল।"

নববিধানবাদিগণের রচিত সাহিত্যেও নীতিবোধ, ব্যক্তি-জীবনের শুদ্ধতা সাধন, সুরুচি, শ্লীলতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এই কারণেই হয়তো 'ব্রাহ্মযুগের বাংলা সাহিত্যে তেমন একটা মৌলিকতা ফুটিয়া উঠে নাই। নবযুগের বাংলা সাহিত্যে এই মৌলিকতাটা প্রথম ফুটিতে আরম্ভ করে বঙ্গদর্শনে।'[১]

বাঙলা সাহিত্যের মধ্যযুগে মঙ্গলকাব্য ও বৈষ্ণব কাব্যের ধারা গড়ে উঠেছিল, সেও শুধুমাত্র ধর্মকে কেন্দ্র করে। বিশিষ্ট ধর্ম-মত, আপন আপন ধর্ম-প্রচার ও গোষ্ঠী-চেতনা বৈষ্ণব সাহিত্য ও মঙ্গলকাব্যের বিষয় ছিল। কিন্তু এই দুই সাহিত্যের ধারা পরবর্তী দুই শতাব্দী-কাল বাঙলা কাব্যকে প্রভাবিত করে এসেছে। এর একমাত্র কারণ, ধর্ম বা গোষ্ঠী-প্রীতির ঊর্ধ্বে এঁদের কাব্যে ছিল চিরন্তন জীবনসত্য ও সুগভীর মানবিক উপলব্ধি। কিন্তু নববিধান-ধর্মকে অবলম্বন করে কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁর অনুগামিগণ যেসকল সাহিত্যকর্ম রেখে গেছেন তার মধ্যে, লৌকিক জীবনসত্য অপেক্ষা পারলৌকিক অনুভূতি প্রবল হয়ে ব্রহ্মকেই সত্য জেনে জগৎকে মিথ্যা বলে পরিত্যাগ করেছে। সমসাময়িক কালে কিংবা পরবর্তী কালে বাঙলা সাহিত্যে নববিধানবাদী সাহিত্যিকগণের প্রভাব সীমিত হয়ে পড়েছে। জীবন-চেতনাহীন সাহিত্য শুধু নিজেদের ধর্মগোষ্ঠীর মধ্যে আবদ্ধ থেকেছে। এইসব সাহিত্যে জাতি, ধর্ম, দেশ, কাল নির্বিশেষে এমন কিছু চিরকালীন আবেদন ছিল না যা ভাবীকালের পাঠক বা লেখককুলকে আকৃষ্ট করতে পারে।

১. বিপিনচন্দ্র পাল, নবযুগের বাংলা, পৃঃ ১৬০।

প্রকৃতপক্ষে নববিধান-সাহিত্যের কোন উত্তরসূরী নেই বাঙলা সাহিত্যে। নববিধান আন্দোলনে নানা কারণে ভাঙন ধরেছিল। কেশবচন্দ্র-প্রবর্তিত নববিধান ও তাঁর ভক্তিবাদ তৎকালীন নবীন ও প্রগতিশীল ব্রাহ্মদের দ্বারা বহুনিন্দিত হয়েছিল। 'কুচবিহার বিবাহ', 'মুঙ্গেরী ভক্তি', কেশবচন্দ্র সেনের 'খ্রীষ্টভক্তি' ও 'ইংরেজপ্রীতি' উনিশ শতকের বহু মনীষী ভাল চোখে দেখেননি। সমকালেই এক বিরাট প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি নববিধানের মাহাত্ম্য ও অগ্রগতিকে ধিক্কৃত করেছিল। ব্রাহ্মধর্মের তৃতীয় শাখা 'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হল। শিবনাথ শাস্ত্রী আচার্য হলেন। নববিধান আন্দোলন স্তিমিত হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে নববিধান-সাহিত্যের অগ্রগতিও রুদ্ধ হল।

দ্বিতীয়ত, সমকালীন যুগন্ধর দুই সাহিত্যিক কেশবচন্দ্র সেনের রচিত সাহিত্য সম্পর্কে বিশেষ অবহিত ছিলেন না। বঙ্কিমচন্দ্রের মানসলোকে ব্রাহ্মধর্মের কোন স্থান ছিল না—ব্রাহ্ম সাহিত্যের তিনি কোন খবর রাখতেন না। তাঁর কৃষ্ণ-চরিত্র প্রকাশিত হত ধারাবাহিক ভাবে 'নবজীবন' পত্রিকায় ১৮৮৪ খ্রীঃ (বাং ১২৯১ আশ্বিন সংখ্যা) থেকে, কিন্তু ইতিপূর্বেই ১৮৭৬ খ্রীঃ, ১০ই ডিসেম্বর 'ইণ্ডিয়ান মিরর' কাগজে কেশবচন্দ্র সেন পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান-প্রধৌত মনন নিয়ে কৃষ্ণ-সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। 'সানডে মিরারে' ১৮৮০ খ্রীঃ, ১২ই ডিসেম্বর ও ১৪ই আগষ্ট ১৮৮১, 'দি নিউ ডিসপেনসেশন' পত্রিকায় ১৮৮১ খ্রীঃ ২২শে আগষ্ট সম্পর্কিত আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। এছাড়া নববিধানের একনিষ্ঠ ভক্ত প্রচারক গৌর-গোবিন্দ রায়ও শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও শ্রীমদ্ভাগবত-গীতা পর্যালোচনা করেছিলেন। কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁর অনুগামী প্রচারকগণের এই জাতীয় কর্মপ্রচেষ্টা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পূর্ণ নিরাসক্ত ছিলেন। কালীনাথ দত্ত বলেন, "বঙ্কিমের পূর্বে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী ও পরে কেশব সেনের দল ধর্মতত্ত্ব পত্রিকায় একবার কৃষ্ণ-চরিত্র উদ্ধারের চেষ্টা হয়। বঙ্কিমচন্দ্র এ বিষয়ে কোন সংবাদ অবগত ছিলেন না, এ বিষয়ে আমিই তাঁহার প্রথম সংবাদদাতা।"[১]

কেশবচন্দ্র সেন সম্পর্কে এই নিরাসক্তি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও দেখিয়েছেন। অবশ্য এর পিছনে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও কেশবচন্দ্র সেনের প্রথম জীবনের মনান্তর দায়ী। রবীন্দ্রনাথের ভাষণে কারণটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—"আমি

১. বঙ্কিমচন্দ্র, কালীনাথ দত্ত, প্রদীপ ২য় ভাগ ১৩০৬ নবম সংখ্যা।

এই ভক্তের সময়ে জন্মিয়াও তাঁর সঙ্গলাভের সৌভাগ্য ভোগ করিতে পারি নাই। তিনি যখন স্বর্গীয় জ্যোতিতে উদ্দীপ্ত হইয়া হিন্দু আত্মীয়গণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলেন এবং আমার পিতৃগৃহে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন তখন আমি সদ্যপ্রসূত শিশু। তারপর যখন আমি বালক, কিছু কিছু জ্ঞান হইয়াছে, তখন ব্রাহ্ম-সমাজে বিরোধের সময়। আমার মনেও সেই বিরোধের ভাব। আমার মনে হইত, তিনি যে ধর্ম, যে সত্য প্রচার করিতেছেন, তাহা আমাদের স্বদেশীয় নহে, বিদেশী। তাঁহাকে লইয়া যখন খুব গোলমাল হইতেছে তখন তাঁর প্রতি আমার একটা বিরোধ ভাব আসিয়াছিল, এটা আমার বেশ মনে আছে। স্বীকার করিতে হইবে, আমার অন্তরের ভিতরে বিরোধভাবের সঞ্চার আমার বালককাল হইতেই হইয়াছিল। কি একটা কুহেলিকা আসিয়াছিল যে তাঁর সঙ্গে সে যোগস্থাপন করিতে পারি নাই। তখন বোল ছিল স্বদেশী। এই তখন দম্ভ, দর্প ছিল। আমার মনে হইত বুঝি আমাদের স্বদেশের যে মাহাত্ম্য আছে, বুঝি সেই মহাপুরুষ সে গৌরব খর্ব করিয়াছেন।"[১]

প্রকৃত পক্ষে কেশবচন্দ্র সেনের সমকালেই বঙ্কিমচন্দ্র এবং তৎপরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবে বঙ্গসাহিত্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হল। ধর্ম, গোষ্ঠী, জাতি, দেশ ও কাল নির্বিশেষে সর্বদেশিক, সর্বকালিক মানবজীবন রসসমৃদ্ধ হয়ে উঠল বঙ্গসাহিত্য। এইভাবে একদিকে সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের অনুবর্তন, অপরদিকে বাস্তবতার উৎকর্ষ প্রকাশ ও অত্যাধুনিক নানাবিধ 'ইজমের' অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যিকগণ সক্রিয় হয়ে উঠলেন। এই শতাব্দীর দ্রুত পরিবর্তনশীল সামাজিক প্রচ্ছদপটে কেশব-মণ্ডলীর রচিত সাহিত্য কিছুটা অনাদৃত ও অবহেলিত হয়ে রইল।

কিন্তু মনে রাখতে হবে, এঁদের সাহিত্যরচনায় এমন কিছু বিস্ময়কর অভিনবত্ব ছিল, যার গুণে রবীন্দ্রনাথও শেষ পর্যন্ত আকৃষ্ট হয়েছিলেন। যে নিরাসক্তি কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁর প্রচারক ভাইদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছিলেন, সেটি বেশি দিন স্থায়ী হতে পারেনি। কেশবচন্দ্রের অনুগামী সাহিত্যিকগণের কনিষ্ঠ দলটি রবীন্দ্রযুগেই বর্ধিত হয়েছেন; রবীন্দ্রনাথের কাছের মানুষ হয়ে উঠছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাহিত্যসূত্রে যুক্ত

---

১. সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তৃতা, কেশবচন্দ্র সেনের জন্মোৎসব উপলক্ষে স্কটিশচার্চ কলেজে ৮ই জানুয়ারী ১৯১০।

হয়েছিলেন কেশবচন্দ্রের অনুজ কৃষ্ণবিহারী সেন। উভয়েই 'সারস্বত-সমিতি'র যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন। কৃষ্ণবিহারী সেন রবীন্দ্রনাথের 'সাধনা' পত্রিকায় নিয়মিত লেখক ছিলেন। বিধানবাদী কৃষ্ণবিহারী সেনের 'বুদ্ধচরিত' ধারাবাহিকভাবে ১২৯৯ বঙ্গাব্দ থেকে 'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। শুধু তাই নয়, কৃষ্ণবিহারী সেনের বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ ও রসরচনাও 'সাধনা' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ সাগ্রহে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু অকালমৃত্যু কৃষ্ণবিহারী সেনের প্রতিভায় ছেদ আনল। তাঁর মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "তাঁহার ন্যায় বহু অধ্যয়নশীল উদারবুদ্ধি, সহৃদয় ব্যক্তি বঙ্গদেশে অতি বিরল। এই বন্ধুবৎসল স্বদেশহিতৈষী ঈশ্বরপ্রেমিক মহাত্মা মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে বঙ্গ-সাহিত্যের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, 'সাধনা'র পাঠকগণ তাহার পরিচয় পাইয়াছেন। এই মনস্বী পুরুষের সহায়তায় বঙ্গভাষা বিশেষ আশান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল, সে আশা পূর্ণ না করিয়াই তিনি অন্তর্হিত হইয়াছেন।"[১]

এটি শুধু শোকগাথার প্রশস্তি মাত্র নয়, এটি বিদগ্ধ সমালোচকের সাহিত্য-বিচার। রবীন্দ্রনাথ মোহিতচন্দ্র সেন ও বিনয়েন্দ্রনাথ সেনের প্রতিভাকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। দার্শনিক পণ্ডিত বিনয়েন্দ্রনাথ সেনকে লিখিত একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "আপনার বইখানি—("ইনটেলেকচুয়াল আইডিয়াল") আমাকে অত্যন্ত সুগভীরভাবে আকর্ষণ করিয়াছে। আপনি যদি কেবল দার্শনিকের মত লিখতেন, তবে আমি আনন্দ ও শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইতাম, কারণ দর্শনশাস্ত্রে আমি অনভিজ্ঞ। জ্ঞানের কথাকে আপনি কল্পনার দ্বারা দীপ্যমান করিয়া তুলিয়াছেন।...শুভদৈবক্রমে মোহিতবাবুর সহিত আমার আলাপ হইয়াছে, আলাপের চেয়ে অনেক বেশি হইয়াছে বলিতে পারি। তিনি আমাকে আপনাদের সকলের দিকেই আকর্ষণ করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার সহিত সম্বন্ধেই আপনাদের সকলের সহিত আমার সম্বন্ধ হইয়াছে—সেই সম্বন্ধ পাকা করিবার জন্য আমি সুযোগের অপেক্ষা করিতেছিলাম। আপনাদিগকে আমার প্রয়োজন আছে। আমাদের দেশে ভাবুক শ্রেণী বিরল—জ্ঞানের সঙ্গে ভাবের সঙ্গে একেবারে নাড়ীর সম্পর্ক এমন লোক অল্প বলিয়া আমার মানসপ্রকৃতি যেন ক্ষুধিত হইয়া থাকে।"[২]

মোহিতচন্দ্র সেনেই প্রথম ব্যক্তি যিনি রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ সম্পাদনা

১. সাধনা, ৪র্থ বর্ষ, দ্বিতীয় ভাগ, ১৩০২ সাল। ২. বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৫৮, পৃ. ৫৯-৬০।

করেন। শান্তিনিকেতনের ব্রহ্ম-বিদ্যালয়ের প্রতি ছিল তাঁর গভীর যোগ। 'বাতায়নে'র কবি উমা দেবীকে কাব্যে নতুনত্ব আনবার জন্য রবীন্দ্রনাথ উৎসাহিত ও অভিনন্দিত করেন। এমন কি, রবীন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্র সেনের মৃত্যুর প্রায় পঁচিশ বছর পরে নিজের মনের 'বিরোধ-ভাব'টি দূর করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, কেশবচন্দ্রের "বিধান অনন্তকালের বিধান, সেই কথা সে মহাপুরুষ প্রকাশ করেছেন; সর্বোচ্চ বাণী তিনি জীবনের মধ্য দিয়ে নূতন করে প্রকাশ করেছেন।···যিনি সত্যস্বরূপ, তাঁকে সকল ধর্মের মধ্যে প্রকাশ করা, গ্রহণ করা,—এই কথা সত্য, ব্রহ্মানন্দের মনের কথা, এবং তাই নূতন করে লাভ করে, নূতন করে নববিধান বলে প্রকাশ করেছেন।"[১]

তাই মনে হয়, নববিধান-সাহিত্য সম্পূর্ণ নিষ্ফলা নয়। বিংশ শতাব্দীর বঙ্গসাহিত্যে নববিধানবাদী সাহিত্যিকগণের মৃদু পদক্ষেপ রবীন্দ্রনাথের মত প্রতিভাধর সাহিত্যিককেও সচেতন করেছিল।

বিংশ শতাব্দীর বাঙলা সাহিত্যে নববিধান-সাহিত্যিকগোষ্ঠী বাঙলা সাহিত্যকে কতটুকু দিয়েছে আর কতখানিই সে প্রভাবিত করতে পারে, কবি-সমালোচকের দৃষ্টিতে সেটা এড়িয়ে যায়নি। তাই তিনি পূর্বোল্লিখিত পত্রে জানিয়েছেন, "নব্য ভারতের তপোবন আপনারা রচনা করিবেন সেখানে নব্য ভারতের নবীন ব্যাসের ব্রহ্মসূত্র উচ্চারিত ও নবীন দ্বৈপায়নের নব-মহাভারত গীত হইবে—সেখানে সকল প্রচার চিত্ত-বিলোপহীন উদার শান্তির মধ্যে তপস্যা ও প্রতিভা সৌন্দর্যে সম্মিলিত হইয়া ঊর্ধ্বমুখী হোমশিখার ন্যায় অনন্তের অভিমুখে উচ্ছ্বসিত হইবে।"[২]

কেশবচন্দ্র সেন ও অন্যান্য ভক্ত প্রচারকগণ নববিধানের মাহাত্ম্য ও জয় ঘোষণা করতে গিয়ে সত্যই বাঙলা সাহিত্যে 'নবমহাভারত'ই সৃষ্টি করেছিলেন। ভগবৎতত্ত্ব ব্যাখ্যা, মহাপুরুষ, সাধ্বী নারী ও ভক্ত প্রচারক-গণের জীবনী-রচনা, ব্রহ্মসঙ্গীত কীর্তন ও ভক্তিমূলক নাটক রচনার মধ্য দিয়ে নব-বিধানবাদী সাহিত্যিকগণ ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা সাহিত্যে 'নূতন ঊষার স্বর্ণদ্বার' খুলে দিয়েছিলেন।

কেশবচন্দ্র ও নববিধান-ধর্মের সত্যাশ্রিত তপস্বিসম্প্রদায়ের সাহিত্য-সাধনায় আছে জ্ঞান থেকে ভক্তিতে, বাসনা থেকে উপাসনায়, জাগতিক

---

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতির ভাষণ, ধর্মতত্ত্ব, ১২ই মাঘ ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত।
২. বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৪৮।

অশালীনতা থেকে শুদ্ধ বুদ্ধ সৌন্দর্যে উত্তরণের একান্ত তপোনিষ্ঠা। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠাতা সকল সৌন্দর্যের, সকল আনন্দের ও সকল রসের উৎস। ভক্তযোগিগণ তাই যথার্থ শিল্পদৃষ্টি নিয়ে ছন্দে, গানে, ভাষায়, রূপে, রেখায় ও বর্ণে সেই মহান্ শিল্পীর প্রতিবিম্বটি খুঁজে পেয়েছেন তাঁদের সাহিত্যে। কেশবমণ্ডলীর সাহিত্যিকগণ শিল্পকে সংযোজিত করেছিলেন আধ্যাত্মিক চেতনার সঙ্গে—এই সত্য ও শিব চেতনা বহুমানুষের জীবনের ছিন্ন পত্র-লিপিকায় রঙ্এর তুলিকা বুলিয়ে বর্ণাঢ্য করে তুলেছিল। এঁরা তাই মহাশিল্পী। প্রায় সাত দশক ধরে এই অধ্যয়নপরায়ণ ভক্ত ব্রহ্মসন্তানগণ বিশ্বাস ও ভক্তির দীপ জ্বালিয়ে বঙ্গসাহিত্যে সৌন্দর্য ও দৈবী ভাবকে অপাবৃত করার যে গুরু দায়িত্ব বহন করেছিলেন, তার বিস্তৃতি ও গভীরতা বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে সম্পূর্ণরূপে স্বীকৃতিলাভের যোগ্য।

## সাহায্যকারী গ্রন্থের তালিকা


| | |
|---|---|
| অক্ষয়কুমার দত্ত | বাহ্য বস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার |
| অজিতকুমার চক্রবর্তী | মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর |
| অমিয়কুমার মজুমদার সম্পাদিত | ভারতসংস্কৃতি |
| অরবিন্দ পোদ্দার | উনবিংশ শতাব্দীর পথিক, শিল্পদৃষ্টি |
| অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় | বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাস, বাংলা গদ্যের শিল্পী সমাজ |
| অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় | বাংলা সাহিত্যের রেখালেখ্য |
| অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় | উনিশ-বিশ, বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত |
| আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ কর্তৃক সম্পাদিত | দশোপদেশ |
| আজিমুজ্জামান | মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য। মুক্তধারা। ভারতে প্রথম প্রকাশ অগ্রহায়ণ ১৩৭৮ নবেম্বর ১৯৭১ |
| কাজী আবদুল ওদুদ | বাংলার জাগরণ, শাশ্বত বঙ্গ |
| উল্লাহ্ রফিক | হাদীস শরীফ, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৯ |
| কেশবচন্দ্র সেন | জীবনবেদ প্রচারকগণের সভার নির্ধারণ, অধিবেশন, সেবকের নিবেদন—তৃতীয় খণ্ড, আচার্যের উপদেশ—দশম খণ্ড |
| কৃষ্ণবিহারী সেন | নববিধান কি ? |
| খগেন্দ্রনাথ মিত্র | কীর্তন |
| গৌরগোবিন্দ রায় | আচার্য কেশবচন্দ্র ( শতবার্ষিকী সংস্করণ ) |
| ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল | ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত |
| দেবীপদ ভট্টাচার্য | বাংলা চরিত-সাহিত্য |

| | |
|---|---|
| দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর | আত্মজীবনী |
| | ব্রাহ্ম সমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত |
| দেবেন্দ্রনাথ বসু | মহাত্মা বিনয়েন্দ্রনাথ সেনের জীবনী |
| নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস | অক্ষয়চরিত |
| নিত্যানন্দ বিনোদ গোস্বামী | বাংলা সাহিত্যের কথা |
| নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় | মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত |
| প্রমথনাথ বিশী ও বিজিতকুমার দত্ত | বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক |
| প্রভাত বসু | মহারানী সুচারু দেবীর জীবনকাহিনী |
| বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | বিবিধ প্রবন্ধ |
| বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী | ব্রাহ্ম সমাজের বর্তমান অবস্থা |
| বিনয় ঘোষ | সংবাদপত্রে বাঙলা সমাজচিত্র |
| বিপিনচন্দ্র পাল | নবযুগের বাংলা সাহিত্য ও সাধনা চরিত্র চিত্র |
| বিপিনবিহারী গুপ্ত | পুবাতন প্রসঙ্গ |
| ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় | সাবাদপত্রে সেকালের কথা |
| | শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ( সমসাময়িক দৃষ্টিতে ), রামমোহন রায়, |
| | ( সাহিত্য সাধক চরিতমালা ) বাংলা সাময়িক পত্র |
| | বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস |
| | সাময়িক পত্র সম্পাদনে বঙ্গনারী, বাংলা সাময়িক পত্রের তালিকা |
| ভবানীগোপাল সান্যাল-সম্পাদিত | বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিবিধ প্রবন্ধ' |
| মণি বাগচি | কেশবচন্দ্র |
| মণিকা মহলানবিশ-সম্পাদিত | ব্রহ্মানন্দ শ্রীকেশবচন্দ্রের পত্রাবলী |
| যোগেশচন্দ্র বাগল | কলিকাতার সংস্কৃতি-কেন্দ্র |
| | রামকমল সেন ( সাহিত্যসাধক চরিতমালা ) |
| | কেশবচন্দ্র সেন ( সাহিত্যসাধক চরিতমালা ) |
| | উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা |
| যোগেন্দ্রলাল খাস্তগীর সাম্পাদিত | সারদাসুন্দরী দেবীর আত্মকথা |

| | |
|---|---|
| যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত | কেশবচন্দ্র ও বঙ্গসাহিত্য, বঙ্গের মহিলা কবি |
| রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | সাহিত্য, আত্মপরিচয়, কাব্যগ্রন্থ, ভারতপথিক রামমোহন |
| রাজনারায়ণ বসু | আত্মচরিত, একাল ও সেকাল |
| শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | বঙ্কিম-জীবনী |
| শশিভূষণ দাশগুপ্ত | বাঙলা সাহিত্যের নবযুগ |
| | বাঙলা সাহিত্যের একদিক |
| শিবনাথ শাস্ত্রী | আত্মচরিত |
| | রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ |
| | মাঘোৎসবে বক্তৃতা ১৯১০ খ্রীঃ |
| সতীকুমার চট্টোপাধ্যায় | সমন্বয়মার্গ, নীতি-বিদ্যালয়ের কথা |
| সুকুমার সেন | বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, মডার্ণ বুক এজেন্সি ১৩৫৫ |
| | বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য |
| | বাঃ সাঃ ইঃ—দ্বিতীয় খণ্ড। দ্বিঃ সং বর্ধমান —সাহিত্যসভা ১৩৫৬; ইসলামী বাংলা সাহিত্য : বর্ধমান সাহিত্যসভা ১৩৫০ |
| সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় | জাতি সংস্কৃতি ও সাহিত্য |
| সোমেন বসু | বাংলা সাহিত্যে আত্মজীবনী |
| হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় | বাঙ্গালার কীর্তন ও কীর্তনীয়া |
| হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত | বঙ্কিমচন্দ্র |
| Banerjee, G. C. | Keshub Chunder Vol. I, Vol. II. |
| | Keshub as seen by his opponents. |
| Basu, Prem Sunder | Life & Works of Brahmananda Keshub. |
| Bose, Nemai Sadhan | The Indian Awakening and Bengal. |
| Bose, Sures Chandra | Life of Protap Chander Mazoomder. |
| Carpenter, Mary | Last Days in England of the Rajah Rammohun Roy. |

| | |
|---|---|
| Collet, Sophia Dobson | Life & Letters of Raja Rammohun Roy. |
| | A Historical Sketch of the Brahmo Samaj. |
| Dutta, Dwijadas | Behold the Man. |
| Dutta, S. N. | Life of Binayendra Nath Sen. |
| Evelyn, Underhill | Mysticism. |
| F. Max Muller | Biographical Essays |
| Gupta, Atul Chandra | Studies in the Bengal Renaissance. |
| Gupta, U. K. | Max Muller on Ram Krishna and Keshub. |
| Gupta, Nagendra Nath | Keshub Chander Sen & the people among whom he lived and worked. |
| Hay, Stephen | Asian Ideas of East and West |
| Koar, Jamini Kanta | Life—its Divine Dynamics |
| Kopf, David | British Orientalism and the Bengali Renaissance. |
| Kopf, David and Joander Safiuddin Ediris | Reflections on the Bengal Renaissance. |
| Leonard | A History of the Brahmo Samaj from itsrise to the present day |
| Muhammad Enamul Haq | A History of Sufi-ism in Bengal, Asiatic Society of Bangla Desh, April, 1957. |
| Mazoomdar, P. C. | Life & Teachings of Keshub Chunder Sen. |
| | Faith and Progress of the Brahmo Samaj. Lectures in America and other papers. |
| | Tour Round the world |
| Mitra, Peary Chand | Life of Dewan Ramcoumul Sen |
| Mohit Chander Sen | Centenary Publication |
| Pigot's Booklet | A Brief Reminiscence of Kesub Chunder Sen |

| | |
|---|---|
| Rev. G. Howells | The contribution of Keshub to Modern Christian Thought |
| Sastri, Shivnath | History of Brahmo Samaj |
| Sen, Amit | Notes on Bengal Renaissance |
| Sen, Keshub | Discourses & writings |
| | Essays : Theological and Ethical |
| | Nine Letters on Educational Measures |
| | Lectures in India |
| | Lectures in England |
| | The Book of Pilgrimages |
| Sen, Krishna Bihari | Romance of Language |
| Sen, Promotha Lal | Plea for the study of Keshub |
| Smith, Wilfred Cantwell | Islam in Modrn History— Princeton University Press WEW Jersey 1957. |


## পত্র ও পত্রিকা


| | |
|---|---|
| তত্ত্ববোধিনী | অগ্রহায়ণ, ১৭৮৬ শকাব্দ |
| ধর্মতত্ত্ব | মাঘ ১৩৬৬, আশ্বিন ১৮০২ শকাব্দ, কার্তিক ১৮০৮ শকাব্দ, অগ্রহায়ণ ১৩৫০ বঙ্গাব্দ, ভাদ্র, ১৮২৬ বঙ্গাব্দ |
| প্রদীপ | ১৩০৬, দ্বিতীয় ভাগ, নবম সংখ্যা |
| প্রবাসী | শ্রাবণ, ভাদ্র, ১৩২৮ |
| প্রচার | অগ্রহায়ণ ১২৯১ |
| বঙ্গদর্শন | ১৩১৩ |
| বঙ্গশ্রী | দ্বিতীয় বর্ষ, ১ম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা |
| বিশ্বভারতী পত্রিকা | কার্তিক-পৌষ, ১৩৫৮ |
| ভারতী | পৌষ, ১২৯১ |
| যুগান্তর | নভেম্বর ১৯৫৩ |
| সংবাদপ্রভাকর | মে, ১৮৫৯ |

| | |
|---|---|
| সাধনা | ১৩০১ দ্বিতীয় ভাগ, তৃতীয় বর্ষ |
| | ১৩০১ দ্বিতীয় ভাগ, চতুর্থ বর্ষ |
| সুলভ সমাচার | ভাদ্র ১২৭৭, শ্রাবণ ১২৭৮, বৈশাখ ১২৮০ |